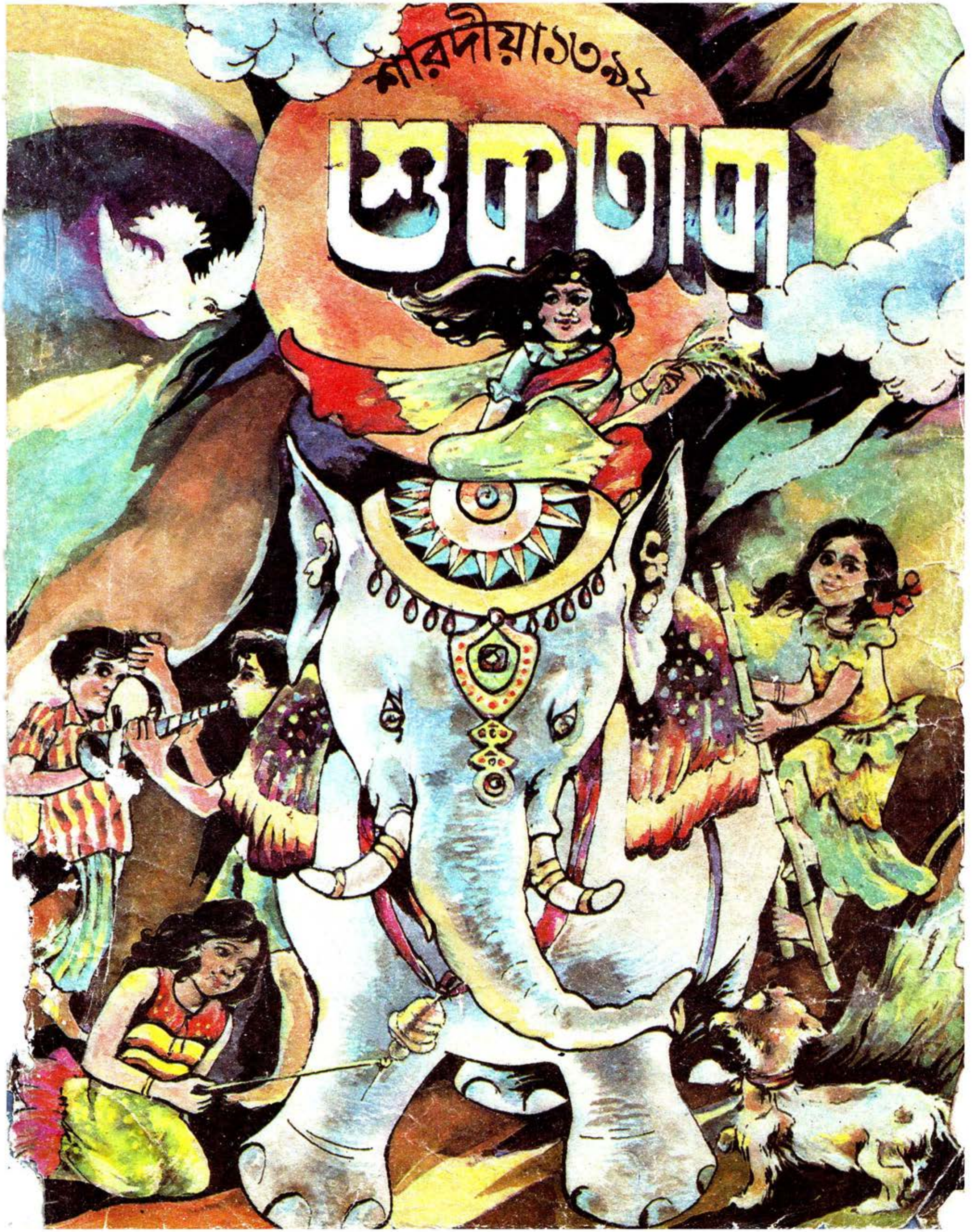
শারদীয়া ১৩৯২
শুকতারা

সুতি ও সিল্ক, ছাপা শাড়ী, ধুতি,
পলিয়েস্টার সার্টিং ও স্যুটিং, রেডিমেড পোষাক ও
গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি

তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
৪৫, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭২

ABC/T-272/85

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি

প্রতিবারের মতন দেবীর কাছে এবারেও আমাদের সেই একই প্রার্থনা।
সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে সকলের জীবন ভরে উঠুক।

কেয়োকার্পিন প্রস্তুতকারক Dey's® যাদের যত্নেই আপনার আস্থা

CLARION C-DMC-3

নিয়ে তুমি এলে-
শারদ প্রাতে...
দুর্গাপূজার আনন্দঘন দিনগুলি
আবার এল। অমঙ্গলের হোক
চির অবসান—আজকের এই
শুভক্ষণে আপনার ত্বকের সম্পূর্ণ
পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে এল।
Boro calendula*
ANTISEPTIC CREAM
Boro calendula*
ANTISEPTIC CREAM
বোরো ক্যালেনডুলা*
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়।
HL
হ্যানিম্যান ল্যাবোরেটরী, কলিকাতা-১২
*A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12
anjan chakraborty, Cal-7

সূচীপত্র

শুকতারা

আশ্বিন ১৩৯২
সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

সম্পূর্ণ উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়–পিনডিদার তেলতত্ত্ব ১০৪
সমরেশ বসু–পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে ২৪৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়–ক্যাসিয়ার কালাচাঁদ ১৪৬
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়–পান্ডব গোয়েন্দা ৩৬
অনিল ভৌমিক–সর্পদেবীর গুহা ৭০
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়–ফ্রি কিক ২১২

নানা স্বাদের গল্প

বিমল মিত্র–ঘাটবাবু ২৯০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত–চাকর ৭
প্রেমেন্দ্র মিত্র–ঘনাদা এলেন ২৩৩
আশাপূর্ণা দেবী–গোবিন্দগোপালের শত্রুরা ২৬
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়–ফুটো ১১
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়–বড়মামার স্বপ্ন ২৬৩
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়–তিনুকাকার অন্তর্ধান রহস্য ৫১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়–নীল মানুষের সংসার ১৩৪
প্রফুল্ল রায়–হাতের কাজ ২৮৪
নবনীতা দেব সেন–পদ্ম কদম ২৪১
বুদ্ধদেব গুহ–কিত্নামে লায়া? ২৭৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ–মড়া যদি জ্যান্ত হয় ৮৫
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়–প্রেতাত্মার সন্ধানে ১৪০
চিত্তরঞ্জন মাইতি–ফাদার আলফানসো ১৭৬
রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়–খেলোয়াড় ১৭৩
সংকর্ষণ রায়–বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তি ১৮৩
দেবল দেববর্মা–আজব চুরি ৯৮
অজেয় রায়–ভুতুড়ে বাড়িতে রাত ১৯৮
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়–ফাংশান পাগল গনুদা ২০৫
পরেশ ভট্টাচার্য–এমন ঘটনাও ঘটে ২১
নটরাজন–ক্যা কসুর ২৬৮
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য–ঘুমন্ত পুরী ২২৬
সুধীন্দ্রনাথ রাহা–উর্দিটা দেখিয়ে এসো ১৯১
মানবেন্দ্র পাল–অলৌকিক ক্যালেন্ডার ৩০৩
শিশিরকুমার মজুমদার–দিশারী ৩১০
শচীন দাশ–মহাশূন্যের বিভীষিকা ২৯৭

ভ্রমণ

ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী–চামড়ার নৌকোয় আটলান্টিক পার ১৬৮
শতদল ভট্টাচার্য–অম্বিকাতীর্থ জ্বালামুখী ৬৬

ম্যাজিক

পি.সি.সরকার (জুনিয়ার)–তিনটে ম্যাজিক ৩১৭

ফিচার

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়–একটি আবিষ্কারের কাহিনী ১৫
দাদুমণির চিঠি ১৫৮
তোমাদের পাতা ১৫৯
মজার পাতা ৩১৯

কবিতা ও ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়–পায়রা পুরাণ ৫
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী–রাত দুপুরে ২৪৫
অমিতাভ চৌধুরী–গ্রামের নাম কলকাতা ৩০৯
রেবতীভূষণ ঘোষ–ব্যাঘ্রবিলাপ ২৫
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়–দাদুর কীর্তি ৫৭
মায়া বসু–তুলসীদাস ও তস্কর ১৪৪
মুস্তাফা নাশাদ–হক কথা ১৫৭
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত–পুষি ৯৭
সুরজিৎ ঘোষ–গরিলার অভিযান ১৯৭
মৌসুমী গুপ্তা–আদ্যিকালের বুড়ি ২৮৯

ছবিতে গল্প

নারায়ণ দেবনাথ–বাঁটুল দি গ্রেট ১৭
বাহাদুর বেড়াল ১৬৩, ১৬৭
হাঁদা ভোঁদা ২৮০
সুফি–শঠে শাঠ্যং ১৩০
সিন্দারেলা–রূপকথার গল্প ১৬৪
দিলীপ দাশ–জাদুকর ৫৮

দাম: পনেরো টাকা মাত্র

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

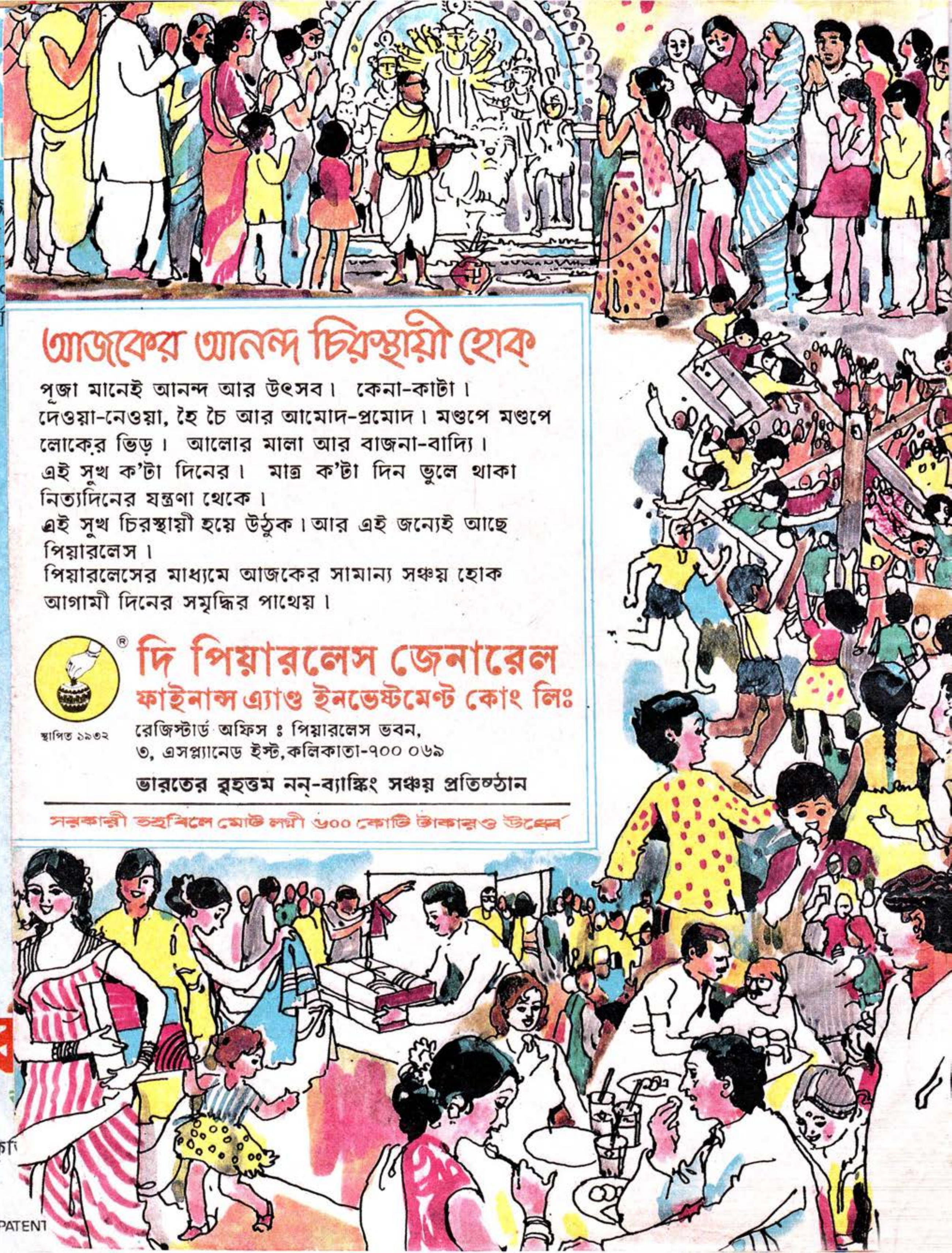

আজকের আনন্দ চিরস্থায়ী হোক
পূজা মানেই আনন্দ আর উৎসব। কেনা-কাটা। দেওয়া-নেওয়া, হৈ চৈ আর আমোদ-প্রমোদ। মণ্ডপে মণ্ডপে লোকের ভিড়। আলোর মালা আর বাজনা-বাদ্যি। এই সুখ ক'টা দিনের। মাত্র ক'টা দিন ভুলে থাকা নিত্যদিনের যন্ত্রণা থেকে।
এই সুখ চিরস্থায়ী হয়ে উঠুক। আর এই জন্যেই আছে পিয়ারলেস।
পিয়ারলেসের মাধ্যমে আজকের সামান্য সঞ্চয় হোক আগামী দিনের সমৃদ্ধির পাথেয়।
দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ
স্থাপিত ১৯৩২
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯
ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান
সরকারী তহবিলে মোট লগ্নী ৬০০ কোটি টাকারও উর্ধ্বে

মিষ্টি-মধুর নতুনত্বের আনন্দের মজা চাখুন!
বন বন
এনেছে নিউট্রিন!
স্বাদেভরা, ক্রীমেভরা, ফ্রুটির আনন্দে,
ভাসুন, মুখরোচক্ চারটি স্বাদগন্ধে।
BON BON
nutrine BON BON
BON BON
nutrine BON BON
দারুণ ভাল নতুন বন্ বন্
এনেছে নিউট্রিন,
নি:সন্দেহে!
মিল্ক ক্রিম • চকোমিন্ট
লিমন কোকোনাট • ফ্রুটি
nutrine BON BON
নিউট্রিন
বন্ বন্
CLARION/NC/8571
nutrine নিউট্রিন ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কন্‌ফেকশনারী কোং প্রা: লি:, চিত্তুর (অ: প্র)

পাহাড়ে পাহাড়ে আনন্দ আয়োজন—

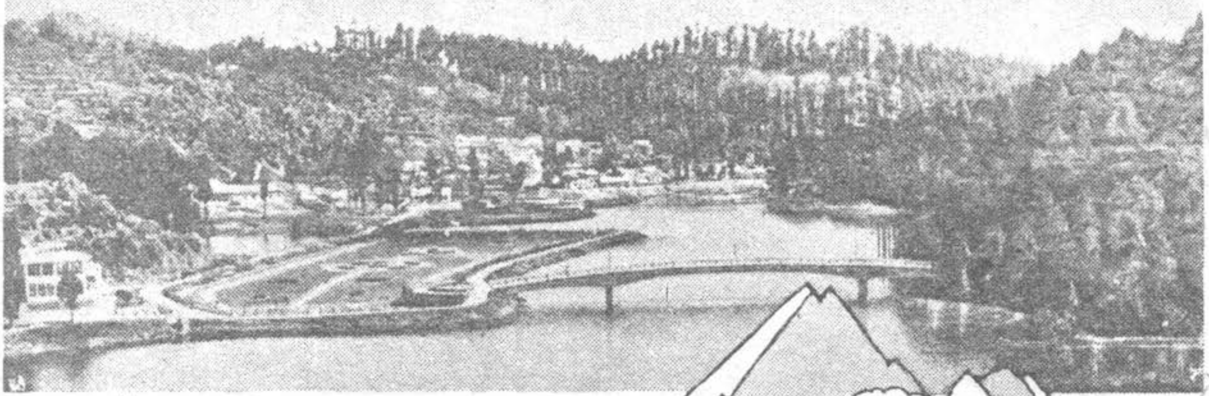

অপরূপ শৈলনগরী
দার্জিলিঙ

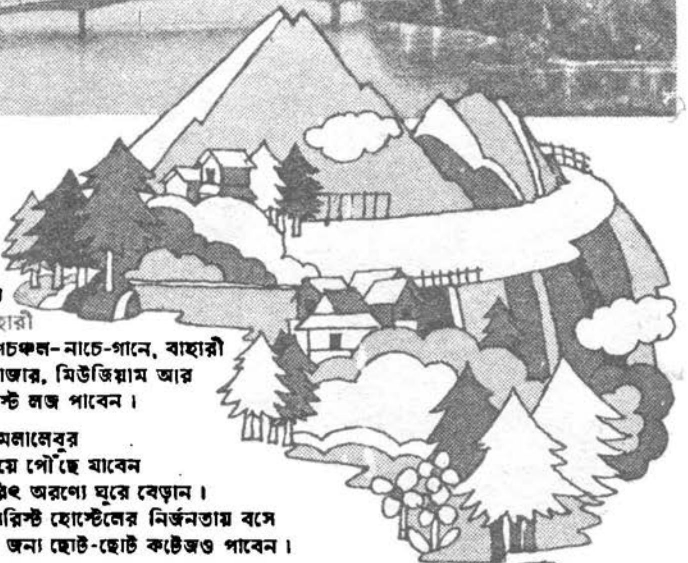

দার্জিলিঙ মানেই দৃশ্যমালার বৈচিত্র্য আর একরাশ অভিজ্ঞতা। শৈলনন্দিনী দার্জিলিঙ আতিথেয়তায় উষ্ণ, বন্ধুত্বে মধুর। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের তুষারমৌলী অপরূপ দৃশ্যমালা—প্রবাদ প্রতিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঢেউ খেলানো সবুজ চা-বাগান আর নানান বাহারী ফুল ও তরুলতায় ঘেরা নয়নাভিরাম উপত্যকা। উৎসবে প্রাণচঞ্চল-নাচে-গানে, বাহারী শোভাযাত্রায় উজ্জ্বল। এছাড়াও আছে রকমারী দোকানপাট, বাজার, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানা। থাকার জন্য আপনার পছন্দসই একাধিক ট্যুরিস্ট লজ পাবেন।

শান্ত, সুন্দর
মিরিক

সবুজ চা-বাগান আর নয়নশোভন কমলালেবুর বাগানের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পৌঁছে যাবেন মিরিকের হ্রদে। শান্ত, নির্জন চিরহরিৎ অরণ্যে ঘুরে বেড়ান। হ্রদে নৌকাবিহার করুন। কিংবা ট্যুরিস্ট হোস্টেলের নির্জনতায় বসে উপভোগ করুন প্রকৃতির মধুর দৃশ্য। আরামে-আয়েশে থাকার জন্য ছোট-ছোট কটেজও পাবেন।

আকর্ষণীয়
কালিম্পঙ

কালিম্পঙের আবহাওয়া সারা বছরই ঠাণ্ডা এবং রমণীয়। এখান থেকে তিস্তার দৃশ্য দেখুন। হিমালয়ের দুর্লভ কিছু দৃশ্য দেখার জন্য চলুন দুরবীন দারা পয়েন্ট। কিংবা যান স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকানগুলিতে অথবা এখানকার জমকালো বাজারে। বাজার বসে সপ্তাহে দুদিন। দোকানপাট রোজই খোলা পাবেন। একাধিক ট্যুরিস্ট লজ পাবেন—রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেছে নিন।

নির্জন
কার্শিয়াং

দার্জিলিঙ যাতায়াতের পথে কার্শিয়াং শান্ত, নির্জন, অপরূপ একটি শহর। স্বীয় সৌন্দর্যে কার্শিয়াং চিররমণীয়। এখানে দেখুন বৌদ্ধ বিহার, ডাউ হিল এবং ঈগলস্ ক্র্যাগ। চমৎকার একটি বার-রেস্টুরেন্ট সমন্বিত এখানকার ট্যুরিস্ট সেন্টারে থাকার ব্যবস্থাও আছে।

সব জায়গাগুলিই দার্জিলিং থেকে খুব কাছে—মিরিক (৪৯ কিমি), কালিম্পঙ (৫১ কিমি) এবং কার্শিয়াং (৩৬ কিমি)। চলুন না, এই পুজোতেই ঘুরে আসা যাক! বৃষ্টি নেই, আবহাওয়াও বেশ চমৎকার। ঠাণ্ডা কিন্তু রোদে ঝলমলে। আর পাহাড়ের আসল সৌন্দর্য তো এখনই দেখার মতো!

বিশদ বিবরণ ও বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেসন কাউন্টার, ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট) কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন: ২৩-৮২৭১, গ্রাম: TRAVELTIPS. নেহরু রোড, দার্জিলিং, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন ব্যুরো, এ/২ স্টেট এম্পোরিয়া, বাবা খরগ সিং মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০ ০০১ ফোন: ৩৪৩৭৭৫,

[illegible] ম্যানসন, ৭৮৭, আন্না সালাই, মাদ্রাজ-৬০০ ০০২ ফোন: ৮৫২০৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/TB 824 RJ/84

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে

অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না. কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A *Kusum* Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

C85 53

সুন্দর চুলেই আপনি সুন্দরী তার যত্ন'ত চাই

ঘন চুলের কদরই আলাদা ! সে চুল ছোট করে কাটা হোক্ আর বড়ই থাক্ । সাজগোজে সুন্দর চুলের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য । তাই সজীব ঘন চুলের জন্য চাই যত্ন। চাই ক্যান্থারাইডিন কেশতেলের-ই যত্ন । ক্যান্থারাইডিন কেশতেলে' মেশানো আছে বিশেষ এক উপাদান, 'ক্যান্থারিস্,' যা আপনার চুলের গোড়ার কোষগুলিকে সজীব রাখতে সাহায্য করে । চুলের কোষগুলি জীবন্ত থাকলে আর ভয় কি ?

১০০, ২০০ ও ৪০০ মিঃলিঃ প্যাকে পাওয়া যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল'এর

ক্যান্থারাইডিন

এমন কেশতেল, ৬০ বছর পরেও যার জুড়ি নেই

ABC/BC-CAN/3/85

শুকতারা

৩৮শ বর্ষ • শারদীয়া সংখ্যা • আশ্বিন, ১৩৯২/সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

পায়রা পুরাণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাঁর পরণে সবুজ জামা
তাঁরই নাম কেষ্ট মামা।
কেষ্টমামার রংটি কালো
হলে কী হয়, মনটি ভালো।
ওঁদের বাড়ী যাই যখনি
দানাপানি পাই তখনি।
মটর দানা, অড়র দানা
যত রাজ্যের পাখীর খানা।
পায়রা ছিল গণ্ডা কুড়ি
তাদের জন্যে রোজ খিচুড়ি।
দেয়াল জুড়ে ওদের বাসা
খোপে খোপে পায়রা ঠাসা।

লক্কা নোটন গেরোবাজ
কী বিচিত্র ডানার সাজ!
বুলি কিন্তু একই রকম
সবার কণ্ঠে বকম বকম।
মামার ছিল একই নেশা
পায়রা ওড়ান রোজ হামেশা।
নীল আকাশে উড়বে ওরা
চরকিবাজি লাট্টু ঘোরা।
আমরা কি ছাই অত জানি
মামার ভাঁড়ে মা ভবানী?
নিঃস্ব হয়ে ছাড়েন শহর
কোথায় গেল পায়রা বহর!

এইটুকুই আছে মনে
দুষ্টু আমি অকারণে
পায়রার ডিম নিলেম কেড়ে
দিতেম ফেরৎ নেড়ে চেড়ে।
ক্ষুদে যেমন পিং পং বল
রংটা কিন্তু নয়কো ধবল।
পলকা ছিল ডিমের খোলা
গেল ভেঙে লাগতে দোলা।
নষ্ট হবে? আহা! সে কী!
একটুখানি চেখে দেখি।
তারপরে দিই লম্ফ দান
মামা পাছে দেখতে পান।

কে যে কখন আড়াল থেকে
আমার কান্ড ছিল দেখে
গলা ছেড়ে জোর চ্যাঁচায়,
"খোকাডিম পায়রা খায়!"
আমি তো, ভাই, ভয়ে হিম
পায়রা খায় আমার ডিম!
ছেলেমেয়ে সবাই মিলে
কী অপবাদ আমায় দিলে!
ছড়া কাটে, নাচে গায়,
"খোকাডিম পায়রা খায়।"

ছবি ঃ দিলীপ দাশ

চাকর

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রদীপের পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

একান্ত নিরুপায় হয়েই প্রদীপের মা সুপ্রিয়াকে একমাত্র ছেলের স্কুলের পাঠ বন্ধ করে দিতে হলো। সুপ্রিয়ার স্বামী সুধাংশু–প্রদীপের বাবা সুধাংশু সামান্য মাহিনার রেলের কেরানী ছিলেন। মালগুদামের একজন পর্যবেক্ষক। হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন।

কিছুই জমিয়ে যেতে পারেননি–কিছুই কোন সংস্থান করে যেতে পারেন নি।

স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রদীপ কটা দিন খুব মন-মরা হয়েছিল। স্কুলের মায়াটা কাটাতে পারে নি। তাই প্রত্যহ দুপুরের দিকে স্কুল বিল্ডিংটার আশপাশে গিয়ে ঘুরে বেড়াত।

টিফিনের সময় দেখতো মাঠে ছেলেরা হৈ হৈ করছে।

দূর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতো।

দূর থেকেই দেবব্রতবাবু–স্কুলের এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হেড-মাস্টার মশাইয়ের একদিন নজরে পড়ে গেল।

দেবব্রতবাবু প্রদীপ ছেলেটিকে ভালবাসতেন।

লেখাপড়ায় সত্যি বড় মেধাবী ছিল ছেলেটি।

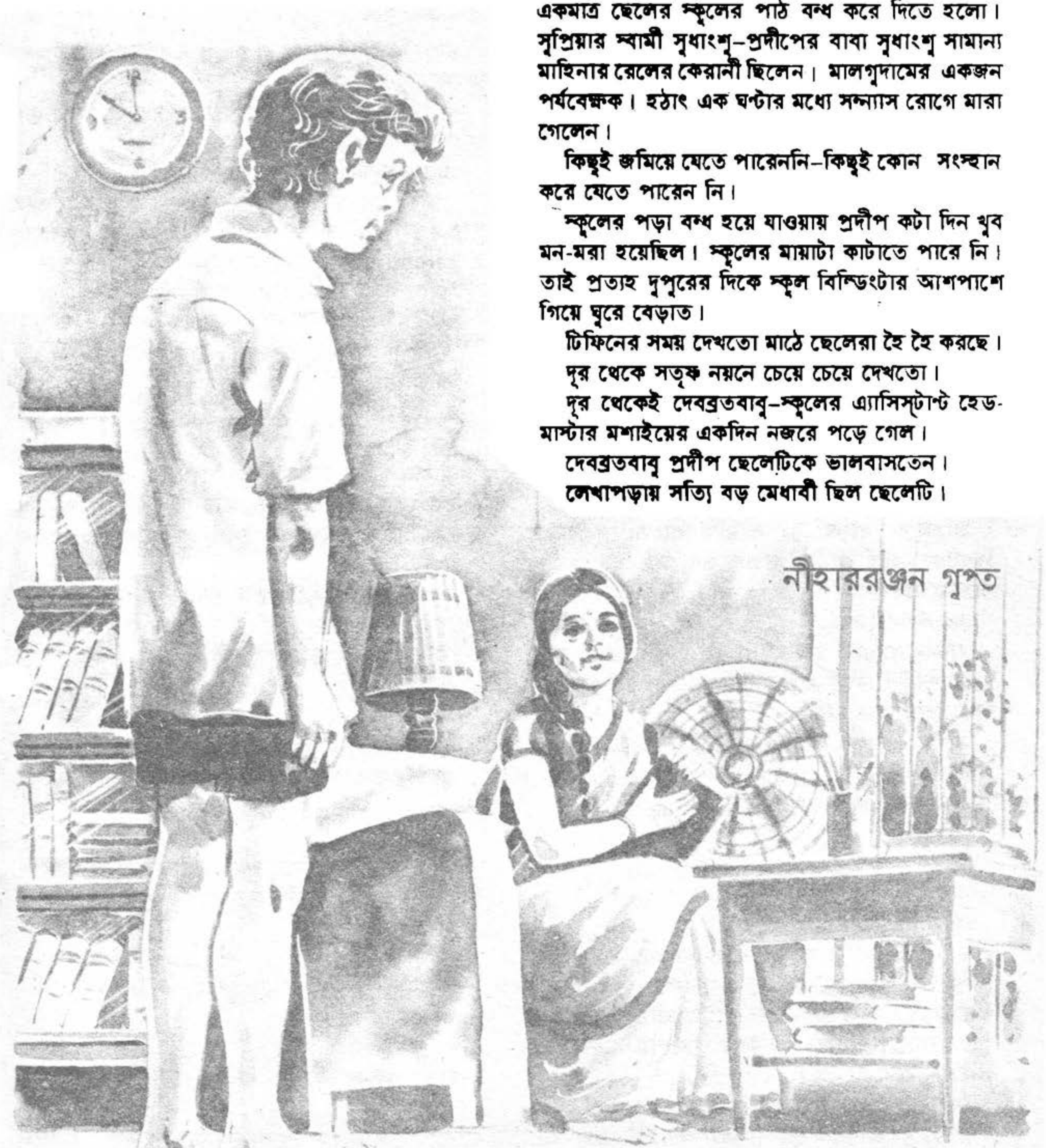

একদিন টিফিনের পরে ছেলেরা যখন ক্লাসে সবাই চলে গিয়েছে, দেবব্রতবাবু এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন–ডাকলেন প্রদীপের নাম ধরে–প্রদীপ–

এগিয়ে এলো প্রদীপ সেই ডাকে, স্যার–

তুমি আর স্কুলে আসছো না কেন প্রদীপ?

আমার বাবা মারা গেছেন স্যার–

আহা–কবে–

মাস দেড়েক হলো–স্কুলের মাইনা দিতে পারি না–নাম কাটা গিয়েছে–

তুমি–

বাবা নেই, কে আর আমায় পড়াবে স্যার–মা কোনমতে সংসার চালান। একটা বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করেন।

তুমি কাল বা পরশু একবার এসো–আমি হেডমাস্টার মশাইকে বলে দেখবো যদি তোমাকে ফ্রি করে দেন।

প্রদীপ খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেল।

মাকে রাত্রে সব কথা বললো।

সুপ্রিয়া কোনো কথা বলেন না।

কেবল স্কুলের মাইনাই ত নয়, আরও অনেক খরচা যে আছে।

ইতিমধ্যে সুপ্রিয়া যে বাড়িতে রাঁধত সে বাড়ির গিন্নীকে বলায় গিন্নীমা বলেছিলেন, কত বয়স তোমার ছেলের বামুনদি?

এই বছর তের–

আমার বাড়িতে ফুটফরমাশ খাটার জন্য একটা বাচ্চা চাকর খুঁজছি। নিয়ে এসে লাগিয়ে দাও–গোটা কুড়ি করে টাকা দেবো মাস মাস–

সুপ্রিয়া ছেলের কথা শুনে সেই চাকরের চাকরির কথাটাই বলেন।

তাই বরং এখানে লেগে যা বাবা–

মা

কি রে?

চাকরের কাজ করবো?

ক্ষতি কি–

না মা, আমি পড়াশুনো করবো আবার–

স্কুলের ফ্রি হলেই তো হবে না বাবা, আরও অনেক খরচ আছে। আমি তো মাইনা পাই মোটে চল্লিশ টাকা–তাতে চালাবো কি করে! ঐ কাজে ঢুকে পড় বাবা–লক্ষ্মী আমার–সোনা আমার।

কিন্তু প্রদীপ যেন দুদিনেই হাঁফিয়ে ওঠে।

একটি মুহূর্ত বিশ্রাম দেয় না–এটা আন, ওটা আন–এটা কর, ওটা কর হাজারো ফরমাশ। তারপর মাস দুই বাদে চুরির অপবাদে নিষ্ঠুরের মতো প্রহার করলো প্রদীপকে বাড়ির বড় ছেলে একগাছা দড়ি দিয়ে বেঁধে।

প্রদীপ হাঁপিয়ে ওঠে।

মাকে কিন্তু কিছু বলে না প্রদীপ। যেমন কাজে যাচ্ছিল কাজে যায়।

ঐ বাড়ির বড় মেয়ে করুণা কলেজে পড়তো হোস্টেলে থেকে। লেখাপড়ায় খুব ভালো ছাত্রী করুণা।

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এলো।

একদিন করুণা পড়তে পড়তে একটা বইয়ের দরকার হতে প্রদীপকে ডেকে বললে, পাশের ঘরে শেলফে Economics য়ের বইটা আছে–আনতে পারবি প্রদীপ।

প্রদীপ বইটা নিয়ে এলো। ঠিক বইটাই এনেছে।

করুণা শুধায়– তুই পড়তে পারিস!

হ্যাঁ দিদি আমি তো ক্লাস এইটে পড়তাম।

পড়িস না এখন?

না দিদি–

কেন?

আমরা গরিব, টাকা পাবো কোথায়?

করুণা কি যেন ভাবলো, তারপর প্রদীপকে পরীক্ষা করলো, দেখলে ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান এবং বেশ পড়াশুনা আছে।

করুণা বললো, তুই পড়বি প্রদীপ?

কেমন করে পড়বো দিদি–আমরা যে বড় গরিব।

আমি তোকে পড়াবো–পড়বি?

পড়বো–

আর শোন–

কি দিদি–

তুই স্কুলে আবার ভর্তি হ–আমি তোর স্কুলের মাইনা দেবো।

সত্যি দিদি!

হ্যাঁ দেবো–কাল গিয়ে স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে জেনে আসবি কত লাগবে–বুঝলি?

আচ্ছা দিদি–কিন্তু–

কিন্তু কি?

কত্তাবাবু-গিন্নিমা জানতে পারলে–

জানবে কি করে?

না, যদি জানতে পারে–

আমি বলবো না–তুইও বলিস না।

আচ্ছা, দিদি–

দুপুরে তো তোর স্কুল–দুপুরে ছুটি নিবি। সকালে বিকালে এখানে ঘরের কাজ করবি–পারবি না?

খুব পারবো—প্রদীপ বলে।

করুণাই মাকে বলে প্রদীপের দুপুরের ছুটির ব্যবস্থা করে দিল একটা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে।

প্রদীপ স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে লাগল।

ঐ বাড়িরই ছেলে সন্দীপন প্রদীপের চাইতে দু'ক্লাশ উপরে পড়ত। লেখাপড়ায় এতটুকু মন নেই। খালি খেলা আর খেলা।

কেমন যেন একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল করুণার প্রদীপের উপর।

করুণা মাকে মিথ্যা বলেছিল একটু—বলেছিল, একটা কারখানায় ছেলেটা কাজ পেয়েছে মা—ও দুপুরে কারখানায় কাজ করবে, সকালে ও বিকেলে এখানে কাজ করবে। কারখানা থেকে ভাল মাইনে দেবে। ওকে কাজ করতে দাও না।

করুণার মা আপত্তি করেনি।

প্রদীপ স্কুলে যাতায়াত করতে লাগল নিয়মিত।

প্রদীপ তার মাকেও কিছু জানতে দিল না তার পড়াশুনার কথাটা।

তারপর তিনটে বছর চলে গিয়েছে।

সন্দীপন ফেল করে ক্লাসে উঠতে পারেনি। প্রদীপ কিন্তু ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছে।

করুণা ছুটিছাটায় বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করে প্রদীপকে, কেমন পড়াশুনা চলছে প্রদীপ?

প্রদীপ বলে, তুমি না দেখলে আমার পড়াশুনা হতো না দিদি।

করুণা ক্রমে বি.এ পাশ করে ইউনিভারসিটিতে এম.এ পড়ছে তখন।

ক্রমশই হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিল প্রদীপ।

ফিসের টাকা করুণাই দিয়েছে।

কেউ জানতেও পারল না আসল ও সত্য কথাটা। বাড়ির চাকর প্রদীপ যে পড়াশুনো করছে, স্কুলে যাতায়াত করছে তা কেউ জানতে পারেনি।

রেজাল্ট বের হলো—দেখা গেল প্রদীপ ফার্স্ট ডিভিসনে তিনটে লেটার নিয়ে পাশ করেছে।

করুণা বললো, এবার কি করবি প্রদীপ?

প্রদীপ বললো, আরও পড়তে চাই দিদি, কিন্তু—

কিন্তু কি রে—

কলেজের মাইনা-খরচা কি করে চালাবো?

সেজন্য তোকে ভাবতে হবে না—তুই কলেজে ভর্তি হয়ে যা।

কেন কত্তাবাবু – আমার কি অপরাধ

প্রদীপ করুণার পরামর্শেই কলেজে ভর্তি হয়ে এলো।

সেই একই ভাবে চলতে লাগলো।

দুপুরে কলেজে যায়–ক্লাশ করে প্রদীপ–সকালে বিকালে চাকরের কাজ করে। করুণাদের বাড়ির সব ফরমাশই করে।

কিন্তু পড়াশুনায় এবারে অসুবিধে হতে লাগল।

রাত্রে অত খাটাখাটনির পর তেমন পড়াশুনা হয় না।

করুণা বুঝতে পারে ব্যাপারটা–

বলে, তোর ভাল পড়াশুনা হচ্ছে না–তাই না প্রদীপ ?

প্রদীপ চুপ করে থাকে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বুঝতে পারি রে–তুই বরং এ বাড়ির কাজটা ছেড়ে দে।

না দিদি ।

কেন ?

গিন্নীমা মনে দুঃখ পাবেন, আর অতটা অকৃতজ্ঞ হতে পরবো না আমি–।

কিন্তু–

তাছাড়া আমার একটা কথা আছে দিদি।

কি রে ?

তোমার প্রতি অবিচার করা হবে–

আমার জন্যে তুই ভাবিস না–ছেড়ে দে এ বাড়ির কাজ।

প্রদীপ কিন্তু ছাড়লো না।

কিন্তু ব্যাপারটা চাপা থাকে না। প্রকাশ হয়ে পড়ে–ঐ বাড়ির ছেলে সন্দীপনই ব্যাপারটা জানতে পেরে বাড়িতে সব কথা বলে দেয়।

করুণার বাবা প্রদীপকে তাড়িয়ে দিলেন।

কেন কত্তাবাবু–আমার কি অপরাধ হলো–আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন।

আসলে রাগটা হয়েছিল করুণার বাবার মেয়ের উপর–ঐ কথা মুখে বললেন না। কেবল চাকরের কাজ গেল প্রদীপের।

কলেজের মাইনেটা করুণাদের বাড়িতে চাকরের কাজ করে মাসে মাসে সে যা মাইনে পাচ্ছিল তাই দিয়েই চলে যাচ্ছিল। চাকরিটা যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখলো প্রদীপ।

ঐ ঘটনার মাস দুই পূর্বে করুণার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। সে তার স্বামীর কর্মস্থলে চলে গিয়েছিল।

করুণা থাকলে হয়তো যাহোক একটা ব্যবস্থা হতো।

থার্ড ইয়ারের ডিগ্রী কোর্সে পড়তে পড়তে পড়া বন্ধ হয়ে গেল প্রদীপের।

অনন্যোপায় প্রদীপ চাকরির সন্ধান একটা করতে লাগলো।

একটা অফিসে বেয়ারার চাকরি পেল প্রদীপ অনেক কষ্টে।

ভেবেছিল এবার দিনের বেলা চাকরি করে রাত্রে ক্লাস করবে–কিন্তু তা হলো না।

মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেল।

প্রদীপ একদিন আবার করুণার বাবার সংগে দেখা করলো।

বাবু–

কিরে–তুই ?

আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি–আমাকে আপনার বাড়িতে চাকরি দেবেন–

চাকরি–

হ্যাঁ–

না–

কেন বাবু–

না–বি.এ পাশ চাকর চাই না।

আমি তো বি.এ পাশ করিনি।

তা হোক কলেজে পড়েছো–অন্য জায়গায় চেষ্টা করো।

বাবু–

যা-যা, বিরক্তি করিস না।

তাড়িয়ে দিলেন করুণার বাবা প্রদীপকে।

অনন্যোপায় প্রদীপ মালদায় গেল করুণার স্বামীর কর্মস্থলে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা হলো না করুণার সংগে–করুণার স্বামী অন্যত্র বদলী হয়ে গিয়েছেন।

প্রদীপ আবার কলকাতায় ফিরে এলো।

যে চাকরি করছিল সে চাকরিটাও তার আর নেই তখন–নতুন চাকরি না বলে কামাই করায় সে চাকরি তার গেছে।

প্রদীপ কি করবে এবারে ভেবে পায় না।

প্রদীপের মা আরও অসুস্থ তখন। একেবারে শয্যাশায়ী–

মা শুধায়, কিছু আর সুবিধা হলো বাবা–

না মা, তবে একটা চাকরের চাকরি পেয়ে যাবো ঠিক–দেখো মা–

আবার চাকরের চাকরি করবি বাবা–

তাই তো এতকাল করে এসেছি মা–ঐ আমার নিয়তি।

ফুটো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দোলগোবিন্দবাবু দুঃখী মানুষ। বরাবরই তাঁর দুঃখে কেটেছে। ছেলেবেলায় গরিব বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি মোয়া বিক্রি করে পেট চালিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন অতি কষ্টে। এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের জীবনটা তাঁর আজও বেশ দুঃখেই কাটে। অল্প মাইনের একটা চাকরি করেন। ঘরে তাঁর বউ দিনরাত গঞ্জনা দেন। ছেলেমেয়ে দুটো ভারী রোগা ভোগা। অফিসেও তাঁকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভালমানুষ বলে বেশি করে খাটিয়ে নেয়। দোলগোবিন্দবাবু নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। তাঁর অফিস বলতে একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি। নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কালি, ইঁদুরমারা বিষ, নানারকম সিনথেটিক আঠা। দোলগোবিন্দবাবু একজন সামান্য কেমিস্ট। ক-এর সঙ্গে ফরমুলা অনুযায়ী খ মিশিয়ে গ তৈরি করা আর কি। তবে মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন একা একা বসে কাজ করেন তখন তাঁর ইচ্ছে যায়, নানারকম জিনিসের সঙ্গে নানারকম বেখাপ্পা জিনিস মিশিয়ে দেখলে কেমন হয়? এরকম মিশিয়ে দেনও কয়েকবার। তেমন কিছু দাঁড়ায়নি।

আজও অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাইরে দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর হাওয়া দিচ্ছে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু র‍্যাক-এ মেলানো তাঁর ছাতাটা নিতে গিয়ে একটু অবাক হলেন। বাঁ দিকের দ্বিতীয় হুকটায় তিনি বরাবর তাঁর ছেঁড়া তাপ্পি-দেওয়া ছাতাটা ঝুলিয়ে রাখেন। আজও রেখেছেন। অথচ ছাতাটা নেই। তার বদলে একটা খুব ঝকমকে নতুন ছাতা ঝুলছে। শুধু নতুন নয় বেশ কায়দার ছাতা। কালো বাঁকানো পুরু হ্যান্ডেল, দারুণ দামী কাপড়, ওজনেও সাধারণ ছাতার চেয়ে পাঁচগুণ ভারী।

র‍্যাক-এ আর দ্বিতীয় ছাতা নেই। অফিসের সবাই কখন বাড়ি চলে গেছে।

দোলগোবিন্দবাবু দারোয়ান রামবিলাসকে ডেকে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রামবিলাস বলল, আমি তো কিছু জানি না বাবু।

অন্যের ছাতাটা নেওয়া উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তবে ছাতা যারই হোক সে ছাতা নিতে এই দুর্যোগে আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কাল ছাতাটা ফেরৎ আনলেই হবে। এই ভেবে দোলগোবিন্দ ছাতাটা নিয়ে বেরোলেন।

ছাতাটা ভাল। খুবই ভাল। মাথার ওপর তুলে দোলগোবিন্দ ছাতাটা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে এবং বেশ বিনীতভাবে খুলে গেল। আজকালকার অটোমেটিক ছাতা যেমন অভদ্রভাবে ফটাং করে খোলে সেরকমভাবে নয়।

বৃষ্টি আজ বড়ই প্রবল। রাস্তায় কলকল করে যেন নদী বয়ে চলেছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি সব বন্ধ। একটা কুকুরকেও দেখা যাচ্ছেই না কোথাও। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বুঝলেন, আজ জল ঠেঙিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে দোলগোবিন্দ দেখলেন, সিঁড়ির নিচে তেমন জল নেই। চটি ভিজল না। দোলগোবিন্দও হাঁটতে হাঁটতে আরও টের পেলেন, ছাতাটা এতই ভাল যে চারদিকে প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাস সত্ত্বেও তাঁর গায়ে একটুও ছাট লাগছে না, বাতাসও নয়। এত ভাল ছাতা নিশ্চয়ই এদেশে হয় না।

বেশ আনমনেই হাঁটছিলেন দোলগোবিন্দ। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের খোড়ো চালের ঘরে বর্ষাকালে বড় জল পড়ত। তাঁরা ঘরে বসে ভিজতেন আর সারা রাত জেগে বসে জড়োসড়ো হয়ে কাটাতেন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, পায়ের নিচে যেন মাটিটা ভাল টের পাচ্ছেন না! হল কী? নিচের দিকে তাকিয়ে উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই কনভেন্ট রোডের রাস্তাটা কোন যাদুবলে যেন প্রায় দশ হাত নিচে পড়ে আছে। আর তিনি ভেসে আছেন।

না, কথাটা ঠিক হল না। তিনি ঠিক ভেসেও নেই। তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। কোনও বাড়তি শক্তি লাগছে না, চেষ্টা করতে হচ্ছে না, একেবারে গ্যাস বেলুনের মতো দিব্যি উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এই অশরীরী কাণ্ডে দোলগোবিন্দ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঁচাও! গেলুম।

ঝড় বৃষ্টিতে সেই শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আর শুনলেও লাভ ছিল না। দোলগোবিন্দ তখন মাটি থেকে বিশতলা বাড়ির উচ্চতায় ঝুলছেন, মানুষ তাঁর কী সাহায্য করতে পারে।

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ভাবলেন, এটা তো দুঃস্বপ্ন, কেটে যাবে এখুনি।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন কাটল না। দোলগোবিন্দ যখন চোখ খুললেন তখন কলকাতা শহরটা প্রায় মাইলটাক নিচে পড়ে আছে। দোলগোবিন্দ শিব, কালি, হরি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাকার যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ল তাঁদের বিস্তর ডাকাডাকি করতে লাগলেন। একবার ছাতাটা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু লাফালে তাঁর হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাছাড়া ছাতাটাই যেন তার হাতখানা মুঠো করে ধরে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না।

দোলগোবিন্দ কখনও এরোপ্লেন চড়েন নি। উঁচু পাহাড়েও কখন ওঠেন নি। বলতে কি এত উঁচুতে তাঁর এই প্রথম ওঠা। নিচের দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, হাত, পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া ধোঁয়া দেখার অবশ্য দোষও নেই। একটু বাদেই দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে ধোঁয়া নয়, তাঁর চারপাশে মেঘ, আঁতকে উঠে ভিড়মি খেতে খেতেও সজাগ রইলেন দোলগোবিন্দবাবু। মেঘ খুব বিপদের জিনিস। মেঘ থেকেই বিদ্যুৎ চমকায় এবং বাজ পড়ে। কাছাকাছি যদি এখন বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে বড় বিপদ।

বেশ কিছুক্ষণ চারপাশ ঘন কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা রইল। দোলগোবিন্দ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, তারপর একসময়ে হঠাৎ আকাশটা হেসে উঠল মাথার ওপর। ঝকমক করছে তারা, বেশ জ্যোৎস্নাও ফুটফুট করছে। পায়ের তলায় পড়ে আছে কোপানো ক্ষেতের মতো মেঘের স্তর।

দোলগোবিন্দ আচমকাই দেখতে পেলেন, হাত দশেক দূরে একটা ডিঙিনৌকো বাতাসে ভাসছে। এক হাতে চোখ কচলে নিয়ে তাকালেন, না, ঠিক ডিঙিনৌকা নয়, একটা অতিকায় পটল। কিংবা...

আর ভাববার সময় পেলেন না। ছাতাটা তাঁকে ধরে এনে ওই অতিকায় পটলের মতো বস্তুটার পিঠে খুব যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ছাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পায়ের নিচে ম্যানহোলের মতো একটা ঢাকনা খুলে গেল এবং তিনি সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে পড়ে গেলেন।

নাঃ, খুব একটা জোরে পড়লেন না। তাছাড়া যেখানে পড়লেন সেখানে ফোম রবারের মতো গদিও ছিল। শুধু ভড়কে যাওয়ায় মুখ দিয়ে "আঁচ" করে একটা শব্দ বেরিয়েছিল তাঁর।

মহাকাশযান, উফো, ভিন্ন গ্রহের জীব ইত্যাদি সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো দোলগোবিন্দবাবুও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটলের মতো বস্তুটি যে ভিন্ন কোনও গ্রহ থেকে আসা একটি উফো সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহই রইল না। উফোর ভেতরটা খুবই বড়-সড় এবং নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রপাতি রয়েছে চারদিকে। দিব্যি ঝলমলে আলো জ্বলছে।

দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষ—না, অবিকল মানুষ নয়—অনেকটা মানুষের চেহারার একটা জীব তাঁর দিকে এগিয়ে এল। মানুষের সঙ্গে এর তফাৎ হচ্ছে এই জীবটার শুঁড় এবং লেজ আছে। বাকিটা মানুষের মতোই। শুঁড়টা হাতির শুঁড়ের মতো অত বড় নয়। লেজটা অনেকটাই গরুর লেজের মতো। লোকটার পোশাক বলতে একটা হাফ প্যান্টের মতো বস্তু, গায়ে একটা জহরকোট গোছের জিনিস।

এদিক সেদিক আরও কয়েকজন অবিকল একরকম জীবকে দেখতে পেলেন দোলগোবিন্দ, তারা সব তখনও মনোযোগে যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছে।

সামনের জীবটা প্রথমে শুধু দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দোলগোবিন্দবাবুকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা না বুঝলেও কথা বলার ঢং-এর মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা আছে।

এরপর জীবটা একটা রেডিওর মতো যন্ত্র মুখের কাছে তুলে ধরে কথা বলতে লাগল।

আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা ভাষা।

জীবটা বলল, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি যে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা একটা অনুবাদ যন্ত্র। আমার ভাষাকে তোমার ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো তো।

ঘাবড়ে গেলেও দোলগোবিন্দ ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন শোনো। যে ছাতাটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা আমরাই পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই মহাকাশযানে একটা যন্ত্রের মধ্যে একটা ফুটো দেখা

দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফুটো আমরা বন্ধ করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সবজান্তা যন্ত্রমগজের সাহায্য নিই। যন্ত্রমগজ আমাদের তোমার নাম জানিয়ে বলে, একমাত্র এই লোকটাই সেই কেমিক্যাল তোমাদের দিতে পারে যার সাহায্যে ফুটো সারানো সম্ভব। তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।

দোলগোবিন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই, সামান্য ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি কেমিক্যালের কি জানি? জীবটা বলল, ভাল করে ভেবে দেখ। আমাদের যন্ত্রমগজ কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ভুলও করে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ও শুধু একটা লোকেরই নাম বলেছে। দোলগোবিন্দ মিত্র। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

দোলগোবিন্দ আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে উনি কিছু আজগুবি মিকশ্চার তৈরি করেছেন, করে সেগুলো বাতিল শিশি বা জারের মধ্যে ভরে নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। তা দিয়ে কোনও কাজ হবে না জেনেও, আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন এই ইয়ে, আমি ফুটো বন্ধ করার কোনও কৌশল জানি না। তবে আমার কাছে কয়েকটা আজগুবি, মিকশ্চার আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা কাজে লাগবে তা তো জানি না।

জীবটা বলল, আপনি এক্ষুণি আপনার ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ওই ছাতাই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। যদি আমাদের ছিদ্র সারাতে পারেন, তবে আপনাকে আমরা পুরস্কার দেবো।

তাই হল। ফের প্রাণ হাতে করে ছাতার হাতল ধরে ঝুলে রইলেন দোলগোবিন্দ। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দেখলেন, সর্বনাশ, দরজায় তালা দেওয়া।

কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় হাতের ছাতাটা আপনা থেকেই উঠে তালাটায় গিয়ে একটা গুঁতো মারল। সংগে সংগে টক করে খুলে গেল তালা।

ভিতরে আলমারি খুলে মোট পাঁচটা শিশি আর জার হাতে আর বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। ছাতাটা তালায় আর একটা গুঁতো দিতেই সেটা এঁটে গেল। দোলগোবিন্দর হাত আর বগল থেকে শিশি আর জারগুলোও পটাপট চুম্বকের আকর্ষণে ছাতার মধ্যে সেঁধিয়ে শিকগুলোর সংগে লেগে রইল।

ঝুল খেতে খেতে দোলগোবিন্দ এসে সেই মহা পটলের মতো মহাকাশযানে উঠলেন।

সেই জীবটা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুকে খুব খাতির করে নিয়ে গেল।

পটলটার তলার দিকে একটা ধাতব বাক্সের মতো জিনিস আছে। ফুটোটা সেখানেই।

দোলগোবিন্দবাবুর মনে পড়ল যে শিশিটায় সবুজ রঙের ঘন পদার্থ রয়েছে তা থেকে দু ফোঁটা একবার তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে যায়। পরে সেটা এমন শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল যে তিনি সেটা উকো দিয়ে ঘষেও তুলতে পারেন নি। সুতরাং দোলগোবিন্দ আর দেরী না করে সবুজ শিশি থেকে দু ফোঁটা ফুটোয় ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শক্ত হয়ে জমে গেল।

জীবটা একটা যন্ত্র থেকে তাপ্পি দেওয়া জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিল। আবার একটা পাইপ থেকে ভীষণ ঠাণ্ডা একটা পদার্থ ছড়াল ওর ওপর। কিন্তু ফুটোর তাপ্পি টিঁকে রইল।

লেজ ও শুঁড়ওলা জীবটা দোলগোবিন্দর দিকে চেয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, চমৎকার! আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন তা আর বলার নয়। এর জন্য আপনাকে আমরা আমাদের গ্রহের দুটি অতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। এ দুটো দিয়ে আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারবেন।

জীব ভদ্রলোক দোলগোবিন্দকে দুটো ক্ষুদে বাক্স দিলেন। দোলগোবিন্দও ফের ছাতার বাঁট ধরে নেমে নিজের বাসার দোরগোড়ায় নামলেন।

পরদিন সকালে বাক্স দুটো খুলে হাঁ হয়ে গেলেন দোলগোবিন্দ, একটায় খানিকটা কর্কচ লবণ, অন্যটায় একটুখানি চুন। রসিকতা নয় তো!

না। অনেকক্ষণ ভেবে দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন, এ দুটো জিনিস সম্ভবত ওই গ্রহে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই ভীষণ মূল্যবান। শুঁড় লেজওলা জীব বোধহয় জানেনা যে পৃথিবীতে ওই দুই বস্তু অঢেল এবং সস্তা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে দোলগোবিন্দর, কিন্তু দমলেন না। সবুজ শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। যেখানে ফুটো পান সেখানেই প্রয়োগ করেন। ছাদের ফুটো, ছাতার ফুটো, বাসনের ফুটো।

ফুটো সারানোয় রীতিমত নাম ডাক হতে লাগল তাঁর। ক্রমে নৌকা জাহাজ এরোপ্লেনের ফুটো পর্যন্ত সারাতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

বলা বাহুল্য, দোলগোবিন্দর নাম এখন ফুটোবাবু। কোটি কোটি টাকার মালিক। বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কোনো কিছুরই অভাব নেই।

ছবি : [illegible]

একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

সেদিন যদি এই ওষুধ আবিষ্কৃত হতো, তাহলে হয়তো সেই নাম-না-জানা ভদ্রলোক অকালে প্রাণ হারাতেন না, যিনি মৃত্যুর সময়ে সমস্ত সম্পত্তি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দান করে গিয়েছিলেন, আর তাঁরই অর্থে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যাদবপুরে জমি কিনে যে হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর নাম এখন সকলেরই জানা, ডাঃ কুমুদশংকর রায় হাসপাতাল। যক্ষ্মা রোগের হাসপাতাল।

যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন রবার্ট কক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই রাশিয়ার প্রেলুকা নামের ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করলেন সেলসম্যান ওয়াক্‌সম্যান।

খুবই দরিদ্র সংসার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও রাশিয়ার অধিকাংশ সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতেন। সেলসম্যানের মা বাড়িতেই প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে ছেলেকে গড়ে তুলতে লাগলেন। ছেলেও আশ্চর্য মেধাবী। মা যা শেখাতেন, ছেলে পরম নিষ্ঠার সংগে সেই পাঠই পড়তেন।

১৯০৯ সালে হঠাৎ সেলসম্যানের মা মারা গেলেন। ছেলেটির জীবনে একমাত্র আদর্শ ছিলেন তাঁর মা। মায়ের মৃত্যুতে অসম্ভব আঘাত পেলেন আর সেই আঘাত ভোলার জন্যেই সেলসম্যান রাশিয়া থেকে সোজা চলে গেলেন আমেরিকায়।

আমেরিকায় সেলসম্যানের খুড়তুতো ভাই থাকতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেলসম্যান পরের বছর কলেজে ভরতি হলেন।

কলেজের জীবাণু বিজ্ঞানের প্রধান ছিলেন ডাঃ জেকব লিপম্যান। লিপম্যানও ছিলেন রুশদেশীয়। তিনিও সেলসম্যানের মতো রাশিয়া ত্যাগ করে আমেরিকায়

বসবাস শুরু করেন। তিনি সেলসম্যানকে অসম্ভব ভালবাসতেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন সেলসম্যান কৃষিবিজ্ঞানের উপযুক্ত এবং তিনি সেলসম্যানকে কৃষিবিজ্ঞানের ক্লাশে ভরতি করে নিলেন।

১৯১৫ সালে গ্রাজুয়েট হলেন সেলসম্যান ওয়াক্সম্যান। ওয়াক্সম্যান আশ্চর্য মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে সকলেই তাঁকে সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্যে আহ্বান করলেন, কিন্তু সেলসম্যান মোটেই মনস্থির করতে পারলেন না।

১৯১৬ সালে ডেবোরা মিটনিকের সংগে বিয়ে হলো সেলসম্যানের আর ঠিক পরের বছর কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এল। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বায়োকেমিস্ট-এর পদে রিসার্চ করতে আরম্ভ করলেন। মেটলিক গবেষণা করে তিনি পি. এইচ-ডি হলেন এবং সৃষ্টি করলেন কৃষিবিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়, যাকে ইংরিজিতে বলা হয় সয়েল মাইক্রোবায়োলজি। সয়েল মাইক্রোবায়োলজির বাংলা করলে বলা যায় মাটির মধ্যে যত জীবাণু আছে, তার ইতিহাসপাঠ।

সেলসম্যান মাটির মধ্যে যখন জীবাণুর গবেষণা করছিলেন, তখন একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি যত মাটির গভীরে অনুসন্ধান করেছেন, ততই দেখেছেন, জীবাণুর সংখ্যা কমে গেছে, কিন্তু ছত্রাকের সংখ্যা কমেনি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। একদল জীবাণু, অন্য আর একদল জীবাণুকে মেরে ফেলে আবার আর একদল জীবাণু অন্য ধরনের জীবাণুকে বাঁচতে সাহায্য করে।

দু বছর পরে রাটজার্সে ফিরে এলেন সেলসম্যান আর এই সময়ে আমেরিকার যক্ষ্মারোগ সংস্থা তাঁকে যক্ষ্মার জীবাণু বিষয়ে গবেষণা করার অনুরোধ করলেন।

চমকে উঠলেন সেলসম্যান।

খেলার ছলে তিনি যা করছিলেন, তাতেই আবিষ্কারের প্রথম সূত্র পেয়ে গেলেন। খানিকটা মাটির সংগে যক্ষ্মার জীবাণু মিশিয়ে দিলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন মাটির মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণু বেশিদিন বাঁচতে পারে না।

সেলসম্যানের মস্তিষ্কের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্যুতের চমক। নিশ্চয়ই মাটির মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে যা যক্ষ্মার জীবাণুকে ধ্বংস করে।

গবেষণার সূত্রপাত। গবেষণার পর গবেষণা। প্রথম যে ওষুধ তিনি অ্যাকটিনোমাইসেটিস ছত্রাক থেকে তৈরি করলেন, তা এত বিষাক্ত যে মানুষের দেহে সহ্য হলো না।

এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় জানালেন, তাঁদের অর্থাভাব ঘটেছে, আর রিসার্চ করতে দেওয়ার মতো টাকা নেই। সেলসম্যান হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

আবিষ্কারের রিসার্চ করতে গেলে বিজ্ঞানীকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করলে সব সময় হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও সাহায্য করেন, তাহলে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার সম্ভব হয়।

সেলসম্যান যখন হতাশায় ভেঙে পড়েছেন তখন আমেরিকার মার্ক শার্প অ্যান্ড ডোম কোম্পানি এগিয়ে এসে সেলসম্যানকে আর্থিক সাহায্য দান করলেন। সেলসম্যান পূর্ণোদ্যমে আবার গবেষণার কাজ শুরু করলেন।

আবার গবেষণায় ডুবে গেলেন ওয়াক্সম্যান। মাটি, মাটি, মাটি–যেখানেই মাটি পান, সেখানেই তিনি খুঁজে দেখেন, তাঁর প্রার্থিত বস্তু তিনি পান কি না।

হঠাৎ একদিন আকস্মিক ভাবে সেলসম্যান পেয়ে গেলেন পরশপাথর। একটা মুরগীর পেট চিরে খানিকটা মাটি পেলেন। সেই মাটি পরীক্ষা করে দেখলেন সেই মাটিতে রয়েছে একরকমের ছত্রাক। সেই ছত্রাকের নাম স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস। এই ছত্রাকের সংস্পর্শে এলেই যক্ষ্মারোগের জীবাণু মারা যায়। এই ছত্রাক থেকে সেলসম্যান যে ওষুধ আবিষ্কার করলেন তার নাম স্ট্রেপটোমাইসিন। যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ওষুধ।

স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার করার জন্যে সেলসম্যান ওয়াক্সম্যান ১৯৫২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয় ও ওষুধ প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানকালে অনেক আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। সর্বাধুনিক কালে প্রস্টাগ্লানডিন ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে ডঃ সুনি বার্গস্ট্রং ১৯৮৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন আর এই গবেষণায় আর্থিক সাহায্য দান করেন আমেরিকার ওষুধ প্রতিষ্ঠান আপজন অ্যান্ড কোম্পানি। হয়ত এইভাবেই সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে ক্যানসার রোগের ওষুধের আবিষ্কার সম্ভব হবে।

ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

বাঁটুল দি গ্রেট

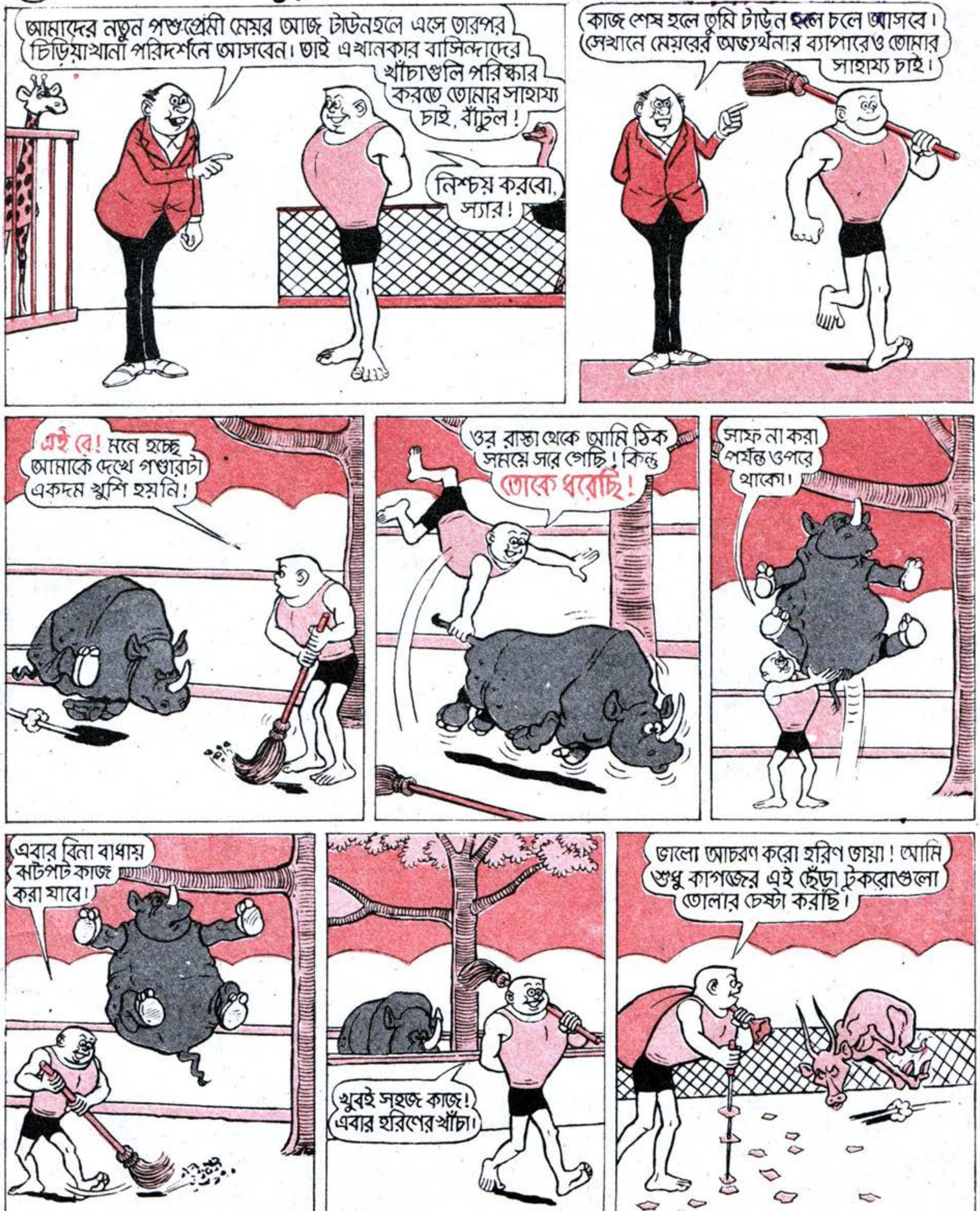
আমাদের নতুন পশুপ্রেমী মেয়র আজ টাউনহলে এসে তারপর চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে আসবেন। তাই এখানকার বাসিন্দাদের খাঁচাগুলি পরিষ্কার করতে তোমার সাহায্য চাই, বাঁটুল!
নিশ্চয় করবো, স্যার!
কাজ শেষ হলে তুমি টাউন হলে চলে আসবে। সেখানে মেয়রের অভ্যর্থনার ব্যাপারেও তোমার সাহায্য চাই।
এই রে! মনে হচ্ছে আমাকে দেখে গণ্ডারটা একদম খুশি হয়নি!
ওর রাস্তা থেকে আমি ঠিক সময়ে সরে গেছি! কিন্তু তোকে ধরেছি!
সাফ না করা পর্যন্ত ওপরে থাকো।
এবার বিনা বাধায় ঝটপট কাজ করা যাবে।
খুবই সহজ কাজ! এবার হরিণের খাঁচা।
ভালো আচরণ করো হরিণ ভায়া! আমি শুধু কাগজের এই ছেঁড়া টুকরোগুলো তোলার চেষ্টা করছি।

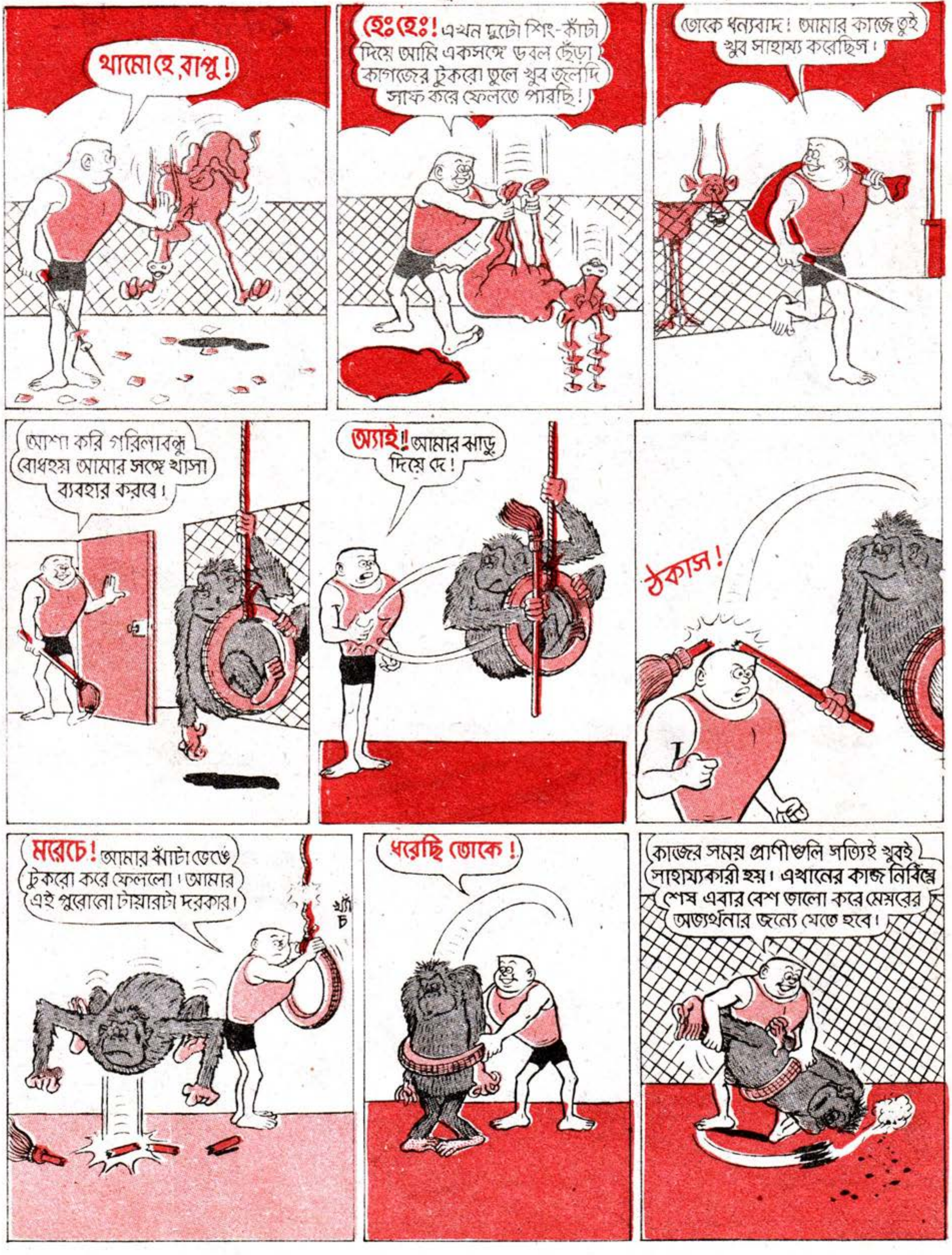
থামো হে, রাপ্পু !
হেঃ হেঃ! এখন দুটো শিং-কাঁটা দিয়ে আমি একসঙ্গে ডবল ছেঁড়া কাগজের টুকরো তুলে খুব জলদি সাফ করে ফেলতে পারছি !
তোকে ধন্যবাদ ! আমার কাজে তুই খুব সাহায্য করেছিস।
আশা করি গরিলাবন্ধু বোধহয় আমার সঙ্গে খাসা ব্যবহার করবে।
অ্যাই! আমার ঝাড়ু দিয়ে দে !
ঠকাস !
মরেচে! আমার ঝাঁটা ভেঙে টুকরো করে ফেললো। আমার এই পুরোনো টায়ারটা দরকার।
খ্যাঁচ
ধরেছি তোকে !
কাজের সময় প্রাণীগুলি সত্যিই খুবই সাহায্যকারী হয়। এখানের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ এবার বেশ ভালো করে মেয়রের অভ্যর্থনার জন্যে যেতে হবে।

টাউন হল
এই যে, এসে গেছো। এবারে এখানে লাল কার্পেটটা পাততে সাহায্য করো, বাঁটুল। যে কোন মুহূর্তে মেয়র এসে পড়তে পারেন।
কোন চিন্তা নেই, স্যার!
এই লাল কার্পেটটা আমার একার খুলে পাতার পক্ষে বেজায় ভারী।
ওঃ, এই ব্যাপার!
এটা কোন সমস্যাই নয়! আমি তুরন্ত এটা খুলে পেতে ফেলছি।
আরে, লাল কার্পেট কোথায়? ওটা আমার জন্যে পেতে দেওয়া উচিত ছিলো।
গেছি রে!
ধমাস!
ঝপাস!
তাজ্জব! মেয়রের এতো দেরী হচ্ছে!
আমি বরঞ্চ এগিয়ে দেখি উনি আসছেন কিনা।
কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

মেয়রের কোন চিহ্নই নেই, স্যার।
ও ছাড়ো, বাঁটুল! তুমি কার্পেটের ওপর ধুলো পায়ের ছাপ ফেলে নোংরা করছো!
ওঃ? আমি এখুনি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি।
একটু ভালো করে ঝাঁকুনি দিলেই ওগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে।
গরর! আমাকে শুধু বের করতে দাও এর জন্যে দায়ী কে...
গেলুম রে!
টাউন হল
ঝনাৎ!
ধপাস!
এটা দারুণ একটা নতুন চমক দিয়েছেন মেয়র, স্যার! আমাদের ধারণা ছিলো আপনি দরজা দিয়েই আসবেন কিন্তু আপনি যে উড়ে ছাদ ফুঁড়ে ঢুকবেন এটা আমরা ভাবতেই পারি নি!

পরেশ ভট্টাচার্য

এমন ঘটনাও ঘটে

আড়াআড়ি ভাবে একটা কেওড়া গাছ উপড়ে পড়ে আছে খাড়ির ওপরে। কিছুটা দূর থেকেই চোখে পড়েছে তালেব মিয়ার।

তালেব মিয়ার মনে চিন্তা, ডিঙি নিয়ে যাবে কেমন করে! যদিও হাত-কুড়ালটা সংগে আছে, কিন্তু ও গাছ কেটে খাড়ির পথ সাফ করতে দিন কাবার হয়ে যাবে। এদিকে ভাঁটার টানও লেগেছে খাড়ির জলে, আর খানিক বাদে ডিঙি ভাসাবার মতো জলও থাকবে না খাড়িতে।

আস্তে আস্তে ডিঙি নিয়ে কেওড়া গাছটার কাছে এলো তালেব মিয়া। গাছটা বেশ বড়সড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। এ গাছ কেটে সাফ করা চাটিখানি কথা নয়।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এই কাণ্ড। এর মধ্যে কখন শিকড়ের মাটি আলগা হয়ে গেছে, পড়ে গেছে ঝাঁকড়া মাথা কেওড়া গাছটা।

ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো তালেব মিয়া। দুধারে সুন্দরবনের কসাড় জংগল। যেখানে মাটি সূর্যের আলোর ছোঁয়া পায় না।

সুন্দরবনের নাড়িনক্ষত্র জানে তালেব মিয়া। ছোটবেলা থেকে এই জংগলের রাজ্যটা চষে বেড়াচ্ছে। ছোট বড় নদীগুলো শুধু নয়, বনের রাজ্যে মাকড়সার জালের মতো যত খাল, খাড়ি ছড়িয়ে আছে এ সব ওর জানা। মাছ ধরতে, কাঠ কাটতে কিংবা মধু সংগ্রহে তো যায়ই, এ ছাড়া মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে তার প্রিয় ছোট্ট ডিঙিটা নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে জংগলের রাজ্যে। জোয়ারের টানে যায়, আবার ভাঁটার টানে ফিরে আসে। বনের রাজ্যে একা একা ডিঙি নিয়ে বেড়ানোটা ওর কাছে নেশার মতো।

আটষট্টি বছর বয়েস তালেব মিয়ার—সেই শিশুকাল থেকে সে জংগলের রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে।

জংগলের রাজ্যটা তার ভালো লাগে। এখানকার গাছপালা, ঝোপঝাড়, নদী-নালা, জন্তু-জানোয়ার, ফুল, পাখি—সবই তার প্রিয়। আজ অবধি কখনো জংগলের পশুপাখি শিকার করেনি, জ্বালানীর জন্যে বাদাবন থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কখনো একটি তাজা গাছ কাটেনি। জংগলের ওপর এমনই ভালোবাসা ওর।

এই ভালোবাসার ফলও পেয়েছে। জংগলের রাজ্যে কতবার বিপদের মুখে পড়েও আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে। সে সব গল্প শুনলে রূপকথার গল্প মনে হবে।

একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো তালেব মিয়া। তারপর ডিঙির কোণ থেকে ছোট্ট কুড়ালটা বার করলো।

একটু ভাবলো, এরপর আল্লার নাম করে কোপ মারলো কেওড়া গাছের ডালে। প্রথম কোপ মারার সংগে সংগে তার মনে হলো গাছটা এখনো বেঁচে আছে। পরক্ষণে মনে হয় এ বাঁচা তো বাঁচা নয়। গাছটার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে গেছে।

পরপর বেশ কয়েকটা ডাল কাটলো। তারপর বড় একটা ডালে কোপ মারতে গিয়ে কুড়ালটা মুঠো ফসকে পড়ে গেল খাড়ির জলে। তালেব মিয়া তাজ্জব বনে গেল। কুড়ালটা আচমকা মুঠো থেকে ফসকে গেল কেন!

কুড়ালটা খুঁজে পাওয়াও তো মুশকিল। খাড়িতে এখনো চার পাঁচ হাত জল। তারপর জলের মধ্যে কোথায় পড়েছে কে জানে। আর কেওড়া গাছের ডালপালার মধ্যে জলে ডুবে কুড়াল খোঁজাও দায়।

জলে নামতে যাবে, এমন সময় ফোঁসফোঁসানি কানে এলো তালেব মিয়ার। পারের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলো, ভয়ংকর বীভৎস একটা দানবের মতো কাঁকড়া একটা কেউটে সাপকে দাড়া দিয়ে ধরেছে। সাপটা ছোবল মারছে কাঁকড়ার শক্ত আবরণের ওপর। আর কাঁকড়াটা তার দাড়া দিয়ে ধরা সাপটাকে জলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

তালেব মিয়া এতদিন এই জংগলের রাজ্যে ঘুরেছে কিন্তু এমন ভয়ংকর দৃশ্য কখনো তার চোখে পড়েনি। সর্বাংগ শিউরে উঠলো কাঁকড়া আর কেউটের লড়াই দেখে।

সাপটা সমানে ছোবল মারছে, আর কাঁকড়া সাপটাকে জলের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। জলের কাছাকাছি নেমে এসেছেও।

শেষ পর্যন্ত সাপটা দু টুকরো হয়ে গেল। লেজের দিকটা নিয়ে কাঁকড়া জলের মধ্যে নেমে গেল তরতর করে। কাঁকড়ার আজ মহাভোজ।

অর্ধেক শরীর নিয়ে কেউটেটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। নরম পলির ওপর খানিকটা জায়গা রক্তে লাল হয়ে গেছে। কেউটেটা ভয়ংকর আক্রোশে ফণা তুলে ফুঁসছে।

তালেব মিয়া ভাবলো, এখন জলে নামা যাবে না, কালান্তক যম চোখের সামনে। ক্ষ্যাপা কেউটের ছোবল মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

ও সাপটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। হয়তো এমনিতে মরে যাবে, কিন্তু মরার আগে

অস্থির ক্ষ্যাপা কেউটেকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না।

দু-একটা জীবন নিয়ে যাবে।

ডিঙির লগিটা তুলে নিয়ে কেওড়া গাছের গুঁড়ির ওপর উঠলো তালেব মিয়া। গুঁড়ির ওপর দিয়ে পারের দিকে এলো। ঠিক করলো লগি দিয়ে কেউটেটাকে পলি কাদার মধ্যে পুঁতে দেবে।

কিন্তু অস্থির ক্ষ্যাপা কেউটেকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। লগির ওপরেই ছোবল মারছে কেউটে। শেষটা কোনমতে কেউটেটাকে নরম পলি-কাদার মধ্যে পুঁতে দিলে। কিন্তু পরক্ষণে পলিমাখা হিলহিলে শরীর নিয়ে বেরিয়ে এলো সাপটা। তালেব মিয়াও যেন ক্ষেপে গেছে। বারবার সাপটাকে লগি দিয়ে খোঁচাতে লাগলো। শেষটা সাপটা স্থির হয়ে গেল। আর ফণা তুলতে পারছে না। শুধু কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। এবারে সাপটাকে সজোরে পলির মধ্যে গুঁজে দিলে। তবু তালেব মিয়া চোখ রাখলো খানিক সময়, সাপটা আবার বেরিয়ে আসে কি না। না। সাপটা আর নরম পলি ঠেলে উঠে এলো না।

কেওড়া গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালো তালেব মিয়া। সূর্য বেশ খানিকটা পশ্চিমে ঢলেছে। মাঘের সূর্য, আর কতক্ষণই বা আকাশে থাকবে। এদিকে খাড়ির জলও ভাঁটার টানে আরো খানিক নেমে গেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই জল-শূন্য হয়ে যাবে খাড়ি। গাছ কেটে ফেললেও তখন আর ডিঙি ভাসাবার উপায় থাকবে না।

এমন বিপাকে কখনো পড়েনি তালেব মিয়া।

এখান থেকে খাড়ি বরাবর হেঁটে গেলে শকুনখালির খাল এমন কিছু দূর নয়। বড়জোর ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। কুড়ালটা সংগে থাকলে তাই করতো তালেব মিয়া। কিন্তু শূন্য হাতে এই জংগলের পথে যাওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু এই জংগলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ। বিপদ তো এখানেও।

কেওড়ার গুঁড়ি থেকে ডিঙিতে নামলো তালেব মিয়া। মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। কিন্তু ভাবনা কি ঝেড়ে ফেলা যায়। এখন যত চিন্তা তার কুড়ালটার জন্যে। ওটা ঠাকুর্দার আমলের কুড়াল। ঠাকুর্দা বলতো, এই কুড়ালটা হাতে রাখবি জংগল মহলে গেলে। দেখবি কোনো বিপদ কাছে আসবে না। বাবাও সেই কথা বলতো। আর তালেব মিয়ার ধারণাও তাই। সে দেখেছে কুড়ালটা হাতে থাকলে মনে কোনো ভয় থাকে না।

সেই কুড়ালটাই আজ বেটক্কর পড়ে গেল খাড়ির জলে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল তালেব মিয়া। হঠাৎ চমক ভাঙলো বানরের কিচিরমিচির শুনে। আর সেই মুহূর্তে একদল পাখিও উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

বানরের এই কিচিরমিচির, পাখির উড়ে যাওয়া—এ সবের মানে বোঝে তালেব মিয়া। সে বেশ বুঝতে পারে, বড় মিয়া অর্থাৎ রাজা বাঘ নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও এসেছে কিংবা আসছে। এই অরণ্য রাজ্যে বানর আর পাখিরা নিচের জন্তু-জানোয়ারদের সতর্ক করে দেয়—পালাও বাঘ আসছে।

একদল বানর বসে আছে কেওড়া গাছের মগডালে। তালেব মিয়া ফিরে তাকানোর সংগে সংগে বানরগুলো ভীষণ চঞ্চল হলো, গাছের ডাল নাড়তে লাগলো জোরে জোরে। একটা বুড়ো বানর মুখ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করতে লাগলো।

তালেব মিয়া বুঝলো, ভয়ংকর বিপদ বুঝেই ওরা তাকে সাবধান করে ওই গাছেই উঠতে বলছে।

তালেব মিয়া ডিঙি থেকে লাফিয়ে পড়লো পারে। পায়ে নরম পলি, গাছে ওঠাই দায়। তবু হেতাল পাতায় কোনমতে পা ঘষে নিয়ে কেওড়া গাছে উঠতে আরম্ভ করলো। কিছুটা উঠেই দেখতে পেল মূর্তিমান ভয়ংকর লাফ দেবার জন্যে তৈরি।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো তালেব মিয়ার। আর সেই মুহূর্তেই দেখলো একটা কেওড়া গাছের ডাল এসে পড়লো বাঘটার মুখের ওপর। বাঘটা মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেও পরমুহূর্তে ভয়ংকর গর্জন করে উঠলো।

ততক্ষণে তালেব মিয়া মরিয়া হয়ে আরো খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে।

এবারে বানর দলের মধ্যে আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল।

তালেব মিয়াও এখন নিরাপদ। গাছের ওপরের দিকে উঠে এসেছে সে। স্থির হয়ে বসেছেও।

সামনেই আর এক ডালে বুড়ো বানরটা বসে আছে। তালেব মিয়া দেখলো, বুড়ো বানরটা তার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে।

পঁচিশ তিরিশটা বানর বসেছিল গাছে। হঠাৎ তারা আবার নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির আরম্ভ করে দিল। তারপর হঠাৎ কি হলো দশ-পনেরোটা বানর এ গাছ-ও

গাছের ওপর দিয়ে চলতে লাগলো। ওরা শকুনখালির দিকে যাচ্ছে।

কেওড়া গাছের নিচে হেতাল ঝোপের কাছে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করছে আর মাঝে মাঝে ভয়ংকর মুখব্যাদান করে ওপরের দিকে দেখছে।

তালেব মিয়ার পাশে বসা একটি বানর মাঝে মাঝে কেওড়া ডাল ভেঙে বাঘটার মুখের ওপর ফেলছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নিবিড় হয়ে নামলো জঙ্গলের রাজ্যে। সংগে ফিকে কুয়াশাও জমছে।

বানরের দল এখনো তাকে ঘিরে বসে রয়েছে। তালেব মিয়ার চোখ মাঝে মাঝে পড়ছে নিচের দিকে। যেখানে অন্ধকারের মধ্যে বাঘের দুটো চোখ জ্বলছে।

তালেব মিয়া ভাবছে, যদি সারা রাত মাঘের শীত গায়ে নিয়ে এই গাছের ডালে বসে কাটাতে হয়।

তালেব মিয়া আবার সচকিত হলো। দূর থেকে ভেসে আসা বানরের কিচিরমিচির আওয়াজ শুনে। এরাই কি দল বেঁধে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসছে। তাই যদি হয়, তাহলে কোথায় গিয়েছিল ওরা এবং কেন? আবার ফিরে এলোই বা কি জন্যে!

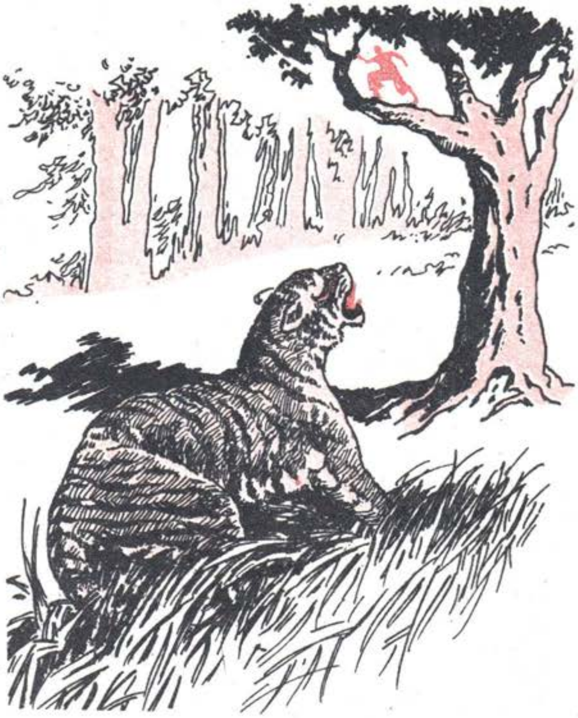

মূর্তিমান ভয়ংকর লাফ দেবার জন্যে তৈরি।

তালেব মিয়ার মনের মধ্যে বিস্ময়!

সে বিস্ময় আরো গভীর হলো যখন তালেব মিয়া শুনতে পেল ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ। একটি নয়, অনেক ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে কারা যেন জঙ্গলের মধ্যে আসছে।

এক সময় দূরে চোখ পড়লো তালেব মিয়ার। কুয়াশার জালের মধ্যেও দেখতে পেল অনেকগুলি আলো কাঁপছে।

বানর দলের মধ্যে তখন সে কী উল্লাস। আনন্দে গাছের ডাল নাড়ছে আর কিচির মিচির করছে। এদিকে বাঘটাও ভয়ংকর শব্দে গর্জন করে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে কৌতূহলের অবসান হলো। দুটো হ্যাজাক আর অনেকগুলো মশাল জ্বালিয়ে বন্দুক, সড়কি, বল্লম নিয়ে ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে একদল মানুষ এসে পৌঁছলো গাছের নিচে। বিপদ বুঝে বাঘটা তখন জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে।

যারা এসেছে তার মধ্যে তালেব মিয়ার বাড়ির ছেলেরা আর পড়শি জোয়ানেরা রয়েছে। গাছের ওপর থেকে তালেব মিয়া সকলকেই দেখেছে।

ডিঙি দেখে মানুষগুলো তখন ক্যানেস্তারা পেটানো বন্ধ করেছে।

পতিরাম বৈদ্যর গলার আওয়াজ জোরালো। ঠোঁটের ডগায় দুটি হাতের তালু শাঁখের মতো করে হাঁক পাড়লো, অ তালেব মিয়া...আ... আ...

ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

তালেব মিয়ার কী যেন হয়েছে, সাড়া দেবে কিন্তু দিতে পারছে না। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সব কিছু যেন তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

অথচ এই মুহূর্তের যা কিছু সবই সত্যি।

শেষ পর্যন্ত সেই ঘোর ভাবটা কেটে গেল। তালেব মিয়া চিৎকার করে বললে, আমি এখানে—এই গাছে।

আনন্দে আবার ক্যানেস্তারা পেটাতে আরম্ভ করলো নিচে জড়ো হওয়া লোকজন। বন্দুক ছিল দেবেন মাস্টারের হাতে, ফাঁকার দিকে একটা গুলিও ছুঁড়লো।

তালেব মিয়া সাবধানে নেমে এলো নিচে। একে ওকে জড়িয়ে ধরলো আনন্দে।

দল বেঁধে তখন সবাই খাড়ির পারে এসে দাঁড়ালো। ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে। কাদার ওপর কাত হয়ে আছে ডিঙিটা। তালেব মিয়া দেখলো তার কুড়ালটা ভেঙে পড়া কেওড়া গাছের ডালে আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাদার মধ্যে নেমে কুড়ালটা নিয়ে এলো তালেব মিয়া।

ডিঙি পড়ে রইলো। কাল জোয়ারের সময় এসে নিয়ে গেলেই হবে। ডিঙি তো আর ভেসে যাবে না, ভেঙে পড়া গাছে আটকে থাকবে।

ফেরার সময় বানর দলের কীর্তির কথা শুনলো তালেব।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে একদল বানর শকুনখালির পারে একটা গাছে জড়ো হয়। ওদের ভাষায় চিৎকার করে সজোরে গাছের ডাল নাড়তে থাকে। সংকীর্ণ খাল-খালের ওপারেই গ্রাম। আর তালেব মিয়ার বাড়ি খালের পারেই।

খালপার দিয়ে যারা যাওয়া-আসা করছিল, তারা থমকে দাঁড়িয়ে বানরদের কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকে। অবাকও হয়।

এদিকে তালেব মিয়া যে জোয়ারের টানে ডিঙি নিয়ে বনের মধ্যে গেছে এবং এখনো ফেরেনি এ কথাটাও কানাকানি হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

তালেব মিয়ার বড় ছেলে মোকসেদও এলো। দেখলো বানরদের কাণ্ডকারখানা। আর তখনই তার মনে হলো, ওরা তার আব্বাজানের বিপদের কথা জানাতে আসেনি তো! মনে পড়লো আব্বাজানের কথা—জংগলে আমার কোনো বিপদ হবে না, এ রাজ্যটারে আমি ভালোবাসি।

এরপর মোকসেদই বললে দল বেঁধে বাদায় ঢোকার কথা।

দেখতে দেখতে পাড়ার লোকজন তৈরি হলো বনে যাওয়ার জন্যে। তারা যতক্ষণ না খাল পেরিয়ে আসে ততক্ষণ বানর দল সমানে চিৎকার করেছে।

তালেব মিয়ার দু চোখে জল ঝরছে। বানরদের এ ঋণ সে শোধ করবে কি করে। তার মনে পড়লো বছর সাতেক আগেকার কথা। এই জংগলে একটা শিশু বানর পাখিধরা জালে আটকা পড়েছিল, তালেব মিয়ার চোখে পড়ে। শিশু বানরটাকে সে মুক্ত করে দেয়। মনে আছে শিশু বানরটিকে ফিরে পেয়ে বানর পরিবার কি রকম আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

আজ বানরেরা কি সেই দানের প্রতিদান দিলে?

আচমকা গাছের ডালে বসা বানরদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললে তালেব মিয়া, কাল যখন ডিঙি নিতে আসবো, তখন তোদের জন্যে দু কাঁদি পাকা কলা নিয়ে আসবো, তোরা থাকিস এখানে।

তালেব মিয়াকে নিয়ে দলবল এগিয়ে চললো। বানরের দল কচি কচি কেওড়ার পাতা ছড়িয়ে দিতে লাগলো সকলের মাথার ওপর।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

ব্যাঘ্র-বিলাপ

রেবতীভূষণ ঘোষ

কেঁদে কয় কেঁদোবাঘ
　　　সুন্দরবনে
হায়রে বিধাতা, এই
　　　ছিলো তোর মনে!
　হরিণের দল হাওয়া
　বরাহ যায় না পাওয়া
এবার আহার বিনে কাটে অনশনে।
　ঝোপে-ঝাড়ে শজারুর
　　　আনাগোনা দেখে
　পেটের দায়েই ভাবি
　　　দেখা যাক চেখে।

　'হালুম'—দিলুম লাফ
　মলুম—বাপরে বাপ।
থাবাটা জখম হল ফুটে গিয়ে কাঁটা
খাওয়া-দাওয়া ঘুচেছিল—এবে চলা-হাঁটা।
　　কাঠুরের পেয়ে সাড়া
　　দিয়েছিনু গলা-ঝাড়া
শুনেই পালালো ব্যাটা
　　　পগারের পার।
কাগজে খবর রটে
　　　আমি ম্যান-ইটার।

গোবিন্দগোপালের শত্রুরা

আশাপূর্ণা দেবী

জীবনে তিনটি জিনিসকে ভয় করেন গোবিন্দ-গোপাল, তারা হচ্ছে, আরশোলা, ছিঁচকে চোর আর সর্দি। শুধু যে ভয়ই করেন, তা নয়, দুচক্ষের বিষ দেখেন, পরম শত্রু বলে মনে করেন।

কিন্তু জগৎ সংসারে এত শত ভয়ংকর আর বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি জিনিস থাকতে, এই তুচ্ছ তিনটে গোবিন্দ-গোপালের পরম শত্রু হতে গেল কেন? এত রাগ বিদ্বেষই বা কেন তাদের ওপর?

ক্যানসার আলসার টি বি টাইফয়েড, আমাশা গেঁটে বাত অম্বল শূল ইত্যাদি খানদানী সব অসুখ থাকতে, তুচ্ছ সর্দিকে প্রাধান্য দেওয়া কেন? কেনই বা খুনে গুন্ডা ডাকাত ছিনতাইবাজরা থাকতে ছিঁচকে চোর? আর সাপ ব্যাঙ বিছে কাঁকড়া বিছে, গিরগিটি ছুঁচো থাকতে আরশোলা! মানেটা কি?

তা মানে আছে বৈ কি। তবে মানে জানতে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে। যখন গোবিন্দগোপাল একটি শিক্ষিত বেকার যুবক। হন্যে হয়ে একটা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই সময় হঠাৎ হাতে চাঁদ পাওয়ার মত বর্ধমান হাই স্কুল থেকে একটি দরখাস্তর উত্তর এল শীঘ্র দেখা কর, একটি

ভূগোল শিক্ষকের পদ খালি আছে।

গোবিন্দগোপাল ভূগোলেরই ছাত্র, সেই মতই দরখাস্ত করেছিলেন। পদ যখন খালি রয়েছে, আর যখন শীঘ্র আসতে বলেছে, তখন চাকরি অবধারিত। যুবক গোবিন্দগোপাল তার সবথেকে ভাল জামাকাপড় সংগে নিয়ে আর মোটামুটি একটা সেট পরে চলে এল বর্ধমানে।

অসুবিধে কিছু নেই। বর্ধমানে গোবিন্দগোপালের এক দূরসম্পর্কের পিসির বাড়ি, সেখানেই গিয়ে উঠবে। যাওয়া আসা বেশী নেই, তা হোক পিসিমা খুবই স্নেহময়ী। এই

তুতোর তুতো ভাইপোটিকে দেখে আহ্লাদে দিশেহারা। বললেন, খুব ভাল দিনে এসেছিস গবু, আজ বাড়িতে একটা যজ্ঞি হচ্ছে, দ্যাওরের নাতির অন্নপ্রাশন।

তা খাওয়া দাওয়াটি হল বটে একখানা! পেল্লাই ভোজ! এটি যে একটি শুভসূচক তাতে আর সন্দেহ নেই। ধর যদি পিসির বাড়িটা এখানে না থাকতো! তাহলে ইস্টিশানে যাত্রী হোটেলে খেয়ে আর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে শুয়ে রাত কাটাতে হতো! তবে অসুবিধে এই পিসির বাড়িতে আজ বাড়ি ভর্তি লোক, কাউকেই প্রায় চেনে না গোবিন্দ গোপাল। তাই রাত্রে নটা না বাজতেই বলল, দুপুরে দেদার খাওয়া হয়েছে, এখন আর খাওয়া দাওয়া নয়, কোথায় শুতে দেবে দেখিয়ে দাও পিসি!

'খাওয়া দাওয়া নেই' এটা অবশ্য মানলেন না পিসি। জোর করে দুটো বৃহৎ সাইজের পান্তুয়া খাইয়ে নিয়ে এলেন শোবার জায়গায়। তবে খুবই খুঁত খুঁত করলেন তিনি বাড়িতে আজ এত লোক, দোতলার বারান্দার ধারে ভাল ভাল ঘরগুলোর একটাও খালি নেই, একতলায় এই ওঁচা ঘরটাই যা খালি। যারা এসেছে তারাও তো কুটুম। ঘর থেকে ভাগানো তো যায়না।

গোবিন্দগোপাল বলল, ঘর ওঁচা নাক বোঁচা বাদাখোঁচা যাই হোক, একটা চৌকী আর একটা ফর্সা বিছানা তো আছে। ব্যস! একটা রাত্তির গোয়ালেও কাটিয়ে দেওয়া যায়।

তা এ তো আর গোয়াল নয়, শুধু ঘরটার তিনভাগ জুড়ে যত রাজ্যের পুরনো ট্রাঙ্ক, ভাংগা বাসনপত্র, ছেঁড়া তোষক বালিশ ডাঁই করে রাখা তাতে কিছুই ব্যাঘাত হল না গোবিন্দগোপালের। এক ঘুমে রাত কাবার। যে পাশে শুয়েছে সেই পাশেই উঠেছে। তবে রাত এমনই কাবার, যে সকালে উঠে চক্ষু চড়ক গাছ। বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ওদিকে ইনটারভিউ দশটায়, আর পিসির বাড়ি থেকে সেই ইস্কুলটা রিকশয় ঘণ্টাখানেক রাস্তা। শহর থেকে দূরে এ একটা পুরনো পাড়া।

পড়ি তো মরি করে সাজিগুজি সেরে বেরিয়ে পড়ল। পিসি বলল, খাবার টাবার খাবি না কিছু?

গোবিন্দ বলল, অসম্ভব।

খালি এক কাপ চা খেয়ে জামার পকেট থেকে চিরুনিটা বার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রিকশয় গিয়ে উঠল।

কিন্তু রিকশওলা ছোকরাটা এতো অসভ্য আর গায়ে পড়া। কেবলই জিগ্যেস করছে কোথা থেকে এসেছেন দাদাবাবু? কী কারণে? এখন কোথায় যাবেন? ইত্যাদি। বলছে আর বৃহৎ মূলোর মত দাঁতগুলোকে বার করেই রেখেছে।

গোবিন্দগোপাল অনুভব করলো এই অজ পাড়াগাঁর

মত জায়গায় লোকগুলো তেমন সভ্য নয়। পিসির বাড়ির ছেলেপুলেগুলোও যতক্ষণ না রিকশয় উঠেছে গোবিন্দগোপাল, ততক্ষণ নিজেরা ঠেলাঠেলি করে কেবলই হেসে মরেছে। একটা বাইরের ভদ্রলোকের সামনে এ রকম হাসাটা যে অভব্যতা তা কি কেউ শেখায়ও নি ছাই। পিসির চোখে না হয় ছানি, বড়ি সুদ্ধ সকলের তো আর তা নয়। দেখতে পায়নি ছেলেমেয়েগুলোর বিটকেলমি!

দারোয়ানটাও এমন মুখ ফিরিয়ে হাসছে কেন?

আবার দেখা যাচ্ছে রিকশওলাটাও।

বুঝল ওদের দস্তুরই এই। অকারণ ফ্যাক ফ্যাক হাসি।

যাক গে মরুক গে এখন ঠিক সময় পৌঁছতে পারলে হয়। যা রাস্তার ছিরি। গোবিন্দগোপালের সেই আমলে কলকাতার রাস্তার ছিরিটা এখনকার মত এত বিচ্ছিরি হয়নি, তাই পিসির ওই শহর থেকে দূরের বাড়িটার রাস্তার মুণ্ডুপাত করতে করতে এল গোবিন্দগোপাল।

কিন্তু ইস্কুলের দারোয়ানটাও এমন মুখ ফিরিয়ে হাসছে কেন? ব্যাপার কী? হেডমাস্টারেরও কি এ রোগ আছে না কি?

নাঃ হেডমাস্টারের সে রোগ দেখা গেল না, দেখা গেল ঠিক উল্টো। মুখ গোম্লা করে বললেন তিনি, আপনার সাবজেক্ট তো ভূগোল। তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা মাথার গোলমালওয়ালা মাস্টার চাইছি না।

গোবিন্দগোপাল আকাশ থেকে পড়লো।

তার মানে?

মানেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে একটাও আর্শি নেই আপনার? কিম্বা অন্য লোক? একজোড়া চোখওলা।

না মানে, এখানে আমার পিসির বাড়ি—ইয়ে—

—ওঃ। সে বাড়িতে কোনো আর্শি নেই। আচ্ছা—! কাকে ডেকে কী যেন বললেন হেডমাস্টার। সে ছুটে গিয়ে বোধহয় কোনো বেয়ারার ঘর থেকে একটা টিন মোড়া ছোট্ট আর্শি এনে দাঁড়াল।

হেডমাস্টারমশাই ইশারা করলেন গোবিন্দগোপালকে দিতে। গম্ভীর ভাবে বললেন, নিজের চোখে দেখে নিন।

দেখল গোবিন্দগোপাল।

দেখে হাত থেকে আর্শিটা পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো।

হেডমাস্টার বললেন, আমি নিশ্চয় একজন ক্লাউনকে আমার স্কুলে নিতে পারি না।

গোবিন্দগোপালের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রাগে অপমানে। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে, আর্শিটা যার জিনিস তাকে আর একটা কিনে নিতে বলবেন।

গটগট করে বেরিয়ে এলো।

রিকশটাকে দাঁড় করানোই ছিল। উঠে বসা ছাড়া গতি নেই।

ছোকরা এখন ভালমানুষের মত মুখ করে বলল,

দাদাবাবু রাতে যে ঘরে শুয়েছিলেন সে ঘরে বুঝি খুব তেলাপোকা?

গোবিন্দগোপাল চমকে বলল, কেন?

না মানে বলতেছি, এ অঞ্চলের তেলাপোকাগুলা বড় গোঁফখেগো! গোঁফ পেলে আর কিছু চায় না। এক কাতে শুয়েছিলেন বোধহয়? যে কাতটা পেয়েছে, একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছে। ইদিকটা দিব্যি ঝাড়!

হ্যাঁ সেটাই আর্শিতে দেখেছিল গোবিন্দগোপাল। চাকরি পাচ্ছে না বলে চেহারায় ভার ভারিক্কী ভাব আসবে বলে, গোবিন্দগোপাল খুব যত্ন করে তোয়াজ করে গোঁফ জোড়াটা বাড়িয়েছিল। দেখল, তার একদিকটা বিলকুল সাফ!

এই অবস্থায় তাকে যেতে হবে পিসির বাড়ি! পিসির বাড়ি থেকে কলকাতা! অগতির গতি রিকশওলা ছেলেটার কাছেই জানতে চাইল, কাছে কোথাও সেলুন আছে কিনা। সে খুব উৎসাহ ভরে নিয়ে গেল একটা সেলুনে।

কী দাগা! কী দাগা!

চাকরি হল না।

গোঁফ মুড়িয়ে বাড়ি ফিরতে হলো। প্রশ্নের শরাঘাতে জীবন মহানিশা! এরপরও কি আরশোলা বা তেলাপোকা বা 'সাক্ষাৎ শয়তান' ওই জাতটার সম্পর্কে উদারতা থাকবে? তদবধি গোবিন্দগোপাল আরশোলা দেখেন কি মারেন। আর দুবেলা বাড়ির সর্বত্র 'ফ্লিট স্প্রে' করেন। যখন করেন হিংস্রভঙ্গীতে।

দ্বিতীয় দাগা, 'ছিঁচকে চোর'।

তার বছর দুই পরের কথা!

ততদিনে কলকাতাতেই একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়ে গেছেন, এবং বিয়েও হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি হুগলীতে। গঙ্গার ধারেই বাড়ি, সুন্দর জায়গা।

নতুন শ্বশুরবাড়ি গেছেন গোবিন্দগোপাল, থাকতে হবে দুচার দিন। ছোট শালী ধরে বসল, আপনি শুনলাম খুব ভাল সাঁতারু, লেক ক্লাবে দু'দুবার ফার্স্ট হয়েছিলেন, আপনি আমাদের একটু সাঁতার দেখান।

বাঃ আমি কি সুইমিং কস্ট্যুম নিয়ে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে এসেছি?

আহা নাইবা হল কস্ট্যুম! শালী হেসেই খুন, তোয়ালে পরেই নেমে যান না।

অসুবিধে হবে।

বেশ তবে জাঙিয়া পরেই নামুন। আমরা ছাত থেকে দেখব। না যদি নামেন তো বুঝবো ও সব সাঁতার জানা-টানা বাজে চাল! ভাঁওতা।

রাগে কান খাড়া হয়ে গেল গোবিন্দগোপালের।

আচ্ছা দেখিয়ে দেবেন বাজে চাল কি ভাঁওতা।

গঙ্গার ঘাটের ধারে যে কাপড়ছাড়ার ঘর থাকে, সেইখানে কাপড় জামা জুতো সব খুলে রেখে সত্যিই জাঙিয়া পরে গঙ্গায় নেমে গেলেন গোবিন্দগোপাল।

তারপর যা একখানা জেদ ধরলেন!

বারবার গঙ্গার এপার ওপার।

থামেন আর না।

বৌ শালা শালী দূরে ছাত থেকে হাত নেড়ে নেড়ে বারণ করতে থাকে 'আর না আর না' বলে, তবু চালিয়ে যায় নতুন জামাই। বাহাদুরী দেখানো আর কী।

অবশেষে যখন উঠে এসে সেই কাপড় ছাড়ার ঘরে এসে হাজির হলেন, বুক ফাঁকা। কোথায় তার দামী কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, চিকনগেঞ্জি। নিউ কাট্ জুতো। ধূ ধূ মরুভূমি। হাত ঘড়িটা আর সোনার বোতামটা বাড়িতে রেখে এসে, খুব বুদ্ধির কাজ করেছি ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন। হায় জানতেন না জগতে জুতো চোরের সংখ্যাও কম নয়।

ঘাটের ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন ছাতও মরুভূমির মত খাঁ খাঁ। কেউ নেই। কাজেই ইশারায় অবস্থা বোঝাবার উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ঘাট থেকে রাস্তার সব্বাই দেখল যদু মুখুজ্যের নতুন জামাই একটা ভিজে জাঙিয়া পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে শ্বশুরবাড়ির গেট ঠেলে ঢুকছে।

কিন্তু সেই ঢোকার আগে প্রতিপদে একবার করে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে না যত রাজ্যের অচেনা অজানা লোকেদের? এই অপদস্থর কারণ তো কোনো পাজী ছিঁচকে চোরের ছিঁচকেমি! ঘড়ি নয়, আংটি নয় বোতাম নয়, শুধু একটা ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি জুতো নেয় যে, তাকেই তো ছিঁচকে বলা হয়।

সেই থেকে ছিঁচকে চোরদের পরম শত্রু মনে করে আসছেন গোবিন্দগোপাল।

উঃ কী হাসির রোলই উঠেছিল সেদিন হুগলীর যদু মুখুজ্জের বাড়ি। পাড়ার লোকেরা সুদ্ধু দলে দলে জানতে এল, কী খোওয়া গেছে নতুন জামাইয়ের।

কী খোওয়া গেছে, কী আর বোঝাবে জামাই।

খোয়া গেছে তো প্রেস্টিজটি! যে গোবিন্দগোপাল

গতকাল রাত্তিরে প্রেস্টিজ পাংচারের ভয়ে পাতে ভাল ভাল খাদ্যবস্তু ফেলে রেখে আধপেটা খেয়ে উঠে পড়েছিলেন জামাইগিরি বজায় রাখতে, তাঁর এই দুর্দশা।

স্রেফ এক ব্যাটা ইতর ছোটলোক চামার পাজী ছিঁচকের জন্যেই তো।

তাহলে? ছিঁচকেরা গোবিন্দগোপালের দু'চক্ষের বিষ, পরম শত্রু হবে না? ছিঁচকেদের ব্যাপারে দারুণ সাবধানী গোবিন্দগোপাল।

আর সর্দি?

সেও এক দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস। এ আবার দু'দুবার দাগা! স্কুলে এক পুরনো মাস্টার বিদায় নিচ্ছেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল হচ্ছে, গোবিন্দগোপালকে বলা হয়েছে একটু ভাষণ দিতে। গোবিন্দগোপাল একটু বলিয়ে কইয়ে।

কিন্তু ঠিক তার আগের দিনই বৃষ্টিতে ভিজে গোবিন্দগোপালের দারুণ কাঁচা সর্দি। তা কী আর করা। সর্দি হয়েছে বলে তো আর কর্তব্য ত্যাগ করা যায় না। তবু কে জানতো এমন হবে।

ভাষণ দেওয়া হল, একসঙ্গে গ্রুপ ফটো হল, মাস্টারকে যা উপহার দেবার দেওয়া হল। মোটামুটি ভালই হল। ফটাফট ছবি তোলা হল গাদা গাদা।

কিন্তু কদিন পরে?

যখন ছবি এল?

দেখা গেল দু দুটো ছবিতেই গোবিন্দগোপালের ছবি উঠেছে হ্যাঁচ্চো মার্কা।

ভাষণ দিতে দিতে ঠিক যে মুহূর্তে ক্যামেরা ক্লিক্ সেই মুহূর্তে বিরাট এক হাঁচি দিয়ে বসেছেন গোবিন্দগোপাল। আবার গ্রুপ ফটোর সময়ও, সেটা আবার হাঁচি চাপতে

ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে গিয়েছিল

গিয়ে মুখের চেহারা হয়েছে মুখ খিঁচোনোর মত।

ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দগোপালের। সেও ছেড়ে কথা কয়নি। বলেছিল কখন কোন মুহূর্তে আপনার মুখের ভূগোল বদলে যাবে, আমি কি করে জানব? হাত গুনতে জানি?

সেই ফটো তো সকলের ঘরে ঘরে দেয়ালে ঝুলছে।

সেই অবধি সর্দি সম্পর্কে গোবিন্দগোপাল 'পাগুলে' সাবধানী! ওঁর সাবধানতার বহর দেখে লোকে পাগলই বলে।

নইলে সিমলে নয়, মুসৌরী নয়, কাশ্মীর দার্জিলিং নয়, যাচ্ছেন নিউ জলপাইগুড়ি। তার জন্যে এতো রণসজ্জা!

ট্রেন রাত্রে, বিকেল থেকেই গোবিন্দগোপাল গায়ে চাপিয়ে রেখেছেন, সুতি গেঞ্জির ওপর গরম গেঞ্জি, গরম গেঞ্জির ওপর পুরোহাতা পুলোভার, পুলোভারের ওপর গলাবন্ধ গরম কোট, গরম কোটের ওপর লম্বা ঝুল মোটকা ওভারকোট, ওভারকোটের আড়ালে ধুতির নীচে মিলিটারী মার্কা কম্বুলে ফ্লানেলের পায়জামা। এর সঙ্গে অলউল্ ফুলমোজা, পায়ে গামবুট। হাতে দস্তানা। মাথায় 'মাঙ্কি ক্যাপ'। অর্থাৎ কিনা বাঁদুরে টুপি।

গোবিন্দগোপালের ছোট মেয়ে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে বাবার ধুতির সঙ্গে গামবুট পরা দেখে। কিন্তু ধুতি ছাড়া কিছু পরেন না তো গোবিন্দগোপাল। বলেন মাস্টারদের প্যান্ট পরা মানায় না।

কিন্তু এখন? এই সব?

এ সব তো কী? তা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কিছু প্রতিষেধক তো দরকার। করো তোমরা হাসি তামাসা, ঠাট্টা ইয়ার্কি।

যাচ্ছেন কোথায়?

না, একেবারে দার্জিলিংয়ের দরজায়।

মাসটা কী?

না, ডিসেম্বরের গোড়া।

তবে? শরীরের এতোটুকু ফাঁক পেলেই যে ঠান্ডাটা ঢুকে পড়বে আর সর্দিটি ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে না জানে? জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছিরি অসুখ হচ্ছে- হাঁচি কাসি কাঁচা সর্দি। মুখের যে অংশটুকু নেহাৎ খোলা রাখা ছাড়া উপায় নেই সেইটুকুতে পুরু করে ভেসলিন মেখে নিয়েছেন গোবিন্দগোপাল, চামড়ার ওপর ভালমত একটা কোটিং পড়ে যাতে! এটা গোবিন্দগোপালের ডাক্তারের পরামর্শ।

গোবিন্দগোপালের বৌ বলল, লোকে তোমায় পাগল বলবে।

বলুক। কথায় ফোসকা পড়ে না। ফট্ করে ঠান্ডাটা লেগে গেলে লোকে আমায় বাঁচাতে আসবে?

কিন্তু এখন, এ সময় দার্জিলিঙের দরজায় যাচ্ছেন কেন গোবিন্দগোপাল?

দায়ে পড়েই। গোবিন্দগোপালের এক বাল্যবন্ধুর ওই নিউ জলপাইগুড়িতে ব্যবসা বাণিজ্য বসবাস। তা বেশ তাতে কারুর কিছু এসে যাচ্ছিল না, কিন্তু সেইখানে বসে মেয়ের বিয়ে দিতে বাসনা হলো তাঁর। তাও না হয় হলো, কিন্তু বাল্যবন্ধুকে মেয়ের বিয়েতে না নিয়ে যেতে পারলে যে তাঁর জীবন বৃথা হয়ে যাবে, এটা একটু বাড়াবাড়ি নয়?

গোবিন্দগোপালের তাই মনে হয়েছিল। আর মনে হয়েছিল, এই সাধটিই যদি মনে ছিল রে ভুজঙ্গ, মেয়ের বিয়েটা গরম কালে দিতে পারলি না?

কিন্তু উপায় কী? ওদের না কি অঘ্রান মাসে বিয়ে হওয়াই সবচেয়ে শুভ। অঘ্রান মাসটা যে পৌষের অগ্রদূত সেটা কেউ খেয়াল করেনি।

অনুরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়। গন্ধমাদনও বইতে হয়।

কিন্তু গোবিন্দগোপালের মাথার ওপর যে আরও একটা গন্ধমাদন চেপে বসবে তা কে জানতো? শেষ মুহূর্তে বন্ধুর টেলিগ্রাম, কলকাতায় এম বি সরকারের দোকানে তার মেয়ের বিয়ের সব গহনা গড়াতে দেওয়া আছে, চেকও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোবিন্দগোপাল যেন গহনাগুলি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন!

তা এটা গন্ধমাদন মাথায় চাপা ছাড়া আর কী? দিনকালটি ভাবো। ট্রেনটি রাতের তাও ভাবো! আর জিনিসগুলো পরের, তাও ভাবো।

গোবিন্দগোপালের ছেলে বলল, অতো ভাবাভাবির কী আছে বাবা, তোমার গায়ে যা পোশাক আসাক, তার মধ্যে একটা হাতির ছানা লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এ তো সামান্য পনেরো কুড়ি ভরি সোনার গহনা।

ছেলের সোজা হিসেব।

পনেরো কুড়ি ভরির ওজনটা আর মাপটাই হিসেব করেছে। দামটা ভাবেনি। রিস্কটা ভাবেনি! এ তো হাতির বাচ্চা নয়, পুরো একটা আস্ত হাতিই।

কিন্তু কী আর কথা?

তবে–পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে নেবার সুযোগ মিলল না। দোকান থেকে (একশোবার তাগাদা দিয়েও)

ডেলিভারী দিল একেবারে ট্রেনের টাইম মুখো। স্টেশনে যাবার পথে ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে, ওটা নিয়ে নিতে হল।

অগত্যা গহনাদের ছোট্ট একটা অ্যাটাচী কেসে হাতেই রাখতে হলো।

গাড়িতে অবশ্য রিজার্ভেশন করা আছে, গিয়ে উঠে বসার ওয়াস্তা।

তা গোবিন্দগোপাল আর বসবার দিকে গেলেন না। একেবারে শুয়েই পড়লেন অ্যাটাচী কেসটাকে মাথার নীচে রেখে।

শোওয়া মাত্রই গাড়ি ছেড়ে দিল।

আর গাড়ি ছাড়া মাত্রই টের পেলেন গোবিন্দগোপাল. নাকের মধ্যে সুড়সুড় করছে। অর্থাৎ কাঁচা সর্দির আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ। এর পরই আসবে সেই প্রবল প্রতাপ। বিভীষণ হাঁচি।

উঃ। এতো প্রিকশান নিয়েও রোখা গেল না?

তার মানে সেই ব্যাপারই ঘটতে যাচ্ছে।

এখন তো বিয়ে মানেই ছবি। অর্থাৎ ফটো ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে বাঘশিকারীর মত ঘুরে বেড়ায় ফটোগ্রাফাররা। আর প্রতিটি ব্যাপারে ফটাফট– ফটো তুলে নেয়। বর আসছে, ফটো! কলাতলায় ফটো। বরণ হচ্ছে ফটো! কড়ি খেলছে ফটো। বর কনে বিদায়, বিদায় আশীর্বাদ, গাড়িতে উঠছে, কিসে না ফটো? আবার কালো শাদা নয়, রঙিন ফটো!

ভূজঙ্গ তার প্রাণের বাল্যবন্ধু গোবিন্দকে (যাকে এখনো সে 'গবা' বলে) কোনো অনুষ্ঠান থেকে সরে থাকতে দেবে? দেবে না। তার মানে প্রতিটি ছবিতে গোবিন্দর সেই মুখভঙ্গি উঠবে। শুধু 'উঠবে' না, অক্ষয় অমর রূপে বাড়িতে বাড়িতে অ্যালবামে সাঁটা হয়ে বিরাজিত থাকবে।

ভেতর থেকে ভূমিকম্পের মত আলোড়ন হয়ে 'হিঁ হিঁ হিঁয়াচ্চো,' হঠাৎ খুচুং করে বেরিয়ে আসা ফাঁচ্ অ্যাঁ, কোনো মোক্ষম সময় আটকাবার চেষ্টার কসরতে দাঁত মুখ খিঁচোনো খুঁউচ্। তবু মুখ ভ্যাঙচানি আর দাঁত খিঁচুনির ভঙ্গীই উঠে যাবে। সব রকম ভঙ্গী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে থেকে যাবে লোকেদের অ্যালবামে! ও! ভাবা যায় না।

এই গহনার দায়টা যদি না থাকতো, গোবিন্দগোপাল

গোবিন্দগোপাল বলে ওঠেন, তুমি ছিঁচকে? তাই তো বলি

ডুব মারতেন। কোনো অনামী অখ্যাত হোটেলে কাটিয়ে পরদিন গরুচোরের মত মুখ নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে বলতেন, 'ট্রেন ফেল করেছিলাম ভাই' কিন্তু সে গুড়ে বালি। ডুব মারবার কোনো উপায়ই নেই। ওই গহনা।

শুধু হাজার তিরিশ টাকা দাম বলেই নয় বিয়ের সময় গহনা না হলে চলবে? বরপক্ষ বর উঠিয়ে নিয়ে যাবে কিনা কে জানে।

যা হয় হবে।

শুয়ে পড়লেন গোবিন্দগোপাল। আর এত দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও সংগে সংগে নাক ডেকে উঠল। ক্রমশঃই বাড়তে থাকল সে গর্জন। কারণ সর্দির প্রতাপে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নানা সুর, নানা বাদ্য বাজতে থাকে নাকের মধ্যে।

ক্রমেই গাড়ির যাত্রীসমূহ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত মানুষ সহ চলন্ত রেলগাড়িতে রেলের চাকার শব্দ ছাপিয়ে বেজে চলে...গোঁ গোঁ ঘোঁৎ ঘোঁৎ। ফর ফর ফররর ফোঁ! ঘ্যাচোং। খ্যাঁক!

এই গভীর অতল থেকেও হঠাৎ মনে হল গোবিন্দগোপালের কানের কাছে, ঘাড়ের নীচে, যেন আরশোলা কুরকুর করে নড়ছে।

শরীর সিরসিরিয়ে উঠল। সংগে সংগে ভেতরটা গুলিয়ে প্রবল একখানা হাঁচি বেরিয়ে এল গোবিন্দ-গোপালের ঘুমন্ত শরীর থেকে। সেই ঘুমের আবল্যের মধ্যেই দেখতে পেলেন, একটা ছায়ামূর্তি, যেন তার কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল।

কে গেল, কেন গেল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলেন না গোবিন্দগোপাল। আবার শব্দ উঠতে লাগল গোঁ গোঁ ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ফররররর ফোঁ!

করিডোর দেওয়া গাড়ি। চার বার্থের কম্পার্টমেণ্ট! নীচের দুটো বার্থের মধ্যে একটায় গোবিন্দগোপাল, আর একটায় অন্য কোনো বাঙালী। 'আপার' দুটোয় দুই অবাঙালী ভদ্রলোক, গাড়িতে ঢুকে এসেই সেই যে ওপরে উঠে পড়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন, নট নড়নচড়ন নট কিছু।

গোবিন্দগোপালও অবশ্য তাই। তবে মুড়ি দিয়েছেন চাদর নয়, ভুটানী কম্বল। আর তিনি নিজে না নড়লেও নৃত্যের তালে তালের মত নাকের তালে-তালে তাঁর কম্বল চাপা ভুঁড়িটি নড়ছে মাঝে মাঝেই।

গাড়ি ছুটছে।

এই ভাবেই চলছে।

আবার গোবিন্দগোপাল অনুভব করলেন ঠিক সেই রকম আরশোলার সুড়সুড়ি। গোবিন্দগোপালের সারা শরীর আবার সিরসিরিয়ে সুড়সুড়িয়ে উঠলো। আর সংগে সংগে আবার সেই ব্যাপার। হ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁচ্।

আর আবার তেমনি কেউ যেন ছিটকে সরে গেল গোবিন্দগোপালের মাথার কাছ থেকে। ভূত না ভগবান?

ভগবানই জানেন। তবে গোবিন্দগোপাল ঘুমের ঘোরের মধ্যেও একটু জানবার চেষ্টা করলেন। চোখ না খুলেই দেখলেন আপার বার্থ দুটি নিথর পাথর!

পাশেরটি?

সেও তো নিথর পাথরই।

আবার নাক ডেকে উঠল। ডাকতেই লাগল। গাড়িও ছুটতেই লাগল। রাতের গাড়ি যেমন নিষ্ঠার সংগে একতালে ছুটে চলে।

আবার সেই! সেই আরশোলার সুড়সুড়ুনি। গোবিন্দ গোপালের নাকের বাদ্য আরো বেড়ে চলছে। গোবিন্দগোপাল অনুভব করলেন মাথার নীচে থেকে অ্যাটাচিকেসটা যেন নিঃশব্দে ইঞ্চি খানেক সরে গেল।

গোবিন্দগোপালের নাক সর্বশক্তিপ্রয়োগে বাদ্যি বাজিয়ে চলে।

অ্যাটাচি কেসটা আরো দুই ইঞ্চিটাক সরে যায় মাথার

সবচেয়ে সেরা

শব্দবোধ অভিধান

এ.টি.দেব প্রণীত

এই অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।
প্রায় ৩৬,০০০ শব্দ সম্বলিত এই অভিধানে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, অপভ্রষ্ট ও দেশজ শব্দের প্রয়োজনীয় পরিচয়—যেমন প্রতিশব্দ, উৎপত্তি প্রকরণ, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ইত্যাদির বিশদ উল্লেখ আছে। তাছাড়া পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ। এবং বহু জ্ঞাতব্য তথ্য, বাংলা বানানের নিয়ম, সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, প্রুফ সংশোধন প্রণালী ইত্যাদি বহু বিষয়ে অভিধানটি সমৃদ্ধ।

দাম– চল্লিশ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৭০০০০৯

তলা থেকে, আর সেই মহালগ্নে কামরায় প্রচন্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে।

বিস্ফোরণ তো ঘটবেই। এতক্ষণ ধরে হাঁচি চেপে নাক ডাকানোর কসরৎ! নাকের মধ্যেকার নার্ভে একটা তোলপাড় কান্ড হয়ে চলছিল না?

আপারের লোক দুটো থমকে থমকে চাদরের মধ্যে থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, কৌন? কৌন?

আর বার বার দুবারের মত তিনবারেও সেই এক ছায়ামূর্তি ছিটকে সরে গেল।

তবে এবারে–

বাড়তির মধ্যে, সে শুধু সরেই গেল না, মেজেয় পড়েই গেল বিস্ফোরণের ধাক্কায়। আর পড়তে পড়তে বলে উঠল, 'ধেত্তারি' নিকুচি করেছে। যতবার শুভ কাজটায় হাত দিচ্ছি, একটা করে অপয়া হাঁচি! ছ্যাঃ!

গোবিন্দগোপাল ইতিমধ্যে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে মাথার কাছের সুইচ টিপে চড়া আলোটা জ্বেলে ফেলে বজ্রমুষ্টি বাড়িয়ে লোকটাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়েছেন।

চড়া আলোয় দেখা যায় পাশের লোয়ার বাথটায় নিথর পাথর হয়ে চাদর চাপিয়ে যে শুয়ে আছে, সে একটা বালিশ!

গোবিন্দগোপাল বলে ওঠেন, ওঃ ব্যাটা! তুমি ছিঁচকে? তাই তো বলি যেন ছুঁচো ছুঁচো গন্ধ লাগছে। তা কোথায় যেন দেখেছি তোমায়? ওঃ সেই সন্ধ্যেবেলা গহনার দোকানে! আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেঁটে থেকে ঘুরছিলে? তা সীট্‌টি বাগালে কী করে মালিক? ঘুষ দিয়ে নিশ্চয়ই? কত ছাড়তে হল? কী বললে আসল 'ওনার'কে? 'বাপ মরমর এই গাড়িতে না গেলে আর শেষ দেখা হবে না বাপের সঙ্গে, এই তো?'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠল, হাত গুনতে জানেন না কি?

গোবিন্দগোপাল বলে উঠলেন, কী জানি আর না জানি তা' গাড়ি থামলেই টের পাবে যাদু!

ও বলে উঠল, আঃ হাঃ! হাত ছেড়ে দিন। কব্জির হাড় ভেঙে গেল।

যাক না। ভালই তো জন্মের শেষ ছিঁচকেমি বন্ধ হবে।

আপারের ভদ্রলোক দু'জন এতক্ষণ পিটপিট করে তাকিয়ে ঘটনাটি অবলোকন করে, সাহস করে নেমে এলেন। নাঃ লোকটার হাতে ছোরাছুরি পাইপগান কিছুই নেই, অতএব ভয়ের কিছু নেই। আর এই মোটা ভদ্দরলোক তো ওর ডান হাতটা চেপেই ধরে আছেন।

এখন বীর বিক্রম, 'মারো শালে ডাকুকো ' বলে হাঁক ছাড়েন তাঁরা। গোবিন্দগোপাল ধমকে ওঠেন, 'ডাকু' মানে? ডাকু হলে ব্যাটাকে ভক্তি করতাম। ব্যাটা ছিঁচকে চোর।

ততক্ষণে গাড়ির সবাই সেখানে এসে হাজির। এবং গোবিন্দগোপালের গহনার সুটকেস বেঁচে যাবার মূল কারণ তাঁর বিস্ফোরক হাঁচিকে তারিফ করতে থাকে।

হাসির রোল ওঠে গাড়িতে!

লোকটাকে নিয়ে আর পুলিশ হ্যাঙ্গামে না গিয়ে, তার হাতটাকে আর একটি মোচড় পাক দিয়ে 'যা ব্যাটা ভাগ' বলে ছেড়ে দিয়ে, মনের আনন্দে অ্যাটাচি বাগিয়ে রিকশয় চেপে বসে বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা দেন গোবিন্দ-গোপাল।

মনে এমন ফূর্তি, যে একটা গানই ধরেন।

বন্ধুর বাড়ির মেয়ের বিয়ের ঘটা। সে তো কহতব্য নয়। ফটো? সেও ফটাফট।

তবে গোবিন্দগোপাল আর হাঁচিকে পরম শত্রু মনে করেন না। ক্ষমা করে দিয়েছেন তাকে। ক্ষমা করে দিয়েছেন আরশোলাকেও।

কারণ? কারণ মাথামুড়ি দেওয়া ভোট কম্বলটা সরাবার চেষ্টায় তার সুঁয়োগুলো আরশোলার সুড়সুড়ুনির মত লাগছিল বলেই তো ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল গোবিন্দগোপালের।

আর ছিঁচকে চোর? তাকে ত ক্ষমা করে ফেলেছেন, কব্জির হাড়টা গুঁড়ো হয়ে গেল বেচারার। যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

গোবিন্দগোপাল এখন নির্ভয়, নিঃশত্রু।

এখন গোবিন্দগোপাল যখন তখনই গুনগুনিয়ে সেই স্বরচিত সংগীতটি গেয়ে ওঠেন,

'ওরে হাঁচিরে–
তোর গুণেতেই বেঁচে আছিরে।
হাঁচি তোর গুণেতেই সেই ছিঁচ্‌কে–
হয়ে গিয়েছিল স্রেফ্ মিচকে।
হাঁচি তোরই জন্য, খেলাম কী নেমন্তন্ন!
হাঁচি, হাঁচি হাঁচি!
ইচ্ছে হচ্ছে কষে নাচি!

তা গাইবেন না এ গান?

যদি গোবিন্দগোপালের হাঁচিহীন গভীর ঘুমের মধ্যে বন্ধুর মেয়ের ওই হাজার তিরিশ টাকার গহনা ভরা অ্যাটাচিটি মাথার তলা থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরতে সরতে হাওয়া হয়ে যেত, কী হতো?

ছবিঃ সরোজ সরকার

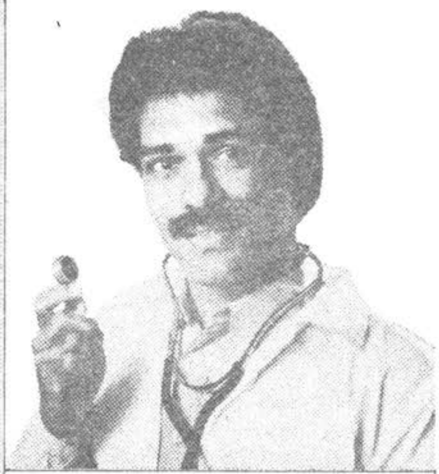

ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।

ভিভা ! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তর যোগফল......

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়···সবসময়।

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা তোমার তুলনা নেই ভিভা !"

JiL জগৎজিত ইন্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড

ASP/JIL-1/84 BEN A

পান্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এবার মনোহরপুর।

বিলুর মাসীমা থাকেন মনোহরপুরে। বিহারের সিংভূম জেলার একটি ছোট্ট পাহাড়ী শহর। বিলু কখনো যায়নি সেখানে। যদিও সেবারে যাবার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু রাজগীর যাওয়ার জন্য আর হয়ে ওঠেনি। এবারে তাই নিছক বেড়াতেই ওরা চলেছে মনোহরপুরে।

টাইম টেবিল দেখে ওরা যাবার সময় ঠিক করে নিল। বাবলু বলল সকাল ছ'টা কুড়িতে ইস্পাত এক্সপ্রেসে গেলে দুপুর নাগাদ পৌঁছনো যাবে। আর রাতের সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেসে গেলে খুব ভোরে।

রাতের গাড়িতেই চলল ওরা। এই গাড়িতে যাওয়ার একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে বেশি রাতের গাড়ি তো, তাই বাড়িতেই খেয়ে দেয়ে আসা যায়। সংগে করে খাবার বয়ে আনার দরকার হয় না। এখানে এসে বার্থ খুঁজে শুধু বেড কভারটি বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়া।

যাই হোক, যথাসময়েই ট্রেন ছাড়ল। বাবলু বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু সবাই আছে ট্রেনে। পঞ্চুকে তোলা হয়েছে ব্রেক ভ্যানে। ওরা সকলে হাত পা ছড়িয়ে যে যার বার্থে শুয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল। ওদের এবারের ভ্রমণটি বেশ আনন্দের, উত্তেজনার। তার কারণ মনোহরপুরে আসার আগে ওরা কোনো চিঠিপত্র দিয়ে আসেনি। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেবে বিলুর মাসীকে। মাসীর ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে ওদের দেখে। পান্ডব গোয়েন্দাদের ফুল ব্যাটেলিয়ান, তার সংগে আবার পঞ্চু। এ কি ভাবা যায়? ওরাও মাসীর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চারিদিক ঘুরবে। বন পাহাড় তোলপাড় করে রাউরকেলায় যাবে। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী পার্ক দেখে সোজা চলে যাবে ব্যাস মন্দিরে। শংখ ও কোয়েল নদীর মিলনস্থলে। সে নাকি ভারি মনোরম জায়গা।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম ঠিক আসে না। তবে একটা ঘুম ঘুম ভাবে শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বাবলুরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে একসময় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙল চক্রধরপুরে। রাত তখন দুটো কি তিনটে। চারিদিক কোলাহলমুখর হয়ে উঠল। দলে দলে লোক এসে উঠে পড়ল ওদের কামরায়। তারপর সকলকে ঠেলে ঠুলে

উঠিয়ে ওরা এসে বসে পড়ল।

একজন বুড়ো ভদ্রলোক বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে আনল কিছু লোক। তারপর চার পাঁচজন উঠে বসে পড়ল সেখানে।

বুড়ো ভদ্রলোক চিৎকার করতে লাগলেন—এ কি! এটা মগের মুলুক নাকি? এটা তো থ্রি-টায়ার বগি। রিজার্ভ কামরা। এতে উঠেছ কেন?

একজন বলে উঠল—উঠেছি তো কী হয়েছে? ট্রেন থেকে তো নামিয়ে দিচ্ছি না। সারারাত ভালোই ঘুমিয়েছ। এবার উঠে পড়ো তো চাঁদু। এটা বাড়ি না যে দিন রাত ঘুমোবে।

বাবলুরা দেখল বেশির ভাগ লোকই ব্যবসায়ী এবং এরা দলে এত ভারি যে কাউকে পরোয়া করে না। সবাই রাউরকেলা অথবা সম্বলপুরের যাত্রী। এদের কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। হয়তো মার খেতে হবে।

বাবলু তবুও কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল—এটা কী হচ্ছে? এত লোক হুড়হুড় করে উঠে পড়ল, আটকান এদের।

—কেন, আটকাবো কেন? তোমরাও টিকিট কেটে উঠেছ এঁরাও উঠেছেন।

—বুঝলাম, কিন্তু এটা তো রিজার্ভ কমপার্টমেন্ট। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এক মাস আগে থেকে টিকিট কেটেছি কি এই দুর্গতি ভোগ করব বলে? আর.পি.এফ. ডেকে নামিয়ে দিন এদের। নাহলে আমাদের মালপত্তর চুরি হয়ে যাবে।

অ্যাটেন্ডেন্ট রেগে বললেন—ওহে ছোকরা, খুব তো হুঁশিয়ার হয়েছ দেখছি। আর.পি.এফ. কাকে বলে জান?

—কেন জানব না? রেলের পুলিশকেই আর.পি.এফ. বলে।

—তাহলে তো খুব জান। রেলের পুলিশ হলেও ওরা হচ্ছে রেলরক্ষী বাহিনী। রেলের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যই ওদেরকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। রেলযাত্রীদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য নয়। নিজেদের মাল নিজেরাই সামলাও। বুঝলে?

বাবলুরা তখন বসার আশা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আর তো একটা স্টেশন, দাঁড়িয়েই চলে যাবে ওরা।

ট্রেন এখনো পর্যন্ত রাইট টাইমে রান করছে। কিন্তু ছাড়ছে না কেন? কতক্ষণ স্টপেজ? এমন সময় হঠাৎ খবরটা শোনা গেল। ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। রাউরকেলা থেকে ইঞ্জিন না এলে ট্রেন ছাড়বে না।

ভালোই হলো। এখন বরং একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। এই ভেবে প্লাটফরমে নেমে চা-অলা খুঁজতে লাগল ওরা। কিন্তু না, এখানে কোনো চা-অলাকেই পাওয়া গেল না। বিরক্তির ওপর বিরক্তি।

যাই হোক। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ট্রেন ছাড়ল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। রাউরকেলা থেকে কোনো ইঞ্জিন না আসায় এখানকারই একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ট্রেনটাকে।

বাবলুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব কিছু দেখতে লাগল। মনোহরপুরে পৌঁছবার আগেই পাহাড় আর জঙ্গল দেখে মন

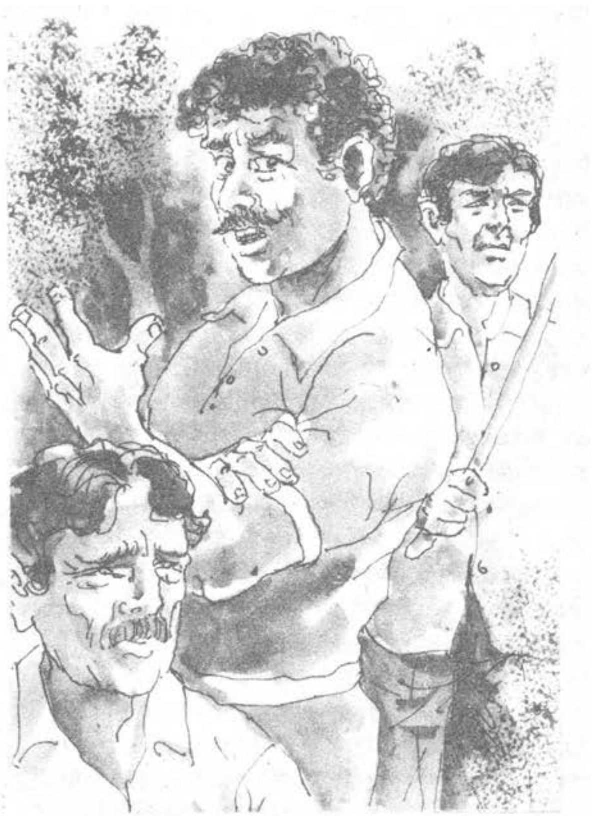

ভরে গেল ওদের। এক জায়গায় একটা টানেল পেরুলো। টানেলটা সত্যিই অবাক হয়ে দেখবার মতো। বাবলুরা কখনো এত বড় টানেল দেখেনি। ট্রেন এসে মনোহরপুরে থামল।

ওরা ট্রেন থেকে নেমে এবং পঞ্চুকে নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

কিন্তু কেলেঙ্কারি হলো মনোহরপুর স্টেশনে নেমে। মনোহরপুর সম্বন্ধে ওদের মনের মধ্যে যে ছবি আঁকা ছিল তা মিলল না। এ কী জায়গা! ছোট্ট এতটুকু। স্টেশনও ছোট। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। স্টেশনেও লোকজন তেমন কেউ নেই। একটু অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক সব। স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখল ছোট্ট একটি বাজার। সিংভূমের আদিবাসীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। বাজার পেরিয়ে বাইরে বড় রাস্তায় এসেও মন ভরল না। দু'পাশে ঘরবাড়ি যা আছে তা খুবই সামান্য। শুধু মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে।

ওরা একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বলতে পারেন এখানে সুকুমার বোসের বাড়ি কোথায়?

দোকানদার যদিও অবাঙালী তবুও পরিষ্কার বাংলায় বলল—না ভাই, এ নামে তো এখানে কেউ থাকে না। এখানে যত বাঙালী আছে সবাইকেই আমি চিনি। কিন্তু সুকুমার বোস? না না, এ নামে এখানে কেউ নেই।

বাবলুরা পড়ল মহা সমস্যায়।

বিলু বলল–সে কিরে? আমার মা-বাবা এসে ঘুরে গেছেন কিছুদিন আগে। আমার মাসীমা যাতায়াত করেন। আর এরা বলে কি?

অগত্যা ওরা আবার স্টেশনেই ফিরে এলো। এখানকার এ.এস.এম. বাঙালী। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি। বাড়ি হাওড়ার রামরাজাতলায়। নাম মহাদেব ভট্টাচার্য। তিনিও বললেন–না ভাই, রেলে চাকরি করেন ও নামে কোনো লোক তো এখানে থাকেন না। আমার মনে হয় মনোহরপুরে নেমে গাড়ি বদল করে আশপাশের কোনো জায়গায় হয়তো যেতে হয়। কিন্তু এখানে কেউ নেই। তবে তোমরা একবার জরাইকেলায় খোঁজ করে দেখতে পারো।

বাবলু বলল–হলো ভালো। চিঠি না দিয়ে আসার এই ফল। এখন কী করবি বিলু?

বিলুর মুখ লাল। বলল–তার আগে এক কাজ কর। খিদে পাচ্ছে। এখন কিছু কিনে কেটে চল ঐ টিলাটার ওপর গিয়ে বসি। তারপর ভেবে দেখা যাবে।

–তাই চল।

এছাড়া আর উপায়ই বা কী? একটা বড় ঠোঙা ভর্তি সিঙাড়া আর জিলিপি কিনে ওরা ধীরে ধীরে শাল মহুয়া ও কেঁদ বনের ভেতর দিয়ে স্টেশনের পিছন দিকের টিলাটার ওপর উঠে পড়ল। কী চমৎকার জায়গা। দলে দলে লোক এখান থেকে কেন্দুপাতা মাথায় নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছে। এই পাতা দেশ দেশান্তরে চালান যাবে। কেন্দুপাতা বিক্রির এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

ওরা সেই টিলার ওপরে বসে দূরের বড় বড় পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। বইতে পড়েছিল, 'মনোহরপুরের জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায়।' কিন্তু হাতি কি এখনও আছে? তবে জঙ্গল যা গভীর তাতে হাতি থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়।

ওরা যখন খাচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ দেখা গেল পাঁচজন যুবক সেখানে এসে হাজির হলো। দেখে মনো হলো বেশ রাগী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ওদের সঙ্গে রয়েছে ভীষণদর্শন দুটো পাহাড়ী কুকুর। ওরা বাবলুদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

দলের যে লিডার সে ওদের দেখে দু হাত কোমরে রেখে সামনে এসে বলল–কৌন হো তোম লোগ?

বাবলু উত্তর না দিয়ে একেবার ওর মুখের দিকে তাকাল।

–বলি আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

ওরা এবারও কোনো উত্তর না দিয়ে একটা জিলিপি পঞ্চুর মুখে গুঁজে দিল।

লোকটি এবার ক্ষেপে উঠে বলল–বতাও কাঁহাসে আয়া তোম লোগ। নয়া চিড়িয়া মালুম হোতা হ্যায়।

আর একজন বলল–বল না রে কোত্থেকে এসেছিস। এখানে নতুন দেখছি কিনা তাই।

বাবলু বলল–আমরা হাওড়া থেকে এসেছি।

–হাওড়া থেকে? কার বাড়িতে উঠেছিস?

–আপনার বাড়িতে।

লাফিয়ে উঠল লোকগুলো–অ্যাঁ! মসকরা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? ঠিক করে বল?

একটা লোক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছিল। ভোম্বল হাসি হাসি মুখে তাকে দেখিয়ে বলল–না না আমরা ওর বাড়িতে উঠেছি।

ওদের লিডার বলল–মারে চাক্কু বদমাশ কো।

বাবলুরা ফিক করে হাসল।

আর একজন বলল–শোন, যদি ভালো চাস তো এখান থেকে মানে মানে পালা। এ জায়গা ভালো নয় বুঝলি?

ভোম্বল বলল–হ্যাঁ বুঝেছি। এখন কেটে পড় দেখি।

লিডার বলল–জানতা হ্যায় ম্যায় কৌন্?

বাবলু বলল–হ্যাঁ। দি গ্রেট কার্লোস, জ্যাকল।

–নেহি। হাম ডমরু সিং।

বাবলুরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

–হাসো মৎ। নেহি তো আভি রোনে পড়েগা। বলেই দলের একজনকে জিজ্ঞেস করল–সরকারনে হামারে লিয়ে কিত্না ইনাম রাখ্খা হ্যায় রে জগ্গু?

জগ্গু দাঁত বার করে বলল–সিরফ পাঁচ হাজার, সর্দার।

বাবলু তীক্ষ্ণ চোখে ডমরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল–ওসব আমাদের শুনিয়ে কোনো লাভ হবে না। ও ছবিটা আমরা তিনবার দেখেছি।

ডমরু সিং তখন খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বাবলুর হাত থেকে জিলিপির ঠোঙাটা কেড়ে নিল। তারপর আনন্দ উল্লাসে ঠোঙাটা নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল পাঁচজনে। লোফালুফি শেষ হলে জিলিপিগুলো টপাটপ মুখে ফেলতে লাগল।

পঞ্চু আর থাকতে না পেরে যেই না 'ভাঁউ' করে উঠল অমনি ওদের সেই তাগড়াই কুকুর দুটো ভয়ংকর মূর্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর। ঐ দুই দুর্ধর্ষ কুকুরের সঙ্গে একা পঞ্চু পেরে উঠবে কেন? লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাবলু ক্রুদ্ধ স্বরে বলল–শীগ্‌গির তোমাদের কুকুর সামলাও বলছি। নাহলে কিন্তু দারুণ বিপদ হবে।

তারা সে কথায় কানই দিল না। উল্টে কুকুরগুলিকে 'লিও লিও' করে উত্তেজিত করতে লাগল।

বাবলু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পিস্তলটা বার করে বলল–এখনো বলছি তোমাদের কুকুর সামলাও।

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল–ঐ খেলনা পিস্তল দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে চাঁদু? একবার যদি লেলিয়ে দিই তো বুঝবে ঠ্যালা। বলেই ডাকল–টমি জিম্মি কাম হিয়ার।

পঞ্চুকে ছেড়ে কুকুরগুলো তখন ওদের দিকে ছুটে গেল আদেশের অপেক্ষায়।

ডমরু সিং বলল—এই বেওকুফ লেড়কা লেড়কিগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে দে তো।

টমি আর জিম্মি বাঘের মতো হুংকার করে ওদের দিকে তেড়ে এলো। কিন্তু ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল দুবার—গুড়ুম...গুড়ুম।

ডমরু সিং-এর দল ভাবতেও পারে নি ঐ খেলনা পিস্তল এই রকম খেলা দেখাবে। ওরা রাগে কাঁপতে লাগল থর থর করে। ডমরু জিলিপির ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। একজন বলল—শোন, তোরা কে বা কারা আমরা জানতে চাই না। যদি ভালো চাস তো এক ঘণ্টার মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবি। নাহলে যন্তর আমাদেরও আছে। সব কটাকে শেষ করে দেব একসংগে। কাছে থাকলে এখুনি দিতাম। বলে দ্রুত পায়ে নেমে গেল ওরা।

বাবলু বলল—যাত্রাটাই খারাপ করে দিল শয়তানরা। প্রথম পদক্ষেপেই মৌচাকে ঢিল। উড়ুক এখন ভন ভন করে।

যাই হোক, ওরা চলে গেলে বাবলুরা পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে একটু সুস্থ করার চেষ্টা করল। অনেক জায়গায় দাঁতের দাগ বসে রক্ত ফুটে উঠেছে। খুব লেগেছে বেচারার।

বাবলু বলল—এখন তাহলে কী করবি?

বিলু বলল—তোদের কাছে দেখাবার মতো মুখ আমার রইল নারে বাবলু। পুরো ঠিকানাটা না নিয়ে এসে খুবই ভুল করেছি।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল—তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বার বার আক্ষেপ করো না তো বিলুদা। এ রকম হয়েই থাকে। এখন চলো যদি কোথাও হোটেল পাই তো গিয়ে উঠি। নাহলে এইভাবে মালপত্তর কাঁধে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

—ঠিক কথা। চল দেখি কোথায় হোটেল আছে।

ওরা ধীরে ধীরে টিলা থেকে নেমে ওপাশের বড় রাস্তায় এলো। কী নির্জন জায়গা। দূরে পাহাড় ও বনভূমি। আশেপাশে ছোটখাটো বসতি। রেলের কোয়ার্টার বাংলো ইত্যাদি। ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়ে। নাম কোয়েল। স্টেশনের ওপাশেও একটা নদী আছে। পাহাড়ী নদী। নাম কয়না। মনোহরপুরের উত্তর ও দক্ষিণে এদের অবস্থান। এরাই বুঝি জায়গাটিকে মনোহর করে তুলেছে। মনোহরপুর মুঠোয় ধরা যাবে এমন একটি ছোট্ট জায়গা। তারপরে আশেপাশে সবই গ্রাম। যেমন নন্দপুর, আনন্দপুর, বরপোষ, ঔরকিয়া, বারাংগা, টিপা, পূর্নাপানি, সেলাই, টিমড়া, পাথরবাসা প্রভৃতি। যাই হোক মনোহরপুরে কিছু নেই। না কোনো বাঙালীর বাড়ি, না কোনো হোটেল, যেখানে থাকা যায়।

ওরা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশান ডানদিকে রেখে দোকানপাট টিম্বার মার্চেন্টের আড়ৎ পেরিয়ে এক সময় দেখল পথ শেষ। রেল লাইন ছাড়া আর কিছুই নেই।

এখানে আর এক বাঙালী রেলকর্মচারী ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হলো ওদের। তিনিও ঐ একই কথা বললেন—না ভাই, এখানে অনেক বোসেরা আছেন বটে তবে ও নামে কেউ নেই। তোমরা বরং এই লাইন ধরে পরের স্টেশন জরাইকেলায় চলে যাও। ওখানে সন্ধান পেতে পারো।

বাবলু বলল—তাই যাবো। কিন্তু ট্রেনে যাওয়া যাবে না?

—না। এই একটু আগেই লোক্যাল চলে গেছে। এখন ইস্পাত এক্সপ্রেস আছে দুপুরের দিকে। কিন্তু সে গাড়ি তো থামবে না। এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাবলু বলল—দেখ, ঠিকানাবিহীন অবস্থায় অযথা ঘুরে না বেড়িয়ে আমার মনে হয় এখান থেকে সোজা রাউরকেলায় চলে যাওয়াই ভালো। ওখানে বরং কোনো হোটেলে উঠে দু-চারদিন থেকে বাড়ি ফিরে যাব।

বিলু বলল—আমার কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে রে।

—তুই একটা বুদ্ধু। ঠিকানাটা নিয়ে আসবি তো।

—আমি তো ভাবতেও পারিনি এই রকম গোলমাল হবে। তা আমি বলি কি চল না আমরা হেঁটেই চলে যাই। একটা স্টেশন তো। যদি খোঁজ পাই। না পাই ওখান থেকেই হয় বাসে, না হয় লাইন ধরে হেঁটে চলে যাব রাউরকেলায়।

বাবলু বলল—এই জংগলের রাজত্বে বাস? একটা ঘোড়ার গাড়ি পাবি কিনা তাই দেখ।

রেলের একজন কুলি সেখানে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, জরাইকেলায় বাস আছে। চল্লিশ মিনিট অন্তর রাউরকেলার বাস পাবে ওখান থেকে। ওটা তো উড়িষ্যায়। আমরা এখান থেকে হেঁটেই যাই জরাইকেলায়। বলার সংগে সংগেই একটা পাথর এসে লাগল লোকটির মুখে। চাপা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল লোকটি। ওর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল।

লোকটির অবস্থা দেখে হৈ হৈ করে ছুটে এলো অন্যান্য কুলি ও মেটের দল।

আরো একটি পাথর এসে পড়ল বাবলুর পায়ের কাছে। বাবলুরা লাফিয়ে সরে এলো সেখান থেকে। তারপর চটপট লুকিয়ে পড়ল বড় বড় গাছের কেটে রাখা গুঁড়ির আড়ালে। ওরা বেশ বুঝতে পারল এই পাথরছোঁড়ার আসল টারগেট ওরাই।

পঞ্চু তখন প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটে গেল আক্রমণকারীদের দিকে। কিন্তু কাউকেই যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেখানে ধরবে কাকে?

কুলিরাও কাদের উদ্দেশে যেন গালাগালি করতে লাগল। তারপর বাবলুদের বলল—তোমরা এখানে এইভাবে ঘুরো না খোকারা। এ জায়গা খুব খারাপ। বড় বড় ডাকাতের আনাগোনা আছে এখানে। সংগে টাকা পয়সা থাকলে বিপদে

পড়ে যাবে। মনে হয় ওরা তোমাদেরই পিছনে লেগেছে। তোমাদের মারতে গিয়েই লেগে গেছে আমাদের লোকের। পালাও তোমরা।

বাবলু বলল—ওরা কারা?

—কৌন জানে ভাই। কাঁহাসে এক ডমরু সিং আয়া। জায়গাটার বদনামি করে দিল।

—তাই নাকি? ওরা কতজন বলো তো?

—ওরা পাঁচ ছ'জন। কিন্তু হলে কি হয়, ওদের ভয়ে জঙ্গলের শেরও কাঁপে।

বাবলু রেগে বলল—আর তোমরা সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখো। চলো তো সবাই মিলে বেশটি করে ধোলাই দিই গিয়ে।

—খোকাবাবু, ধোলাই দিলে কুছু হোবে না। আমরা সবাই মিলে ধোলাই ওদের দিতে পারি। কিন্তু গরমিন্টের নোকরি করি আমরা। তোমরা আজ আছো কাল নেই। আমাদের ইখানে বরাবর থাকতে হবে। আজ ধোলাই দিব। কিন্তু কাল? কাল কী হোবে? ওরা যখন পাল্টা ধোলাই দিবে?

তোমরাও তখন তার পাল্টা দেবে। প্রাণে না মেরে হাত ভেঙে দেবে ওদের। যাতে আর কখনো এইসব কাজ করতে না পারে। আসলে তোমরা রুখে দাঁড়াও না বলেই ওরা এত জোর পায়।

পঞ্চু তখন একটা গাছের কাছে গিয়ে প্রচন্ড চিৎকার করছে।

তাই দেখে হই হই করে ছুটে গেল বাবলুরা। গিয়ে দেখল যা ভেবেছে তাই। অর্থাৎ সেই ডমরুর দলেরই একজন পঞ্চুর তাড়া খেয়ে গাছে উঠে পড়েছে। বাকিরা হয় কাছেপিঠেই আছে, নয়তো পালিয়েছে। অথবা দলবল ছাড়া একাই ছিল ও। বাবলুদের দেখতে পেয়ে ওদের জখম করে কুকুর মারার বদলা নিতে চেয়েছিল।

বাবলু চট করে ওর পিস্তলটা তাগ করে বলল, নেমে আয় শীগ্‌গির, নাম বলছি। না হলে আমরাও নিচ থেকে পাথর ছুঁড়ব।

ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল পাথর ছুঁড়তে শুরুই করে দিয়েছে।

এ লোকটির নাম জগ্গু। প্রাণের দায়ে জগ্গু সুড় সুড় করে গাছ থেকে নেমে এলো। নেমেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবলুর হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তলটা। কিন্তু নিলে কি হবে। পঞ্চু তখন গাঁক করে কামড়ে ধরেছে ওর হাতের

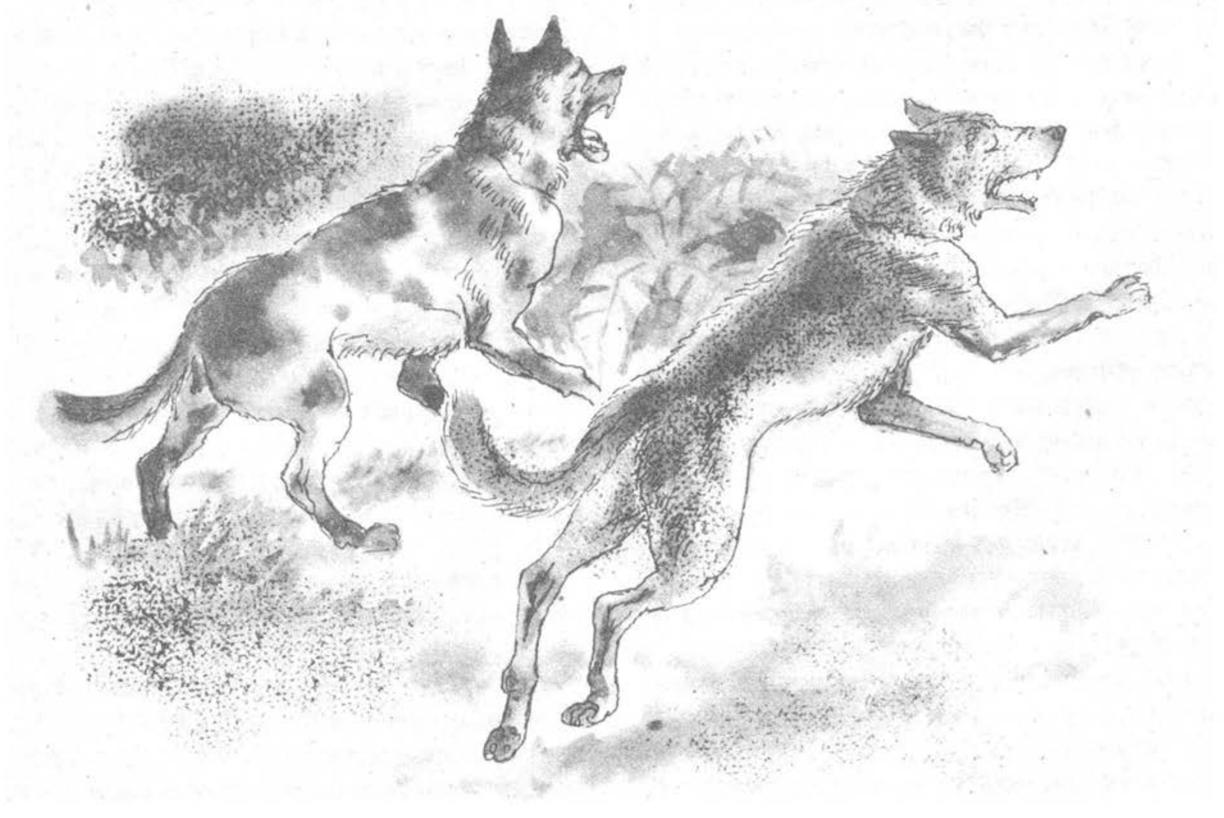

কব্জিটাকে। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। বাবলু সেটা কুড়িয়ে নিয়েই ওর পেটে মারল এক ঘুঁষি।

পঞ্চুর কামড় ও বাবলুর ঘুঁষির যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল জগ্গু। ওর কব্জির হাড় তখন গুঁড়িয়ে গেছে।

বাবলু বলল– তোর আর বাঁচার আশা নেইরে জগ্গু। এখন ভগবানের নাম নিয়ে পেটের ভেতর চোদ্দটা ইন্‌জেকশান নিয়ে দেখ যদি বাঁচতে পারিস। কিন্তু হাতের হাড়গুলো? ও হাত কেটে ফেলে না দিলে ওখানে তো গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে।

লোকটি রাগে ফোঁস ফোঁস করে বলল–হাম জরুর মরেগা। লেকিন তুম নেহে বাঁচোগে। ডমরু তুমকো ছোড়ে গা নেহি।

–তোর ডমরু বাবা কোথায়? আমরা তো তার মোকাবিলা করব বলেই ঘুরছি। এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করেছিস তোরা। তোদের শেষ না করে আমরা যাব না এখান থেকে।

জগ্গুর তখন রক্তচক্ষু। সে চলে যেতে উদ্যত হলো।

বাবলু বলল–এবারের মতো ছেড়ে দিলুম। তোর ডমরু বাবাকে বলিস তিন দিনের মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। না হলে কিন্তু বিপদে পড়বি।

জগ্গু তবুও নুইবার পাত্র নয়। তার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন মনেপ্রাণে এক ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করেই চলে গেল।

বাবলুরা আর দেরি না করে লাইন ধরে এগিয়ে চলল জরাইকেলার দিকে। বেশ কিছুদূর যাবার পর বাবলুরা বুঝল পথ বড় কম নয়। এ ওদের শহরতলির স্টেশন নয় যে বেলুড় বালি অথবা দাসনগর রামরাজাতলার মতো দু'পাঁচ মিনিটের পথ হবে। ওরা যত এগোয় বনজঙ্গল তত গভীর হয়। দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যায় দিগন্তের বুক চিরে এই রেলপথ যেন অন্তহীন পথের দিকে চলে গেছে। এখানে চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর ঘন বন। স্টেশনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

যেতে যেতে এক জায়গায় বনজঙ্গল পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট টিলার ওপর একটি পরিত্যক্ত বাড়ি ওদের নজরে পড়ল।

বাবলু বলল– বাড়িটা বেশ চমৎকার তো। নিশ্চয়ই কোনো ধনী লোক স্বাস্থ্য ফেরাবার উদ্দেশ্যে এইখানে এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন। নাহলে এমন জঙ্গলে বাড়ি করবে কে?

বিলু বলল–হয়তো এটা ভূতের বাড়ি। উপদ্রবের চোটে কেউ টিকতে না পেরে পালিয়েছে।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠলো দু'বার–

বাবলু বলল–যার বাড়িই হোক। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি আমরা। এখন চল ঐ বাড়িতে ঢুকে একটু শুয়ে বসে জিরিয়ে নিই। তারপর আবার হাঁটা যাবে।

সবাই একমত হয়ে বলল–হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো। এবার একটু বিশ্রাম না নিলে চলছে না। খিদেও পাচ্ছে। সকালের জলখাবার তো মাঠে মারা গেল। কী যে আছে কপালে কে জানে?

যাই হোক, ওরা জঙ্গল পেরিয়ে টিলার ওপর উঠে সেই পুরনো বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বাড়িটি পুরনো হলেও খুব একটা খারাপ নয়। কোনো ঘরের দরজা নেই। কোনোটির জানালা আছে কিন্তু পাল্লা নেই। আসলে দামি দামি কাঠ লোহা ইত্যাদি খুলে কেউ বেচে দিচ্ছে। বাড়ির ভেতর ঢুকেই বাবলু বলল–আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

বিলু বলল–কী কাজ?

–ধর, আমরা যদি একটা দিন এই বাড়িতেই থেকে যাই?

বাচ্চু বিচ্ছু বলল–তোমার কি মাথা খারাপ?

–না রে মাথা খারাপ নয়। আমি একটা দারুণ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি এখানে।

–কি রকম?

–যেমন ধরো এই যে বাড়িটা, ভাঙা হলেও এর কন্ডিশান ভালো। শুধু পরিত্যক্ত বলে এর জানালা দরজাগুলো খুলে বেচে দিয়েছে কেউ। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই ঘরের ভেতরে ধুলো নেই। তার মানে দিনে রাতে এখানে বেশ কিছু আগন্তুকের যাতায়াত আছে। অতএব একদিন এখানে থাকলেই আমরা বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল–কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আমরা কি পেটে কিল মেরে বসে থাকব বলতে চাও? এই জঙ্গলে খাবো কি?

বাবলু বলল–সে ব্যবস্থা ঠিকই হবে। নিশ্চয়ই এর আশেপাশে কোনো না কোনো পাহাড়ী গ্রাম আছে। সেখান থেকেই যোগাড় করে আনব খাবার দাবার।

–কিন্তু যে ঘরের জানালা দরজা নেই সে ঘরে থাকব কোন ভরসায়। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? বনজঙ্গল থেকে কোনো জন্তু-জানোয়ারই বা যদি এসে হাজির হয় তাহলে?

–এলেই বা। আমরা তো রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছি না। একটা রাত জেগেই কাটিয়ে দেবো, জন্তু-জানোয়ার এলে তাড়া দিলেই হবে। তাছাড়া পূর্ণিমার কোটাল চলছে। জ্যোৎস্নায় ভরে থাকবে চারিদিক। কী সুন্দর হবে বল তো।

সবাই তখন একমত হয়ে বলল–ঠিক বলেছিস বাবলু। এ একটা দারুণ অ্যাড্‌ভেঞ্চার কিন্তু। এখানে কাছেপিঠে কোথাও না কোথাও মানুষের বসতি থাকবেই। চল খোঁজ করে দেখি।

কথা বলতে বলতেই ওরা দেখল জনা দুয়েক লোক জরাইকেলার দিক থেকে লাইন ধরে এদিকে আসছে। তারা বাবলুদের ঐ ঘরের ভেতর দেখেই থমকে দাঁড়াল।

বাবলু এগিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বলল–আচ্ছা ভাই, এখানে কাছে পিঠে কোনো গ্রাম আছে কি?

লোকগুলি বলল–তোমরা কারা?

–আমরা এখানকার ছেলেমেয়ে নই। আপাতত: মনোহরপুর থেকে আসছি। জরাইকেলায় যাব। আমরা এই বাড়িতে এক রাত থাকতে চাই। কাজেই আশপাশে কোনো গ্রাম থাকলে সেখান থেকে কিছু কিনে কেটে এনে পিকনিকের ব্যবস্থা করতে পারব।

লোক দুজন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল–খোকাবাবুরা, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও এখান থেকে। এই জায়গায় যত সব চোর ডাকাতদের আড্ডা। ওদের খপ্পরে পড়লে বেঘোরে মরবে। তাছাড়া এখানে আশেপাশে কোথাও কোনো মানুষের বসতি নেই। বহু দূরে যদিও বা দু'একটা গ্রাম আছে কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। কেনাকাটা করতে গেলে তোমাদের জরাইকেলায় যেতেই হবে। বলে চলে গেল লোকগুলো।

বিলু বলল–কী করবি তাহলে ভেবে দেখ বাবলু।

বাবলু বলল–করবার কিছুই নেই। এখন আমাদের জরাইকেলাতেই যেতে হবে। তারপর ওখানে কোথাও খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যেবেলা আবার আসা যাবে এখানে। কেননা এই বাড়িতে রাত্রিবাসের লোভ আমি সামলাতে পারছি না। তবে তার আগে দিনের আলোয় এখানকার পরিবেশটাকে একটু ভালো করে দেখে নিই আয়।

কথাটা মনে ধরল সকলের। ওরা তখন সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অরণ্য অভিযান শুরু করল। এক জায়গায় দেখল সেই বনের ভেতর অসংখ্য পেয়ারা গাছ। মনে হয় পেয়ারার চাষ হচ্ছে এখানে। পাকা পাকা পেয়ারায় গাছের ডাল ভরে আছে। আর একপাশে কলাবন। বড় বড় কলার কাঁদি ঝুলছে সেখানে। তাই না দেখে তো লাফিয়ে উঠল সকলে।

বাবলু বলল–বড্ড খিদে পেয়েছে রে। কিন্তু 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা মারাত্মক অপরাধ'। এ কাজ তো আমরা করতে পারি না। অথচ ধারে কাছে এমন কেউ নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করে নেবো।

বাচ্চু বলল–ঠিক আছে বাবলুদা, এক কাজ করা যাক। আমরা আমাদের পেট ভরে খাওয়ার মতো কিছু ফল পেড়ে নিই। তারপর সেই পরিমাণ ফলের দাম ওদের জন্য একটা গাছতলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখে যাই।

–দি আইডিয়া। বলে ওরা এটা কলার কাঁদি পেড়ে কলা খেল। বেশ পাকা পাকা কলা। তারপর একটা পেয়ারা গাছে উঠল পেয়ারা পাড়তে। গাছের মগডালে উঠতেই বিলু হঠাৎ

দেখতে পেল ওদের। বলল—বাবলু, হুঁশিয়ার। বলেই ঝুপ ঝাপ করে নেমে পড়ল গাছের ডাল থেকে।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল—কী হলো বিলু ?

—ডমরুর দল ঐ পোড়ো বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। চারিদিকে হন্যে হয়ে কী যেন খুঁজছে ওরা। সম্ভবতঃ আমাদের। ঐ জগ্গু লোকটা আমাদের হাতে মার খেয়ে হয়তো ওর দলকে খবর দিয়েছে। তাই ওরা এসেছে এদিকে।

—কিন্তু ওরা কি করে জানল বল তো যে এখানে আমরা আছি।

—হয়তো যে লোকগুলোর সংগে একটু আগে আমরা কথা-বার্তা বলছিলাম তারাই বলে দিয়েছে।

ভোম্বল বলল—তাহলে উপায় ?

বাবলু বলল—উপায় এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকা।

বিলু বলল—না, ধরে পেটানো।

বাচ্চু বিচ্চু বলল—অসম্ভব। সব সময় গা জোয়ারি করা উচিত নয়। ওরা এখন সশস্ত্র। বিশেষ করে আমাদের মনে হয় জগ্গুর মারের বদলা নিতেই এখানে এসেছে ওরা।

বলতে বলতেই দেখা গেল সেই পোড়ো বাড়ির ছাদের ওপর কুখ্যাত চারজনকে। একজন নেই। মানে, পঞ্চুর আক্রমণে আহত জগ্গু আসতে পারেনি। ওদের কারো হাতে চেন, কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে লোহার রড। আর ওদের লিভার সেই ডমরু সিং-এর হাতে শোভা পাচ্ছে ঝকঝকে একটি দোনলা অটোম্যাটিক রিভলভার।

বিলু বলল—গতিক সুবিধের নয় বাবলু। ওরা যেরকম ক্ষেপে রয়েছে দেখছি তাতে আমাদের পেলে মনে হয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অতএব লুকিয়ে পড়াই ভালো।

বাবলু বলল—হ্যাঁ লুকিয়ে পড়তে হবে এবং সুযোগ পেলে আড়াল থেকে আক্রমণ করতে হবে ওদের। তবে আমার মনে হয় যেভাবেই হোক ওদের পিছু নিলে ওদের মূল ঘাঁটির সন্ধান আমরা পেয়ে যাব। তারপর জরাইকেলা অথবা রাউরকেলায় গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে ওদের ধরিয়ে দিতে পারব বামাল সমেত।

—ঠিক।

ওরা সকলেই তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দেখল শয়তানগুলো ছাদের ওপর থেকে চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে।

বাবলু বলল—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস কি ? এই বনে আমরা এতক্ষণ আছি অথচ কোনো পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। এই বনে এত কলা, এত পেয়ারা অথচ কোনো রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই। তার মানে এই বনেই ওদের ঘাঁটি। ওরা অনবরত পশুপাখি শিকার করে এখানে আতংকের সৃষ্টি করে বলেই এখানে কোনো পাখি নেই। এই জংগল ওদেরই জিম্মায় বলে ওদের ফসল কেউ চুরি করতে সাহস করে না।

বিলু বলল—ঠিক বলেছিস বাবলু। তোর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

একটু পরেই দেখা গেল শয়তানরা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের পথ ধরছে।

বাবলুরা প্রস্তুত ছিল। তাই চটপট লুকিয়ে পড়ল বড় বড় পাথরের খাঁজের আড়ালে।

ডমরুর দল যখন ওদের পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে এগিয়ে গেল ওরা তখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খুব সন্তর্পণে যাতে ওরা একদম টের না পায় এমনভাবে ওদের অনুসরণ করতে লাগল।

জংগল এখানে অত্যন্ত গভীর ও বিভীষিকাময়। তাই বেশ লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে অতি সহজেই ওদের পিছু নেওয়া যাচ্ছিল। জংগলের আরো গভীরে যাবার পর এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ডমরুর দল।

তারপর সেইখানেই কয়েকটি পাথরের ওপর সারি দিয়ে বসে পড়ল ওরা।

ডমরু সিং পায়ের ওপর পা তুলে পা নাচাতে নাচাতে বলল—কোথায় গেল বল তো ছেলেমেয়েগুলো ? ওরা কি ম্যাজিক জানে ?

দলের একজন বলল—তোমার যেমন ওস্তাদ। ওরা এই জংগলে আসতে যাবে কোন দুঃখে? লোকের কথা শুনে এইখানে ঢুকে পড়লে তুমি। ওরা ঠিক জরাইকেলায় চলে গেছে। ওখানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে ওদের।

ডমরু বলল—রেজ্জাক, তুম ও লেড়কা লোগকো পতা লাগাও। আমি নিজের হাতে খুন করব ওদের।

আর একজন বলল—কত বড় সাহস। এক ফোঁটা ফোঁটা ছেলেমেয়ে বলে কিনা ডমরু সিংকে দেখে নেবে ? আমাদের দেশে এসে আমাদেরই বলে কিনা তিন দিনের ভেতর এখান থেকে চলে যেতে।

ডমরু বলল—আমি আজ রাতের ভেতরে অপারেশন শেষ করতে চাই। টমি আর জিম্মির বদলা নিতেই হবে। আর জগ্গুটার অবস্থাও যা করেছে তারও বদলা নেওয়া চাই। হাম কিসিকো নেহি ছোড়েংগে।

ওরা সকলে পাথরের ওপর বসে এক একটি গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে কথা বলছিল। এই জায়গাটাই ওদের আড্ডার জায়গা তা বোঝাই যাচ্ছে। ওরা ওদের হাতিয়ারগুলো পাশে রেখে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে বিলু আর ভোম্বল একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। বাচ্চু বিচ্চুও কি একটা ইশারা করল যেন।

বাবলু সবার চোখের দিকে তাকিয়ে ইংগিত করল।

ঠিক এইরকম সময়ে কি করা উচিত পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা জানে। ওরা বুকে হেঁটে একটু একটু করে এগিয়ে চলল। পঞ্চুও ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো। আর বাবলু পিস্তল উঁচিয়ে রইল ট্রিগার টেপার অপেক্ষায়।

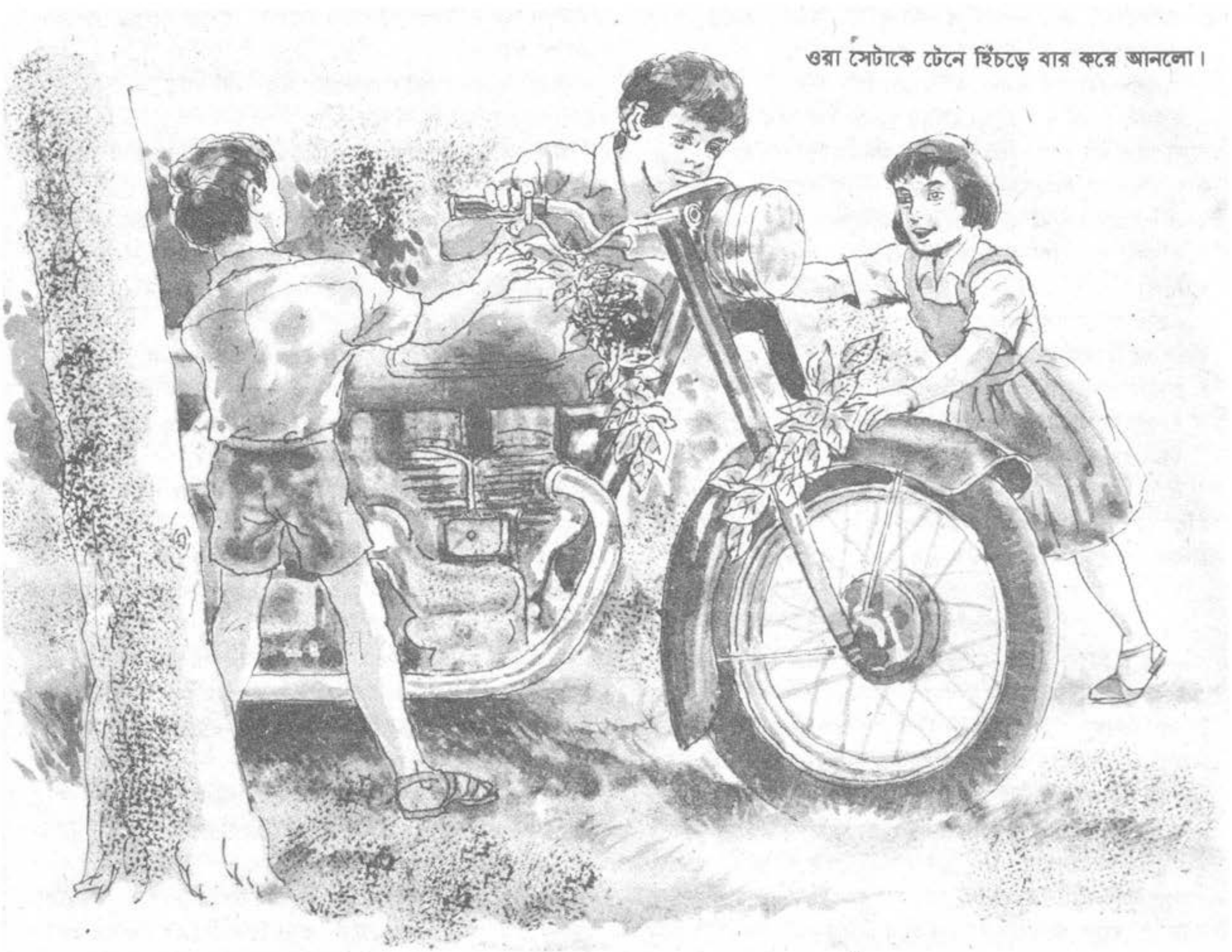

ওরা সেটাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনলো।

ভোম্বল বুকে হেঁটে গিয়ে হস্তগত করল ডমরুর রিভলভারটা। বিলু টেনে নিল একজনের লোহার চেন। বাচ্চু আর বিচ্ছু নিল একজনের রড ও অপরজনের ছোরা। নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে আবার ফিরে এলো।

যাক ঝুঁকিটা নিয়ে ভালোই হয়েছে। কেননা শত্রুদের নিরস্ত্র করা তো হলো।

ডমরু সিং বলল—দেরি কোর না রেজ্জাক। জলদি চলা যাও।

রেজ্জাক বলল—যাচ্ছি। তবে ওস্তাদ ঐ পুলিশ অফিসারের বাইকটা আমাকে দাও না। যাবো কি আসব।

—ডমরু বলল বুরবাক কাঁহাকা। ওটা নিয়ে এখন কেউ যায়? ঐ বাইক দেখলেই তো ধরে ফেলবে তোকে। নিজেও মার খেয়ে মরবি। আমরাও দলকে দল অ্যারেস্ট হয়ে যাব।

রেজ্জাক উঠে পড়ল। তারপর বলল—ঠিক আছে, আমি দু'ঘণ্টার ভেতরেই হদিশ নিয়ে আসছি ওদের। বলে আশপাশে কী যেন খুঁজতে লাগল।

ডমরু বলল—ক্যা হুয়া?

—আরে আমার চেনটা তো এইখানেই রেখেছিলুম। গেল কোথায়?

ওর পাশে যে বসেছিল সে বলল—আমার রড কই?

আর একজন বলল—আমার ছুরি?

ডমরু অমনি লাফিয়ে উঠে বলল—আমার রিভলভার? হিঁয়া তো কোই নেহি হ্যায়।

সবাই তখন একজোট হয়ে খোঁজাখুজি শুরু করল। বাবলুরা ওদের কাছ থেকে অনেকটা দূরত্বে সরে এসে পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

চারজনের এই দলটি তখন খুবই বিভ্রান্ত।

ডমরু বলল—মনে হচ্ছে কোনো দুশমন আমাদের পিছু নিয়েছে। সেই ছেলেগুলোও হতে পারে। আমাদের এখুনি এর মোকাবিলা করতে হবে।

বাকি তিনজন বলল—কী দিয়ে মোকাবিলা করবে ওস্তাদ? শুধু হাতে না লাঠি দিয়ে?

ডমরু সিং চেঁচিয়ে বলল—থামো। যদি ঐ ছেলেমেয়েগুলোই হয় তো আমি নিজের হাতে এক এক করে গলা টিপে মারব ওদের। বলে গাছপালার ওপর দিকে একবার নজর বুলিয়ে দেখল কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা। না। সেখানেও কেউ নেই। ডমরু আবার বলল—যদি ঐ ছেলেমেয়েগুলোই হয় তাহলে নিশ্চয়ই ওরা রাত্রিবেলা ঐ ভাঙা বাড়িতে গিয়ে জুটবে। আর তখনই আমি ওদের এক এক করে শেষ করব। বলে ওরা আরো গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চুও যাবে বলে এগোচ্ছিল। কিন্তু আটকালো বাবলু। বলল—কী দরকার। ওরা তো আবার আসবে। ততক্ষণে রাতের লড়াইয়ের জন্যে আমরা পুরোপুরি তৈরি হয়ে নিই আয়। বলে পঞ্চুকে কাছে ডেকে ওর পিঠ চাপড়ে বাবলু বলল—পঞ্চু, তুই বরং ওদের পিছু নে। তুই গিয়ে দেখে আয় ওদের ঘাঁটিটা কোথায়। যা। কুইক।

অভিজ্ঞ কুকুর লেজ নেড়ে বুঝিয়ে দিল তাকে কি করতে হবে তা সে বুঝেছে। একবার সে শিরদাঁড়া টান করে ডমরুর দলকে দেখে নিল। তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল ওদের।

বাবলুরা তখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করল কোথায় আছে সেই বাইকটা। কেননা রেজ্জাক নামে লোকটাকে ওরা বলতে শুনেছিল পুলিশ অফিসারের বাইকের কথা। তার মানে নিশ্চয়ই ওরা কোনো পুলিশ অফিসারের বাইক চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এক জায়গায় একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা। বেলা গড়িয়ে এসেছে তখন। ওরা দেখল সেই ঘন সবুজ কলাবনের ভেতর এক জায়গায় একটি নতুন মাটির হাঁড়ি উপুড় করা রয়েছে। তার ওপর কলাপাতা চাপা দেওয়া। তার মানে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে ওটা। বেশ বড়সড় হাঁড়ি।

ভোম্বল বলল—হাঁড়ি যখন রয়েছে তখন যদি কিছু চাল ডাল পাওয়া যেত রে কোথাও তাহলে দিব্যি ফুটিয়ে খাওয়া যেত। বনে তো শুকনো পাতা বা কাঠকুটোর অভাব নেই।

হঠাৎ বিলু এক জায়গায় কী যেন দেখে ছুটে গিয়ে বলল—বাবলু ঐ দেখ বাইকটা!

আরে সত্যিই তো! একটা লাল রঙের মোটর বাইক একটি বড় পাথরের আড়ালে লতাপাতা চাপা দেওয়া অবস্থায় লুকনো রয়েছে। তাই দেখে ওরা সেটাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে। বাড়ির পিছনে এক জায়গায় মোটর বাইকটাকে লুকিয়ে রেখে ওরা ঘরে এসে ওদের মালপত্তরগুলো এক জায়গায় নামিয়ে রাখল।

বাবলু প্রথমেই ওর পিস্তলে গুলি ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর পরীক্ষা করল ডমরু সিং-এর রিভলভারটা। মোট ছটা গুলি আছে তার ভেতর। বিলু আর ভোম্বল একজন চেন ও একজন রডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। বাচ্চু বিচ্চুর তো নিজস্ব ছোরা ছিলই উপরন্তু শয়তানদের ছোরাটাও পেয়ে গেল।

বাবলু বলল— পঞ্চু ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিভাবে কি করব তার পরিকল্পনাটা করে নিই আয়। সূর্য ডুবেছে। আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। যা করবার এইবেলা করে নিতে হবে আমাদের।

সকলে বলল—কি ভাবে কী করব বল?

—এখানে আমরা এমনভাবে লুকিয়ে থাকব যাতে সহজেই ওদের দেখতে পাই, কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে না পায়। তাহলে অতর্কিতে আক্রমণ করতে খুব সুবিধে হবে। আর আমরা যে এখানেই আছি সে কথা জানাবার জন্যে জঙ্গলের দিকের জানালায় একটা বাতি জ্বেলে রাখব।

বাচ্চু বিচ্চু তখন এপাশ ওপাশ ঘুরে এ-ঘর ও-ঘর করছিল। হঠাৎই তারা বলল—বাবলুদা, ঐ দেখ রেল লাইন ধরে কারা যেন কোথায় যাচ্ছে।

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল—কারা রে?

—দেখোই না।

বাবলু দেখল একদল আদিবাসী পুরুষ মহিলা মাথায় পসরা নিয়ে মনোহরপুরের দিক থেকে জরাইকেলায় যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বেচাকেনা সেরে ফিরছে ওরা। দেখেই ছুটল সকলে। বলল—এই যে, শোনো! কী আছে গো তোমাদের কাছে?

লোকগুলো থমকে দাঁড়িয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল—তুরা সব কে বটে? চিনি গিদ্‌ড়ে?

—হ্যাঁ। আমরা শহরের ছেলে। জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি। রাতে পিকনিক করব। চাল ডাল কিছু আছে তোমাদের কাছে?

—জমত্র্যার (হ্যাঁ)।

এদেরই ভেতর থেকে একজন বিহারী লোক এগিয়ে এসে বলল—তুম সব কৌন হো বেটা? ইসি মকানমে কাহে কো ঘুসা? হিঁয়া পর ডাকু হ্যায়।

বাবলু পিস্তল দেখিয়ে বলল—ডাকুর ভয় করি না আমরা। তোমাদের ডমরু সিং-এর একজন লোককে আমরা এমন মেরেছি এবং আমাদের কুকুর তাকে এমন কামড়েছে যে সে বোধ হয় বাঁচবে না। এখন ওদের মারব বলে লুকিয়ে আছি এই বনের ভেতর।

লোকটি তো শুনেই লাফিয়ে উঠল— আই বাপ্।

বাবলু বলল—কাল আবার যখন মনোহরপুরে যাবে তখন জিজ্ঞেস করে দেখো, ওর নাম জগ্গু।

লোকটি আনন্দের আবেগে লাফিয়ে উঠে বলল—তুমনে বহৎ আচ্ছা কাম কিয়া বেটা। ও ডমরু বহুৎ বদমাশ হ্যায়।

আউর ও জংগু ভি।

একটি আদিবাসী মেয়ে তখন ছুটে এলো বাবলুর কাছে। বলল--আমার বুনকে উরা ধরে লিয়ে গেছে। তু পারবি খোকাবাবু উকে ফিরিয়ে আনতে? উর নাম কমলা।

বাবলু বলল–চেষ্টা করব। আমরা ওদের ডেরা জানি না। তোমরা এখন ঘরে যাও। কাল সকালে এসো একবার। সব জানতে পারবে তখন।

ওরা তখন ওদের যার কাছে যা কিছু ছিল দিয়ে দিল। লাল মোটা চাল, আলু, বেগুন, ঢ্যাঁড়স। বাবলু অনেক চেষ্টা করল ওদের দাম দিতে কিন্তু কেউ নিল না।

তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আদিবাসীরা চলে যেতেই বাবলুরা মালপত্তরগুলো ঘরে নিয়ে বলল–যাক, এবার পেট ভরে ভাতে ভাত খেয়ে সারা রাত ধরে ডমরু সিং-এর সংগে চু কিৎ কিৎ খেলা যাবে কি বল?

বিলু বলল–সে কথা আবার বলতে? কিন্তু পঞ্চুটা এখনও আসছে না কেন? ধরা পড়ে গেল না তো?

ভোম্বল বলল–অসম্ভব। পঞ্চুকে ধরবার ক্ষমতা ডমরু সিং-এর নেই।

বাবলু বলল–তাহলে শোন ভোম্বল, রাতের খাবারের ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে আমাদের তখন চল ঐ হাঁড়িটা নিয়ে এসে ভাতে ভাত রান্না করে খেতে বসে যাই।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল–কিন্তু রাঁধবে কোথায়? এখানে ঘরের ভেতরে রাঁধতে বসব আর ওদিক থেকে মূর্তিমানরা সব যদি এসে হাজির হয় তখন?

–ওরা বেশি রাত ছাড়া আসবে না। ততক্ষণে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য তাড়াতাড়ি করতে হবে সব কিছু। চল লেগে পড়া যাক। কিছু কাঠকুটো শুক্‌নো গাছের পাতা জ্বেলে দিলেই হয়ে যাবে। আপাততঃ ঐ হাঁড়িতে করে কোয়েল নদীর জল নিয়ে এসে ভাতটা বসাই আয়। আমাদের ওয়াটার বটলে যা জল আছে তাতে রাতের খাওয়াটা হয়ে যাবে।

বাবলুরা সশস্ত্র হয়েই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল সেই অরণ্য গভীরে কলাবনের ভেতর থেকে হাঁড়ি আনতে। ওরা যথাস্থানে এসে টর্চের আলো হাঁড়ির ওপর ফেলল। হাঁড়ি ঠিক সেই ভাবেই আছে। কে রেখে গেছে কে জানে? যেই রাখুক। ওদের তো কাজে লেগে গেল।

ভোম্বল এগিয়ে গিয়ে হাঁড়িটার কাছে গিয়ে কলাপাতা সরিয়ে যেই না হাঁড়িটা তুলেছে অমনি বাপ্‌রে বলে লাফিয়ে উঠে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বিলু বাচ্চু বিচ্ছুও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। বাবলু নিজেও কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বিলু বলল–দরকার নেই বাবলু ডমরু সিং-এর মোকাবিলা করে। শীগ্‌গির পালিয়ে চল এখান থেকে।

বাবলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল–কিন্তু পঞ্চু?

–হ্যাঁ পঞ্চু এলেই। আর এখানে থাকা নয়।

ওরা যে দেখল তা সত্যিই ভয়ানক ব্যাপার। কিন্তু সেই ভয়টা এত বেশি হলো যে ভয়ের চোটে ওরা না পারল এগোতে, না পারল পালাতে। হাঁড়িটা তুলতেই ওরা দেখতে পেল একটা কাটা মুণ্ডু ঢাকা দেওয়া আছে সেখানে। কিন্তু তাই দেখে ভয় পাবার ছেলেমেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়। যদি না মুণ্ডুটা চোখ মেলে ওদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাত।

বাবলু আর একবার টর্চের আলো সেই মুখের ওপর ফেলেই নিভিয়ে দিল আলোটা। এ দৃশ্য কি দেখা যায়? এক অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র মানুষের কাটা মুণ্ডু। কিন্তু সেটা জীবন্ত। ধড় থেকে কোনো মানুষের মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা কখনো কোনো অবস্থাতেই জীবন্ত থাকতে পারে না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভূত দেখেনি। ভূত বিশ্বাসও করে না। কিন্তু এই অরণ্যে এই জীবন্ত কাটা মুণ্ডুকে অস্বীকার করবে কি করে?

আরো একবার সেই দিকে টর্চের আলো ফেলে ওরা এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল। কেনই বা পিছোবে না? কাটা মুণ্ডু তখন ওদের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে বলল–শোন, আমার কাছে এসো।

বাবলু ভয় পেয়ে বলল–না। না যাবো না। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা নিরপরাধ, না জেনে আপনার ঘুম ভাঙিয়েছি। আমাদের ওপর রাগ করবেন না।

কাটা মুণ্ডু আবার বলল–তোমরা কে তা জানি না। তবে দয়া করে একবার তোমরা আমার কাছে এসো। আমাকে উদ্ধার করো। আমি মৃত মানুষ নই।

–সেকি! আপনি মৃত নন?

–না। আমি ভালো করে কথাও বলতে পারছি না বাবা। আজ তিন দিন আমি এই অবস্থায় এখানে আছি।

বাবলু তবুও ভয়ে ভয়ে বলল–সত্যি বলছেন?

–হ্যাঁ। তোমাদের ভেতর থেকে কে যেন বলল আর দরকার নেই ডমরু সিং-এর মোকাবিলা করবার। আমিও এখানে এসেছিলাম ঐ ডমরু সিং-এর মোকাবিলা করতে। এসে বিপদে পড়ে গেছি। আমি রাউরকেলার এস পি

–তাই নাকি? একটা মোটর বাইক এই জংগলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমরা, সেটা কি আপনার?

–হ্যাঁ আমার। লাল রঙের বাইক। নম্বর–।

বাবলুরা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

–আমাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করো তোমরা। না হলে হয়তো আর একটু পরেই এসে পড়বে ওরা। এই কলাবাগানের একদিকে আমার স্ত্রী এবং একদিকে আমার পুত্রকে হত্যা করে পুঁতে রেখেছে ওরা। আর আমার হাত পা বেঁধে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে শুধু মুখটাকে বার করে রেখেছে। বলেছে আমার

মৃত স্ত্রী পুত্রের কবর পাহারা দিতে। হাঁড়িটার তলা দিয়ে একটু একটু হাওয়া ঢুকছিল তাই কোনো রকমে শ্বাস নিচ্ছিলাম। আজ তৃতীয় রাত। কাল আর পরশু ওরা আমাকে একটা করে কলা খাইয়ে গেছে। আজ এখনো আসেনি। অনাহারে এবং অত্যাচারে আমি বড়ই দুর্বল।

আর কিছুই বলতে হলো না। ওরা সবাই মিলে ছুটে গিয়ে লোহার রড বড় ছোরা ইত্যাদি দিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলল এস.পি. সাহেবকে। তারপর হাত পায়ের বাঁধন কেটে কোনো রকমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল কোয়েল নদীতে। সেইখানেই তাঁকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করানো হলো। তারপর বাবলু নিজে গিয়ে কয়েকটি কলা পেয়ারা নিয়ে এসে খেতে দিল এস.পি. সাহেবকে।

এস.পি. বললেন– আমি বড়ই দুর্বল। একদম চলতে পারছি না।

বাবলু বলল–কোনো ভয় নেই আপনার। আসুন না আপনি আমাদের সঙ্গে। আপনাকে আমরা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে ওরা টেরও পাবে না। এই বলে এস.পি. সাহেবকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে ফিরে এলো ওরা। তারপর তাড়াতাড়ি মাটির হাঁড়িটায় জল ভরে এনে ভাতে ভাত ফোটাতে বসল। মিনিট পনেরোর ব্যাপার। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর যা হোক দুটো খাওয়া হলো সকলের। আগে খেতে দিল এস.পি. সাহেবকে। তারপর ওরাও খেল।

ততক্ষণে পঞ্চুও এসে হাজির হয়েছে। পঞ্চু এক দারুণ উত্তেজনায় ছটফট করছে তখন।

বাবলু বলল–কাজ হাসিল করতে পেরেছিস তো পঞ্চু?

পঞ্চু কুঁই কুঁই করে লেজ নেড়ে বাবলুর চারিদিকে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। তার মানে সে পেরেছে।

বাবলু বলল–আজ ঐ দুর্বৃত্ত ডমরুর মোকাবিলা হবে। যদি বেকায়দায় পড়ি পারবি তো আমাদের রক্ষা করতে?

পঞ্চু সোজা দুপায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল।

এস.পি সাহেব অবাক হয়ে বললেন–তাজ্জব ব্যাপার, এ তো দেখছি অবিকল মানুষের মতো ব্যবহার করছে।

বাবলু বলল–ও কুকুর হলে কি হবে। আসলে সব কিছুই ওর মানুষের মতো। ওকে পাঠিয়ে ছিলাম ডমরুর ঘাঁটিটা চিনে আসতে। ও সব কিছু দেখে শুনে এসেছে সেই কথাটাই আকারে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছিল আমাকে।

–সত্যি সত্যিই চিনে এসেছে ও? ডমরুর ঘাঁটির সন্ধান নিতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলাম আমি। এদের দলের একজন লোককে ধরে লকআপে যখন মারধোর করছিলাম সেই সময় মারা যায় লোকটা। খুব বেশি মারিনি। কথা আদায়ের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই মেরেছিলাম। এমন সময় আচমকা লোকটার স্ট্রোক হয়ে যায়। মেডিকেল রিপোর্টে স্ট্রোক ধরা পড়ে। কিন্তু আমি ওর লোককে ধরেছিলাম বলে ডমরুও আমার স্ত্রী পুত্রকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর চিঠি দিয়ে আমাকে জানায় আমি ওর শাগরেদকে ছেড়ে দিলেই ও আমার স্ত্রী পুত্রকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু লকআপে ওর লোকের মৃত্যু ঘটায় আর তো সে সম্ভাবনা রইল না। তাই ধৃত লোকটির সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী থেকে যতটা সম্ভব অনুমান করে এই জঙ্গলে এসেছিলাম। কিন্তু একা এসেই ভুল করেছিলাম আমি। ডমরুর লোকেরা সহজেই আমাকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে ধরে ফেলে। তারপর হাত পা বেঁধে আমাকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে আমার চোখের সামনেই আমার স্ত্রী পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর পরের ঘটনা তো তোমরা জানো।

বাবলু বলল–এস.পি. সাহেব, আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। মঙ্গল সিং-এর মতো ডাকাত আর প্রেমা তামাং-এর মতন কুখ্যাত দস্যুকেও চোখে সরষে ফুল দেখিয়েছি। ওদের কাছে ডমরু সিং কিছুই নয়।

–পারবে? পারবে তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে? আমি বড় দুর্বল। তবুও স্নান করে এবং তোমাদের দেওয়া দুটি ভাত খেয়ে একটু জোর পেয়েছি। তোমার ঐ পিস্তলটা আমাকে দেবে বাবা?

বাবলু বলল–না। এ আমি কাউকে দেবো না। আর শুনুন, আমাদের নামগুলো আপনি জেনে নিন। আমার নাম বাবলু, এর নাম বিলু, ঐ ভোম্বল আর ওরা হলো বাচ্চু বিচ্ছু। আর এই যে দেখছেন কুকুরটা, এর নাম....

–পঞ্চু।

–কি করে জানলেন?

–কেন, একটু আগেই তো তুমি ওর নাম ধরে ডাকলে। এস.পি. সাহেব আবার বললেন–কিন্তু বাবা, তোমরা এইটুকু টুকু ছেলেমেয়েরা ঐ গুন্ডা বদমাশগুলোর মোকাবিলা করবে আর আমি একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার হয়ে চেয়ে চেয়ে তাই দেখব তা কি করে হয়?

–না না। তা কেন? অস্ত্র আপনিও পাবেন। এই নিন ডমরু সিং-এর রিভলভার। এটা অটোম্যাটিক। মোট ছটা গুলি ভরা আছে এতে। যদি দেখেন আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে একমাত্র তখনই এটা ব্যবহার করবেন।

এমন সময় বহু দূরে মশালের আলো দেখা গেল। তার মানে ওরা আসছে।

বাবলুর নির্দেশ মতো এস.পি. সাহেব বহু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বড় একটি পাথরের খাঁজে আশ্রয় নিলেন।

বাবলু বলল–আপনি এইখান থেকেই বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে রিভলভার তাগ করে থাকবেন। ওরা কেউ ছাদে উঠলে অনায়াসে গুলি করতে পারবেন এখান থেকে। কিন্তু সাবধান। সামনে আসবেন না একদম। কেননা আপনার এখন ছুটে পালাবার শক্তি নেই। আপনি তৈরি থাকুন। আমরা ভেতরে

যাচ্ছি। এই বলে বিলু ভোম্বল বাচ্চু ও বিচ্ছুকে নিয়ে দ্রুত সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল বাবলু।

এবার শুরু হলো পরিকল্পনা মতো কাজ।

প্রথমেই জঙ্গলের দিকের জানালায় একটা মোমবাতি জ্বেলে ওদের এখানকার অবস্থিতি জানিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ঘরের মাঝখানে জিনিসপত্তরগুলো রেখে তাইতে এমন ভাবে চাদর চাপা দিল যাতে ওরা এসে মনে করে যে বাবলুরাই শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

এবার ভোম্বলের খেল। সে ঐ ঘরের বাঙ্কের ওপর উঠে বসে ল্যাম্পের মতো একটা দড়ির ফাঁস নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পাশে রাখল ছিনতাই করা সেই লোহার রড়খানা।

আর একটি ঘরের ভাঙা দরজার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে রইল বিলু। ওরা হাতে রয়েছে চেন। ওরা কেউ ভেতরে ঢুকলেই এই দিয়ে বেদম পেটাবে।

বাবলু বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে বড় বড় থামের আড়ালে পিস্তল উদ্যত করে এমনভাবে লুকিয়ে রইল যাতে ও সব দিকে নজর রাখতে পারে।

আর পঞ্চু? সে ছাদে ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে দরজার পাশ ঘেঁষে লুকিয়ে রইল এমনভাবে যাতে কেউ ছাদে উঠে পড়লে প্রচণ্ড চিৎকার করে তাকে এমন তাড়া লাগাবে যে ছাদ থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে বাছাধন।

মাত্র দু তিন মিনিটের ব্যাপার।

নাটক শুরু হলো।

একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ডমরু সিং তিনজন সঙ্গী সহ এসে হাজির হলো সেখানে। বাবলু আড়াল থেকেই দেখে বুঝল ওদের নিষ্ঠুর চোখে খুনের ছায়া। একবার তার বুকটা কেঁপে উঠল। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ। শয়তানগুলোর কারো হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র নেই। প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত ছোরা।

ডমরু সিং একবার আলোটা উঁচু করে দরজার কাছ থেকেই ভেতরটা দেখে নিল। তারপর আলোটা একজনের হাতে দিয়ে চুপিচুপি পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল। বাকি দুজন দরজার আড়াল থেকেই উঁকি মেরে ঠান্ডা মাথায় খুন দেখার জন্যে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু একি! ডমরু ভেতরে ঢুকে এক টানে চাদরটা সরাতেই একটা কোলা ব্যাঙ থপ করে লাফিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

যেই না পড়া ডমরু অমনি লাফিয়ে উঠল তড়াং করে। আর

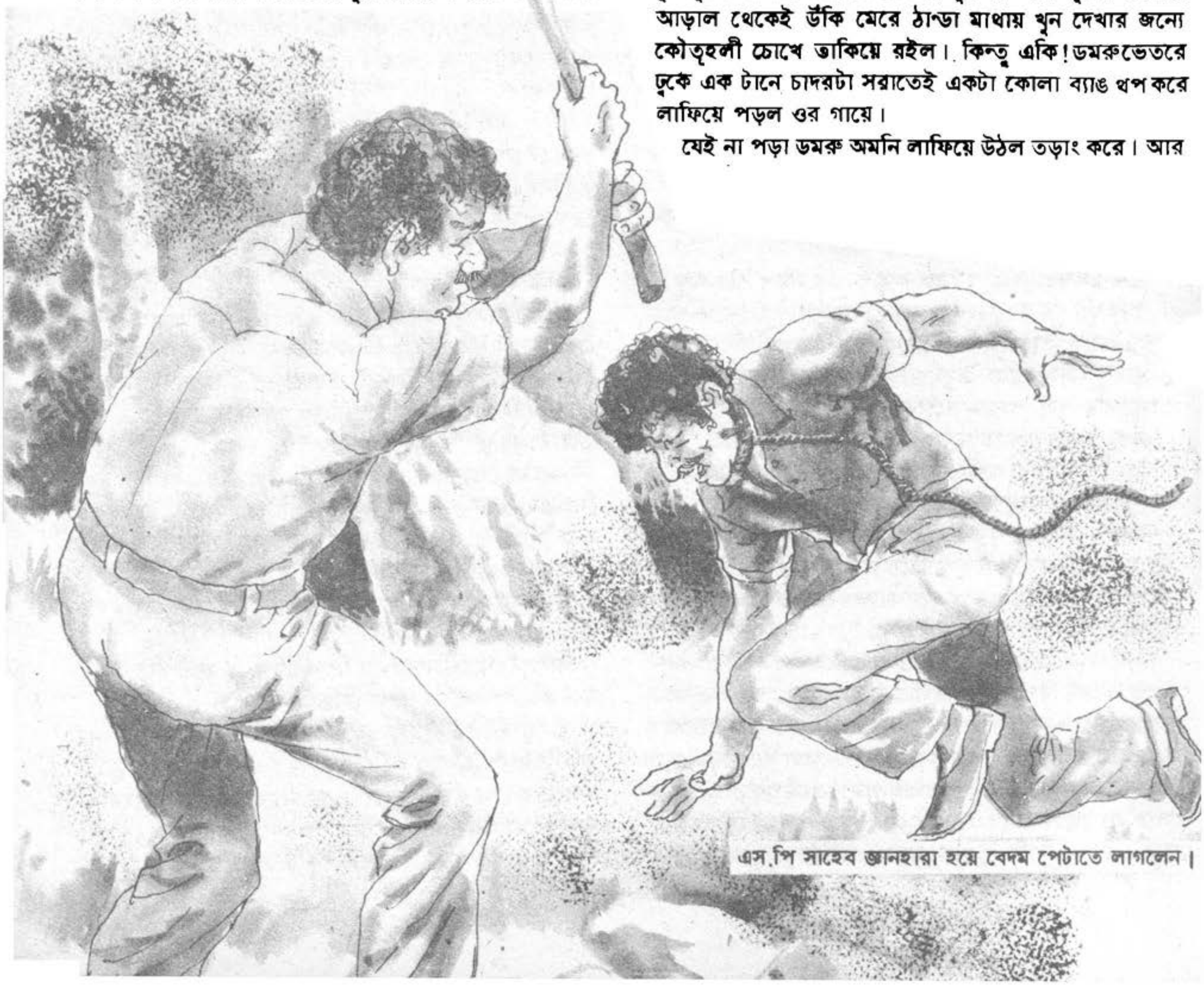

এস.পি সাহেব জ্ঞানহারা হয়ে বেদম পেটাতে লাগলেন।

সেই মুহূর্তেই ভোম্বলের নাইলনের দড়ির ফাঁস মালার মতন আটকে গেল ডমরুর গলায়। ভোম্বল সেটাকে গলায় লটকে দিয়েই গায়ের জোরে টেনে ধরল। ডমরু সিং আঁ–আঁ–আঁক্ শব্দ করে দুহাতে সেই দড়িটা ধরে প্রাণপণে একটা হেঁচকা টান দিতেই ভোম্বল টাল সামলাতে না পেরে বাক্সের ওপর থেকে ধড়াস করে ডমরুর ঘাড়ের ওপর পড়ে গেল। ডমরুর তখন এমনিতেই শোচনীয় অবস্থা। দম আটকে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে প্রায়। তার পক্ষে ভোম্বলকে আক্রমণ করা মোটেই সম্ভব হলো না। আর ভোম্বল সেই সুযোগকে হাতছাড়া না করে ডমরুর মুখের ওপর টেনে মারল এক ঘুঁষি।

অন্য লোক দুজন লিডারের ঐ অবস্থা দেখে ভোম্বলের ওপর যেই না লাফিয়ে পড়তে যাবে ভোম্বল অমনি ভাঙা জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল পাশের ঘরে। অর্থাৎ যে ঘরে বিলু ছিল। লাফাবার সময় জানলার মাথার দেওয়ালটা খুব জোরে ঠুকে গেল ওর মাথায়। তবুও পাছে বিলু বুঝতে না পেরে চেন ঘুরিয়ে দেয় সেই ভয়ে দেওয়ালের এক কোণ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল ও। ততক্ষণে ঐ লোক দুটোও ছুটে এসে ঐ ঘরে ঢুকেছে। যেই ঢোকা বিলু অমনি বন বন করে চেনটাকে ঘোরাতে লাগল। কী মার! কী মার! ওরা তো তখন মারের চোটে বাবারে মারে বলে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

যে লোকটার হাতে মশাল ছিল সে তখন সংগীদের ঐ অবস্থা দেখে আর থাকতে না পেরে মশালটা একপাশে রেখে দিয়ে আক্রমণ করতে গেল বিলুকে। এটাই কাল হলো। বাচ্চু সেই সুযোগে মশালটা তুলে নিয়ে পিছন দিক থেকে লোকটার জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। টেরিলিন আর টেরিকটের জামাপ্যাণ্ট ধরে গেল সহজেই। লোকটি দিশেহারা হয়ে ভয়ানক চিৎকার করে যত ছোটাছুটি করতে লাগল আগুন তত জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। লোকটি তবুও পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায়? বাড়ির বাইরে যাবার পথ আগলে তো পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। অগত্যা নিরুপায় হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে আধপোড়া অবস্থায় মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ল বেচারী।

বিলুর হাতে মার খাওয়া লোক দুটিও তখন বেকায়দায় পড়েছে। রক্তাক্ত কলেবরে সেই অন্ধকারে কোথায় যে যাবে তারা ঠিক করতে পারল না। বাধ্য হয়েই তারা তখন সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু যেই না তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে অমনি পঞ্চু সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল যে লোক দুটো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়েই ভাঙা ছাদ থেকে নিচের পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই যে পড়ল আর উঠে দাঁড়াতে হলো না।

অসহায় ডমরু সিংও তখন এই মৃত্যুপুরীতে একা। তাকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই সেখানে। ডমরু সিং মেঝেয় পড়ে আছে। তার বুকের ওপর ক্রোধান্ধ পঞ্চু বসে আছে থাবা

গেড়ে। বাচ্চু মশালের আগুনটা নিয়ে একবার করে তার মুখে ঠেকাচ্ছে আর বলছে, অনেক মার খেয়েছিস, এবার একটু মুখ শুদ্ধি কর। বিল্লু ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে চেন ঘোরাচ্ছে। বাবলু পিস্তলটা মাঝে মাঝে ওর কপালে ঠেকিয়ে বলছে, কিগো! দেবো নাকি ডিস্যুম করে? ভোম্বল বলছে, লোহার রডটা দিয়ে ওর মাথাটা একটু ফাটিয়ে দিলে কেমন হয়। বিচ্ছু বলছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছুরিটা দিয়ে ওকে কেটে এখুনি কিমা করে ফেলি। আর ডমরু? তার তখন জাঁতাকলে ইঁদুর পড়লে যেমন হয় ঠিক সেই রকম অবস্থা।

বাবলু এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেঁকে ডাকল—এস.পি. সাহেব! আপনি এবার এখানে চলে আসতে পারেন। আপনার স্ত্রী পুত্রের হত্যাকারী এখন আমাদের হেফাজতে। দুর্দান্ত ডমরু সিংকে আমরা জ্যান্ত ধরেছি।

ভোম্বল তখন হঠাৎ কি মনে করে সেই দড়ির ফাঁসটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল—তবে ফাঁসির দড়িটা আমিই কিন্তু পরিয়ে দেবো ডমরু সিং-এর গলায়। বলে ফাঁসটা ওর গলায় লটকে টেনে ধরে রইল।

এস.পি. সাহেব ততক্ষণে এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে হো নেহি সকতা। হাম তো উনকো মিট্টিমে গাড়া দিয়া।

এস.পি. সাহেব রিভলভারটা ডমরুর দিকে তাগ করে বললেন—ছোট্টুলাল, তুমি স্বপ্নেও ভাবোনি ধর্মের কল এইভাবে বাতাসে নড়বে, তাই না? রাতারাতি নাম পাল্টে ডমরু সিং হতে চেয়েছিলে। কিন্তু তখন কি জানতে না ডমরু সিংদের পরিণামটা শেষ দৃশ্যে কি রকমটা হয়? এবার তুমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও ছোট্টুলাল।

রিভলভারটা তাগ করে রইলেন তার বুকের দিকে। তারপর ট্রিগার না টিপে সামান্য একটু হেসে বললেন—না, এমন শান্তির মৃত্যু তোমার জন্য নয়। ডমরু সিং, তোমাকে আমি খেলিয়ে খেলিয়ে মারব। ঠিক যেভাবে আমার চোখের সামনে তুমি লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিলে আমার বউ আর ছেলেকে।

ডমরু সিং চিৎকার করে উঠল—নেহি! মুঝে ছোড় দো এস.পি. সাহাব। ম্যায় বচন দেতা হুঁ জিন্দেগিমে অ্যায়সা কাম কভি নেহি করে গা।

এস. পি. সাহেব বললেন—বেশ। তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে। আগে তুমি আমার বউ আর ছেলের জীবন ফিরিয়ে দাও।

—এ ক্যায়সে হো শেখতা?

—তাহলে তুই মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ ডমরু। বলে রিভলভারটা এক পাশে রেখে দিলেন।

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে লোহার রডটা তুলে দিল এস.পি. সাহেবের হাতে।

এস.পি. সাহেব জ্ঞানহারা হয়ে বেদম পেটাতে লাগলেন ডমরুকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচন্ড দাপাদাপি লাফালাফি এবং তারপরই সব শেষ হয়ে গেলে এস.পি. সাহেব বললেন—আমার বাইকটা কোথায়?

বাবলু বলল—আমরা সরিয়ে রেখেছি একপাশে।

—ওটা আমাকে দাও। আমি এখুনি একবার রাউরকেলা থেকে ঘুরে আসছি। যতক্ষণ না আসি তোমরা বসে বসে পাহারা দাও এদের। এরা একেবারে মরেনি কিন্তু।

—আপনি যেতে পারবেন স্যার?

—না পারলেও যেতে আমাকে হবেই।

এস.পি. সাহেব তাঁর মোটর বাইক নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশ নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। তারপর সকলে মিলে পঞ্চুকে অনুসরণ করে একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গুহামুখে একটি কাঠের দরজা তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। একটি লতানে ঝোপ সেটিকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিল যে বাইরে থেকে সহসা কেউ বুঝতে পারত না এখানে কি আছে। ওরা গিয়ে সেটাকে টেনে ছিঁড়ে দরজা ভেঙে ফেলল। তার ভেতরে ছিনতাই বা ডাকাতি করা অল্প কিছু সোনার গয়না। নগদ প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে এবং বড় বড় মেয়েও দু'চারজন ছিল। তাদের মধ্যে কমলা নামে সেই সাঁওতালি মেয়েটাকেও পাওয়া গেল। পান্ডব গোয়েন্দাদের কৃপায় মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে।

এস.পি. সাহেব পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বললেন—সাবাস পঞ্চু।

পঞ্চু আনন্দে ডেকে উঠল—ভৌ ভৌ ভৌ।

সকালের সোনার রোদে চারিদিক তখন ভরে গেছে। কি ভাবে যেন খবর পেয়ে জরাইকেলা ও মনোহরপুর থেকে দলে দলে লোক এসে চারিদিকে ভিড় করে ফেলেছে তখন।

ছবিঃ দিলীপ দাশ

তিনুকাকাকে নিয়ে আমার বাবা কাকারা শেষ পর্যন্ত সত্যি ভারি মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন। কী যে করা যায়। দুদুকাকার ব্রহ্মতালু জ্বলছে রাগে। ঠাকুমার ভয়ে কিছু বলতেও পারছেন না। বললেই এক কথা, তুই আবার তিনুটার পেছনে লাগলি! দাঁড়া, উপেন বাড়ি আসুক, যদি না বলছি তবে আমার নামে কুকুর পুষিস। উপেন অর্থাৎ আমার সোনা জ্যাঠামশাই–তিনি এলে নালিশ দিলে দুদুকাকাকে ডেকে শাসন করবেন, তোরা কী হলি, মার কথা অবজ্ঞা করিস! আমাদের সামনে দুদুকাকা চান না, তাঁর দাদা এসে তাঁকে ধমকান। তবু মাথা যে ঠিক রাখতে পারছেন না বুঝতে পারছি। ঠাকুমা এ-বাড়ি ও-বাড়ি গেলেই হুংকার, হারামজাদা তোকে ধরে খড়মপেটা না করলে তুই সজুত হবি না! ভেবেছিস কি! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! বাড়িতে কেউ তিষ্ঠোতে পারবে না দেখছি। ছেলেপিলেদের পড়াশোনা পর্যন্ত লাটে তুললি!

তিনু কাকার অন্তর্ধান রহস্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুমার এখন এক কথা, দেখিস্ তিনুটা যেন আবার ভেগে না যায়। ভেগে গেলে যে দুদুকাকার রক্ষা থাকবে না, তিনুকাকার সর্বনাশের মূলে দুদুকাকা–এ সব সাত পাঁচ চিন্তায় কাকা আমার সত্যি অস্থির।

দুদুকাকা দেখলেন, তিনুকাকা গোপাটের দিকে যাচ্ছে। আমরা গুপ্তচর বৃত্তিতে আছি। দুদুকাকা খবর পেলেই দৌড়ে হাজির।–এই কোথায় যাচ্ছিস! এক পা বাড়ি থেকে নড়লে ঠ্যাং ভেঙে দেব। পাজি হতচ্ছাড়া, ভাগার তালে আছে। যা বাড়ি যা, ঘরে গিয়ে বসে থাক। বৌমা না আসা পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।

–বলছি তো তোমাদের বৌমাকে খবর দেবে না। দিলেই ভাগব।

এদিকে কাকীমাকে খবর না দিয়েও উপায় নেই। কাকা তখন নিরুদ্দেশ। ঠাকুমার সারাদিন বারান্দায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বিলাপ–আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা ভাইপো, বিবাগী হয়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে তিনু! তোকে কে আছে রে দেখার! তুই কেন চলে গেলিরে! যাবি তো খবর দিয়ে কেন গেলি না রে! কাকে এখন খুঁজতে পাঠাই রে। বাড়িতে আমার এক পাল রাক্ষস কেবল গিলতে জানে রে। তোর খোঁজে আমি কাকে যে পাঠাই রে! আমার বৌমার কী হবে রে!

কাঁহাতক সহ্য করা যায়। বাবা কাকারা সব প্রবাসে। দুদুকাকা বাড়ি থাকেন। ঠাকুরপূজা. জমি, যজমান সব দেখেন। পঞ্চুকাকা গরু বাছুর গোয়াল। আসলে দুদুকাকা কেন খুঁজতে বের হচ্ছে না, পঞ্চাটা কী করে দিবানিদ্রা দিতে পারে এত বড় দুর্ঘটনার পর ঠাকুমার মাথায় সেটাই

আসছে না। ফলে বসিরের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা রওনা হয়েছিলাম নিখোঁজ বামালের খোঁজে। পেয়েও গেছিলাম।

বিয়ের আগে ঠাকুমার ভাই বেঁচে থাকতেও কাকা আমার মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তখন কেশব দাদু চিঠি দিত দিদিকে, তিনুটা আবার উধাও। কী যে করি!

কাজেই তিনুকাকার উধাও হওয়া নিয়ে আমাদের

কোনো দুশ্চিন্তা হত না। বেরিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মুশকিল হত ঠাকুমাকে নিয়ে।

ঠাকুমা ভারি উচাটনে পড়ে যেতেন তখন। পঞ্চুকাকাকে পাঠাতেন খবর দিয়ে–বিয়ে দিয়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেশব দাদু আসতেন। একদিনের পথ। তাও চলে আসতেন। এসে বলতেন, বিয়ের কথা তুললেই ভাগছে।

ঠাকুমার এক কথা, আমি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। এবার এলেই পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে হবে।

–কিন্তু দিদি!

–আরে কিন্তুটা কী বলবি তো!

–ও যে বলছে অতি ঝক্কি পোহাতে পারবে না।

–ও বলল, আর তুই শুনলি! অমন বলে থাকে। এবার ফিরে এলেই খবর দিয়ে দিবি। উপেন, জলু, অভিমন্যু সবাই চলে যাবে। আমিও যাচ্ছি। বাড়ি উজাড় করে সব তোর ওখানে তুলে নিয়ে যাব। পায়ে পায়ে লোকজন থাকবে। ভাগেটা কী করে দেখব! বিয়ে দিলেই দেখবি দায়িত্বজ্ঞান বাড়বে। বাউণ্ডুলেপনা মাথায় উঠবে। বাড়ি থেকে নড়তেই চাইবে না। এমন মহৌষধ প্রয়োগে কাকা আরোগ্যলাভ করবেন জেনেই গত বৈশেখে বিবাহ।

মাসখানেক বাদে কেশব দাদুর চিঠি, এবারে আর মরতে ভয় পাই না দিদি, শান্তিতে মরতে পারব। তিনুটার সংসারে মন বসেছে। দাদু সত্যি কিছুদিন যেতে না যেতে সজ্ঞানে মারা গেলেন। আর কাকাও তারপর একদিন সজ্ঞানে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

আগে আসত দাদুর চিঠি, এবারে কাকীমার চিঠি। ঠাকুমাকে লিখেছে, পিসিমা আপনার ভাইপো, আজ ক'দিন হল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। এত জমাজমি গাছপালা বাগান দেখি কী করে! ও যে কোথায় গেল– দীর্ঘ চিঠি। কোথাও কোন রাগ অভিমানের প্রশ্ন নেই।

তিনুকাকার বের হয়ে পড়াটা আমাদের কত বড় যে সংকট তখন দুদুকাকার চোখ মুখ দেখলে টের পেতাম।

–আরে গেলি!

ঠাকুমার চিৎকার–যা, বসিরকে খবর দে। পঞ্চারে পাঠা গোপালদি। অচল ভোলা উমাকে পাঠা–এক একদিকে তোরা বের হয়ে পড়।

দুদুকাকা না পারলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত!–কোথায় খুঁজব। উমা অচলের পড়াশোনা নেই!

ঠাকুমার এক কথা, পড়াশোনা করার সময় অনেক পাবে–ওটা ভেসে যাবে না। কিন্তু আমার ভাইপোটা ভেসে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারপর খুঁজেও পাওয়া গেল। ধরে আনাও গেল। কড়া পাহারা। আমাদের ইস্কুল ফিস্কুল মাথায়। পড়াশোনা করলেও হয়, না করলেও হয়। দুদুকাকার মেজাজ সপ্তমে, তিনিই আমাদের অভিভাবক। পড়তে বসতে বলতে পারেন না, ইস্কুলে যেতে বলতে পারেন না। কারণ ঠাকুমার কথার উপর কারো কথা নেই। আমাদের জ্যাঠা কাকারা মিলে ছ'জন, চার পিসি–সবার বড় বেশি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য–এ-হেন পরিস্থিতিতে দুদুকাকা বড় অসহায়। কিছু বললেই বাবা কাকারা প্রবাস থেকে এলে নালিস, আমাকে তোরা কাশী পাঠিয়ে দে। আমি এখন কে! ডালু আমার কথার মর্যাদা দেয় না। তোমাদের এখন সবার পাখা গজিয়েছে, আমি নিমিত্ত মাত্র। কালই বারদী চলে যাব। অপমান আর সহ্য হয় না।

বারদী থেকে স্টিমারে নারানগঞ্জ, তারপর কলকাতা– ঠাকুমার বোন কাশীবাসী, সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী না হলে জীবনে এমন হয় না। মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট জায়গা। সংসারের টানে সেই মোক্ষলাভ পর্যন্ত হচ্ছে না। রেগে গেলেই মোক্ষলাভের জন্য অধীর হয়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যে বারাণসী মনে করিয়ে দিয়ে বলবে, সব থাকল, চললাম। এই একটা ভয়ে বাবা জ্যাঠা এবং কাকারা বড়ই জুজু ঠাকুমার কাছে। মার কোন অভিযোগ শুনতেই তাঁরা রাজি না। দুদুকাকা সবার ছোট। বাড়ি থাকেন, জমিজমা, গৃহদেবতা, যজমান সব সামলানোর দায় তাঁর। আর আছে পঞ্চুকাকা, গোয়াল-ঘর, গরু বাছুর, চাষ আবাদের মালিক। তিনি আমাদের সংসারে, দুদুকাকার পরই দ্বিতীয় মনিব। এই মনিবের ঠেলাতেই, তিনুকাকাকে এবারে পাকড়াও করা গেছে। আর আছে একজন, সবাই জানে তাকে চোরা বসির। সেও নানা অঞ্চলের খবর দিয়ে যায়–বাড়ি ঢুকতে অবশ্য ভয় পায়। ভয় দু-কারণে–এক আমার পাগল জ্যাঠামশাই আর এক পঞ্চুকাকা। সেই বলেছিল, আমাদের বাড়িতে এক জোড়া বাস্তু সাপ আছে। দুধগুখরো। ঠাকুরদার খাটের নিচে, মেঝের গর্তে তার নিবাস।

চোরা বসির না থাকলে এবারে আমরা খবর পেতাম না, তিনুকাকা কোথায় ঘাপটি মেরে আছেন। বসিরের মাথায় থাকে মেটে হাঁড়ি, আর এক জোড়া কেউটে। সে আমাদের কেউটে সাপের খেলা দেখিয়ে আকৃষ্ট করে। আমরা ঘর থেকে চাল ডাল সুপারি পান, যা কিছু জ্যাব ভর্তি করে নিয়ে যাই গোপাটে। সে কখনও আমাদের কচ্ছপের ডিম দেয়। সেই খবর দিয়েছিল, অনুমান হয়।

–অনুমান।

যেদিন আমার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !
"মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে!"
"মানে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা!"
"হ্যাঁ মা, দাঁতে গর্ত! আমি ওকে আমার দাঁত দেখালাম... আমার "স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা" টুথপেস্টের কথা বললাম..."
"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড, সোনা!"
"ও হ্যাঁ! বললাম তুমি বলেছ ভালো, তাই আমি ওটা ব্যবহার করি! আমারও ভালো লাগে!"
"অতিতই ভালো! মাড়ি মজবুত করে, দাঁতের আয়ু বাড়িয়ে দেয়..."
"হ্যাঁ মা! মা, একটু চকলেট কেক খাই? পরে দাঁত ব্রাশ করে ফেলবো! সত্যি মা..."
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড
স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।
FOR THE GUMS
Forhan's
with active FLUORIDE to check tooth decay

331F244 BEN

দৌড় দেখেই বুঝেছিলাম, আমার তিনুকাকা না হয়ে যায় না।

অনুমান হয়, তিনু কর্তা দন্দির শ্মশানে আইসা মকুব দিছেন। এলাহী কান্ড।

কথাটা পাঁচকান না হয় সে জন্য চুপি চুপি বসির বলেছিল, আল্লার মর্জি না হলে হয় না। ফকির দরবেশ আউলিয়া সব তাঁর মর্জিতে। আপনার আমার সাধ্য কি! আসলে বসিরের ধারণা, ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে সংসার ছেড়ে বিবাগি হওয়া যায় না।

তখন আমার ঠাকুমার অনশন চলছে। কাকীর চিঠি পেয়েই ঠাকুমা নিরামিষ ঘরের বারান্দায় বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে তিনু রে, তুই কোথায় গেলি রে বাপ! আমার দাদার কী হবে রে! বৌমা জলে ভেসে গেল রে! আমার বাড়িতে কে আছে রে খোঁজখবর নেয়। সব কটা বৌদের কথায় ওঠে বসে রে! এ-হেন অবস্থা যখন চলছে, গাঁয়ের মানুষজন ঠাকুমার বিলাপে বাড়িতে অষ্ট প্রহর হাজির, বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে, কে শোনে কার কথা–দুদুকাকা শিরে সংক্রান্তি ভেবে বের হয়ে পড়েছেন–একদিকে পঞ্চুকাকা গেছে, একদিকে দুদুকাকা, কিন্তু দিনের শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরছেন, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই আমরা চার ভাই বাড়ি দৌড়ে গিয়ে পঞ্চুকাকার মারফত খবর দিলাম, তিনুকাকা দন্দির শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেছে। খবরটা বসিরই দিয়ে গেছে।

খবর পাওয়া মাত্র ধাওয়া–ঠিক মক্কেল সেখানে। চেনার উপায় নেই, গেরুয়া পরনে, জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। গালে লম্বা দাড়ি। বোঝার উপায় নেই তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা ঠিক বুঝতে পেরে যেই না সাধুবাবার কুঁড়েঘরে হাজির, তখনই লম্বা দৌড়। এই দৌড় দেখেই বুঝেছিলাম, ঠিক আমার তিনুকাকা না হয়ে যায় না। আমাদের সার্কাস দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়ে এ-ভাবে একবার দৌড়ে মেলা থেকে পালিয়েছিলেন। যত ডাকি, তিনুকাকা, কোনো ভয় নেই, টিকা দিতে এসেছে, পালাচ্ছ কেন? তিনুকাকা কি একা, মেলাসুদ্ধু লোক দৌড়াচ্ছে। কলেরা বসন্তের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে সরকারী দায়িত্ব নিয়ে এসেছে যারা, তারা তো হতভম্ব। সবাই দৌড়ায়। মুরগির ঝাঁপি ফেলে দৌড়ায়। কাঁচের চুড়ি চিনেমাটির পুতুল ফেলে দৌড়ায়। জিলিপির কড়াই উল্টে দিয়ে দৌড়ায়। মেলা একেবারে ফাঁকা। আমরা দৌড়াই তিনুকাকাকে ধরার জন্য। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই, তিনুকাকা না গেছে–ভ্রমণ তার একমাত্র বিলাস। সেই তিনুকাকা কাকীমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য বোধহয় আবার ভ্রমণে বের হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চুকাকা আমাদের খুবই বলশালী মানুষ। তার সংগে পারবে কেন। দু-লাফে কাকার জটা সাপটে ধরতেই ফসকে গেল। পঞ্চুকাকার হাতে নকল পরচুলা, তিনুকাকা তখনও ছুটছে। দুদুকাকার ধমকে পঞ্চুকাকার চৈতন্য

উদয়।–আরে পালাচ্ছে, ধর ধর। পরচুলা ফেলে দৌড়া।

পঞ্চুকাকা এবার দাড়ি সাপটে ঝুলে পড়ল। তিনুকাকা আর যায় কোথায়! দাড়িটা নকল নয়, পঞ্চুকাকা ঝুলে পড়তেই টের পেয়েছিল।

দুদুকাকার হুমকি, আবার তিনু তুই নিরুদ্দেশ। তুই কি আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিবিনে।

তিনুকাকা চুপ।

–হাঁট। তিনুকাকা হাঁটতে থাকল।

বাড়ি এসে তিনুকাকা আমাদের নিয়ে নাপিত বাড়ি গেল। দাড়ি কামিয়ে বলল, ওম শান্তি! আর দাড়ি রাখছি না। দাড়িটাই কাল হয়েছে!

আমরা বললাম, ওম শান্তি বলছ কেন তিনুকাকা।

–বুঝলি না, বাঁধন আলগা হল। দাড়িটাই যত নষ্টের গোড়া।

সেই থেকে আছেন তিনুকাকা। কাকীমা না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কাকীকে আনতে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা দশ বার ক্রোশ পথ। একদিনে যাওয়ার উপায় নেই। খাল বিল নদী টিলা ডিঙিয়ে যেতে হয়। কোন সড়ক পথ নেই। কাকীমা ডুলিতে আসবেন। আর গেলেই তো কাকীমা আসতে পারবেন না। সংসারে একা মানুষ। এক বুড়ি মাসি থাকে সঙ্গে। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে। চাকর বাকর আছে। সবাইকে সব বুঝিয়ে তবে না আসা! কাজেই কাকীমা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাজ তিনুকাকাকে পাহারা দেওয়া।

তিনুকাকা মাঝে মাঝে খুবই চটে যেতেন–এই তোরা যা। আমি মাঠে যাব।

–আমরাও যাব।

–তোরা কি আমার হাগা মোতা বন্ধ করে দিবি!

দুদুকাকা বলেছে, ও যাই বলুক সঙ্গে থাকবি। রাতে পাহারার ভার পঞ্চুকাকার। দক্ষিণের ঘরে আমরা চার ভাই। বড়দা মেজদা একপাশে। তিনুকাকা মাঝখানে। আমি আর শান্তি একপাশে। নিচে দরজার পাশে পঞ্চুকাকার বিছানা। দরজায় তালা দেওয়া।

–অ পঞ্চু শুনছ! মধ্যরাতে তিনুকাকার গলা।

–আজ্ঞে।

–কৃপা হোক!

কৃপা হোক মানে দরজার তালা খুলে দাও।

পঞ্চুকাকা দরজার তালা খুলে হ্যারিকেন উসকে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

সারা রাত এই চলে। পঞ্চুকাকা শোয়। ঘুম লেগে আসতে না আসতেই, আবার ডাক, পঞ্চু কৃপা হোক!

এ-ভাবে সারারাত চললে কাঁহাতক সয়। সহসা ক্ষেপে গিয়ে পঞ্চুকাকা বলে ফেলল, কৃপা করে হাগা মোতার কাজটা ঘরেই সারুন কর্তা। আর পারি না।

কাকা জামা তুলে পঞ্চুর হাতখানা পেটে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, বুঝতে পারছ? কাকার বড় কাতর মুখ।

–কী।

–কান পেতে শোন! বলে কাকা দু-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পঞ্চুকাকা কান পেতে শুনতে গিয়ে খটাস করে লাফিয়ে উঠল।–উরে ব্বাস! আল্লার গজব চলতাছে!

–হ্যাঁ গজব। সাধে কি বিবাগী হই পঞ্চু। বড় কষ্ট! পেটে ঐরাবত ডাকছে।

আমরাও ঘুমাতে পারছি না! পেটে আল্লার গজব–কী ব্যাপার, তাজ্জব বনে গেছে পঞ্চুকাকা। পেটে এমন দুরমুস চলছে–আর কর্তা এত নির্বিকার! আমরাও হতবাক, পেটে ঐরাবত ডাকে কেন?

বড়দা বলল, পঞ্চুকাকা, কি হয়েছে। ঐরাবত ডাকে কেন?

পঞ্চুকাকা বলল, পেটখানা দেখ, ফেঁপে ঢোল। ভুটভাট–খৈ ফুটছে জালার ভিতর। তোদের তিনু কাকার পেট ফাঁসল বলে!

আমরা আর কান পাততে সাহস পেলাম না। পেট ফেঁসে গেলে ঊর্ধ্বগতি।

বড়দা বলল, দুদুকাকাকে ডাকি!

সহসা তিনুকাকা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন, না না, দাদারে ডাকবি না! ঘুমাচ্ছে। উঠলেই ক্ষেপে যাবে।

পঞ্চুকাকা বলল, হজমের বড়ি খান। দিচ্ছি।

–হজমের বড়ির কম্ম নয় ওটা পঞ্চু! সাধে কি গৃহছাড়া হই। একখান পুঁটুলি আছে আমার জ্যাবে। সর্বক্ষণ পাহারা দেও ভাল। কিন্তু হাগা-মোতা নেশা-ভাঙ দুই মানুষের বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। তোমাদের বৌমার সেটা আদপেই মালুম হয় না। আলসেতে টিকা গুঁজে দাও একখানা পঞ্চু! আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা বসে থাকলি কেন! ঘুমা। কলকে জ্বালাও, দেখবে ঐরাবতের ডাকাডাকি সব বন্ধ।

আমরা একসঙ্গে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি।

পুঁটুলিটা খুলে কি বের করছেন তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা খুবই জব্দ। সারারাত জাগিয়ে রাখলে কে না জব্দ হয়। কানে কানে পঞ্চুকাকার কী যেন বললেন আর তখনই

ঠাকুমা পঞ্চুকে দেখেই বললেন, কি রে এখানে কেন!

পঞ্চুকাকা তাড়াতাড়ি একখানা ছোট কাঠ, এবং ছুরির বন্দোবস্ত করতেই কাকা ব্যোম শংকর বলে আসন পিঁড়ি করে বসে গেলেন। নিবিষ্ট মনে কাঠে কুচি কুচি করে কী কাটলেন। তারপর তালুতে রেখে ঘষলেন অনেকক্ষণ—তারপর ছোট একখান নাড়ুর মতো বস্তু কলকেয় বসিয়ে জ্বলন্ত টিকা গুঁজে ফুঁ দিতে থাকলেন। হ্যারিকেন জ্বলছে। পঞ্চুকাকা নিবিষ্ট মনে দেখছে। সত্যি আল্লার মেহেরবানি না থাকলে কর্তার চোখ মুখ এমন অপার্থিব হবার কথা নয়। আসন পিঁড়ি হয়ে ঘাড় নিচু করে ফুস ফুস ফুস—ফটাস। যেন মাথার খোপড়া উড়ে গেল। তারপর কতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন আমরা জানি না। কখন এসে আমাদের মাঝখানে শুয়েছেন জানি না, কখন ঘুমিয়েছেন জানি না—আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, কাকা নাক ডাকাচ্ছেন, কখন ঘুম থেকে উঠবেন তার কোন লক্ষণ নেই।

পঞ্চুকাকা আর দুদুকাকা বাইরের উঠোনে তিনুকাকাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করছেন!

দুদুকাকা বললেন, তুই গিয়ে মাকে বুঝিয়ে বল।

পঞ্চুকাকা বলল, না আপনে যান কর্তা।

দুদুকাকা বললেন, না, তুই যা। তুই গিয়ে বুঝিয়ে বললে মা বুঝবে।

পঞ্চুকাকা বলল, আমার বুক কাঁপছে কর্তা।

—কাঁপুক। তবু যা। তুই তো আমার সব কথা রাখিস।

ঠাকুমা আমার খান্ডারনি বোঝা যায়। সবার অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন করে ছাড়েন। ঠাকুমা মুড়ির ধান বের করে দিচ্ছিলেন তখন। পঞ্চুকে অসময়ে অন্দরে দেখেই বললেন, কি রে এখানে কেন!

—কর্তা মা একখান কথা ছিল! বৌদিমণি আসছেন। বড় সার কথা। বৌদিমণিরে ধরিয়ে দেবেন। না দিলে তিনু কর্তা আবার বিবাগী হবে।

—হতচ্ছাড়া আবার বিবাগী হবে বলছে! কিসের অভাব! দাদা কি কিছু কমতি রেখে গেছে! বৌমা আমার লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখতে।

—তা কর্তা-মা তবু হয়।

–হয়। হতে দিচ্ছেটা কে! কোন কাম কাজ নেই তোর! নিজের কাজে মন দে।

পঞ্চুকাকা ফিরে যাচ্ছিল।

দুদুকাকা হাত টেনে ধরলেন।–বললি!

–শুনতে চাইল না। কাম কাজে ফাঁকি দিচ্ছি ভাবছে।

–সে ভাবুক। তুই আয়। সংগে না হয় আমি থাকছি!

–চলেন তবে। গোমড়া মুখে পঞ্চুকাকা দুদুকাকার পাশে হাঁটছে।

–মা পঞ্চু বলছিল.......

–সে তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছে।

হঠাৎ দুদুকাকা ক্ষেপে গেল। বলল, ঠিক আছে, আমাদের কী! এবার তোমার ভাইপো বিবাগী হলে, আমরা নেই। বাড়াবাড়ি করলে, বিলাপ জুড়লে, আমি পঞ্চু দু'জনেই বিবাগী হয়ে যাব। তখন বুঝবে ঠ্যালা।

আমরা ঠাকুমার চারপাশে ঘিরে আছি। আমরাই একমাত্র ঠাকুমাকে ভয় পাই না। বললাম, কাকারা বিবাগী হয়ে গেলে কী হবে ঠাকুমা! আমরা খুঁজতে যাব কী করে!

–যা হবার হবে। যার কেউ নেই তার কে দেখে!

দুদুকাকা পঞ্চুকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, তিনুর বৌকেই বলে দেব।

–কি বলবি!

–তিনুর নেশা ভাঙের অভ্যাস আছে। বৌমা নেশা করতে দেয় না। চোখে চোখে রাখে বলে বাড়ি থেকে পলাতক। বৌমাকে বলে দিও, যেন একটু আধটু নেশাভাঙ করতে দেয়। না দিলে পেট ফেঁপে বাড়িতেই একদিন টেঁসে যাবে।

–তিনু নেশা করে? কি নেশা!

দুদুকাকা মাথা চুলকে বলল, নেশা! মানে গাঁজা খায়!

–হতচ্ছাড়া গাঁজা খায়। ও আমার কি হবে! তারপরই বলল, পালায় নি তো?

–না। ঘুমাচ্ছে।

–ঘুমাচ্ছে! ঘুম আমি বের করছি। কখন রোদ উঠে গেছে এখনও ঘুমাচ্ছে! বলেই ঝাঁটা নিয়ে ভাইপোকে জাগাবার জন্য ছুটতে গেলে, পঞ্চুকাকা যে-ভাবে তিনুকাকার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়েছিল তেমনি আমরা চারভাই সবাই মিলে ঠাকুমার কোমর ধরে ঝুলে পড়লাম। ঠাকুমা আর এতটুকু নড়তে পারল না। তিনুকাকার নাম করে হাওয়ার ঝাঁটা ঘোরাতে থাকল। আর বিলাপ, হায় আমার বৌমার কপালে শেষে এই লেখা ছিল রে!

ছবি : আত্রেয় শর্মা

দাদুর কীর্তি

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

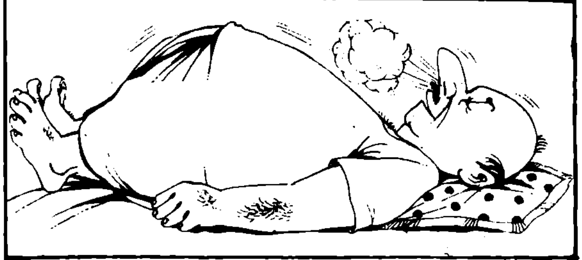

শেয়াল ডাকে 'হুক্কা হুয়া' বেড়াল ডাকে 'মিঁউ'
'হাম্বা' বলে ডাকে গরু পাপিয়া ডাকে 'পিউ'!
ময়ূর ডাকে 'ক্যাঁকো' বলে ঘুঘু ডাকে 'ঘু-উ'
চড়ুই ডাকে 'চুরুৎ চুরুৎ' কোকিল ডাকে 'কু-উ'।
'হালুম বলে' ডাকে যে বাঘ জংগলের-ই ফাঁকে
বুঝি না ছাই কী বলে যে দাদুর নাকটা ডাকে।
বলছি আমি দিব্যি করে- অঙ্কের বই ছুঁয়ে
নাকে দাদু কামান দাগে খাটে শুয়ে শুয়ে।
ফিরলে বাঁ-পাশ দাদুর নাকে বাজে যে ড্রাম পার্টি
ডান-পাশেতে ফিরলে পরে, তবলায় বিশ চাঁটি।
চিৎ হয়ে যেই শোয় গো দাদু নাকে সানাই বাজে
জড়িয়ে ধরলে পাশের বালিশ বুক কাঁপে আওয়াজে।
তার ওপরে যেদিন দাদু নস্যিটা দেয় নাকে
ঘরটা সেদিন যায় যে ভরে জেট্-প্লেনেরই হাঁকে!
গুল ভেবো না, ভর দুপুরে তোমরা যদি শোনো
ভাববে ঘরে চম্বলের-ই ডাকাত চেঁচায় কোনো!
ঘুমিয়ে দাদু নাকের ডাকেই কাগজ পড়ে চলে
না-ঘুমিয়ে টেকুর তুলি আমরা যে অম্বলে!!

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

জাদুকর
BOOK LAND
MAGIC SHOP
শহরের অসংখ্য বাড়ি আর অগুন্তি মানুষের ভীড়ের মধ্যে দীননাথও একজন অখ্যাত বাসিন্দা। কারো সঙ্গেই তার তেমন আলাপ পরিচয় নেই। তার কি পেশা তাও কেউ জানে না। তবে নেশা একটা আছে— সে নাকি একটু আধটু ম্যাজিক জানে।
দিলীপ দাস
গতবার যে ম্যাজিকের অর্ডারটা দিয়ে গেছলুম সেটা কি আজ দেবেন?
নিশ্চয়ই। সব রেডি করে রেখেছি, এই নিন।
ধন্যবাদ স্যার।
রাস্তায় কতকগুলো ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল।
হুররে, ঐ দ্যাখ আমাদের দীননাথ যাচ্ছে।
ধ্যাৎ, দীননাথ নয়। বল দীনবন্ধু।
বাঃ বেড়ে বলেছিস তো, দীনবন্ধু। চল বন্ধুর সঙ্গে একটু মজা করি
এই বন্ধু। ও দীনবন্ধু, শুনে যাও একটু।
হাঃ-হাঃ-হাঃ, পালাচ্ছে! মার ব্যাটাকে, মার।
ছোঁড়াগুলো আবার আমার পেছনে লেগেছে পালাই বাবা—

দীননাথ ছুটতে ছুটতে একটা গলিতে নিজের বাড়ি পৌঁছে গেল
আঃ, বাঁচলুম !
এইবার নতুন ম্যাজিকটা খুলে দেখি।
আগে পুরোনো দু'একটি খেলা প্র্যাকটিশ করে হাতটা সড়গড় করে নিই, কেমন?
আমার আছে জানা, হরেক রকম খেলা — মার্বেল তাস টুপি পাখি আরও কত মেলা !
এই দ্যাখো মার্বেল একটা এ হাতে। ডান হাত ফাঁকা মোর সন্দেহ কি তাতে?
এইবার কি? — এক থেকে দুই হয়, দুই থেকে তিন। তিন থেকে চার হয় তাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্। হাঃ-হাঃ-হাঃ
আর একটা ছোট্ট খেলা
তাসের পর একেবারে নতুন এবং মজাদার একটা খেলা দেখাবো।

তার আগে, এই খেলার নিয়মাবলীটাতে একটু চোখ বুলিয়ে নিই –
ধন্যবাদ। এবার আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি সেই বিখ্যাত মজার খেলাটি শুরু করতে পারি।
এই খেলাটির নাম হল, দি খাজাপানী বক্স।
একটা বাক্স। কল্পবাক্সও বলতে পারেন। দেখুন – ভেতরটা একদম ফাঁকা।
পর্দাটা টেনে দিলুম-
কুইসিং –ভ্যান্সীং– গাংকারি—হুস্।
আরে কি কাণ্ড! একটা পুতুল—হাতি। চমৎকার!

পর্দাটা একটু আস্তে টানা উচিত। নইলে কোথাও আটকে গিয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে।
এবার নেক্সট্‌—সাওনে লাংফো সংকারে...... ইয়াহু।
দেখুন সুন্দর একটি ফুলের ভাস, কি মজা!
নাঃ, সবগুলো খেলাই নিখুঁত হচ্ছে—
এবার আমার সর্বশেষ মন্ত্রটা প্রয়োগ করি—চাংনাসি মংরো টানাকাবি হুঁং—
—চাংনাসি মংরো টানাকাবি হুঁং—চাংনাসি....
ঠক্‌—
ঠক্‌—
ঠক্‌
দেখুন, একটা লম্বা কানওয়ালা খরগোশ—
খর্‌—আরে একি কাণ্ড!

তৃতীয়বার যে একটা পুতুল থাকবে তাতো কাগজটায় লেখা ছিল না !
কে বলে আমি পুতুল ? আমি জীবন্ত ।
অ্যাঁ !
আমার নাম গ্লাকঃ। আমি ভিন্ গ্রহের বাসিন্দা।
তুমি, আ-আপনি এখানে এলেন কি করে ?
একটু আগে যে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিলে তারই শক্তিতে আমি টেলিপোর্টেড হয়ে তোমাদের এই পৃথিবীতে এসে পড়েছি।
তুমি তো খুব ভাল ম্যাজিক জানো দেখছি দীননাথ। আর তোমার ঘরটাও খুব সুন্দর।
আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে।.... আমার খাবার সময় হল। আপনি আমার সঙ্গে যদি কিছু খান তো...
আনন্দের সঙ্গে।

তুমি কি একাই থাক?
হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আবার কে থাকবে?
বাঃ, তোমাদের খাবার খুব ভালো লাগলো!
দীননাথ, এবার তো আমাকে ফিরতে হবে। আমাকে ফেরত পাঠাও।
ক্-কি করে?
তোমার ঐ মন্ত্রটা বল... পুরো মনঃসংযোগ করে, এবং ঠিকমত উচ্চারণ করলেই—
চাংনাসি মংরো টানাকাবি...চাংনাসি— নাঃ, ঠিক হচ্ছে না।
আমার মনে হচ্ছে ঠিক হবে। আমি বাক্সের মধ্যে ঢুকছি তুমি মন্ত্রটা ঠিক ঐ ভাবে বলো।
গ্লাক...আমি যদি তোমার সঙ্গে...তোমার দেশে যেতে চাই.... মানে এখানে আমার আপনজন তো কেউ নেই!
তুমি যাবে আমার সঙ্গে? এ তো খুব ভালো কথা!

আমি মনে মনে ভাবছিলুম যদি তোমার মতো ম্যাজিশিয়ানকে দেশে নিয়ে যেতে পারি...
তবে আর কি : আপনাদের দেশে গিয়ে আমি অনেক অনেক ম্যাজিক দেখাবো। আশা করি সকলের ভালোই লাগবে।
সে তো ঠিক কথাই। তবে—
তবে ওখানে কি তোমার ভাল লাগবে দীননাথ ?
লাগবে। সত্যি বলছি গ্লাক্, এই পৃথিবীতে আমার একদম ভাল লাগছে না।
এসো আমার সঙ্গে।
পর্দাটা ভাল করে টেনে দাও।
চাংনাসি মংরো টানাকাবি হুঁং...চাংনাসি মংরো টানাকাবি হুঁং

দিন তিনেক পর-
একিরে বাবা! দিনের পর দিন একটা লোক ঘরের ভিতর করছেটা কি?
এই যে মশাই শুনছেন? বলি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন? দরজাটা দয়া করে খুলুন!
নাঃ কোন সাড়া শব্দ নেই! কি জানি কি অঘটন ঘটালো! পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল।
আরে একি! লোক গেল কোথায়? ঘর তো ফাঁকা!
!?
ভিতর থেকে সব বন্ধ, অথচ...!
তিন দিন আগেও ভদ্রলোককে নিজের চোখে দেখেছি! এখন দেখুন দেখি কি কাণ্ড!
হুম্!
আশ্চর্য কাণ্ড! কিছু অদ্ভুত লোক আছে—যারা কোথা থেকে আসে কোথায় যায় কেউ জানতেও পারে না!
শেষ

অগ্নিকা-তীর্থ জ্বালামুখী

শতদল ভট্টাচার্য

সম্রাট আকবর বললেন—ও সব হিন্দুদের বুজরুকি। যদি সত্যি ওদের দেবী-মাহাত্ম্য ওখানে থাকে তাহলে কুণ্ডের মধ্যে জল ঢেলে দিলেও আগুন জ্বলবে। যাও, জল ঢেলে কুণ্ড ভরিয়ে দাও। ব্যাপারটা আমি দেখতে চাই।

ছুটল একদল মোগল ভৃত্য। পাহাড়ের কোলে গহ্বরে আগুনের শিখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলছে। ওরা গিয়ে পাশের কুণ্ড থেকে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে ভরিয়ে ফেলল সেই অগ্নিময় কুণ্ড।

এবার ?

ওরা গোল গোল চোখে তাকিয়ে দেখল, যেই মাটি জল শুষে নিল অমনি যথারীতি আগের মতোই শিখা জ্বলতে লাগল।

দেবীমাহাত্ম্যকে সেদিন সম্রাট স্বীকার করে নিয়ে অপরাধ খণ্ডনের জন্যে একটি বহুমূল্য ছাতা দেবীকে দিয়েছিলেন। শুনেছিলাম ছাতাটি নাকি সোনার। ছাতাটি দেখে অবশ্য বুঝতে পারলাম না সোনার কিনা, তবে বহুমূল্যের এটুকু আন্দাজ করা যায়।

আমি এসেছি জ্বালামুখী মন্দিরে। পাঠানকোট থেকে ছোটরেলে জ্বালামুখী রোড স্টেশন যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে মন্দির প্রায় ২১ কিলোমিটার। তার থেকে বাসে যাওয়া ভাল। হিমাচল প্রদেশের বড় শহর ধরমশালা। সেখান থেকে নিয়মিত বাস যায় জ্বালামুখী গ্রামে, দূরত্ব ৫৩ কিলোমিটার। প্রায় মন্দিরের কাছেই বাস যায়। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু এগিয়েই সামনে একটা চড়াই। সেই চড়াই দুপাশে দোকান হাট রেখে গিয়ে মিশেছে যে পাহাড়ের নিচে তার নাম কালীধর – পাহাড়ের কোলে শ্বেত শুভ্র নাতিবৃহৎ মন্দির। লম্বা লম্বা একসার সিঁড়ি ভেঙে উঠে মন্দিরে বিরাট ফটক। ফটক পার হলে সামনে প্রশস্ত সুন্দর প্রাঙ্গণ, নাট-মন্দির, একটা বকুলগাছ, মন্দির অফিস, আর দেবীর বাহন একটি চিতাবাঘের মূর্তি আছে। প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মূল মন্দির। মন্দিরের উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে দেখতে হয়, ঠিক পেছনেই পাহাড় উঠে গেছে। তাতে সৌন্দর্য আরও বেড়েছে।

জ্বালামুখী মন্দির ৫১ পীঠের একটি। পীঠস্থান কাকে বলে ? এক একটি পূণ্যস্থানের বিশেষ পরিচিতি আছে বলাই বাহুল্য। যেমন যোগপীঠ বলতে বোঝায় ভগবানের আবির্ভাব স্থান। তেমনি পীঠস্থান বলতে বোঝায় যেখানে সতীর দেহখণ্ড পড়েছিল। দক্ষযজ্ঞ ঘটনার থেকেই পীঠস্থানের উৎপত্তি। রাজা দক্ষ হলেন মহাদেবের স্ত্রী সতীর বাবা। তিনি যজ্ঞ করবেন ! সকলকে নেমন্তন্ন

করেছেন। কিন্তু জামাই মহাদেবকে তিনি কোনো খবরই দেননি। মহাদেব ছাইভস্ম মেখে গায়ে সাপ জড়িয়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান, ভূতপ্রেত সব সঙ্গীসাথী। গাঁজা ভাঙের নেশায় ভরপুর, কাজেই এমন জামাইকে লোক সমাজে কাজকর্মের ভেতর আনা যায় না। কিন্তু সতী বললেন, তাতে কী হয়েছে? বাপের বাড়ি তো! নেমন্তন্ন না থাকলেও বাবার কাছে যেতে দোষ কি? মহাদেব শিউরে উঠে বললেন, যেও না, যেও না সতী, আমি দিব্যচোখে দেখছি গেলে ফল ভাল হবে না। সতী শুনলেন না শিবের কথা। অনাহূত সতী বাপের বাড়ি হাজির হতেই দক্ষ রেগে আগুন, তুই এলি কেন? তোকে নেমন্তন্ন করিনি। সতী বললেন, তাতে কী হয়েছে বাবা? দক্ষ তেমনি বলতে লাগলেন, না, তুই এসেছিস মানে এবার শিব আসবে।

এই বলে তিনি দেবতা, মুনি ঋষি ও সতীর অন্যান্য পনেরো জন বোনের সামনে শিবের নিন্দা করতে লাগলেন। সেই নিন্দা সতী সহ্য করতে পারলেন না। পতির নিন্দায় সতী দেহত্যাগ করলেন। মহাদেব তাই শুনে দারুণ রেগে হাজির হলেন দক্ষের যজ্ঞস্থলে। শিবের রোষে তাঁর জটা থেকে জন্ম নিল মহাবলশালী বীরভদ্র। সে দিল যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে। চারদিকে লোকদের মারধোর করতে লাগল। যে যেখানে পারে পালাতে লাগল। হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। যজ্ঞের পুরুত ছিলেন ভৃগু ঋষি। তাঁকে ধরে বীরভদ্র দাড়ি টেনে ছিঁড়ে দিল। ছেঁড়া দাড়ি নিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ভৃগু পালালেন। এদিকে শিব তো রাগে উদ্দাম নৃত্য করছিলেনই, এবার ত্রিশূল দিয়ে দক্ষরাজার গলা কেটে ফেললেন। তখন সতীর মা প্রসূতি জামাইয়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন, এ কি করলে তুমি বাবা, আমি যে বিধবা হয়ে গেলাম। শাশুড়ীর দুঃখে কাতর হয়ে শিব দক্ষের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। তবে যে মুখে দক্ষ শিবনিন্দা করেছিলেন সে মুখ রইল না, তার বদলে ছাগলের মুণ্ডু বসিয়ে দিলেন। প্রসূতি সধবা রইলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে এ গল্প আছে।

এবার সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিব প্রলয় নাচ

জ্বালামুখী মন্দিরের কুণ্ড

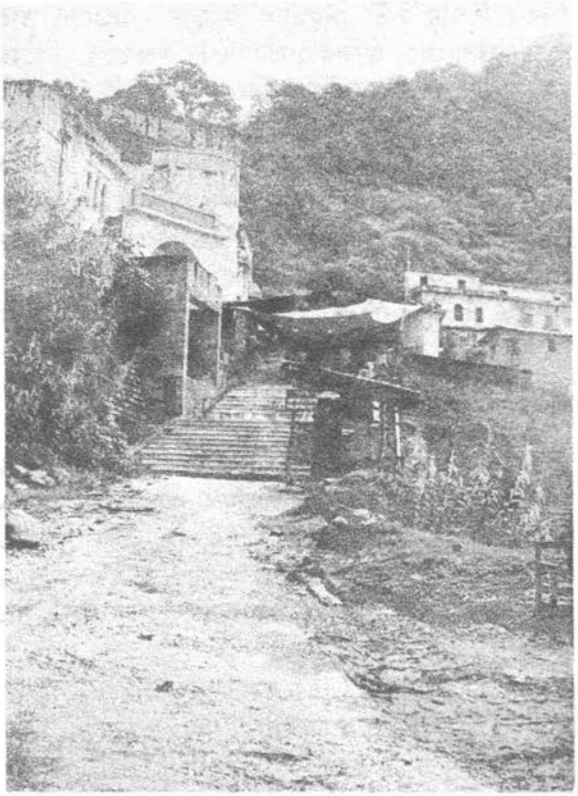

জ্বালামুখী মন্দিরের প্রবেশ পথ

নাচতে শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গনলেন। শিবের কাঁধ থেকে মৃতদেহ সরাতে না পারলে দুনিয়া রসাতলে যাবে। কাজেই শিবের অজ্ঞাতে বিষ্ণু করলেন কি, সুদর্শনচক্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে সতীর দেহ কেটে ফেললেন। কাঁধে সতীর দেহ নেই দেখে শিব শান্ত হলেন। আর সেই দেহখণ্ডগুলি ৫১ ভাগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যেখানে যেখানে পড়ল সেখানে হলো পীঠস্থান। জ্বালামুখীতে সতীর জিব পড়েছিল। সেই রসনার স্বাক্ষরই হলো কুণ্ডের এই অনির্বাণ অগ্নিশিখা। এই কুণ্ডকে ঘিরেই মন্দির গড়ে উঠেছে। মন্দিরে দেবীর কোনো বিগ্রহ নেই। লেলিহান শিখাকেই দেবীর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। দেবীর রসনা এখানে পড়েছিল বলে দণ্ডে দণ্ডে ভোগ দিয়ে পুজোর বিধি আছে।

কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে পুণ্যার্থীরা কুণ্ডের মধ্যে নেমে অগ্নিশিখা স্পর্শ করছে। লাল কাপড় পরা লাল উত্তরীয় গায়ে দুজন পুরুত কুণ্ডের পাশে বসে আছেন। আমায় বললেন, তুম ভী যাও।

আমিও কুণ্ডে নেমে সেই শৈলগাত্রের পবিত্র অগ্নিশিখা স্পর্শ করলাম। আশ্চর্য। জ্বলন্ত শিখাতে হাত দিলে যতখানি জ্বালা অনুভূত হয় ও তো সেরকম লাগল না! আগুনের দাহিকাশক্তি কই? শিখায় আমার আঙুল এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশমাত্র ছিল। তবুও আমি হলফ করে বলতে পারি সে শিখায় আর একটুখানি আমার আঙুল থাকলেও বিশেষ জ্বালা করত না। এ আগুন পোড়ায় না। এ কি দেবীমাহাত্ম্যর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাত্রীদের জন্যে? আমি অভিভূত হলাম।

বৈজ্ঞানিকরা এ আগুনের ব্যাখ্যা দেন অন্য রকম। তাঁরা বলেন পাহাড়ের মধ্যে সঞ্চিত পেট্রোল গন্ধক ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ আছে, তা থেকে শিলার ফাটল দিয়ে স্বাভাবিক গ্যাস বেরিয়ে এই আগুনের কারণ হয়েছে। পেট্রোল খুঁজতে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে পাহাড়ের গায়ে ড্রিলিং করা শুরু হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন শিলায় ড্রিল বিট আটকে যেতে থাকলে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। কি জানি, এ ব্যাপারও দেবীমাহাত্ম্য কিনা!

দেবতাস্থানে দেব থাকলে দেবী থাকবেন, দেবী থাকলে দেব থাকবেন। কাশীতে বিশ্বনাথ আছেন বলে অন্নপূর্ণা আছেন। কালীঘাটে কালী আছেন বলে তাঁর ভৈরব শিবও আছেন। বৈকুণ্ঠ থেকে স্বয়ং নারায়ণ যখন পুরীতে জগন্নাথ হয়ে আর্বিভূত হলেন লক্ষ্মী হয়ে এলেন তাঁর ভৈরবী বিমলা মা। জ্বালামুখীতে দেবীর অবস্থান অম্বিকা নামে এবং শিব বা ভৈরবের নাম উন্মত্ত। কুণ্ডের সামনে বসে জোড় হাতে একজন পুণ্যার্থী অম্বিকাপীঠের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চলেছে:

জ্বালামুখী জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব,
দেবীর অম্বিকা নাম, উন্মত্ত ভৈরব।

মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসার সময়ে পুরুত বললেন, এপ্রিল মাসে এখানে নবরাত্রির বিরাট মেলা বসে। একবার দেখতে আসবেন কিন্তু।

ফটো : লেখক

ছোটদের উপযোগী বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
- ট্রুনটুনির গল্প [৩.০০]

সুকুমার রায়
- খাগড়াই [৩.৫০]

সুখলতা রাও
- ঈশপের গল্প [৩.৫০]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- হাসিখুসি ১ [৩.৫০]
- হাসিখুসি ২ [৩.৫০]
- হাসিরাশি [৪.৫০]
- আষাঢ়ে স্বপ্ন [৩.০০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- কুমির সাহেব [৩.০০]

লীলা মজুমদার
- জানোয়ার [৪.০০]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- ছেলেবেলার বিবেকানন্দ [৪.০০]
- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে [৫.০০]
- ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ [৫.৫০]
- ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত [৫.৫০]

সুনির্মল বসু
- আমার ছড়া [৪.০০]

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
- ছোটদের সারদাদেবী [৬.৫০]

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
- ছবিতে হিতোপদেশ [৩.০০]
- ছবিতে রামায়ণ [৫.০০]
- ছবিতে মহাভারত [৫.৫০]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
- আমরা বাঙালী [৪.০০]
- আমাদের দেশবন্ধু [২.২৫]

মনোমোহন চক্রবর্তী
- ছবিতে পৃথিবী ১ [৪.০০]
- ছবিতে পৃথিবী ২ [৪.০০]

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
- মজার ছড়া [৫.০০]

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
- মজার কবিতা [৫.০০]

শৈল চক্রবর্তী
- ছড়ার দেশে টুলটুলি [৬.০০]

গৌরী ধর্মপাল
- চোদ্দ পিদিম [৬.০০]

মীরা বালসুব্রমনিয়ন
- তিনটে তামার পয়সা [৭.০০]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু
- ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন [৫.৫০]

আমার শৈশব
জন্ম থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত ছবি ও বৃত্তান্ত লেখার বই
[সাধারণ ২৫.০০ ।। শোভন ৪০.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড- কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সর্প-দেবীর গুহা

অনিল ভৌমিক

ভ্যাঙ্কুয়ার দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের বন্দর ভিক্টোরিয়া। সেই বন্দর-শহরে তখন রাত গভীরের দিকে। রাস্তার ধারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটা রেস্তোরাঁ তখনও খোলা আছে। রেস্তোরাঁয় লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। অন্ধকারে বাড়ির ছাদের মাথায় নানারঙের নিয়ন আলো জ্বলছে। কিছু নিয়ন আলো জ্বলছে নিভছে। কত জিনিসের প্রচার করছে এসব–সাবান, চা, কোকো, সিগারেট। নিয়নের আলোর নানা রঙ পড়ছে রাস্তায় বাড়ির দেয়ালে, পথচলতি লোকজনদের গায়েও ছড়াচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের এই আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছিল পিটার। সমুদ্রের ধারে প্রিন্স রুপার্ট হোটেলে তার আস্তানা। আজ রাতে আর হোটেলে খাবে না। এক বিলাসবহুল হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে। এখন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বড় কাপের এক কাপ কফি খাবে। তারপর নিজের হোটেলে ফিরে যাবে।

মোড়ের কাছাকাছি এসে একটা রেস্তোরাঁ পেল। তখনও খোলা। লোকজনেরও ভিড় কম। রেস্তোরাঁয় ঢুকে পিটার দেখল যে এখানে ওখানে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। কোণার দিকে একটা টেবিলে দেখল একজন মাত্র লোক বসে আছে। পিটার সেই বেঞ্চটার সামনে লোকটার পাশে বসল। বেয়ারা আসতে এক কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর পা ছড়িয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। আড়চোখে একবার পাশের লোকটাকে দেখল। রোগা চেহারা লোকটার। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের শার্ট ট্রাউজার নোংরা কোঁচকানো। কতদিন কাচা হয় নি মা মেরীই জানে। গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে লোকটা। একটা জিনিস লক্ষ্য করল পিটার। কেমন ভীতমুখে মাঝে মাঝে লোকটা দোকানের দরজার দিকে তাকাচ্ছে। দোকানে যে ঢুকছে তাকেই চোখ পিটপিট করে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার গোগ্রাসে খাবার গিলছে। যেন কতদিন খায় নি।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। পিটার ধীরে সুস্থে চুমুক দিতে লাগল কফির কাপে।

হঠাৎ পাশের লোকটা উঠে দাঁড়াল। ওর চোখে মুখে আতংক। পিটার দেখল দোকানের দরজা দিয়ে একটা লোক ঢুকে চারদিকে তাকাচ্ছে। তার ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। লোকটার ভারি চোয়াল। চোখ দুটো ছোট ছোট। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীব্র। মুখে সরু গোঁফ। মাথার চুল বড় বড়। পাট করে আঁচড়ানো। ষণ্ডা মতো চেহারা লোকটার। পিটারের পাশে বসা রোগাটে চেহারার লোকটা তখন বসে পড়ে টেবিলের তলায় লুকোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারল না। ষণ্ডা মতো লোকটা ততক্ষণে ওকে দেখে ফেলেছে। এক লাফে এগিয়ে এসে লোকটা দ্রুতহাতে প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করল। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গপ্ করে একটা শব্দ হলো। গুলি ছুটল। গুলি লাগল রোগা লোকটার বাঁ কাঁধে। লোকটা টেবিলের নিচে গড়িয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। পিটার কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু ষণ্ডামত লোকটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখেই পিটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লোকটাকে ঠেকাতে হবে। ষণ্ডামত লোকটা তখন টেবিলের সামনে। পিটার মুহূর্তে দু পা টেবিলের কোণায় ঠেকিয়ে লাথি মারল। টেবিলটা উল্টে গেল। ষণ্ডামত লোকটা টাল সামলাতে না পেরে ওলটানো টেবিলের ধাক্কায় মেঝেয় পড়ে গেল। পিটার একলাফে পিস্তলসুদ্ধু লোকটার হাতটা পায়ের বুট দিয়ে চেপে ধরল। লোকটার চোখ মুখ ব্যথায় বিকৃত হলো। কিন্তু সে পিস্তল ছাড়ল না। পিটার পায়ের চাপ বাড়াল। লোকটা পিস্তল ছেড়ে দিল। পিটার বাঁ পা দিয়ে পিস্তলটা চেপে রাখল। ডান পা লোকটার হাত থেকে তুলে নিল। লোকটা বাঁ হাতে ডান হাতটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। পিটার এই সুযোগটাই চাইছিল। লোকটা কিছু বোঝার আগেই পিটার ওর থুতনি লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালাল। লোকটা ঔঁক করে শব্দ তুলল মুখে, তারপর গোড়াকাটা গাছের মত চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। আর নড়ল না।

পিটার দ্রুতহাতে পিস্তলটা তুলে নিল মেঝে থেকে। তারপর উল্টে-পড়া টেবিলের নিচে থেকে আহত রোগা লোকটাকে টেনে তুলল। লোকটা তখন জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। পিটার বলল, ডান হাতটা দিয়ে আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরো। লোকটা তাই করল। পিটার ওকে জড়িয়ে ধরে যত দ্রুত সম্ভব দরজার দিকে ছুটল।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস পিটারের চোখে মুখে লাগল। ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামাল। দরজা খুলে রোগা লোকটাকে ঠেলে সিটে বসিয়ে দিল। তারপর নিজে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, হাসপাতাল চলুন। জলদি।

ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একটু পরে রাস্তায় একটা বাঁক নিতেই পিটারের মাথায় হঠাৎ চিন্তা এল—গুলিতে আহত লোকটা। সরকারী হাসপাতালে গেলে অনেক জেরার মুখে পড়তে হবে। থানা পুলিশের ঝামেলায়ও পড়তে হতে পারে। ও ড্রাইভারকে বলল, ড্রাইভার—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। ড্রাইভার রাস্তার দিকে চোখ রেখে মুখ না ফিরিয়ে বলল।

—আপনার জানাশোনা কোনো নার্সিং হোমটোম আছে?

—ঐ তো ঐ পেট্রল পাম্পটার পেছনেই আছে—কী নাম যেন নার্সিং ক্লিনিকটার।

—নামে দরকার নেই। সোজা ওখানে চলুন। জলদি।

রোগা লোকটা কঁকিয়ে উঠল। পিটার দেখল লোকটার বাঁ কাঁধের দিকে জামাটা রক্তে ভিজে গেছে। তখনও রক্ত পড়া বন্ধ হয় নি। পিটার পকেট থেকে রুমাল বের করে গুলিতে ক্ষত জায়গাটায় চেপে ধরল।

ক্লিনিকের সামনে এসে গাড়িটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে থামল। পিটার ট্যাক্সির ভাড়া মেটাল। তারপর গুলিতে আহত লোকটাকে ট্যাক্সি থেকে বের করে কাঁধে ধরে ধরে ক্লিনিকের সিঁড়ির দিকে এগোল। লোকটা তখন গোঙাতে শুরু করেছে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে ক্লিনিকের দুজন পুরুষ নার্স ছুটে এল। তাদের হাতে ছিল একটা ভাঁজ করা স্ট্রেচার। ওরা আহত লোকটাকে স্ট্রেচারটা খুলে পেতে তাতে শুইয়ে দিল। তারপর ক্লিনিকের ভেতরে নিয়ে গেল।

এতক্ষণে পিটার স্বস্তি পেল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গেল। এখন তার নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হলো।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে ক্লিনিকের অফিসে ঢুকল। একটা লম্বাটে বড় খাতা সামনে নিয়ে একজন বয়স্কা নার্স বসে আছে। পিটার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, একজন আহত লোককে আমি নিয়ে এসেছি।

–জানি। তাকে আট নম্বর বেড-এ রাখা হয়েছে। এবার রোগীর নাম ঠিকানা, আপনার নাম ঠিকানা দিন।

পিটার নিজের আর হোটেলের নাম ঠিকানা দিল।

–রোগীর নাম ঠিকানা? নার্সটি বলল।

–জানি না।

নার্সটি পিটারের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। বলল, কিন্তু এটা তো লিখতে হবে ভর্তির খাতায়।

–আহত লোকটি তো এখনও অজ্ঞান হয়ে যায় নি। ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

–বেশ। নার্সটি টেলিফোন তুলে নিল। কার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। একটুক্ষণ ফোন ধরে রইল। তারপর ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে।

–কী নাম লোকটার? পিটার জানতে চাইল।

–হাজুকা–হাইডা উপজাতির লোক। দেশ-গ্রাম ছেড়ে এখন এই ভিক্টোরিয়া শহরেই থাকে। ডক-এ কাজ করে।

–হাইডা উপজাতি কারা? পিটার জানতে চাইল।

নার্সটি মৃদু হাসল। বলল, আপনি বোধহয় নতুন এসেছেন

–হ্যাঁ–বেড়াতে এসেছি।

–হাইডা উপজাতি হলো রেড ইন্ডিয়ানদের একটা শাখা। এখান থেকে উত্তরে প্রায় সত্তর আশি মাইল দূরে হাইডারা থাকে। ওদের বড় বসতি হলো লিলুয়েট উপত্যকায়।

ওরা কথা বলছে তখনই একজন নার্স দ্রুতপায়ে এল। বয়স্কা নার্সটিকে বলল, আট নম্বর বেড-এর রোগীর সঙ্গে কে এসেছেন? পিটার দু'পা এগিয়ে বলল, আমি।

–আপনাকে ডঃ নিকলসন ডাকছেন।

–চলুন। পিটার নার্সের পিছু পিছু চলল। চারদিক নিস্তব্ধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব সুন্দর বন্দোবস্ত। একটা ঘরে ঢুকল নার্সটি। পিটারও ঢুকল। সারি সারি সাদা ধপ্‌ধপে বিছানা বালিশ পাতা কয়েকটা বেড। আট নম্বর বেড-এর কাছে একজন এ্যাপ্রন পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। দুজন নার্সও দাঁড়ানো সেখানে। পিটার দেখল হাজুকা চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। এর মধ্যেই ওকে হাসপাতালের নীল ডোরাকাটা পায়জামা ঢোলা শার্ট পরানো হয়েছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে নার্সটি মৃদুস্বরে বলল,

পিটার থুত্‌নি লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালাল।

ডঃ নিকলসন। পিটার একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ডঃ নিকলসনের সামনে দাঁড়াল।

–আপনিই এই আহত লোকটিকে এনেছেন?

–হ্যাঁ। পিটার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

–একটা পিস্তলের গুলি ওর কাঁধ থেকে বের করা হয়েছে।

–ও।

–গুলিটা পুলিশের পিস্তলের গুলি নয়। কাজেই গুরুত্ব দিচ্ছি না খুব। তবু সমস্ত ব্যাপারটা জানা দরকার। প্রয়োজনে আমরা পুলিশকে ডাকবো। আপনি কি ওর পরিচিত? বন্ধু?

পিটার মাথা নাড়ল। তারপর সমস্ত ঘটনাটা আস্তে আস্তে বলে গেল। ডঃ নিকলসন মাথা নিচু করে সমস্ত ঘটনাটা শুনলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন?

পিটার ওর হোটেলের নাম বলল। তারপর বলল, আমি শিকাগো থেকে এখানে এসেছি। বেড়াতে।

ডঃ নিকলসন দুহাতের তালু ঘষে নিয়ে বললেন, আপনি একজন নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কাজেই আপনাকে কোনো ঝামেলায় ফেলা উচিত হবে না। অবশ্য আপনার নাম ঠিকানা তো আমাদের কাছে রইলই।

পিটার একবার হাজুকার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, ও এখন কেমন আছে?

–প্রাণের ভয় নেই। সপ্তাহ দুয়েক এখানে থাকতে হবে। ভালো হয়ে যাবে। তবে বাঁ হাতটায় আর আগের মতো জোর পাবে না।

–আমি ওকে কখন দেখতে আসতে পারি।

–যে কোনো সময়। অফিস থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড করিয়ে নেবেন।

–ধন্যবাদ। পিটার হাত বাড়াল। ডঃ নিকলসন হেসে করমর্দন করলেন।

ক্লিনিকের অফিস ঘরে এল পিটার। হাজুকার চিকিৎসায় খরচ অগ্রিম কিছু–সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ডলার জমা দিল। ভিজিটিং কার্ড নিল।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল পিটার। দেখল পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। বাইরের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। কয়েক পা হাঁটতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেল। হোটেলে ফিরে এল যখন তখন হোটেলের বাগানের গাছে গাছে পাখি ডাকতে শুরু করেছে।

ঘরে ঢুকে পিটার জামা প্যান্ট না খুলেই শুয়ে পড়ল। শুধু জুতো জোড়া খুলে রাখল। মাথার কাছে রাখা ফোনটা তুলে নিল। লাইনের ওপার থেকে রিসেপশনিস্ট-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলুন।

–আমাকে কেউ যেন না ডাকে। প্রয়োজনে আমিই ডাকবো।

–আপনি যেমনটি চান। রিসেপশনিস্ট বলল।

পিটার হোটেলের মোটা কম্বলটা থুতনি অব্দি টেনে দিল। ঘুম আসছে না। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছে। হাজুকাকে নিয়ে ও এখন কী করবে। ক্লিনিকে অর্থ যা জমা দিয়েছে তাতে এক সপ্তাহ হাজুকাকে রাখতে ওরা আপত্তি করবে না। কিন্তু আরো বেশিদিন যদি হাজুকাকে থাকতে হয়, আরো খরচ তাহলে। না দিতে পারলে ক্লিনিকের লোকেরা অসুস্থ লোকটাকে হয়তো রাস্তায় নামিয়ে দেবে। ওটা তো সরকারী হাসপাতাল না। পিটার একবার ভাবল আমার কী দরকার এসব ঝামেলায় জড়ানোর। ওরা যা করার করুক। আমি আর ক্লিনিকে যাবো না। এসব ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন পিটারের ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশ খেল।

একটু বেলার দিকে গরম জলে খুব ভালো করে স্নান করল। পেটপুরে দুপুরের খাওয়া খেল। তারপর মোটা কম্বলে মাথামুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যের কিছু আগে। বিছানা থেকে নেমে দু হাত ওপরে তুলে আড়মুড়ি ভাঙল। অনেক ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। সসেজ দিয়ে গোল রুটি খেল। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে পোশাক পরে নিল। ক্লিনিকে আর যাবে না, এটাই সকাল পর্যন্ত ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ওর মন পাল্টাল। একবার অন্তত হাজুকাকে দেখতে যাওয়া উচিত। এখন কেমন আছে সেটাও জানা উচিত। হোটেল থেকে রাস্তায় যখন নামল তখন রাস্তার ধারে, দুপাশের বাড়িঘর, দোকানে আলো জ্বলছে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পিটার ক্লিনিকের দিকে চলল।

ক্লিনিকের সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছে তখনই নজরে পড়ল ক্লিনিকের নামটা। কজি ক্লিনিক। নামটা বেশ।

ভিজিটার্স কার্ড দেখিয়ে পিটার আট নম্বর বেড-এর কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল হাজুকা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। পিটার আস্তে আস্তে ডাকল, হাজুকা। প্রথম ডাক বোধহয় ওর কানে গেল না। আর একবার ডাকতেই হাজুকা চোখ মেলে তাকাল। একটু লালচে হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও পিটারকে চিনল। হাসল একটু। পিটার টুল টেনে ওর বিছানার পাশে বসল। বলল, এখন কেমন আছো?

হাজুকা আস্তে আস্তে মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল, ভালো।

–ওষুধ খাওয়া দাওয়া সব ঠিকমত দিচ্ছে তো?

–হ্যাঁ। হাজুকা কম্বলের তলা থেকে ডান হাতটা বের করল।

পিটার ওর হাতে হাত রেখে চাপ দিল। হাজুকার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ও ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ ভাই। তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

–ওসব কথা থাক। পিটার হেসে বলল। তারপর বলল,

আচ্ছা কী ব্যাপার বলো তো? ঐ লোকটা কে?

–ওর নাম আর্থার।

–তোমাকে মারতে চেয়েছিল কেন?

–সে অনেক কথা। তোমাকে সব কথা বলবো। তার আগে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি–আর্থার যেন তোমার হদিস না পায়। আর্থার একটা পয়লা নম্বরের খুনে। ওর কাছে একটা মাছি মারা আর মানুষ হত্যা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

–ও কে?

–ও আসলে আমাদের হাইডা উপজাতির লোক। কিন্তু অনেকদিন আগে ও আমাদের দেশ-গাঁ ছেড়ে এই ভিক্টোরিয়ায় চলে এসেছে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এখানকার গুণ্ডাদলের সংগে মিশে কয়েকবার জেলও খেটেছে।

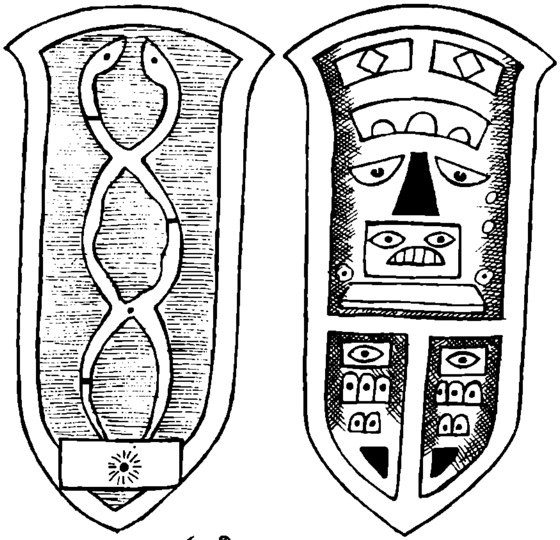

সর্পদেবীর তামার ফলক।

–তোমার সংগে শত্রুতা কীসের? পিটার জানতে চাইল।

–কারণ এই তামার ফলকটা। এই কথা বলে হাজুকা ডান হাতের জামার আস্তিনটা ওপরের দিকে গোটাল।

পিটার দেখল ওর বাহুতে বাঁধা একটা তামার ফলক। পিটার কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, এটা কী?

–এটা সর্পদেবীর বাহুতে বাঁধা থাকত, তার অলংকার এটা। আমাদের অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। একটু থেমে বলল, হাত থেকে খুলে নিয়ে দেখ।

পিটার রূপোর সরু শেকলে বাঁধা তামার ফলকটা ওর বাহু থেকে খুলে নিল। দেখল প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চাকতি মত। বিচিত্র সব কারুকাজ তাতে। ফলকটা ঘুরিয়ে অন্য পিঠটা দেখল। দুটো সাপ যেন জড়িয়ে আছে এরকম একটা অদ্ভুত নক্সা খোদাই করা। পিটার তামার ফলকটার এপিঠ ওপিঠ বারকয়েক দেখল। তারপর হাজুকাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, এটা তোমার কী কাজে লাগবে যীশুই জানে।

হাজুকা ম্লান হাসল, এটায় খোদাই করা নক্সাগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে সর্পদেবীর গুহার নির্দেশ আছে এর মধ্যে।

–সর্পদেবীর গুহা? পিটার বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

–সে সব পরে তোমাকে বলবো। এখন বড় দুর্বল লাগছে। কথা বলতে পারছি না। হাজুকা বলল।

পিটার উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম কর।

একটু পরেই পিটার ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়? সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তাটা দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। গতকাল রাতের সেই রেস্তোরাঁটার কথা মনে পড়ল। খুব ভালো কফি করে ওরা। ওখানেই যাওয়া যাক্। এক কাপ কফি খেয়ে হোটেলে ফেরা যাবেখন।

রেস্তোরাঁটায় গিয়ে যখন পৌঁছল তখনও বেশি রাত হয় নি। বেশ ভিড় রেস্তোরাঁটায়। ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। চেয়ার খালি নেই। কপাল ভালো বলতে হবে। তখনই ওর সামনে একজন চেয়ার ছেড়ে উঠল।

পিটার দ্রুত ছুটে গিয়ে চেয়ারটায় বসে পড়ল। লক্ষ্য করল না যে এক কোণায় বসে আছে আর্থার। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লক্ষ্য রাখছে কী করছে পিটার।

কফি খেয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে এল পিটার। পকেট থেকে লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটা ধরল। বেশি রাত হয় নি। তাছাড়া হাঁটতেও ভাল লাগছে।

হোটেলে ঢুকে ঘরের চাবিটা নিল। ঘরে এসে বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিল। কেমন গুমোট যেন ঘরটায়। বাইরে সমুদ্রের জোর হাওয়া ঘরে ঢুকল। গুমোট ভাবটা কেটে গেল।

গায়ের জামাটা খুলছে তখনই জানালার শার্শিটায় একটা জোরালো শব্দ শুনে পিটার ঘুরে দাঁড়াল। দেখল আর্থার খোলা জানালা থেকে লাফিয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর দাঁড়াল। আর্থার কালো ছোপধরা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। আর্থারের হাতে পিস্তল নেই। তবে কোমরে ছোরাটোরা থাকা অসম্ভব নয়। পিটার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জামাটা খুলতে খুলতে বলল, কী ব্যাপার চাঁদু, একেবারে হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছো?

–রেস্তোরাঁ থেকে তোমার পিছু নিয়েছি। আর্থার শান্তস্বরে বলল।

–তাই নাকি? পিটার অবাক হওয়ার ভংগি করল, আশ্চর্য! আমি বুঝতেই পারি নি।

–বাজে কথা ছাড়ো। হাজুকাকে কোথায় রেখেছো?

–হাজুকা? পিটার অবাক হবার ভান করল, কে হাজুকা?

–কাল রাতে আমি যাকে গুলি করেছিলাম।

–ও সেই আহত লোকটা?

–হ্যাঁ, কোথায় সে?

–হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা কেটে পড়েছি।

–কোন হাসপাতালে?

–সরকারী হাসপাতালে।

–এখানে দুটো সরকারী হাসপাতাল আছে। কোনটাতে?

–সে আমি বলতে পারবো না। ট্যাক্সি ড্রাইভার সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

–হুঁ। হাজুকা সম্বন্ধে আর কিছু জানো না?

–বিন্দুবিসর্গও না।।

–বেশ–আর্থার মাথা ঝাঁকাল, তোমার কথা সত্যি বলে মেনে নিলাম। যদি আমাকে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা কর–তাহলে–

–বুঝেছি–পিটার ঘাড় কাত করে বলল, তারপর যেন কিছুই জানে না এমনি ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু ঐ আধবুড়ো লোকটার ওপর তোমার এত রাগ কেন বাপু।

আর্থার আবার ছোপধরা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। বলল, পাঁচ-ছ লক্ষ ডলার কখনো চোখে দেখেছো?

–না। পিটার ঠোঁট ওলটাল।

–তুমি তো এখানে নতুন এসেছো। লিলুয়েট উপত্যকায় আছে সর্পদেবীর গুহা। সেখানে আছে ছ'সাত হাত লম্বা একটা সাপের মূর্তি। নিরেট সোনায় তৈরি। চোখ দুটো চুনিপাথরের। সারা গায়ে হীরে মুক্তোর টুকরো বসানো। ওটা চুরি করতে পারলে খুব কম করে ছ'লক্ষ ডলার তোমার পকেটে। বুঝেছো খোকা?

পিটার মাথা নেড়ে বলল, খুব বুঝেছি।

–হাজুকা সেই গুহায় ঢোকার হদিস জানে। সবসময় ও হাতে একটা তামার চাকতি পরে থাকে। ওটাতেই আছে সর্পদেবীর গুহায় ঢোকার নক্সা।

–এতক্ষণে বুঝলাম। পিটার বিছানায় বসতে বসতে বলল,–ঐ নক্সাটা তোমার চাই–এই তো।

আর্থার আর কোনো কথা বলল না। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

পিটার মৃদু হাসল। আসলে পিটার নিজেও একটি দলের সংগে যুক্ত। শিকাগো শহরে ওর আস্তানা। এক ভালো দাঁও মেরে বেশ কিছু ডলার ও পেয়েছিল। তাই ভ্যানকুয়ার দ্বীপে বেড়াতে এসেছ। গুণ্ডার দলে ওর খুব কদর।

জামাকাপড় ছেড়ে ও নিচে নেমে রাতের খাবার খেয়ে এল। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল সর্পদেবীর গুহা আর সেখানকার ছ'লক্ষ ডলার দামের সাপের মূর্তির কথা। ও বুঝল ঐখানে ওকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। এরকম একটা দাঁও হাতছাড়া করা যায় না। হাজুকাকে হাতে রাখতে হবে। মূর্তি চুরি করতে গেলে ওর সাহায্য চাই। হাজুকাকে কথা বলাতে হবে। সব খবরাবখর নিতে হবে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পিটারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পরের দিন বিকেলের দিকে তৈরি হয়ে চলল ক্লিনিকে হাজুকাকে দেখতে।

পথে যেতে যেতে ও বুঝল একটা খয়েরী ওভারকোট পরা লোক ওকে অনুসরণ করছে। পিটার এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল। পেছনের লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। পিটার উঠে দাঁড়িয়েই দ্রুতপায়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। একছুটে দোকানের ভেতরটা পেরিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে একটা সরু গলিতে নামল। তারপরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে বাঁ হাতি আরো ছোট একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। সেটা দিয়ে ছুটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটল। ও পেছনে তাকিয়ে দেখল সেই খয়েরী ওভারকোট পরা লোকটা ঠিক তখনই বড় রাস্তায় এসে উঠেছে। চারিদিকে তাকাচ্ছে লোকটা। পিটার মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

হাজুকাকে আজকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। এটা ওটা জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে ও বলল, হাজুকা, সর্পদেবীর গুহার ব্যাপারটা আমাকে একটু বলো তো?

–সব বলবো তোমাকে। তার আগে বলো আর্থার তোমার খোঁজ পেয়েছে?

পিটার সত্যি কথাটা চেপে গেল। বলে উঠল, নাঃ।

–হুঁ, হাজুকা বলল, ও কিন্তু সহজে আমাদের ছাড়বে না।

–সে দেখা যাবে'খন। তুমি সব কথা খুলে বলো।

–বেশ। হাজুকা মাথার বালিশটা উঁচু করে আধশোয়া হলো। তারপর বলতে লাগল, লিলুয়েট উপত্যকার পাশেই একটা পাহাড় আছে। খুব বেশি উঁচু নয়। আসলে এটা একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এই পাহাড়ের একটা গুহার নাম সর্পদেবীর গুহা। প্রতি পূর্ণিমার রাতে এই গুহায় সর্পদেবী সবাইকে দর্শন দেয়। হাইডারা দলে দলে আসে। সর্পদেবীর উদ্দেশে ডলার সোনা রূপা যে যা পারে রেখে যায়। সর্পদেবীর পুজো করে যে প্রধান পুরোহিত তার নাম কারিবু। অসীম ক্ষমতা কারিবুর। সেই সর্পদেবীকে চালায়। কারবু যা বলে সব হাইডারা মাথায় পেতে মেনে নেয়। –হাজুকা থামল।

–হুঁ। আচ্ছা এই সর্পদেবী কে?

–একটি মেয়ে। এই ভ্যানকুয়ার দ্বীপের যেখানে যেখানে হাইডাদের বসতি আছে সেসব জায়গা থেকে খুঁজে পেতে একটি মেয়ে নিয়ে আসে কারিবু। অনেক লক্ষণ মিলিয়ে আনা হয়। পূর্ণিমার রাতে যার জন্ম হয়েছে, মাথার চুলের রঙ যার সোনালী, গায়ের রঙ কালো, চোখ নীলাভ, এমনি অনেক লক্ষণ মিলিয়ে তবে সেই মেয়েকে সর্পদেবী করা হয়।

–এই সর্পদেবীর গুহায় আর কী আছে? পিটার বলল।

–একটা সাপের মূর্তি আছে।

–খুব দামী?

–কয়েক লক্ষ ডলার।

না, আপনার চিকিৎসা প্রিন্স দ্বীপের ওকাই করবে।

–যে কেউ তো চুরি করতে পারে সেটা।

–অসম্ভব। সর্পদেবী যে বেদীতে এসে দাঁড়ায় তার পেছনে পাহাড়ের পাথুরে গায়ে ওটা আটকানো। বেদীর এপাশে গভীর খাদ। সেখানে গলিত লাভা গন্ধক ফুটছে। সেটা পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

–তাহলে সর্পদেবী সেই বেদীতে আসে কী করে?

–মনে হয় পেছনে কোনো সুড়ঙ্গপথ আছে যেখান দিয়ে সর্পদেবী আর কারিবু আসে। কিন্তু সে পথের হদিস কারিবু ছাড়া আর কেউ জানে না।

–আচ্ছা–তুমি ঐ তামার অলংকারটা পেলে কী করে? পিটার জানতে চাইল।

–সে অনেক কথা। আর একদিন তোমায় বলবো। হাজুকা শ্রান্তস্বরে বলল।

–না–আজকেই বলো। তোমার এখানে আমি কয়েকদিন পরে আসবো।

–কেন? আর্থার কি তোমার হদিস পেয়েছে?

–পেতে কতক্ষণ! ভিক্টোরিয়া তো শিকাগো শহরের মতো বড় নয়। আমাদের দুজনকেই সাবধান হতে হবে।

–তা ঠিক। হাজুকা বলল, তবে শোন। প্রায় বছরখানেক আগের কথা। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছে। দরজা খুলে দিতেই একটি হাইডা মেয়ে ঢুকল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি। দু এক পা এগিয়েই মেয়েটি মেঝেয় পড়ে গেল। তখনি বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় চিনলাম মেয়েটিকে। সেই লালচে চুল। নীলচে চোখ। সর্পদেবী। আমি তো ভয়ে কাঠ। এত রাত্রে সর্পদেবী আমার ঘরে। আমি তাড়াতাড়ি সর্পদেবীকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটা কম্বল ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। নিজে মেঝেয় একটা হেমলক গাছের বাকলে তৈরি চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষে রাত্রির দিকে ঝড়বৃষ্টি কমে গেল। হঠাৎ সর্পদেবী গোঙাতে শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে গেলাম। তখন সর্পদেবী সারা গা মোচড়াচ্ছে আর ছটফট করছে। আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে? সর্পদেবী গোঙাতে গোঙাতে বলল, পেটে অসহ্য

ব্যথা। আঁ–আঁ–

আমি বুঝলাম এই দ্বীপের মারাত্মক রোগটি সর্পদেবীকে ধরেছে। এই রোগটা হলো আমাশা। আমি এখানে কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলাম। সরকার থেকে আমাদের এসব সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু পড়া চালাতে পারি নি। বাবা অথর্ব হয়ে পড়ল। আমাকে তামার খনিতে মজুরের কাজ নিতে হলো। আধুনিক ওষুধপত্র আমি জানতাম। আমার ঘরেও ওষুধপত্র রাখতাম। অনেকেই আমার কাছে ওষুধের জন্যে আসত। মারাত্মক আমাশার ওষুধ আমার কাছে ছিল। দুটো বড়ি সর্পদেবীকে খাইয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে সর্পদেবীর ছটফটানি বন্ধ হলো। একসময় গোঙানিও থেমে গেল।

সকাল হলো। সর্পদেবীর ঘুম ভাঙল তখন। দেখলাম অনেকটা সুস্থ তখন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

কারিবু আমাকে প্রিন্স দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। এক খুব বড় ওঝা আছে ওখানে। তাকেই দেখাতে। দেখিয়ে ক্যানো নৌকো করে ফিরছি তখনই ঝড়জল শুরু হলো। কারিবুর নৌকো কোথায় ভেসে গেল। আমাদের নৌকো ডুবে গেল। আমি সাঁতরে কোনো রকমে তীরে এলাম। তারপর তোমার এখানে।

–এখন কেমন আছেন?

–ভালো। পেটের ব্যথাটা নেই বললেই চলে। আচ্ছা তুমিই আমাকে ওষুধ দাও না। তোমার ওষুধ খেয়ে অনেক উপকার হয়েছে আমার।

আমি বললাম, –কিন্তু কারিবু কি রাজী হবে?

–আমি বলবো।

–দেখুন বলে।

দুপুর নাগাদ পাঁচজন দেহরক্ষী নিয়ে কারিবু এসে হাজির। সর্পদেবীকে অনেকটা সুস্থ দেখে কারিবু খুব খুশি হলো। সর্পদেবী তখন কথাটা বলল। কারিবু মাথা নেড়ে বলল, না, আপনার চিকিৎসা প্রিন্স দ্বীপের ওঝাই করবে। সর্পদেবী বারবার বলল যে আমার ওষুধ খেয়ে ও সুস্থ হয়েছে, আমার ওষুধ খেলেই ওর অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু কারিবু রাজী হলো না। সিডার গাছের ডাল দিয়ে তৈরি মাচার মতো এনেছিল ওরা। তাতে সর্পদেবীকে বসিয়ে ওরা নিয়ে গেল। হাজুকা থামল।

পিটার বলল, তারপর কী হলো?

–কিছুদিন পরে কারিবু ওর দেহরক্ষী পাঠাল। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। হাজুকা বলতে লাগল, কারিবু ডেকে পাঠিয়েছে, না গিয়ে উপায় নেই। গেলাম দেহরক্ষীর সংগে। সর্পদেবীর বাসস্থান আমরা কেউ জানতাম না। কারিবু আর তার পাঁচজন দেহরক্ষী শুধু জানে সর্পদেবী কোথায় থাকে। ওরা আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সর্পদেবী কাঠের মাচায় শুয়ে আছে। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। কারিবু মাচার বিছানার পাশেই বসেছিল। আমি কারিবুকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারিবু বলল, দেখ, অনেক ভেবে দেখলাম সর্পদেবীকে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পারো। আজ থেকে তুমিই ওর চিকিৎসা করবে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্পদেবীকে সুস্থ করতে পারবো কি না জানি না।

–চেষ্টা করে দেখ–কারিবু বলল, সর্পদেবী নির্বাচন যে কী কঠিন কাজ সে তোমরা কিছু কিছু জানো। কাজেই যে করেই হোক এই সর্পদেবীকে বাঁচাতে হবে। কারিবু একটু থেমে বলল, আর একটা কথা। সর্পদেবী যে অসুস্থ একথা যেন কেউ না জানে। আর পনেরো দিন পরে পূর্ণিমা, সেদিন যেন সর্পদেবী দর্শন দিতে পারে। হাজুকা থামল।

–তারপর? পিটার বেশ আগ্রহের সংগে শুনতে লাগল।

–আমি চিকিৎসা শুরু করলাম। আমাদের কাছে আমাশা সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ। বেশির ভাগ হাইডা এই রোগে মারা যায়। যাহোক, ভিক্টোরিয়া থেকে ভালো ওষুধ কিনে নিয়ে গেলাম। আমাকে খরচ টরচ সব কারিবু দিত। দিন দশেকের মধ্যে সর্পদেবী অনেকটা সুস্থ হলো। পূর্ণিমার দিন গুহায় হাইডাদের দর্শনও দিল। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই সর্পদেবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরীক্ষা করেই বুঝলাম আর বাঁচবার আশা নেই। সারারাত প্রচন্ড ব্যথায় সর্পদেবী ছটফট করল। শেষ রাত্রির দিকে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ওর মধ্যেই দুর্বল স্বরে আমাকে বলল, গয়নার বাক্সটা নিয়ে এসো।

ওটা শিয়রের কাছে রাখা ছিল। আমি এনে দিলাম। বাক্স থেকে তামার এই অলংকারটা আমাকে দিয়ে বলল, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। কিন্তু আমি আর বাঁচবো না। তোমাকে এই পবিত্র অলংকারটা দিলাম। এটাতে একটা ধাঁধা আছে। যদি সমাধান করতে পারো তবে সর্পদেবীর বেদীতে তুমি যেতে পারবে। সোনালী সাপের মূর্তি তখন তোমার হাতের মুঠোয়। সেই মূর্তি বিক্রি করতে পারলে তোমার পরের তিন পুরুষ রাজার হালে জীবন কাটাতে পারবে।

আমি তাড়াতাড়ি তামার অলংকারটা কোমরে গুঁজে রাখলাম। ভোরের দিকে সর্পদেবী মারা গেল। হাজুকা থামল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। পিটারও একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, কারিবু কি আবার স্বর্পদেবী যোগাড় করেছে?

–হ্যাঁ। তবে তাকে আমি দেখি নি।

–আচ্ছা পূর্ণিমা কবে? পিটার জিজ্ঞেস করল।

হাজুকা জামার আস্তিন গোটাল। সেই তামার চাকতিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, দশ দিন পরে। তার মানে আজ সাত তারিখ, সামনের সতেরো তারিখ। এই অলংকারে মাসের হিসেব আছে।

আমি সেদিন সর্পদেবীর গুহায় যাবো। সব নিজের চোখে

দেখে তবে বুঝবো তোমার তামার চাকতিটার ধাঁধাটা কী।

—বেশ তো, চলো লিলুয়েট উপত্যকায় আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে যেতে হবে।

—কেন?

—নতুন সর্পদেবী যেদিন দর্শন দেবার কথা সেদিনই তার অলংকারের কারুকাজ করা বাক্সটা খোলা হয়েছিল নিশ্চয়ই। তখনই ধরা পড়েছিল যে বাহুর তামার অলংকারটা খোয়া গেছে। কারিবু আমাকেই সন্দেহ করেছিল। ওর দেহরক্ষী পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্য। আমি বিপদ আঁচ করে সেইদিন রাত্রেই পালালাম। এই ভিক্টোরিয়া শহরে চলে এলাম।

—আচ্ছা হাজুকা—তোমার ঐ অলংকারটা এক রাত্রির জন্য আমাকে দেবে?

হাজুকা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছো। তবু তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না। সর্পদেবীর অলংকার আমাদের কাছে খুব পবিত্র জিনিস।

—ঠিক আছে—পিটার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি দুদিন পরে আসবো। তখন ওটার নকল এঁকে নেব।

পিটার ক্লিনিকের বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল রাস্তায় বেশি গাড়ি বাস চলছে না।একটু রাত হয়েছে।

দুদিন পরে পিটার আবার ক্লিনিকে এল। কিন্তু আর্থারের লোক ওকে ঠিক অনুসরণ করল। পিটার এ-গলি সে-গলিতে ঢুকে, এক ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে লোকটাকে বোকা বানাল। কিন্তু আর্থার সেদিন বুদ্ধি করে দুজন লোক লাগিয়েছিল। একজনকে ঝেড়ে ফেললেও অন্য লোকটা ঠিক পিটারকে অনুসরণ করল। ও যখন ক্লিনিকটায় ঢুকছে তখন ক্লিনিকের নাম, হাজুকার বেডনম্বর সব জেনে নিয়ে গেল। পিটার এসবের কিছুই জানতে পারল না। ও তখন একমনে হাজুকার সেই তামার অলংকারের নক্সাগুলো একটা বড় নোট বইয়ে এঁকে নিচ্ছে। দুপিঠের নক্সাই আঁকল। আঁকা শেষ হলে ভালো করে মিলিয়ে নিল। আসলে পিটার অপরের সই জাল করতে সিদ্ধহস্ত। ঐ গুণটি এখানে খুব কাজে লেগে গেল। নোটবইটা বন্ধ করে পিটার বলল, আচ্ছা, আর্থারের ব্যাপারটি কী বলো তো?

হাজুকা বলতে লাগল—সী ভিউ রোডে একটা ঘর নিয়ে আমি থাকতাম। আর্থার থাকতো আমার পাশের ঘরে। হঠাৎ একদিন আমার অসাবধানতার জন্য এই তামার চাকতিটা দেখে ফেলে। ও তো হাইডা। ঠিক বুঝল সর্পদেবীর অলংকার এটা। ও প্রথমে অলংকারটা ভালো করে দেখতে চাইল। আমি দিলাম না। ও তারপর জবরদস্তি শুরু করল। আমি সেই আস্তানা ছেড়ে পালালাম। কয়েকদিন একটা পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে রইলাম। কিন্তু খিদের জ্বালায় বেরোতে হলো। তাই সেদিন রাত্রে রেস্তোরাঁটায় খেতে গিয়েছিলাম। তারপর তো তুমি সবই জানো।

—হুঁ। যাক গে তুমি তো অনেক সুস্থ এখন। সামনের পূর্ণিমার রাত্রে আমাকে সর্পদেবীর গুহায় নিয়ে যেতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো।

পিটার আর কোনো কথা বলল না। আর কোথাও না গিয়ে সোজা হোটেলে চলে এল।

দুতিন দিন পিটার আর ওমুখো হলো না। সমুদ্রে স্নান করে, ওয়াটার স্কি করে, সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিল। তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আবার ক্লিনিকের দিকে চলল। বেশ অবাক হলো যখন দেখল কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। কী ব্যাপার? আর্থার এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিল?

ক্লিনিকে হাজুকার বেড-এর কাছে যেতেই ওকে দেখে হাজুকা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পিটার অবাক। বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করল, কী হলো? কাঁদছো কেন?

হাজুকা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, আর্থার সেই তামার অলংকারটা নিয়ে গেছে।

—আশ্চর্য। তুমি এখানে আছো জানলো কী করে?

—কীভাবে জানলো জানি না। কাল রাত্রে এ ঘরে এসে হাজির। বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে অলংকারটা চাইল। ক্লিনিকের লোকেরা ওর হাতে পিস্তল দেখে কেউ এগোতে সাহস করল না। আমি মিথ্যে করে বললাম পিটারকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও বিশ্বাস করল না। প্রথমে জামা গুটিয়ে বাহু দেখল। ওটা তখন বাঁধা ছিল না। ও জানে আমি শোবার সময় কোথায় রাখি ওটা। ও বালিশ ওল্টাতেই ওটা পেয়ে গেল। ওর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। অলংকারটা পকেটে নিয়ে ও চলে গেল।

—কিছছু ভেবো না। ওটায় খোদাই করা সব নক্সা আমার নোট বইয়ে নকল করা আছে। এখন কাজের কথায় এসো। ডাক্তাররা কবে তোমাকে ছেড়ে দেবে বলছে?

—সকালেই বড় ডাক্তার বলে গেছে আমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেব।

—এখন বলো তো লিলুয়েট উপত্যকায় পৌঁছতে আমাদের কতদিন লাগবে?

—কীসে যাবে?

—একটা জীপ ভাড়া করবো।

—তাহলে দিন দেড়েকের মাথায় আমরা ওখানে পৌঁছে যাবো।

—হুঁ। চৌদ্দ তারিখ আমাদের রওনা দিতে হবে অর্থাৎ আর চার দিন পরে। তোমার কাঁধের অবস্থা কেমন? পারবে যেতে?

—ঘা তো শুকিয়ে এসেছে। তবে বাঁ হাতটায় তেমন জোর পাচ্ছি না।

—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি তো আছি। আর কিছুক্ষণ হাজুকার সংগে গল্পগুজব করে পিটার হোটেলে ফিরে এল।

পরের দুটো দিন পিটার আর হোটেল থেকে বেরোল না। সেই তামার অলংকারের নক্সাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এটা ও বুঝল যে সর্পদেবীর গুহায় ঢোকার পথের নিশানা রয়েছে পেছনের জোড়াসাপের নক্সাটার মধ্যে। ও খুঁটিয়ে দেখল দুটো সাপের মত আঁকাবাঁকা দুটো পথের ইঙ্গিত রয়েছে। পথগুলো মাঝে মাঝে বন্ধ আঁকা আছে। সেই বন্ধ জায়গাগুলো এড়িয়ে যেটা সঠিক পথ সেটা পিটার বের করে ফেলল। কিন্তু সবশেষে রয়েছে একটা চতুর্ভুজ আঁকা। পথ ওখানেই শেষ। চতুর্ভুজের মাঝখানে একটা বিন্দু। ওটার চারপাশে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে এরকম দাগ।

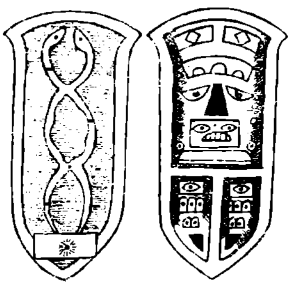

পিটার বুঝল এই চতুর্ভুজের বাধাটা পেরোতে পারলেই সর্পদেবীর বেদীতে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এই বাধা কীভাবে পেরোনো যাবে।

ও অনেক রাত অব্দি এই ধাঁধার সমাধান ভাবল। কিন্তু কোনোটাই সঠিক সমাধান মনে হলো না। তখন স্থির করল গুহার শেষে ও জায়গাটায় পৌঁছে সব দেখে সমাধানটা ভাবতে হবে। চোখে না দেখে কিছু ভাবা যাবে না।

ও আর রাত না করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুদিন পরে হাজুকা ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেল। পিটারই ক্লিনিকের সব পাওনা মিটিয়ে দিল। হাজুকাকে সঙ্গে নিয়ে ওর হোটেলে এল।

পরদিন পিটার একটা জীপ ভাড়া করল। একটা তাঁবু, কয়েক দিনের মত খাবার দাবার, পেট্রল, জলের পাত্র, এরকম প্রয়োজনীয় সব কিছু জীপটায় তুলে রাখল।

চৌদ্দ তারিখ প্রাতরাশ খেয়ে ওরা জীপ ছেড়ে দিল। রওনা হলো লিলুয়েট উপত্যকার উদ্দেশে।

ষোল তারিখ সন্ধ্যেবেলা ওরা লিলুয়েট উপত্যকায় পৌঁছল। হাইডাদের গ্রামের কাছাকাছি জঙ্গলের আড়ালে ওরা তাঁবু ফেলল। আসার পথে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় নি। শুধু ঠান্ডাটা বেশি পড়েছিল। বাক্স থেকে গরম কাপড়, সোয়েটার, কম্পর্টার এসব বের করতে হয়েছে। গায়ে দিতে হয়েছে। পথে আর্থারও ওদের কোনো বিপদে ফেলার চেষ্টা করে নি। আর্থার যা চেয়েছিল তা পেয়ে গেছে। কাজেই ওদের দিকে ওর আর নজর নেই।

এখন সর্পদেবীর গুহায় যাওয়ার জন্যে হাইডাদের পোশাক চাই। হাজুকা সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজের বাড়ি গেল। লুকিয়ে হাইডাদের দুটো পোশাক নিয়ে এল। সাদা কালো ডোরাকাটা পোশাকগুলো ঢলঢলে।

সতেরো তারিখ সন্ধ্যের মধ্যেই পিটার আর হাজুকা খেয়েদেয়ে তৈরি। একটু রাত হতেই হাইডাদের পোশাক পরে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিকের বনের গাছপালা, ঝোপ। পায়ে চলা পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দলে দলে হাইডারা যাচ্ছে। ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

প্রায় মাইলখানেক দূরে। লিলুয়েট পাহাড়ের তলায় পৌঁছল ওরা। পিটার হাতঘড়িতে দেখল পৌনে ন'টা। সর্পদেবীর গুহার সামনে গিয়ে পৌঁছল ওরা। হাইডাদের দলের সঙ্গে মিশে ওরা গুহার মধ্যে ঢুকল। গুহার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল গুহাটা বেশ বড়। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল বিরাট গহ্বর একটা। তাতে গলিত লাভা গন্ধকের স্তর। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত পর্যন্ত এই গহ্বর। গলিত লাভা থেকে লালচে আলো বেরোচ্ছে। ওটার পরেই একটা পাথরের বিরাট বেদী। বেদীর ওপাশে পাথুরে দেয়ালে আটকানো রয়েছে একটা ফণা মেলে ধরা সাপের মূর্তি। তার দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। তারই আলোতে দেখা যাচ্ছে সেই মূর্তিটা। সাপটা সোনার। তার ওপর পাথর বসানো। পিটার দেখেই বুঝল ঐ পাথরগুলো অত্যন্ত দামী। সাপের মুখ থেকে সোনার কাটা জিভ বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো নীল পাথরের। পিটার অবাক হয়ে দেখছিল সাপের মূর্তিটা। মশালের আলোয় ঝকমক করছিল মূর্তিটা। ও বুঝল, আর্থার মিথ্যে বলে নি। মূর্তিটার দাম ছ লক্ষ ডলারের বেশিই হবে। পিটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নাঃ। ঐ মূর্তির কাছে বেদীতে পৌঁছোবার কোনো উপায় নেই। সামনেই গলিত লাভার গহ্বর। দুপাশে নিরেট পাথুরে দেয়াল। গহ্বর পার হবার কোনো উপায় নেই। গলিত লাভার হাত পাঁচেক কাছে যা রাখা যাবে তাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গহ্বরের এপাশে দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে। হাতে কাঠের বল্লম। কাঁধে তীর ধনুক।

দর্শনার্থী হাইডাদের সঙ্গে পিটার আর হাজুকা বসে রইল। গহ্বর থেকে একটা হলদে সাদা ধোঁয়া উঠে আসছে। সেই ধোঁয়া মাঝে মাঝে সর্পদেবীর বেদীটা ঢেকে দিচ্ছে। গুহার ভেতরটা বেশ গরম।

হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দ উঠল গুহাটায়। হাইডারা সব উঠে দাঁড়াল। দু হাত ওপরে তুলে তারা চিৎকার করে কী বলে উঠল। হাজুকা চাপাস্বরে পিটারকে বলল, দু হাত তোলো। হাজুকা নিজেও দুহাত তুলল। পিটারও তুলল। পিটার চাপাস্বরে বলল, ওরা কী বলছে?

—বলছে সর্পদেবীর জয়। সর্পদেবী এখনি বেদীতে আসবে।

তখন মাথা নিচু করবে। তারপর সবার সঙ্গে বসে পড়বে।

পিটার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেদীর পেছনের পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। কোথা দিয়ে সর্পদেবী আসবে? ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে পাথুরে দেয়ালটা। ওর মধ্যেই পিটার আবছা দেখল বাঁদিকে কোণাটায় একটা পাথরের খাঁজ বড় হচ্ছে। পাথরটা সরে যাচ্ছে। পাথরটা আরো সরে গেল। সর্পদেবী ঢুকল। পেছনে পেছনে ঢুকল–একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষ। পিটার হাজুকাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ঐ লোকটা কে?

–প্রধান পুরোহিত–কারিবু। হাজুকা নিচু স্বরে বলল।

কারিবুর গায়ে একটা কালো সাদা ডোরাকাটা চাদর আলগাভাবে জড়ানো। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখে পাতলা দাড়িগোঁফ।

পিটার এবার সর্পদেবীকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ঠিকই মেয়েটির গায়ের রং কালো। মাথার চুল লালচে। চোখ দুটো ভালো দেখা যাচ্ছে না। নাকে নোলক। গলায় ঝুলছে তিন চারটে পাথরের মালা। পরনে সোনালী জরির কাজ করা কালো সাদা ডোরাকাটা পোশাক।

সর্পদেবী বেদীর ওপর গিয়ে দাঁড়াল। হাইডারা কেউ কেউ সোনার অলংকার বেদীর ওপর ছুঁড়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ ভাঙানিও ছুঁড়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ ডলারের নোট পাথরের টুকরোয় জড়িয়ে ছুঁড়ে দিল।

হাইডারা এবার বসে পড়ল। এবার কারিবু এগিয়ে এল। চিৎকার করে দ্রুত বক্তৃতার ঢং-এ কী বলতে লাগল। পিটার হাজুকাকে ফিসফিস করে বলল, কী বলছে?

–বলছে সাপের পবিত্র মূর্তি চুরি করার চেষ্টা চলছে। বিদেশীরা বিধর্মীরা এই চেষ্টা চালাচ্ছে। দুঃখের কথা, লোভে পড়ে কিছু হাইডাও এই দলে জুটেছে। তোমরা কোনো বিদেশী দেখলেই সর্পদেবীর দেহরক্ষীদের খবর দেবে। হাজুকা ফিসফিস করে বলে গেল। পিটার গায়ের চাদরটা নাক অব্দি টেনে দিল। মাথার দিকেও চাদরটা ভুরু অব্দি টেনে দিল।

কারিবু হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে দ্রুতহাতে বেদীতে যে সোনার গয়না, খুচরো, ডলারের নোট পড়েছিল সেসব তুলে নিল। তারপর বেশ দ্রুতপায়েই পেছনের দিকে হাঁটতে লাগল। সর্পদেবী এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। তাকে কারিবু হাত তুলে ইঙ্গিত করল। সর্পদেবী দ্রুত বেদী থেকে নেমে কারিবুর

পিটার দ্রুত হাতে কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল।

পেছনে পেছনে চলল। ধোঁয়ার আড়ালে ওরা মিলিয়ে গেল। হাইডারা চিৎকার করে সর্পদেবীর জয়ধ্বনি দিল। তারপর সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

পিটার ওর হাইডাদের পোশাকের নিচে প্যান্টের পকেট থেকে হাতঘড়িটা বের করল। হিসেব করে দেখল। সর্পদেবীর ও কারিবুর বেদীতে আসা, বক্তৃতা, গয়না কুড়িয়ে দ্রুত ফিরে যাওয়া, এতে সময় লেগেছে পনেরো মিনিটের মতো পিটারের এটা একটু অদ্ভুত লাগল। কারিবু ফিরে যাওয়ার সময় এত তাড়াহুড়ো করছিল কেন? কথাটা ভাবতে ভাবতে পিটার গুহার বাইরে এল। হাজুকাও এল। ঠিক তখনই একজন দেহরক্ষী পিটারের দিকে এগিয়ে এল। পিটার আর মুখ ঢাকার অবকাশ পেল না। দেহরক্ষীটিও সেই চাঁদের আলোয় পিটারের মুখ দেখে বুঝল বিদেশী। কিন্তু দেহরক্ষীটি হাতের কাঠের বর্শাটি বাগিয়ে ধরার আগেই পিটার দ্রুতহাতে কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। দেহরক্ষীটি কিছু বোঝার আগেই আমূল ওর পেটে ঢুকিয়ে দিল। রক্ষীটি 'অঁক' করে মুখে একটা শব্দ করে পেট চেপে বসে পড়ল। পিটার দ্রুত চারদিক দেখে নিল। দেখল হাইডারা দল বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি দুজন হাইডা যাচ্ছে। তাও ওরা সামনে। পিটার রক্ষীটির পিঠে লাথি মারল। রক্ষীটি গড়িয়ে সামনের ঝোপঝাড় ভেঙে খাদে পড়ে গেল। চোখের সামনে মানুষ খুন হতে দেখে হাজুকা ভয়ে কাঁপতে লাগল। পিটার ওর শরীরটা ধরে ঝাঁকুনি দিল। ফিসফিস করে বলল, ছ'লক্ষ ডলার হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। চলো।

ওরা বনের আড়ালে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল। পিটার বলল, হাজুকা—খাবার দাবার বার কর। দু কাপ কফির জল বসিয়ে দাও। রান্নাবান্নার দরকার নেই। কৌটোর খাবারই খাবো। হাজুকা ঝোলা থেকে খাবার দাবার বের করল। ছোট্ট স্টোভটা জ্বেলে কফি করল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে পিটার নোটবইয়ে আঁকা নক্সাটা দেখতে লাগল। দুটো সাপ যেন জড়িয়ে আছে। তার মানে দুটো সুড়ংগ পথ। হঠাৎ নিচের দিকে একটা জোড়ার কাছে দেখল কালো বিন্দু একটা। বুঝল এটা কোনো গর্ত হবে। তার পাশ দিয়েই পথ। পিটার পেন্সিলের দাগ দিয়ে যে পথে যাবে সেই পথটা ছকে নিল।

ততক্ষণে খাবার বের করা হয়ে গেছে। দুজনে খেতে লাগল। হাজুকা খেতে খেতে বলল, কী ভাবছো পিটার?

—সুড়ংগপথের সমাধান করেছি। কিন্তু শেষেরটা পারি নি। যাকগে—আর দেরি নয়। আজকেই যাবো। তৈরি হয়ে নাও।

—আজকেই?

—হ্যাঁ। অনেকেরই নজর আছে ঐ সাপের মূর্তিটার ওপর। তাছাড়া কারিবু বুঝতে পেরেছে ঐ মূর্তি চুরি করার জন্য বিদেশী লোকেরা উঠে পড়ে লেগেছে।

—শেষ বাধাটা কী? হাজুকা জানতে চাইল।

—সেটা ওখানে না পৌঁছে বলতে পারবো না। এই বাধা কাটাবার পথ শুধু কারিবু জানে।

—সর্পদেবী?

—না। জানে না। তাকে বোধহয় চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়।

—তা ঠিক। নইলে আগের সর্পদেবী আমাকে সমাধানটা বলতে পারতো। চলো, আর দেরি নয়।

পিটার কোমরে পিস্তল আর ছোরাটা গুঁজে নিল। বাক্সমত বড় ব্যাটারির টর্চটা নিল।

ওরা যখন লিলুয়েট পাহাড়ের পেছনটায় পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়েছে। চাঁদের আলোয় একটা গুহা ওরা দেখল। পিটার চাঁদের আলোয় নক্সার সংগে মেলাল। না। এই গুহা একটু গিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা গুহা আছে। সেটা খুঁজতে লাগল। ঐ গুহাটার সমান্তরালে বাঁ দিকে খুঁজতে লাগল। ঝোপঝাড় সরিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জংগলের আড়ালে গুহার মুখ পেল। টর্চ জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকল। টর্চের আলো যতদূর পৌঁছল দেখল টানা সুড়ংগ চলে গেছে। ওরা কয়েকটা চাঁই পাথর পেরিয়ে চলল। পিটার যেতে যেতে নক্সাটা মিলিয়ে নিচ্ছে। ও আগেই সঠিক সুড়ংগপথটা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছিল। কাজেই পাথরের চাঁই আর টুকরো টুকরো পাথর ছড়ানো পথ দিয়ে ওরা চলল বিনা বাধায়। চারিদিকে নিস্তব্ধ। দুজনে দুজনের শ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এক সময় এক ঝাঁক বাদুড় ডানা ঝাপটে গুহার মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধ চারিদিক।

আর একটা সুড়ংগ এসে যেখানে মিলেছে সেখানেই দেখল বেশ বড় একটা গর্ত। আর তার পাশ দিয়ে যাওয়ার মতো রাস্তা আছে। পিটার নক্সায় দেখল ওখানে কালো ফুটকি মতো অর্থাৎ এখানে একটা গর্ত আছে। গর্তটা পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই হঠাৎ সুড়ংগ পথ শেষ হয়ে গেল। সামনেই চৌকোণো পাথরের একটা ছোট দেয়ালের মতো। পিটার পাথরের ছোট দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল। টর্চটা মাটিতে বসিয়ে আলোটা দেয়ালের ওপর ফেলল। তারপর দেয়ালটা ঘুরে ঘুরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কীভাবে এটা সরানো যায় বুঝল না। তবে দেয়ালের ধারগুলো দেখে বুঝল এটা সরে যায়। কিন্তু কী করে? ও বারকয়েক ধাক্কা দিল। হাজুকাকে ডেকে দুজনে মিলে ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু পাথুরে দেয়াল অনড়। পিটার লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আবার নক্সাটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল নক্সাটায় এখানে আলো ছড়িয়ে পড়ার মত আঁকা আছে। পিটার টর্চটা দেয়ালের কাছে নিয়ে এল। কিন্তু দেয়াল অনড়। নক্সাটা আবার ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখল দেয়ালের মাঝখানে একটা ছোট্ট অস্পষ্ট বিন্দু। ও দেয়ালের ঠিক মাঝখানে দেখল সত্যি ও জায়গাটায় একটু গর্তমত। মনে হয় কিছু দিয়ে যেন ওখানে আঘাত করা

হয়েছে। তখনি নজর পড়ল ঠিক গর্তমত জায়গাটার নিচেই একটা গোল পাথর পড়ে আছে। পিটার একমুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ঘটনা ওর মনে খেলে গেল–সর্পদেবী আর কারিবু বেদীতে ঢোকার আগে একটা গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। দুহাত ওপরে তুলে পিটার চেঁচিয়ে উঠল, আলো নয়–শব্দ। তারপরই নিচু হয়ে গোল পাথরটা হাতে তুলে নিল। হাজুকা হাঁ করে পিটারের পাগলামি দেখতে লাগল। পিটার দুহাতে গোল পাথরটা তুলে পাথুরে দেয়ালের ঠিক মাঝখানটায় গর্তমত জায়গাটায় এক ঘা মারল। প্রচন্ড শব্দ উঠল সুড়ংগটায়। দেখা গেল দেয়ালটা কাঁপছে থরথর করে। আস্তে আস্তে দেয়ালটা নেমে আসতে লাগল। ফাঁক দেখা গেল। ফাঁকটা বড় হতে লাগল। তখনও দেয়ালটা কাঁপছে। বেশ কিছুটা ফাঁক হতেই উল্লাসে নোটবইটা ছুঁড়ে ফেলে পিটার ছুটে গিয়ে ফাঁকটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। হাজুকাও খুশিতে লাফিয়ে উঠল। পিটারের ছুঁড়ে দেওয়া নোটবইটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। তারপর সেও ছুটে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে সর্পদেবীর বেদীতে এসে দাঁড়াল পিটার। দুপাশে মশাল জ্বলছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল সেই গলিত লাভার খাদ। তারপর গুহার মুখ। সামনে তাকিয়ে দেখল পাথুরে দেয়ালে লোহা দিয়ে আটকানো সাপের মূর্তি। ছুটে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে হাত দিল। সারাটা গা সোনার। কত দামী পাথর গায়ে বসানো। ফণা তোলা জীবন্ত সাপ যেন।

হঠাৎ হাজুকার কথা মনে হলো। দেখল হাজুকা বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে মুখে ভীষণ ভয়ের ছাপ। পিটার ডাকল, এসো হাজুকা, দুজনে হাত না লাগালে হবে না।

হাজুকা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। চিৎকার করে বলল, না–না। আমার অভিশাপ লাগবে। আমি এখান থেকে চলে যাবো। একদৃষ্টিতে সাপের মূর্তির চোখের দিকে তাকিয়ে ও একথা বলল। পিটারের মাথায় খুন চেপে গেল। হাজুকা যদি পালাতে পারে তাহলে সমূহ বিপদ। ও নিশ্চয়ই গ্রামে ফিরে মূর্তি চুরির কথা বলবে। পিটার আর মূর্তি নিয়ে পালাতে পারবে না। এত দামী একটা মূর্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। শিকাগোর নামকরা গুন্ডা পিটার আসল চেহারা ধরল। কোমর থেকে পিস্তল বের করে তাক করল হাজুকার দিকে। বিপদ আঁচ করে হাজুকা ছুটতে যাবে, পিটারের পিস্তলের গুলি ওর বুকে গিয়ে লাগল। গুলির প্রচন্ড শব্দে গুহাটা কেঁপে উঠল যেন। হাজুকা একটা পাক খেয়ে গলা লাভার খাদটায় পড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওর চিহ্ন আর রইল না। সেইসংগে পিটারের নোটবইটাও গলিত লাভায় তলিয়ে গেল। পিটার পিস্তলটা কোমরে গুঁজে মূর্তিটা জোরে টানতে লাগল। মূর্তিটা একটু নড়ল। কিন্তু খুলে এল না। ও মূর্তিটা টানাটানি করছে, তখনই হঠাৎ গুলির প্রচন্ড শব্দে গুহাটা আবার কেঁপে উঠল। গুলিটা ওর মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে সাপের মূর্তির গায়ে লাগল। দুটো পাথরের টুকরো ছিটকে গেল। পিটার বিপদ বুঝে মুহূর্তের মধ্যে এক লাফে বেদীর পেছনে গিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে আরো গুলির শব্দ হলো। কিন্তু দ্রুত লাফিয়ে পড়ার জন্যে পিটার বেঁচে গেল। বেদীর আড়ালে বসে ও কোমর থেকে পিস্তল বের করল। ধোঁয়ায় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝল গুহায় ঢোকার সেই দরজার সামনের পাথরটার আড়াল থেকে কেউ গুলি চালাচ্ছে। পিটার সেইদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওদিক থেকেও গুলি ছুটে আসতে লাগল। বেদীতে পাথুরে দেয়ালে গুলি লাগছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে পিটার আবছা দেখতে পেল গুহায় ঢোকার সেই দরজাটার ফাঁক অনেকখানি কমে গেছে। পিটারের চিন্তাটা নাড়া খেল। কেন কারিবু সর্পদেবীকে নিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল? কেন দরজাটা ছোট হয়ে আসছে? ও সেদিন হিসেব করে দেখেছিল বেদীতে সর্পদেবী আর কারিবু মাত্র পনের মিনিট ছিল। তবে কি পনের মিনিট পরেই দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়? ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল দরজার ফাঁক আরো একটু কমেছে।

পিটার চিৎকার করে বলল, কে তুমি? কথাটা গুহাটায় প্রতিধ্বনিত হলো।

–আমি তোমার পুরোনো বন্ধু–আর্থার। আর্থার হেসে উঠল।

–তুমি কী করে এখানে এলে?

–বন্ধু তুমিই তো পথ দেখিয়ে নিয়ে এলে।

–তুমি কী চাও?

–সাপের মূর্তিটা।

–বেশ নিয়ে যাও। এই আমি পিস্তল ফেলে দিচ্ছি। পিটার হাতের পিস্তলটা বেদীর ওপর গড়িয়ে দিল। বলল, এবার তোমারটা ফেল। আর্থারও পিস্তলটা বেদীর ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

দুজনে উঠে এসে বেদীর ওপর দাঁড়াল। আর্থার কালো ছোপধরা দাঁত বের করে বলল, শেষ সমাধানটা আমার বুদ্ধিতে কুলোয়নি। নইলে এসে দেখতে সব ভোঁ-ভাঁ। কথাটা শেষ করে ও কাঁধের ঝোলাটা নামাল। হাতুড়ি শাবল বের করল। পিটার বলে উঠল, শেষ পর্যন্ত তুমিই এটা পেলে।

–হ্যাঁ, অনেক খাটুনি গেছে তোমার। তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম করো গে। তার মানে আর্থার সব জানে।

পিটার আর দাঁড়াল না। ছুটে দরজার কাছে এল। দেখল দরজার ফাঁক আরো ছোট হয়ে গেছে। ও দ্রুত ডান পাটা গলিয়ে দিল। তারপর শরীরটা। দরজার ওপাশে চলে গেল ও। তখনি দরজাটা আরো ছোট হয়ে গেল। ওখান থেকে ও শুনল আর্থারের শাবলের ঘা-এর শব্দ।

ওদিকে শাবল চালিয়ে চালিয়ে আর্থার মূর্তিটা পাথুরে দেয়াল থেকে আলগা করে ফেলল। তারপর কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই মূর্তিটা দেয়াল থেকে খুলে এল। পাথরের টুকরো

ধূলোয় গড়িয়ে পড়ল। আর্থার মূর্তিটা কাঁধে তুলে নিল। বেশ ভারি মূর্তিটা। পিস্তলটা ছুটে বেদী থেকে তুলে নিল। কোমরে গুঁজল। তারপর হা হা করে হেসে উঠল। সমস্ত গুহায় সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হলো।

কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছেই ওর খুশির ভাব মিলিয়ে গেল। কোথায় দরজা? নিরেট পাথরের দেয়াল সেখানে। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও সাপের মূর্তি রেখে ছুটে গিয়ে শাবল নিয়ে এলো। এলোপাথাড়ি শাবল চালাতে লাগল। কিন্তু শক্ত নিরেট পাথরে শাবলের ঘা লাগাতে আগুনের স্ফুলিংগ ছিটকোল শুধু। দেয়াল অনড়। আর্থার বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

এদিকে পিটার সহজেই বুঝল আর্থারের অবস্থাটা। ও দেখল পায়ের কাছে বাক্স ব্যাটারির টর্চটা তখনও জ্বলছে। ও ঠিক করল। পাথরের ঘা দিয়ে দরজা খুলে দেবে। আর্থার দরজা পেরোলেই ওর মুখে টর্চের আলো ফেলবে। হঠাৎ জোরালো আলো চোখে পড়লে ও হকচকিয়ে যাবে। তখনই পিটারই ছুরি চালাবে।

পিটার চৌকোণো পাথরের মাঝখানে গোল পাথরটা দিয়ে ঘা দিল। গম্ভীর শব্দ উঠল গুহাটায়। দেয়ালটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সরে যেতে লাগল। মানুষ ঢোকার মতো ফাঁক হতেই মূর্তিটা কাঁধে নিয়ে ডান হাতে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে আর্থার একলাফে দরজা পেরিয়ে এপাশে এল। পিটার তৈরিই ছিল। টর্চটা ঘুরিয়ে ওর মুখে ফেলল। আর্থার চমকে উঠে গুলি চালাল। টর্চটা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। হঠাৎ সব অন্ধকার। পিটার ছোরা হাতে অন্ধকারেই আর্থারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক কাঁধে ওরকম ভারি মূর্তি, আর হঠাৎ এই অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আর্থার টাল সামলাতে পারল না। পাথুরে মেঝেয় পড়ে গেল। পিস্তলটাও হাত থেকে ছিটকে গেল। পিটার এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ও ছোরাটা আর্থারের বুকে বিঁধিয়ে দিল।

অন্ধকারের মধ্যে পিটার কিছুক্ষণ বসে বসে হাঁপাতে লাগল। তারপর অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে সাপের মূর্তিটা তুলে নিল। কাঁধে তুলল। কয়েক পা এগিয়েই ও দাঁড়িয়ে পড়ল, কোনদিকে যাবে? নক্সা? নোটবই? আলো চাই। সিগারেট লাইটারটা আছে। ও প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট লাইটারটা বের করল। জ্বালল। সেই আলোতে

…সমাধানটা আমার বুদ্ধিতেও কুলোয় নি।

দরজার কাছে খুঁজল কিছুক্ষণ। এখানেই কোথাও নোটবইটা ও ছুঁড়ে ফেলেছিল। না। কোথাও নেই। এদিকে লাইটার বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখতেও পারছে না। অল্প পেট্রল। কতক্ষণ আর জ্বলবে। অথচ এখন একমাত্র এই লাইটারটাই ভরসা। নক্সা পাওয়া গেল না। আচ্ছা—আর্থারের কাছে তো সেই তামার অলংকারটা থাকতে পারে। ও মৃত আর্থারের জামা-প্যান্টের পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তামার অলংকারটা পেল না। পেল আর্থারের কোমরে গোঁজা ওর পিস্তলটা। সেটা নিয়ে লাইটারের মৃদু আলোয় সুড়ংগের মধ্যে দিয়ে চলল। আস্তে আস্তে। নক্সার কিছুই মনে নেই। আন্দাজেই চলল। কাঁধে সাপের মূর্তি। হাতে লাইটারের মৃদু আলো। একটু পরেই দ্রুত পা চালাল। লাইটারের আলো বেশিক্ষণ পাওয়া যাবে না। সামনেই দেয়াল। ভুল পথ। আবার ফিরে এল। অন্য সুড়ংগপথ ধরল। আলো কমে আসছে। দ্রুত ছুটল। সামনেই খাদ। সামলাতে গিয়েও পারল না। মূর্তি কাঁধে সোজা খাদে পড়ে গেল। একে মূর্তির ভার, তার ওপর এত উঁচু থেকে পা পিছলে পড়া। ডান পায়ের হাঁটুটায় জোর ঘা লাগল। অন্ধকারে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

তখনি একটা ঠান্ডা শিরশিরে হাওয়া পিটারের গায়ে লাগল। ঠান্ডা কী যেন ওর গায়ের ওপর উঠে আসছে। আর একটা। আর একটা পায়ের দিকে। লাইটারটা তখনও হাতে রয়েছে। নিভে গেছে ওটা। পিটার লাইটার জ্বালল। সাপ? সেই মৃদু আলোয় দেখল অসংখ্য সাপের চকচকে গা। সাপগুলো ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করছে। আতংকে পিটারের বুক হিম হয়ে গেল। থরথর করে হাতটা কাঁপতে লাগল। সেই সংগে লাইটারটাও। আলোও কাঁপছে। অত সাপের নিঃশ্বাসের শব্দ ওর কানে এল। ও শিউরে উঠল। দ্রুত উঠতে গেল। পারল না। হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা। তবু পালাতে হবে। ও বাঁ পাটা হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে পাথুরে দেয়ালের কাছে গেল। লাইটারের কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখল খাড়া উঁচু দেয়াল। বুঝল এখান থেকে মুক্তি নেই। তখনই দেখল এখানে ওখানে কতকগুলি নরকংকাল। পিটার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পর পর কয়েকটা সাপের কামড় ও দাঁত চেপে সহ্য করল। হঠাৎ উন্মত্তের মতো কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। প্রচন্ড শব্দ উঠল সুড়ংগ পথে, গর্তটায়। গুলি শেষ। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলল পিটার। নিকষ অন্ধকার চারদিকে।

শরীর বেয়ে কেমন একটা ঠান্ডা স্রোত বুকের দিকে উঠে আসছে। অবশ হয়ে আসছে শরীরটা। পিটার আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

ছবি : অলয় ঘোষাল

অনেক দিন পরে আবার বেরিয়েছে

ছোটদের বুক অফ নলেজ

(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ)

বাংলা ভাষায় বুক অফ নলেজের অদ্বিতীয় বই। এমন কোনো বিষয় নেই যা এই বইটিতে নেই। এক কথায় বলা যায় সমস্ত পৃথিবীটিকেই এই বইটি এনে দেবে মুঠোর মধ্যে। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন থেকে আরম্ভ করে মনীষীদের জীবনী, প্রাচীন গুহামানবের পরিচয়, হাল আমলের বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মহাকাশ অভিযান, ভারতীয় মহাকাশযাত্রীদের কথা, খেলার কথা আরও অনেক অজানা কাহিনী। মস্ত আকারের বইটি পাতায় পাতায় ছবিতে ভরা। আর আছে অজস্র রঙিন ছবি।

দাম : ১২০ টাকা মাত্র

১২০ টাকা পাঠালে বইটি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মড়া যদি জ্যান্ত হয়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললেন, "আমি আসছি মেদিগঞ্জ থেকে। আমার নাম স্যার, বটুক রায়। খুব গন্ডগোলে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রকান্ড একটা ইংরেজি বই খুলে বসে ছিলেন। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। মুখ তুলে দেখে বললেন, "আপনি বসুন আগে।"

ভদ্রলোকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। সত্যি বলতে কী, ইনি যেন এক নরদানব। গর্দানে মাংস ঠেলে উঠেছে। বাহুতে দাগড়া-দাগড়া পেশী ঠেলে বেরিয়ে আছে। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। মাথার চুল কদমফুলি। অর্থাৎ ন্যাড়া হবার পর যেমন চুল গজায়। দেখার মতো গোঁফখানাও বটে! গায়ে স্পোর্টিং গেঞ্জি, পরনে আঁটো প্যান্ট। পায়ের ওই বিশাল চপ্পল যে অর্ডার দিয়ে বানাতে হয়েছে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। কব্জিতে চাঁদির বালা এবং গলায় মিহি সোনার চেন ঝিকমিক করছিল। ভদ্রলোক সাবধানেই বসলেন সোফায়। তবু মনে হল, সোফাটা যে কোনো মুহূর্তে মড়াৎ করে ভেঙে পড়বে।

ষষ্ঠীচরণ পর্দার ফাঁকে মুন্ডু বাড়িয়ে ছিল। তার চোখও ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। কর্নেল বললেন, "ষষ্ঠী, কফি নিয়ে আয়।" তখনও সে নরদানব দেখছে। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই সে অদৃশ্য হল।

কর্নেল বললেন, "আপনি শরীরচর্চা করেন বুঝি?"

ব্যায়ামবীর সলজ্জ হাসলেন। "একসময় করতুম স্যার! বার তিনেক দেহশ্রী খেতাব পেয়েছিলুম। তবে এখন বয়স হয়েছে। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর ওসব হয়ে ওঠে না।"

"আপনার গন্ডগোলটা কী, বলুন এবার।"

ব্যায়ামবীর বটুক রায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তারপর উনি যে কাহিনী শোনালেন, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমাঞ্চকর।...

মেদিগঞ্জ বহরমপুর থেকে সামান্য দূরে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো গঞ্জ। ছোটখাটো একটা শহরই বলা যায়। বটুকবাবু সম্প্রতি কিছুকাল আগে একটা ক্লাব করেছেন। ক্লাবটার নাম 'শ্মশানবন্ধু ক্লাব'। মেদিগঞ্জের সব মড়া এই ক্লাবের ছেলেরাই বটুকবাবুর নেতৃত্বে শ্মশানে নিয়ে যায়। সৎকারের সব দায়িত্ব তারা নেয়। গরিব মানুষের মড়া কিংবা রাস্তাঘাটের বেওয়ারিশ মড়া, এখন আর আগের মতো গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় না। শাস্ত্রমতে চিতায় পোড়ে এবং সৎকারাদি হয়। সব খরচ ক্লাবের।

কিন্তু রোজই তো আর লোক মরে না। তাছাড়া আজকাল কত সব ওষুধ বেরিয়েছে। সহজে লোক মরে না। এদিকে বটুকবাবু এবং ক্লাবের ছেলেদের যেন নেশা ধরে গেছে মড়া বয়ে। মড়া না পেলে মন ভাল থাকে না। সবই অভ্যাস!

তাই কারুর গুরুতর অসুখবিসুখ হলেই ওঁরা তক্কে-তক্কে থাকেন। বাড়ির আনাচে-কানাচে ওত পেতে বেড়ান। তারপর যেই কান্নাকাটি শোনেন, অমনি বটুকবাবু একলাফে বাড়িতে ঢুকে হাঁক দেন, "কোথায় লাশ?" পেছনে তাঁর চেলারা বাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "বলো হরি, হরি বোল!"

গন্ডগোলটা ঘটেছে দুদিন আগে। সেদিন ছিল শুক্রবার।

মেদিগঞ্জে দুজন প্রমথবাবু আছেন। একজন হলেন প্রমথ মিত্তির–তিনি স্কুলমাস্টার। অন্যজন হলেন প্রমথ বোস–তিনি পোস্টমাস্টার। দুজনকেই লোকে প্রমথ মাস্টার বলে। দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের ওধারে। দুজনেই রোগা, খেঁকুটে চেহারার মানুষ। একজন ভোগেন অম্বলে, অন্যজনের লিভার খারাপ।

শুক্রবার সন্ধ্যার একটু আগে সতু নামে ক্লাবের একটি ছেলে দৌড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে খবর দিল, প্রমথ মাস্টার টেঁসে গেছেন। বাজারে গিয়ে এইমাত্র শুনে এসেছে সে। কিন্তু কোন প্রমথ মাস্টার, সেটার হদিস করতে পারেনি।

বটুকবাবু বললেন, "চল তবে। আগে কাছেরটাই দেখি।"

কাছেরটা মানে স্কুলমাস্টার প্রমথবাবু–প্রমথ মিত্তির। তিনি যদি না টেঁসে থাকেন, তাহলে পোস্টমাস্টার প্রমথবাবু অর্থাৎ প্রমথ বোসের টেঁসে যাওয়া অবধারিত। মৃত্যুর খবর তো আর মিথ্যা রটতে পারে না। বিশেষ করে দুজনেই ওঁরা নিরীহ সজ্জন মানুষ বলে পরিচিত।

প্রমথ মিত্তিরের বাড়ির কাছে যেতেই কান্নাকাটি শোনা গেল। অমনি বটুকবাবু গামছাখানা একটানে কোমরে বেঁধে বাড়ি ঢুকে পড়লেন। তারপর যথারীতি হাঁক ছাড়লেন, "লাশ কোথায়?"

এদিকে ওঁর চেলারাও পেছন-পেছন ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, "বলো হরি, হরি বোল!"

অমনি কান্নাকাটি গেল থেমে। তারপর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মাস্টার-গিন্নি। রণরঙ্গিনী চেহারা, বাঁ হাতে খ্যাংরা ঝাঁটা। ডান হাতে কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে হুংকার দিলেন, "তবে রে মড়া খেকো শকুনের পাল! তোদের জ্বালায় একটু কাঁদবারও যো নেই রে হতচ্ছাড়ারা!"

মাস্টার-গিন্নি দজ্জাল মহিলা। ব্যায়ামবীরেরও তোয়াক্কা করেন না। বেগতিক দেখে বটুকবাবু তার দলবল নিয়ে কেটে পড়লেন। কিন্তু খামোকা কান্নাকাটির কী মানে হয়! বটুকবাবু বললেন, "আয় রে! পোস্টমাস্টার প্রমথ বোসের বাড়ি যাই।"

শ্মশানবন্ধু ক্লাব দৌড়ে চলল পোস্টমাস্টারের বাড়ির দিকে।

প্রমথ বোসের বাড়িটা একেবারে গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গায়। চারদিকে গাছপালা। তার মধ্যে একটা পুরনো একতলা বাড়ি। কাছাকাছি গিয়ে ভন্টু বলল, "কৈ? কান্নাকাটি তো শোনা যাচ্ছে না।"

বটুকবাবু বললেন, "ধুর বোকা! পোস্টমাস্টারবাবুর কে আছে যে কাঁদবে? উনি একা থাকেন না?"

তবু বলল, "কেন–ওঁর চাকর ভোলা তো আছে। তার কাঁদা উচিত!"

কিন্তু বাড়ি একেবার চুপচাপ সদর দরজা হাট করে খোলা। বেলা পড়ে এসেছে। দিনের আলো কমে গেছে। ডেকে ভোলার সাড়া পাওয়া গেল না। একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বটুকবাবু বললেন, "তোরা চুপচাপ উঠোনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি দেখে আসি ব্যাপারটা।"

বটুকবাবু বারান্দায় উঠে দেখলেন ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো তাতে পুরনো দেয়াল। আলো খেলে না একেবারে। উঁকি মারতেই চোখে পড়ল, খাটে পোস্টমাস্টার চিত হয়ে শুয়ে আছেন। বটুকবাবু কাসলেন। ডাকলেন। তবু সাড়া নেই। তখন ভেতরে ঢুকে গেলেন।

প্রমথবাবুর চোখ খোলা। কিন্তু চোখের পাতা স্থির। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ। কপালে হাত রেখে বটুকবাবুর মনে হলো, ভীষণ ঠান্ডা হিম। অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "লাশ পাওয়া গেছে! ডোমপাড়া থেকে খাটুলি নিয়ে আয়

শীগগির!"

চেলারা চেঁচিয়ে উঠল, "বলো হরি! হরি বোল!" সতু আর ভণ্টু দৌড়ল ডোমপাড়া থেকে খাটুলি কিনতে। খরচ ক্লাবের।

খাটুলি চলে এল মিনিট দশেকের মধ্যে। এদিকে বালিশের নিচে থেকে চাবি নিয়ে ঘরে তালা এঁটে প্রমথ বোসের মড়া খাটুলিতে চাপিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানবন্ধু ক্লাব ছুটে চলল শ্মশানের দিকে। ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

শ্মশানের নিচেই গঙ্গা। একটা তেচালা ঘরে ঘাটোয়ারি-বাবুর অফিস। লণ্ঠন জ্বেলে বসে ছিলেন ঘাটোয়ারিবাবু। মেঝেয় বসে বিড়ি ফুঁকছিল মধু ডোম। সবে তেচালার সামনে মড়া নামিয়েছেন, এসে গেল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। খাটুলি তুলে তেচালায় ঢোকানো হল।

ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, "কার মড়া বটুকবাবু?"

বটুকবাবু বললেন, "পোস্টমাস্টার প্রমথবাবুর।"

"কিসে গেলেন?"

"তা বলতে পারব না মশাই।" বটুকবাবু বললেন। "নিশ্চয় অসুখ হয়েছিল। বিছানায় মরে পড়ে ছিলেন। শ্মশানে নিয়ে এলুম।"

ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, "তাহলে যে একটা ডেথ সার্টিফিকেট চাই বটুকবাবু!"

"কেন, কেন?" বটুকবাবু খচে গেলেন। "এত মড়া এনেছি, কারুর তো চান নি মশাই!"

"আহা, ইনি যে সরকারি লোক। পাবলিকের মড়া নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বুঝলেন না? আইনের

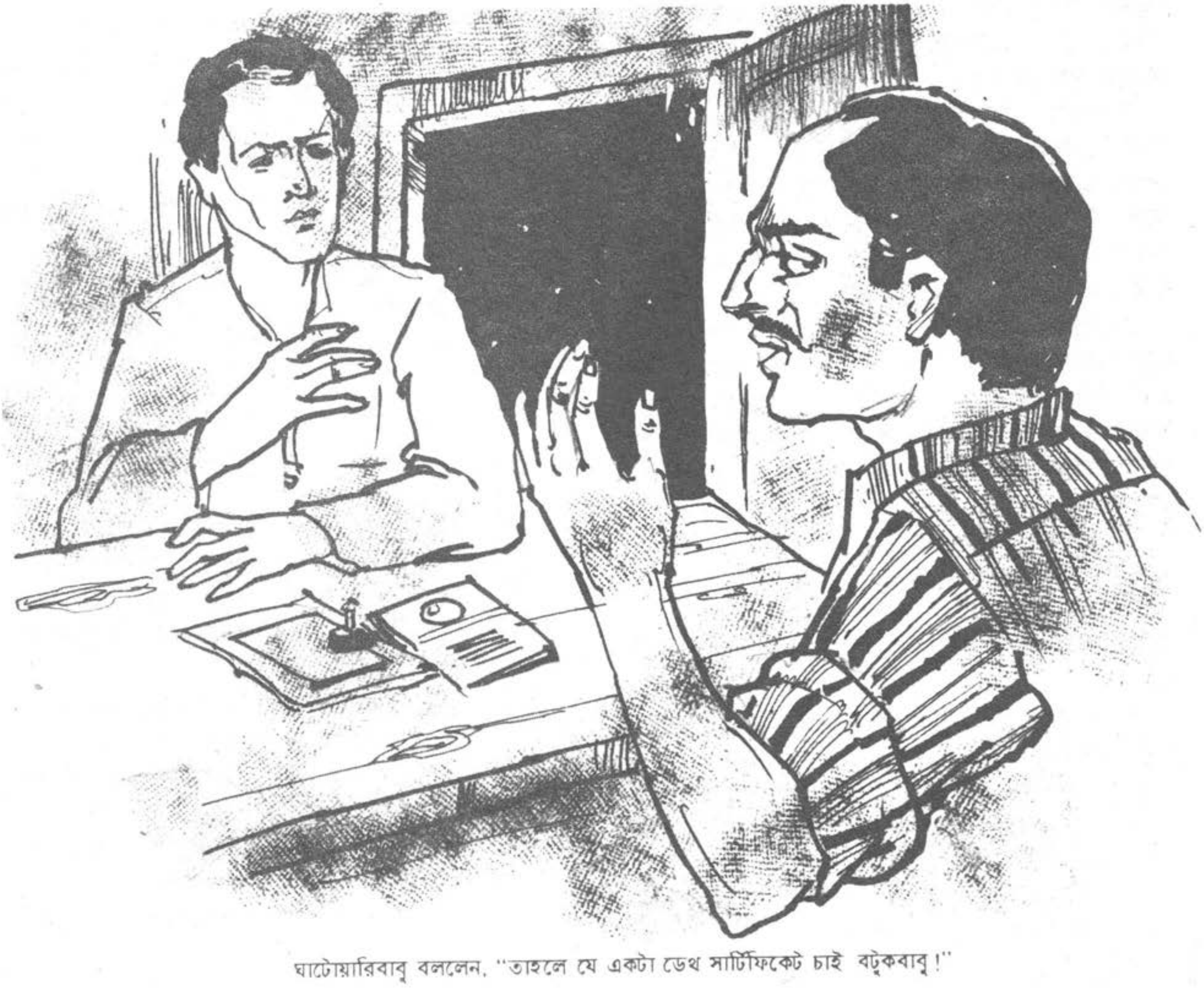

ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, "তাহলে যে একটা ডেথ সার্টিফিকেট চাই বটুকবাবু!"

ব্যাপার!"

"ধুর মশাই! এতকাল আইন দেখান নি। এখন আইন দেখাচ্ছেন!"

ঘাটোয়ারিবাবু গোঁ ধরে বললেন, "না মশাই। বিনা ডেথ সার্টিফিকেটে আমি মড়া পোড়াতে দেব না এখানে।"

বটুকবাবু ওঁকে তুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলবেন কি না ভাবছেন, সতু বলল, "ঠিক আছে বটুকদা! কুঞ্জ ডাক্তারের কাছ থেকে এক্ষুণি সার্টিফিকেট এনে দিচ্ছি।"

বলেই ডানপিটে সতু বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে চলে গেল! কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টিটা কমে এল। ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, "ততক্ষণে আমি খেয়ে আসি।" মধু ডোমও বলল, "আমিও খেয়ে আসি তাহলে।" তারপর দুজনে চলে গেল। যাবার সময় ঘাটোয়ারিবাবু লণ্ঠনটা নিয়ে গেলেন। তপু বারণ করতে যাচ্ছিল, বটুকবাবু বললেন, "ছেড়ে দে!" আসলে উনি ভীষণ রেগে গেছেন ঘাটোয়ারিবাবুর ওপর।

অন্ধকারে বসে রইলেন ওঁরা। বৃষ্টিটা একটু পরে আবার বেড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। মেঘও ডাকছিল। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছিলেন বলে বটুকবাবুর টর্চ নিতে মনে ছিল না। ছেলেগুলোরও খেয়াল হয় নি। এখন মনে হচ্ছিল একটা আলো থাকলে ভালো হতো।

তেচালার একটা পাশে খাটুলিতে পোস্টমাস্টারবাবুর মড়া, অন্যপাশে মেঝেয় বসে আছেন বটুকবাবুরা। হঠাৎ একটা খসখসে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কানে এল। তারপর বিদ্যুৎ চমকাতেই বটুকবাবু দেখলেন, কে একজন তেচালা থেকে নেমে গেল। বটুকবাবু বললেন, "কে, কে?" কোনো সাড়া এল না।

স্বপন বলল, "দেশলাই নেই কারুর কাছে?"

ভন্টু বলল, "আছে। কেন?"

"একবার জ্বাল তো!"

বটুকবাবু বললেন, "কেন রে? দেশলাই জ্বেলে কী হবে?"

স্বপন বলল, "আমার কেমন যেন খটকা লাগছে। ভন্টু, আয় তো!"

দুজনে খাটুলির কাছে গেল। ভন্টু দেশলাই জ্বালল। অমনি চমকে উঠল ওরা। চমকালেন বটুকবাবুও। খাটুলি শূন্য। মড়া নেই।

ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে। পোস্টমাস্টারবাবু মরে ভূত হতেই পারেন। কিন্তু ভূত হয়ে নিজের মড়া নিয়ে যাবেনটা কোথায়? কেনই বা যাবেন?

সবাই বৃষ্টির মধ্যে ডাকাডাকি এবং খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু প্রমথ বোসের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন স্বপন বলল, "বটুকদা! চলুন তো পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি।" সবাই এতে একগলায় সায় দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের কথায় বটুকবাবু রাজী হলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফের হাজির হলেন প্রমথ বোসের বাড়িতে।

নাঃ। যেমন তালা দিয়ে এসেছিলেন, তেমনি তালা ঝুলছে সদর দরজায়। চাবি পোস্টমাস্টারের বালিশের তলায় পেয়েছিলেন। তাই বটুকবাবুর কাছে চাবি ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখেন, ঘরের দরজাতে তালা তেমনি ঝুলছে। সে-তালা খুলে ঘরের ভেতরও দেখলেন। কেউ নেই।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে একটুকরো চাঁদও উঠেছে। হতবাক হয়ে বটুকবাবুরা বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল সতুর সঙ্গে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "কী ব্যাপার? আপনারা চলে এসেছেন যে শ্মশান থেকে। কুঞ্জবাবু কিছুতেই মুখের কথা শুনবেন না। মড়া পরীক্ষা করে তবে সার্টিফিকেট দেবেন। তাই ওঁকে শ্মশানে বসিয়ে রেখে আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছি। ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, ফিরে এসে আপনাদের দেখতে পাননি।"

বটুকবাবু বললেন, "কিন্তু মড়া? মড়াই যে নেই!"

"নেই মানে?" সতু হাসল। "মড়া থাকবে না কেন? দিব্যি আছে।"

"বলিস কী!" বটুকবাবু ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।

"হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কী? মড়া নেই বলছেন কেন বটুকদা?"

সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন শ্মশানের দিকে। যেতে যেতে ব্যাপারটা সংক্ষেপে স্বপন জানিয়ে দিল সতুকে। সতু বিশ্বাসই করল না কথাটা। মড়া পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল এবং আবার কখন ফিরে এসে খাটুলিতে শুয়েছে, এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

কিন্তু বটুকবাবু গিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, সত্যি খাটুলিতে মড়া রয়েছে। কিন্তু কাপড়ঢাকা দেওয়া কেন? টেবিলে লণ্ঠন রেখে ঘাটোয়ারিবাবু বসে আছেন। পাশে একটা টুলে বসে আছেন কুঞ্জবাবু ডাক্তার। মধু ডোম বসে বসে ঢুলছে। কুঞ্জ ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, "বটুক না এলে মড়ায় হাত দেব না বলে ওয়েট করছি। নাও বটুক, কাপড় ওঠাও। দেখি, সত্যি মরেছে মাস্টারবাবু—নাকি জ্যান্ত আছে এখনও?"

হাসতে হাসতে মস্ত টর্চ জ্বেলে খাটুলির দিকে এগিয়ে

পুলিশ অফিসার হেমাংগবাবু ঘরে ঢুকলেন

গেলেন ডাক্তারবাবু। বটুকবাবু কাপড় ওঠালেন তারপর ভীষণ চমকে গেলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ক্লাবের ছেলেরাও হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুঞ্জ ডাক্তার বলে উঠলেন, "এ কী হে বটুক! এ তো পোস্টমাস্টার নয় দেখছি।"

মড়াটা স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের।

কুঞ্জ ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেই বললেন, "মড়া তাতে সন্দেহ নেই। তবে বটুক, তোমায় একটা কথা বলি শোনো! বেশি উৎসাহ ভাল নয়। এক প্রমথের মড়া শুনে এলুম। এসে দেখি অন্য প্রমথ। প্রমথ মিত্তিরের সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না বাপু, সে তুমি যাই বলো। মিত্তিরের বউ বড় দজ্জাল মহিলা। আমার মুন্ডু মড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।"

কুঞ্জ ডাক্তার গোঁ ধরে চলে গেলেন। বটুকবাবু ব্যায়ামবীরের শরীরে তখন আর একফোঁটা জোর নেই। ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, "তোরা যা হয় কর সতু! আমার মাথা ঘুরছে।"

সতু আর ভন্টু দৌড়ে খবর দিতে গেল স্কুলমাস্টারের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দজ্জাল মহিলা এবং আরও সব লোক এসে পড়ল। এতক্ষণে দেখা গেল, প্রমথ মিত্তিরের মাথার পেছনে চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শক্ত কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। সবাই শিউরে উঠল। এ তো হত্যাকান্ড!

কাজেই মড়া পুড়ল না। পুলিশ এল রাতদুপুরে। মড়া চালান গেল সদরের মর্গে।

এদিকে পোস্টমাস্টার প্রমথ বোসের পাত্তা নেই। তাঁর চাকর ভোলারও নেই। বাড়িতে এখন তালা ঝুলছে।...

।। দুই ।।

ট্রেনে মেদিগঞ্জ পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বটুকবাবুরা আগে এখানকার বনেদি বড়লোক ছিলেন। এখন অবস্থা কিছুটা পড়ে এসেছে। গংগার ধারে

সেকেলে গড়নের প্রকান্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ি। আমাদের যত্ন-আত্তির ত্রুটি হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেয়ে শ্মশানবন্ধু ক্লাবের ছেলেরা এসে ভিড় করল। কর্নেল তাদের সংগে কৌতুকে মেতে উঠলেন। বৃদ্ধ গোয়েন্দা-প্রবরের যা স্বভাব।

হাস্য পরিহাসের বিষয় হল, মড়া। খাটুলিতে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যদি মড়া জ্যান্ত হয়ে লাফ দিয়ে পালাতে থাকে, তাহলে কেমন হবে? ছেলেগুলো হাসতে লাগল। মজার ব্যাপার তো হবেই। তবে এ যাবৎ তেমন হয় নি–শুধু শ্মশানের তেচালা থেকে পোস্টমাস্টারের মড়াটা পালিয়ে যাওয়া ছাড়া।

একসময় বটুকবাবু এসে ঘোষণা করলেন, "থানার পুলিশ অফিসার হেমাংগ নন্দী এসেছেন। সতু ভন্টু! তোরা সব এখন যা। ক্লাবে গিয়ে বস আমি যাচ্ছি।"

ওরা বিমর্ষভাবে চলে গেল। কর্নেলের সংগে খুব জমে উঠেছিল। পুলিশ অফিসার হেমাংগবাবু ঘরে ঢুকলেন। সহাস্যে নমস্কার করে বললেন, "কর্নেল! আপনার ট্রাংক-কলের পরই আমি পোস্ট-অফিসে গিয়েছিলাম। নতুন পোস্টমাস্টার আজ সকালে জয়েন করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম, প্রমথ মিত্তির মারা যাওয়ার পরদিন অর্থাৎ শনিবার তাঁর নামে একটা পার্সেল এসে পৌঁছয়। পোস্টম্যান মোটে দুজন। হরিপদবাবু আর মাখনবাবু। মিত্তিরমশাইয়ের বাড়িটা হরিপদবাবুর বিটের মধ্যে পড়ে। যাই হোক, সেদিন পোস্টমাস্টার না থাকায় ওঁরা দুজনেই সব কাজকর্ম করেন। দুপুরে হরিপদবাবু পার্সেলটা দিয়ে আসেন মিত্তিরমশাইয়ের স্ত্রীকে। সাধারণ পার্সেল বলেই ডেলিভারি দেন।"

কর্নেল বললেন, "রেজিস্ট্রি পার্সেল নয়?"

"না।" হেমাংগবাবু বললেন। "পার্সেলের প্যাকেটের ভেতর অম্বলের ওষুধ পাওয়া গেছে। কলকাতার একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ কোম্পানি থেকে বিনামূল্যে পাঠানো নমুনা ওষুধ। মিত্তির মশাইয়ের অম্বলের অসুখ ছিল। বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখে থাকবেন।"

"শুক্রবার সন্ধ্যায় মিত্তির মশাই কোথায় ছিলেন, তদন্ত করেছেন কি?"

"হ্যাঁ। উনি বাসুদেববাবুর মেয়েকে সাতটা পর্যন্ত পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হারাণবাবুর কাছে শোনেন, পোস্টমাস্টারমশাই মারা গেছেন। তাঁর বডি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই শুনে মিত্তির মশাই শ্মশানের দিকে চলে যান। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুতা ছিল শুনলুম।"

"তাহলে ওঁকে পথেই খুন করা হয়েছিল?"

"ঠিক তাই। আচমকা ওর মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়। নিশ্চয় পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। রক্তও পড়া উচিত। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ধুয়ে গেছে। কাজেই জায়গাটা আমরা খুঁজে বের করতে পারি নি।"

বটুকবাবু কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন, "বুঝতে পেরেছি। মিত্তির মশাইকে খুন করে তার বডিটা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল খুনী। হয়তো গংগায় ফেলে দেবার মতলব ছিল। আমরা থাকায় পারে নি।"

হেমাংগবাবু বললেন, "হয়তো তাই। আপনারা যেমনি শ্মশান থেকে পোস্টমাস্টারবাবুর খোঁজে তাঁর বাড়ির দিকে দৌড়ে গেছেন, তেমনি সে মিত্তির মশাইয়ের বডি শূন্য খাটুলিতে রাখতে সুযোগ পেয়েছে। ভেবেছিল, পোস্টমাস্টারের বডি বলেই চিতায় উঠবে। রাতবিরেতে অত কে লক্ষ্য করবে–তাছাড়া ওই বৃষ্টি।"

"তাহলে পোস্টমাস্টারকে সে তেচালা থেকে নিশ্চয় বেরিয়ে যেতে দেখেছিল এবং বিদ্যুতের আলোয় চিনতেও পেরেছিল!"

বটুকবাবুর কথা শুনে কর্নেল বললেন, "তাই সম্ভব। কিন্তু পোস্টমাস্টার গেলেন কোথায়? তাঁর চাকর ভোলাই বা কোথায় গেল?"

হেমাংগবাবু বললেন, "ভোলাকে পাওয়া গেছে। দুমাইল দূরের গ্রামে তার বাড়ি। তার বক্তব্য হল, সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারে নি। সেটা সত্যি বলেই মনে হয়েছে আমাদের। কারণ এখনও সে প্রবল জ্বরে ভুগছে। ডাক্তারের মতে ম্যালেরিয়া।"

কর্নেল বললেন, "আপনারা কাকে খুনী বলে সন্দেহ করছেন?"

"পোস্টমাস্টারকে প্রথমে সন্দেহ করেছিলুম। মনে হয়েছিল, আগাগোড়া ব্যাপারটা তাঁরই প্ল্যান। মড়ার ভান করে পড়ে থাকা, শ্মশান থেকে সুযোগ পেয়ে কেটে পড়া এবং মিত্তির মশাইকে খুন করা–কিন্তু শেষে ভেবে দেখলুম, এতে অনেক হিসেবের গন্ডগোল হচ্ছে। প্রথম কথা, শ্মশান থেকে কেটে পড়ার পর মিত্তির মশাইকে খুন করার জন্য উপযুক্ত জায়গায় পেয়ে যাবেন, এটা খুবই আকস্মিক ব্যাপার। এক হতে পারে, আগেই খুন করে লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে মড়া সেজেছিলেন। কিন্তু হারাণবাবুর সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে, পোস্টমাস্টারকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পরও মিত্তির মশাই জীবিত ছিলেন!

অতএব এ ব্যাপারটা ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা, রোগা টিঙটিঙে দুর্বল মানুষ উনি। মিত্তির মশাইকে খুন করা সম্ভব হলেও তাঁর বডি বয়ে নিয়ে শ্মশানের তেচালায় ঢোকা একেবারে অসম্ভব! তাছাড়া উনি নাকি রোজ সন্ধ্যায় আফিং খেতেন। ভোলা বলেছে।"

"আফিং খেতেন?" কর্নেল চমকে উঠলেন।

"হ্যাঁ। তাছাড়া ওঁর ঘর খুঁজে আমরা আফিংয়ের কৌটোও পেয়েছি।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "যাক্, তাহলে খাটুলি থেকে উঠে ওঁর মড়ার চলে যাওয়ার রহস্য ফাঁস হল।"

বটুকবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ফাঁস হল কি ভাবে?"

"পোস্টমাস্টার আফিং খেয়ে মড়ার মতো পড়ে ছিলেন। আপনারা ওঁকে মড়া ভেবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর গঙ্গার ধারে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটানিতে ওঁর মৌতাত কেটে যায় এবং খাপ্পা হয়ে চলে আসেন। আফিংখোরদের মৌতাত হঠাৎ কেটে গেলে তারা ভীষণ খাপ্পা হয়ে যায়।"

"কিন্তু উনি গেলেন কোথায় তাহলে?"

"সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।"

হেমাঙ্গবাবু বললেন, "কর্নেল, গত বছর আমি নদীয়ার রামনগর থানায় থাকার সময় চৌধুরিবাবুদের মন্দিরের বিগ্রহ চুরির রহস্য আপনি যেভাবে ফাঁস করেছিলেন, এবারও তাই করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে। সেবারকার মতোই সব রকম সাহায্য আপনি পাবেন। মিত্তির মশাইয়ের হত্যারহস্য নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছিলুম। আজ সকালে আপনার ট্রাঙ্কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।"

"দেখা যাক।" গোয়েন্দাপ্রবর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "হুঁ—একটা কথা। পোস্টমাস্টারবাবুর ঘরের চাবিটা কি আপনার কাছে? চাবিটা আমি চাই।"

হেমাঙ্গবাবু ব্রিফকেস খুলে চাবিটা বের করে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং চা-টা খেয়ে উনি বিদায় নিলেন। বটুকবাবু বললেন, "তাহলে বিশ্রাম করুন কর্নেল! আমি একবার ক্লাব থেকে ঘুরে আসি।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "এ রাতে কি একটা মড়া পাওয়ার আশা করছেন বটুকবাবু?"

বটুকবাবু হো হো করে হাসলেন। "পেলে খুশিই হবো। তবে সে-মড়া আবার জ্যান্ত হয়ে না পালিয়ে যায়।"

বটুকবাবু চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্নেল ডাকলেন, "বটুকবাবু, শুনুন!"

বটুকবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। তখন কর্নেল বললেন, "আপনি তো শরীরচর্চা করেছেন একসময়। ব্যায়ামবিদ ছিলেন। কখনও কুস্তি লড়েছেন?"

বটুকবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "হুঁউ, লড়েছি বৈকি। মেদিগঞ্জেই একসময় প্রতি বছর কুস্তি প্রতিযোগিতা হতো। তখন লড়তুম।"

"আপনার সঙ্গে কুস্তি লড়ার মতো পালোয়ান আছে এ তল্লাটে?"

"আছে বৈকি। মেদিগঞ্জেই আছে।"

"নাম কী তাঁর?"

"বেণীমাধব কুন্ডু। বাজারের ওদিকে বাড়ি।"

"কি করেন ভদ্রলোক?"

বটুকবাবু বাঁকা মুখ করে বললেন, "বেণী একটা জুয়াড়ি। একসময় ওদের মস্ত ব্যবসা ছিল। জুয়ো খেলে সব উড়িয়ে দিয়েছে। এখন ওর কাজ হল বর্ডার এলাকার মেলায় গিয়ে জুয়োর আসর পাতা। সারা বছর এখানে-ওখানে মেলা বসে নানা উপলক্ষে। মেলায়-মেলায় জুয়োর ছক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কার্বাইড ল্যাম্প জ্বেলে বসে থাকে। চামড়ার কৌটোয় হরতন এস্কাপন চিড়িতন রুইতন ড্রাগন আর মুকুট আঁকা ছটা চৌকো গুটি ভরে নাড়ে। তারপর ছকের ওপর ছড়িয়ে দেয়। ছকেও ওইসব চিহ্ন আঁকা। লোকে এককেটা চিহ্নে পয়সা ফেলে দান ধরে। প্রতি গুটির ছপিঠে ওই ছটা চিহ্ন আছে। গুটির ওপরপিঠে যে চিহ্ন, ছকের সেই চিহ্নের ঘরে পয়সা থাকলে খেলুড়ে ডবল পয়সা পাবে। যার না মিলবে, সে হারবে।"

কর্নেল বললেন, "জানি। দেখেছি।"

বটুকবাবু বললেন, "হঠাৎ একথা কেন কর্নেল?"

"এমনি।" বলে কর্নেল চোখ বুজলেন। বটুকবাবু মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

।।তিন।।

রাত দশটা বাজল দেয়ালঘড়িতে। খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল, বটুকবাবু আর আমি বারান্দায় বসে কথা বলছিলুম। ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা উঠেছে গাছপালার ফাঁকে। আকাশে টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বারবার চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে। হঠাৎ কর্নেল বললেন, "চলুন বটুকবাবু, পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়িতে হানা দেওয়া যাক।"

বটুকবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "যাবেন? বেশ তো, চলুন। এখান থেকে শর্টকাটে চুপিচুপি নিয়ে যাব।"

ওঁদের বাড়ির পেছনে বাগান। বাগানের গেট দিয়ে আমরা আগাছার জঙ্গলে পড়লুম। টর্চ জ্বালা মানা। তবে চাঁদের আলোয় হেঁটে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল না। পোস্টমাস্টারের নিরিবিলি বাড়িটা দেখে আমার গা ছমছম করল অজানা ভয়ে। গাছপালার ভেতর বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকে একটা বন্ধ জানালার কাছে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই কানে এল শব্দটা। ঠক্ ঠক্ ঠক্...ঠক্ ঠক্ ঠক্!

বটুকবাবু ফিসফিস করে বললেন, কাঠঠোকরা পাখি নাকি?

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। রাতের বেলা কাঠঠোকরা পাখি শব্দ করবে কেন বুঝলুম না। তাছাড়া শব্দটা শোনা যাচ্ছে যেন পোস্টমাস্টারবাবুর ঘরের ভেতর থেকে।

তারপর ঝর ঝর করে কী ঝরে পড়ল। বটুকবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন, সিঁদেল চোর। কর্নেল ওঁকে চুপ করতে ইশারা করলেন। কিন্তু ঠক ঠক শব্দটা যেই একটু জোরে হয়েছে এবং আবার ঝর ঝর করে সম্ভবত চুনবালি খসে পড়েছে, অমনি আর ব্যায়ামবীরকে বাগ মানানো গেল না।

"তবে রে ব্যাটা চোর" বলে আচমকা পেল্লায় হাঁক ছেড়ে উনি সামনে ছিটকে গেলেন। চাঁদের আলোয় দেখলুম, ওঁর বিশাল শরীর বাড়ির অন্যদিকে মিলিয়ে গেল। ধুপ ধুপ শব্দে মাটি কাঁপল। তারপর ধপাস শব্দ হল কোথায়।

তারপর নরদানবের হুংকার এবং "বাপরে" বলে আর্তনাদও শুনতে পেলুম। দৌড়ে বাড়ির সামনে সদর দরজায় পৌঁছলুম দুজনে। দরজা খোলা। উঠোনে দাঁড়িয়ে বটুকবাবু নিজের প্রকান্ড বাহুতে হাত বুলোচ্ছেন। আমাদের দেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "বিছুটি! বিছুটি!"

টর্চের আলো জ্বেলে কর্নেল বললেন, "সিঁদেল চোর বিছুটির ঘা মেরে পালিয়েছে দেখছি বটুকবাবু।"

বটুকবাবু বললেন, "আলকুশিও হতে পারে। ইশ! জ্বালা করছে প্রচন্ড!"

"চোরকে দেখতে পেয়েছেন কি?"

বটুকবাবু করুণমুখে বললেন, "না। পেলে তো এক আছাড়ে ফুটিফাটা করে দিতুম। বারান্দার থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। যেই গেছি আর বিছুটি না আলকুশি ঘষে দিয়েছে।"

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে তালা ঝুলছে। অন্যটার তালা ভাঙা। সে-ঘরটাই পোস্টমাস্টারের শোবার ঘর। বটুকবাবু সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। দেখলুম, একখানে দেয়ালের অনেকটা ধস ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে চোর। পরীক্ষা করে কর্নেল বললেন, "দেয়ালে কিছু পোঁতা আছে কি না খুঁজছিল।"

বললুম, "গুপ্তধন নয় তো?"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "তাও হতে পারে। দেখছ না সারা ঘর ওলটপালট করে খুঁজেছে! না পেয়ে শেষে দেয়ালে—" বলে দেয়ালের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মেঝে থেকে হাতখানেক উঁচুতে খোঁড়া হচ্ছিল। সেখানে কী পরীক্ষা করে কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। "হুঁ, এখানে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ছিল বলে সন্দেহ হয়েছিল চোরের।"

বটুকবাবু জিগ্যেস করলেন, "কী খুঁজছিল বলুন তো?"

"ওই তো জয়ন্ত বলল, গুপ্তধন!"

বটুকবাবু বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটায় হাত বুলোতে বুলোতে হেসে ফেললেন, "যাঃ! প্রমথ মাস্টারের ঘরে গুপ্তধন? অসম্ভব ব্যাপার।"

কর্নেল টর্চের আলো ফেলে খসে পড়া চুনবালিগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "চোর ঠিকই ধরেছিল। এখানে সদ্য নতুন পলেস্তারা করা হয়েছিল দেখছি। বটুকবাবু, দেখুন তো একটা শক্ত খুন্তি বা শাবল পান নাকি। রান্নাঘরে খুঁজে দেখুন। টর্চ নিয়ে যান।"

বটুকবাবু কর্নেলের টর্চ নিয়ে চলে গেলেন। তক্ষুণি ফিরে এলেন একটা কালিমাখা ছোট্ট লোহার গোঁজ নিয়ে। বুঝলুম ওটা দিয়ে ভোলা কয়লা ভাঙত। কর্নেল বললেন, "বটুকবাবু! জায়গাটা খুঁড়ুন।"

বটুকবাবু অবাক হয়ে খুঁড়তে শুরু করলেন। নরদানবের হাতের ঘা। বাড়ি ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল। গোঁজ মেরে চাপ দিচ্ছেন, আর পুরনো ইটের টুকরো সুদ্ধু চাবড়া উঠে আসছে। একটু পরেই চাবড়ার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা সাদা প্যাকেটের মতো জিনিস। দেখামাত্র আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, "এ কী! এ যে দেখছি একটা পার্সেল!"

কর্নেল প্যাকেটটা কুড়িয়ে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "হ্যাঁ, পার্সেল। রেজিস্টার্ড পার্সেল। গালার সিল ঠিকঠাক আছে। পুলিশ অফিসার হেমাঙ্গবাবুকে আমি এই পার্সেলটারই খোঁজ নিতে বলেছিলুম। আমার অনুমান ঠিক দেখছি। স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের নামেই এটা এসেছে। অথচ ওঁকে ডেলিভারি না দিয়ে

পোস্টমাস্টারবাবু এটা এখানে গুপ্তধনের মতো পুঁতে রেখেছিলেন!"

বটুকবাবু বললেন, "কী আছে ওতে? অম্বলের ওষুধ নাকি?"

কর্নেল হাসলেন। "ওষুধ কোম্পানির নামেই পাঠানো হয়েছিল প্রমথ মিত্তিরের কাছে। যাই হোক, আপাতত আর এখানে নয়। চলুন ফেরা যাক।"

রহস্যময় পার্সেলটার ভেতর কী এমন দামী ওষুধ আছে যে প্রমথ বোস ওটা প্রমথ মিত্তিরকে ডেলিভারি না দিয়ে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা আমার মাথায় ঢুকছিল না। পার্সেলটা খুলে দেখার কথাও বারকতক কর্নেলকে বললুম। গোয়েন্দাপ্রবরের কানেই যেন ঢুকল না। উপরন্তু সেই রাত্রেই থানায় গিয়ে হেমাংগ নন্দীর কাছে জমা দিয়ে এলেন।

সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "বটুকবাবু, মিত্তির মশাইয়ের স্ত্রী নাকি দজ্জাল মহিলা—সবসময় হাতে খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে থাকেন?"

বটুকবাবু গাল চুলকে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। মেদিগঞ্জের ওই একজনকেই একটু ভয় করে চলি।"

"চলুন না একবার আমাকে নিয়ে!"

"সর্বনাশ!" বটুকবাবু আঁতকে উঠলেন। "সামনে আমি যাব না কর্নেল স্যার! বরং আপনাকে বাড়িটা দেখিয়ে দেব দূর থেকে। সেদিন সত্যি সত্যি প্রমথ মাস্টারের লাশ পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত—এইতে আমাকে নাকি উনি দুবেলা অভিশাপ দিচ্ছেন আর ঝাঁটা নিয়ে শাসাচ্ছেন।"...

কাজেই দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে কেটে পড়লেন বটুকবাবু। কর্নেল দরজার কড়া নাড়তেই "কে র‍্যা" বলে ভেতর থেকে এমন চিলচ্যাঁচানি ভেসে এল যে আমার পিলে চমকে উঠল। তারপর দরজা খুলে গেল। রণচণ্ডী বটে চেহারাখানা। কিন্তু কর্নেলের তো বটেই, আমারও সৌভাগ্য যে হাতে ঝাঁটা নেই। দরজায় শান্ত সৌম্য ঋষিতুল্য, সাদা দাড়ি এবং মাথায় সায়েবি টুপি—তাছাড়া চেহারাও সাহেবি, গলায় ঝুলন্ত ক্যামেরা আর বাইনোকুলার—এমন এক মূর্তি দেখেই বোধ করি ভদ্রমহিলা থ বনে গেছেন।

কর্নেল গলায় মধু মাখিয়ে বললেন, "প্রণাম দিদিভাই!" অমনি মিত্তির-গিন্নি গলে জল হয়ে গেলেন।

বাইরের ঘরে খাতির করে বসালেন। কর্নেল নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনার স্বামীর হত্যারহস্যের কিনারা করতেই এসেছি দিদিভাই।"

এলেন একটা কালিমাখা ছোট্ট লোহার গোঁজ নিয়ে।

মিত্তির-গিন্নি চোখ মুছতে মুছতে হুংকার দিয়ে বললেন, "ওই ড্যাকরা হতচ্ছাড়া ডাকবাবুই ওকে খুন করেছে। ওকেই আপনারা ধরুন! ও পালিয়ে-পালিয়ে

বেড়াচ্ছে। আপনারা না ধরতে পারেন, দেখবেন আমিই ওকে ধরব। গর্তে লুকিয়ে থাকলে চুলের ঝুঁটি ধরে বের করব। তারপর মুড়ো খ্যাংরা ঝাড়ব ওর পিঠে।"

কর্নেল হাত তুলে আশ্বস্ত করে বললেন, "দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দিদিভাই।"

মিত্তির-গিন্নি শান্ত হয়ে বললেন, "বলুন।"

"আপনার স্বামীর নামে কি মাঝে মাঝে পার্সেল আসত ডাকে?"

"আসত। পরশুই তো একটা এসেছে। থানার বড়বাবু জানতে এসেছিলেন। ওঁকে দেখিয়েছি।"

"এর আগেও এসেছে তো?"

"হুঁউ। এসেছে।"

"আপনার সামনে কখনও সে-সব পার্সেল খুলেছেন মিত্তিরমশাই? কী থাকত ওতে?"

"ওর অম্বলের অসুখ ছিল। তারই ওষুধ।"

"আমার প্রশ্নের জবাব হল না দিদিভাই! আপনি কখনও দেখেছেন পার্সেল খুলতে?"

মিত্তির গিন্নি একটু অবাক হয়ে বললেন, "না তো! পার্সেল আসত, শুধু তাই দেখেছি। পিওন দিয়ে যেত।"

দরজার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল একটি কিশোরী। সে বলে উঠল, "কেন মা—পার্সেল এলে বাবা সেটা কুন্ডুকাকাকে দিয়ে আসতেন না? আমি দেখেছি। জিগ্যেস করলে বলতেন, কুন্ডুর ওষুধ। আমার নামে আসে।"

মিত্তির-গিন্নি মাথা নাড়লেন। "তা আমি বলতে পারব না বাপু! নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সবসময়। তার ওপর হাঁটুর বাত বর্ষাভর কটকট করে কামড়াচ্ছে। যন্ত্রণায় কেঁদেকেটে অস্থির!" বলেই আবার রণচন্ডী হলেন। "ওই কান্না শুনেই হতচ্ছাড়া বটুক এসে বলেছিল, লাশ কোথায়? ওর পোড়ামুখের কথাই ফলে গেল রাত না পোহাতেই! একবার ওকে পেলে হয়। ঝেঁটিয়ে পালোয়ানগিরি ঘুচিয়ে দেব।"

কর্নেল কিশোরীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "কাকে দিয়ে আসতেন পার্সেল?"

মেয়েটি বলল, "কুন্ডুকাকাকে।"

তার মা বললেন, "ওই যে গো, বেণীকুন্ডু! সেও এক পালোয়ান। মেদিগঞ্জে তো পালোয়ানের অভাব নেই। এক পালোয়ান বেড়াচ্ছে বাড়ি-বাড়ি মড়া খুঁজে—আরেক পালোয়ান বেড়াচ্ছে দেশে-দেশে জুয়া খেলে। মার, মার! মুড়ো ঝাঁটা মার হতচ্ছাড়াদের মুখে!"

ভদ্রমহিলা সমানে তর্জন গর্জন করতে থাকলেন। কর্নেলের উঠে আসা গ্রাহ্যই করলেন না। রাস্তায় কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন। কিছু জিগ্যেস করব ভাবলুম। কিন্তু মুখের অবস্থা দেখে সাহস হল না।

একটা খালি সাইকেল রিকশো আসছিল। সেটা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "থানায় যাব।"...

হেমাংগ নন্দী আমাদের দেখে উত্তেজিত ভাবে বললেন, "আসুন আসুন। পার্সেল থেকে কী বেরিয়েছে দেখুন।"

কর্নেল জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "হুঁ—কোকেন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি। নিষিদ্ধ মাদকের কারবার দেখছি। নিরীহ সজ্জন ভদ্রলোক এবং স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের নামে পাঠানো হত, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। উনিও কিছু তলিয়ে না বুঝে এবং সম্ভবত কিছু পয়সাকড়ির লোভে পার্সেল পৌঁছে দিতেন আসল প্রাপকের কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে, এই পার্সেলটা স্কুলমাস্টারের কাছে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। কেন হয় নি? ধূর্ত পোস্টমাস্টারের সন্দেহ হয়ে থাকবে এবং কোনোভাবে টের পেয়েও থাকবেন তাই ডেলিভারি দেন নি। পিওনদেরও জানান নি। নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

আমি হেসে ফেললুম। "নিশ্চয় আফিং আছে ভেবেছিলেন?"

কর্নেল সায় দিলেন। "আফিং ভাবাই স্বাভাবিক। আফিংখোর মানুষ তো। যাই হোক, পার্সেলটা না পেয়ে মূল প্রাপক খেপে উঠেছিল। সন্দেহ করেছিল মিত্তিরমশাই ওটা আত্মসাৎ করেছেন। তাই তাঁকে খুন করে বসল প্রতিহিংসাবশে। সুযোগও ছিল চমৎকার। পোস্টমাস্টার মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ শ্মশানে আছে। নেহাত আকস্মিক ঘটনা-পরম্পরায় সে একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাল্টা ঘটনাপরম্পরায় সব উল্টে গিয়েছিল।"

হেমাংগবাবু বললেন, "খুনীটা তাহলে কে? তাকে ধরতে হবে এখনই।"

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, "এমনি ধরা কঠিন হবে। কাল রাতের ঘটনার পর সে সতর্ক হয়ে গেছে। তাকে ফাঁদ পেতে ধরতে হবে। তবে সেজন্যই আমাদের দরকার পোস্টমাস্টারমশাইকে।"

"উনি তো নিখোঁজ! ওঁকেও খুন করে গংগায় ফেলে দিয়েছে কিনা কে জানে!"

কর্নেল হাসলেন। "প্রমথ বোস আফিং খান বটে, ভীষণ ধূর্ত বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক।" বলে উনি উঠলেন।

হেমাংগবাবু অস্থির হয়ে বললেন, "কিন্তু খুনীর নাম

ছবি দেখতে ছোটরা ভালোবাসে। রংচংয়ে ছবি হলে তো কথাই নেই। সেই দিকে নজর রেখে

দেব সাহিত্য কুটীর

একের পর এক বের করে চলেছেন অফসেটে ছাপা রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা সব বই। ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ আরও অনেক কিছু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বর্ণপরিচয়

(প্রথম ভাগ)

দাম : ৫.৫০ পয়সা মাত্র

অফসেটে ছাপা বড় আকারের নতুন বই। আগাগোড়া চার রংয়ে ছাপা অজস্র ছবিতে ভরা বর্ণপরিচয়ের নবতম সংস্করণ।

খুশির পড়া

দাম : ৬.০০ মাত্র

খুশি হয়ে পড়ার মতো বই-ই বটে। পাতায় পাতায় রংয়ের বাহার, ঝকঝকে সব ছবি ছোটদের তাক লাগিয়ে দেবে।

গুণতে মজা

দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবি আর ছড়া দিয়ে ছোটদের যেমন গুণতে শেখানো হয়েছে তেমনি শেখানো হয়েছে যোগ, বিয়োগ করতেও। ছবি দেখে ছড়া পড়তে পড়তেই ছোটরা শিখে যাবে অংকের প্রথম পাঠ।

খোকাখুকুর ABC

দাম : ২.৫০ মাত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরাজি শেখানোর বই আর বোধহয় নেই। রংচংয়ে ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে ইংরাজি অক্ষরমালা।

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয়

দাম : ৬.০০ মাত্র

ছোটদের বর্ণপরিচয়ের এক মজাদার বই। একটি বইয়েই বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি আর উর্দু বর্ণমালা শেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবিতে ভারতের ইতিহাস

দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র

দেশের কথা জেনে ছোটরা যাতে বড় হতে পারে সেইজন্যেই চার রংয়ে ছেপে নাম মাত্র দামে বার করা হয়েছে এই বইটি।

ছোটদের চিড়িয়াখানা	আগডুম বাগডুম	ইকড়ি মিকড়ি
দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবিতে ভরা ছোটদের ভালো লাগার মতো দারুণ তিনটি ছড়ার বই। হাতে পেলে ছোটরা এর একটিও ছাড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৯

কী?"

কর্নেল বলার আগেই আমি মুখ ফসকে বলে ফেললুম, "পালোয়ান এবং জুয়াড়ি বেণীমাধব কুন্ডু!"

হেমাংগবাবু লাফিয়ে উঠলেন। কর্নেল বললেন, "একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তাকে সহজে খুঁজে পাবেন না আর। আমার ফাঁদ পাতা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন হেমাংগবাবু!"...

।।চার।।

কর্নেল গংগার ধারে-ধারে হাঁটছেন। আমার সংগে কথা বলছেন না। বুঝলুম, হেমাংগ নন্দীকে খুনীর নাম বলে দিয়ে ওঁর রাগের কারণ হয়েছি। একেবারে ওস্তাদের মার শেষ মুহূর্তে দেখানো স্বভাব ওঁর। হেমাংগবাবুদের তাক লাগাবেন ভেবেছিলেন। হল না।

বাইনোকুলারে মাঝে মাঝে পাখি দেখছিলেন কর্নেল। গংগার ধারে ঘন ঝোপঝাড় গাছপালার জংগল। কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। খানিকটা দূরে বিশাল এক বটগাছ। ডালপালা আর অসংখ্য ঝুরিতে যেন নিজেই এক দন্ডকারণ্য হয়ে রয়েছে। তার ভেতর একটা পুরনো মন্দির দেখতে পাচ্ছিলুম। কর্নেল বাইনোকুলারে মন্দির অথবা বটগাছে কোনও দুর্লভ পাখি দেখতে থাকলেন। তারপর কিছু বলা-কওয়া নেই, আচমকা দৌড়ুতে শুরু করলেন মন্দিরটার দিকে। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ওঁর সংগে দৌড়ুনোর মানে হয় না। কারণ এরপর ওই দুর্লভ পাখির পেছনে সারাটা দিন ঘুরবেন। আমার অত ধকল সইবে না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর আমারও রাগ হল। শরতকালের তীব্র রোদ। যদিও মাথা বাঁচানোর মতো ছায়া আছে। গরমে ঘামছি দরদর করে। আধঘন্টা অপেক্ষা করে ফিরে চললুম বটুকবাবুর বাড়ির দিকে।....

কর্নেল ফিরলেন একেবারে বেলা গড়িয়ে। হাতভর্তি লালহলুদ একগাদা অর্কিড। ওঁর বাড়ির ছাদের 'প্ল্যান্টওয়ার্ল্ডে' আশ্রয় পাবে ওগুলো, তাতে সন্দেহ নেই। আমার রাগ এবং নিজের রাগ সব জল করে একগাল হেসে বললেন, "ডার্লিং! আজ আমার রথ দেখা আর কলাবেচা দুই-ই হল।"

"তার মানে?"

বৃদ্ধ ঘুঘুপ্রবর রহস্যময় হেসে বললেন, "আজ রাত দশটায় দেখবে। ধৈর্য ধরো! তুমি সম্ভবত বটুকবাবুর সংসর্গে এসে তাঁর মতোই অতি উৎসাহী এবং অধীর হয়ে পড়েছ। সাবধান।"

লম্বা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বিকেল অব্দি। উঠে দেখলুম, কর্নেল আবার বেরিয়েছেন। বটুকবাবুর সংগে শ্মশানবন্ধু ক্লাবে গেলুম আড্ডা দিতে। আজও লাশ পড়েনি। ওরা বিমর্ষ। লাশ বওয়ার জন্য নাকি ওদের কাঁধ সুড়সুড় করে।

ক্লাব থেকে ফিরে দেখা পেলুম কর্নেলের। হেমাংগ নন্দী ইউনিফর্ম পরে কোমরে রিভলবার বেঁধে হাতে বেটন নিয়ে হাজির। বুঝলুম ফাঁদ পাতা হয়েছে।

কিন্তু রোগা শুঁটকো চেহারার এক ভদ্রলোক একপাশে চুপ করে বেজার মুখে বসে আছেন। উনি কে? বটুকবাবু ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করছিলেন। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "মাস্টারমশাই! আপনি!"

চমকে উঠলুম। ইনিই তাহলে সেই মাস্টার প্রমথ বোস? কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, "প্রাণের ভয়ে ভদ্রলোক জংগলের ভেতর মন্দিরে লুকিয়ে ছিলেন সেদিন থেকে। ভোলার বউ খাবার দিয়ে গেছে দুবেলা। কাজেই অসুবিধে হয় নি।"

হুঁ—তাহলে বাইনোকুলারে দূর থেকে মন্দিরের ওখানে ওঁকে দেখতে পেয়েই সন্দেহবশে ছুটে গিয়েছিলেন কর্নেল?....

ঢঙ ঢঙ করে দেয়ালঘড়িতে দশটা বাজল। ততক্ষণে আমাদের খাওয়াদাওয়া সারা। পোস্টমাস্টার খেলেন সামান্যই। রাতে এক গুলি আফিং পেলেই বরং সন্তুষ্ট হতেন।

কর্নেল, হেমাংগবাবু, বটুকবাবু, প্রমথবাবু আর আমি বাগানের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগাছার জংগলে গেলুম। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা সবে উঁকি দিচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। আকাশ আজ পরিষ্কার। খানিকটা যাওয়ার পর কাল রাতে দেখা পোস্টমাস্টারের বাড়ির ভিতর ঢুকে আমরা ওত পেতে বসলুম বারান্দার থামের আড়ালে। পোস্টমাস্টার উঠোনে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর অবাক হয়ে শুনি, উনি কেত্তন গাইছেন। "...মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব/কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব..."

বারকতক গেয়েছেন, হঠাৎ সদর দরজায় ঠিক বটুকবাবুর মতো এক নরদানবের আবির্ভাব ঘটল। একেবারে বটুকবাবুর প্রতিরূপ। তেমনি কদমফুলি চুল, স্পোর্টিং গেঞ্জি, আঁটো প্যান্ট, হাতে বালা। শরতকালের চাঁদের আলো খুব পরিষ্কার। তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম বেণী কুন্ডুকে।

ঢুকেই বললেন, "খুব খেল দেখালে মাইরি ডাকবাবু! কৈ—আমার পার্সেল দাও!"

পোস্টমাস্টার খিখি করে হাসলেন। "যা ভয় পেয়েছিলুম! তোমায় তো বিশ্বাস নেই হে! শেষে ভেবে দেখলুম, আপোস করে মিটিয়ে নেওয়া যাক। তাই চিঠি লিখে তোমায় ডাকলুম।"

পালোয়ান বিশাল হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেরি কোরো না। মাল দাও।"

পোস্টমাস্টার তেমনি ভূতুড়ে হেসে বললেন, "মাইরি বেণী! তুমি আমার চোখের সামনে মিত্তিরকে ঠকাস করে মারলে আর নেতিয়ে পড়ল! উঃ! দেখে যা ভয় পেয়েছিলুম!"

"তুমি দেখেছিলে তাহলে? ঠিক আছে। মাল দাও!"

"দিচ্ছি রে বাবা, দিচ্ছি!" পোস্টমাস্টার বললেন। "উঃ! চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্যে মিত্তির আমার মড়া দেখতে আসছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। দেখি, তুমি ওর মাথায় ঠকাস করে—বাপ্‌স! দেখেই আমার বাকি নেশার ঘোর কেটে গেল। তখন দিশেহারা হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলুম। বাড়ি ঢোকার সাহসই হল না।"

পালোয়ান দু হাতে ওঁকে আচমকা শূন্যে তুললেন পুতুলের মতো। পোস্টমাস্টার হাত পা ছুঁড়তে থাকলেন। বুঝলুম, স্কুলমাস্টারের লাশ তুলে নিয়ে যেতে ওই পালোয়ানের একটুও অসুবিধে হয় নি।

কিন্তু তখনই এক কান্ড ঘটে গেল। আচমকা বটুকবাবু লাফ মেরে উঠোনে পড়লেন। তারপর 'তবে রে ব্যাটা। কাল রাতে আমাকে বিছুটি না আলকুশি মেরে পালিয়েছিলে তাহলে তুমিই?' বলেই জাপটে ধরলেন বেণী কুন্ডুকে। পোস্টমাস্টার ছাড়া পেয়ে হাততালি দিয়ে কুস্তি দেখতে থাকলেন। দুই পালোয়ানে জাপটা-জাপটি, মাটিতে গড়াগড়ি শুরু হলো। ধুন্ধুমার সেই তুলকালামে ভূমিকম্প হচ্ছিল যেন। মাটি কাঁপছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ এই কুস্তি দেখতে দিলেন না কর্নেল। টর্চের আলো ফেলে বললেন, "খুব হয়েছে বটুকবাবু! বেণীবাবু! এবার উঠে পড়ুন।" বেণী কুন্ডু হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রতিপক্ষকে ছেড়ে। সংগে সংগে হেমাংগবাবু দৌড়ে গিয়ে ওঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। দরজা দিয়ে একদংগল কনস্টেবলও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। পোস্টমাস্টার তখনও খি খি করে হেসে হাততালি দিচ্ছেন।....

ছবি—অলয় ঘোষাল

পুষ্যি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

পায়ের নিচে পুষ্যি নিলাম
নাম দিলাম তার পাপোষ
জুতোর সংগে আপোষ।

বিটলে বামুন খিটকেলে
ক্ষুধায় খাবে ইঁট পেলে।
কথা কইতে কইতে
দেখায় তুলে পৈতে,

গুরুভোজন যখন করে শুরু
বক্ষ দুরুদুরু।
পরনে তার ফতুয়া
পায়ে নেইতো জুতুয়া,
কাদা পায়েই উঠ্-বোস
পাপোষের কি আপশোষ!
সারা ঘরটা ভরলো কাদায়
পাপোষকে কে অমন কাঁদায়,
বারণ করে হন্যে,
তবে আমি পুষ্যি নিলাম
পাপোষ কার জন্যে?

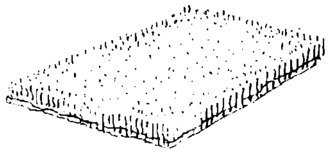

ছবি : দিলীপ দাশ

আজব চুরি

দেবল দেববর্মা

শহরে হঠাৎ চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

এপাড়া-ওপাড়া এমনকি বি. ডি. আর. রেলের ইস্টিশান ছাড়িয়ে ভাদুল যাবার রাস্তার ধারে একটা বাড়িতে সেদিন চুরি হলো।

বারো দিনে তেরোটা চুরি। থানার বড় দারোগা তপেশরঞ্জন মাথায় হাত দিয়ে বসল। এই একরত্তি শহরটায় যদি নিত্যি চুরি লেগে থাকে তাহলে ওপরওলাকে কী কৈফিয়ত দেবে? আর পুলিশ সাহেব নিশ্চয় ভাববেন, লোকটা অপদার্থ। অকর্মার ধাড়ী। শহরের গুন্ডা-বদমাশ, চোর-ছ্যাঁচোড়, দাগী আসামী, কারো সন্ধান রাখে না। থানার চেয়ারে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। অপরাধীরা তাই শহরটাকে স্বর্গরাজ্য ভেবে নিশ্চিন্তে রোজ কুকর্ম করে যাচ্ছে।

এখানে এসে তাকে এমন বেকায়দায় পড়তে হবে তপেশরঞ্জন তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। এই ছোট শহরটার চোর-বদমাশের দল যেন তাকে বেকুব বানিয়ে ছাড়বে। শুধু প্রথম মাসটা যা একটু সুখশান্তিতে কেটেছে। চুরি-ডাকাতি খুন-জখম, লুঠ-রাহাজানি সব মিলিয়ে একটি মাত্র ঘটনা। তাও শহরে নয়, মাইল দুই দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটা বড় রকমের চুরি হয়ে গেল। সেজন্য গৃহস্বামীর গাফিলতি আছে। বলতে গেলে বাড়িটা প্রায় অরক্ষিতই ছিল। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন কলকাতায় এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে। আশ্চর্য মানুষ! ঘরদোর পাহারা দেবার কোনো ব্যবস্থা করে যান নি। অন্তত পাড়াপড়শীর কাউকে যদি রাত্তিরে শোবার কথা বলে যেতেন, তাহলে চোর বাবাজী এমন অনায়াসে তালা ভেঙে বাসন-কোসন, ঘড়া-কলসি, ট্রানজিস্টর রেডিও, সেলাইকল ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে চম্পট দেবার সুযোগ পেত না। অবশ্য তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন একটা লোক ধরাও পড়েছে। তাকে জেরা করে কিঞ্চিৎ দাওয়াই দিতেই এই অঞ্চলের চুরি-ডাকাতির বহু কথা জানা গেল। তপেশরঞ্জন আশা করেছিল আরো অনেক অপকর্মের সংগে জড়িত একটা বড়ো গ্যাংকে সে শীগগির আসামীর কাঠগড়ায় তুলতে পারবে।

কিন্তু পরের মাসেই সব যেন গন্ডগোল হতে শুরু করল। প্রথম মাসটা এই শহরের দাগী আসামীরা

বোধহয় বড় দারোগাকে একটু বাজিয়ে দেখছিল। এবার তড়িঘড়ি তারা কাজে হাত লাগাল। ইংরেজী এপ্রিল মাস। আর ওই মাসের পয়লা তারিখে তপেশরঞ্জনকে এপ্রিল ফুল বানিয়ে শহরের বুকে প্রথম চুরি। প্রতাপ-বাগানের একটা দোতলা বাড়ির নিচের তলার রান্নাঘর থেকে বেশ কিছু জিনিসপত্র লোপাট হলো। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই নিচে নেমে গৃহস্থ দেখল রান্নাঘরের দরজা হাট করে খোলা। পাঁচ-ছটা কাঁসার থালা, তিন-চারটে বড় বাটি আর ছ-সাতটা গেলাস নিপাত্তা। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে যে ব্যাপারটা পুলিশকে ভাবিয়ে তুলল তা হলো বাইরের দরজা খুলে বামালসুদ্ধ কেউ বেরিয়ে যায় নি। আবার বাড়ির কোথাও অর্থাৎ রান্না ঘরের মেঝেতে কিংবা অন্য কোনোখানে চোর মহাপ্রভুর পদচিহ্নটি পর্যন্ত নেই। ফলে সামান্য চুরি কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো।

পরদিন শহরে ওই এক ঘটনা। এবার চুরি হলো ফিডার রোড থেকে। তবে রান্নাঘরের তৈজসপত্র নয়, বেডরুমের পাশে অন্য একটা ঘরে আলনাতে কয়েকটা দামী শাড়ি ছিল। গভীর রাতে চোর কখন ভিতরে ঢুকে শাড়ি ক'খানা নিয়ে চম্পট দিয়েছে কেউ তা টের পায় নি। অথচ সেখানেও ওই এক ব্যাপার। ঘরের দরজায় ছিটকিনি ছিল। রাত্তিরে কেউ তা খোলে নি। কিংবা চোরে দরজা ভাঙে নি। অথচ শাড়িগুলো যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অবাক কান্ড! তাহলে চোরটা ঢুকল কেমন করে? আবার বেরুল কোন পথ দিয়ে? শুধু বাড়ির লোক কেন, থানার তাবড় পুলিশ অফিসাররা মাথা ঘামিয়ে এর জবাব খুঁজে পেল না।

তৃতীয় দিনের চুরিটা যেন এক লহমার ব্যাপার। মনে হবে চোরটা বুঝি তক্কে তক্কে ছিল। জেলা স্কুলের দিবাকর স্যার আড়াডাঙায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন।

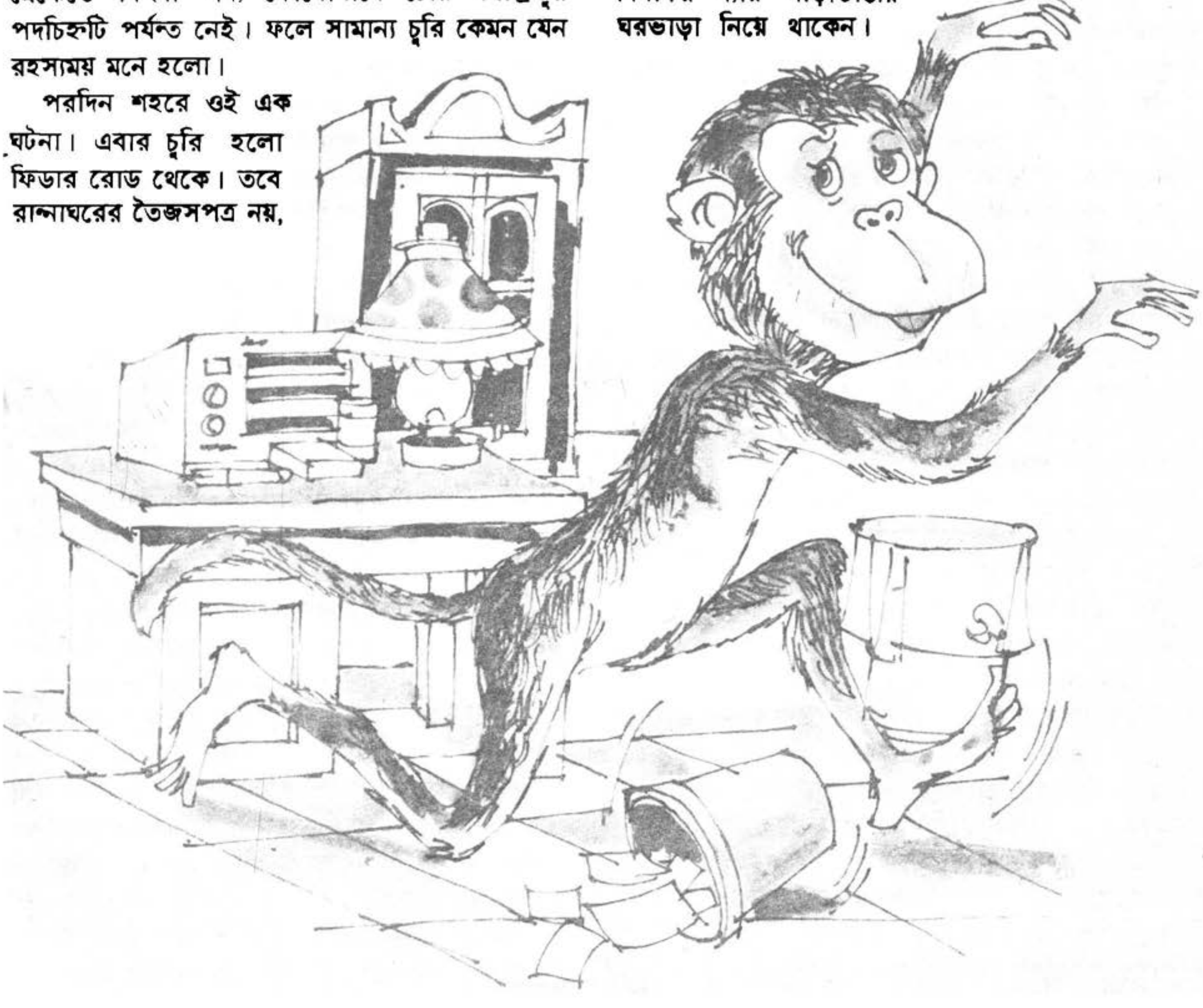

কিছুদিন হলো স্ত্রী বাপের বাড়িতে। এখন তাই স্কুলের বোর্ডিঙে খাওয়ার ব্যবস্থা। রোজ রাত্তির সাড়ে নটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বোর্ডিঙে খেতে চলে যান। সেদিনও গেছেন। যাবার সময় সদর দরজায় তালা দিতে ভুল হয় নি। সামনের ঘরে টেবিলের ওপর দামী হাতঘড়ি আর একটা বিলিতী কলম ছিল। ঘড়িটা বিয়েতে শ্বশুরের দেওয়া আর কলমটা তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধু বিদেশ থেকে ঘুরে এসে প্রেজেন্ট করেছিল। খাওয়া সেরে চটপট চলে আসবেন ভেবে ঘড়ি আর কলমটা সংগে নেন নি। কিন্তু বাড়ি ফিরে দরজা খুলে চক্ষু ছানাবড়া। টেবিলের ওপর থেকে খান দুই-তিন বই কেউ টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে। টেবিলের জিনিসপত্র ঈষৎ অগোছালো। কিন্তু তাঁর রিস্টওয়াচ আর কলমটা তো নেই। দিবাকর অনেক খুঁজলেন, বারবার চিন্তা করলেন যদি অন্য কোথাও থাকে। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট মনে আছে টেবিলে হাতঘড়ি আর কলমটা ছিল। তাছাড়া ঘরের মধ্যে যে কেউ এসেছিল তার প্রমাণ তো সামনে। টেবিলের ওপর জিনিসপত্র তিনি কস্মিনকালেও অমন এলোমেলো করে রেখে যান নি। অথচ সদর দরজায় তালা। যাবার সময় যেমন ছিল ফিরে এসেও ঠিক তেমনটি দেখেছেন। অটুট, অক্ষত। তাহলে চোরটা ঢুকল কেমন করে? কলম আর হাতঘড়িটা কব্জা করে পালালই বা কোন পথ দিয়ে?

বারো দিনে তেরোটা চুরি হতেই তপেশরঞ্জন একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল। ডাকাতি-রাহাজানি কিংবা খুন-খারাপির ঘটনা নয়। নেহাৎ ছোটখাটো চুরির ব্যাপার। নইলে বড় সাহেব চটেমটে কবে তাকে একটা ওঁছা থানায় বদলি করে দিত। কিন্তু যা চলছে তাতে অমন একটা দুর্ঘটনা হলেই হয়। টাকা-পয়সা, সোনার অলংকার নাই বা খোয়া গেল। তবু একনাগাড়ে পরপর বারো দিন চুরি। তাও আবার দশ দিনের মাথায় এক রাত্তিরে দুবার। রাত্তির এগারোটা নাগাদ নতুন বাজারে, ফের শেষ রাত্তিরে স্কুলডাঙায়।

বড় দারোগা তো দিশেহারা। তদন্ত করতে গিয়ে কোনো খেই পাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই, চোর কোথাও দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে নি। সব বাড়িতে সদর দরজায় কিংবা সেই ঘরের ভিতর থেকে ছিটকিনি অথবা খিল দেওয়া ছিল। তাহলে চোর কি অদৃশ্য মানুষের বেশে ঘরে ঢুকে দামী জিনিসপত্র হাতিয়ে নিঃশব্দে চম্পট দিয়েছে? কেমন করে সেটা সম্ভব তা পুলিশ কেন, শহরের মানুষও ভেবে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে শহরে একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য চুরির পিছনে কোনো রহস্য থাকলে এই ধরনের গুজব ছড়ায়। নতুন চটির একজন দোকানী বলল, শেষ রাত্তিরে প্রায় খেজুর গাছের মতো ঢ্যাঙা একটা ছায়ামূর্তিকে সে পথ দিয়ে যেতে দেখেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে সে দেখেছে ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ কেমন খর্বাকৃতি হয়ে কিছুদূরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

সানবান্দার হিমানী পিসী শুনে বলল, তা হতে পারে। বোধহয় মরার আগে চোর-টোর ছিল। আত্মাটা এখনও মুক্তি পায় নি। রাতদুপুরে গেরস্থর ঘরে ঢুকে তাই চুরি করে বেড়াচ্ছে।

ভাইপো কমল বেজায় ভীতু। সে পিসীর দিকে তাকিয়ে বলল, ওসব কথা কেন বলছ? রাত্তিরে আমার ভয় লাগবে না বুঝি?

ফিডার রোডের বীরেন হাজরা বলল, চুরি নয় মশায়, এ হলো ভুতুড়ে কান্ড। নইলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ, অথচ ঘরের জিনিসপত্র হাওয়া হয়ে গেল! প্রেতাত্মা ছাড়া এমন অপকর্ম কার হবে?

ইতিমধ্যে একদিন বড়ো সাহেবের তলব আসতেই তপেশরঞ্জনের কাহিল অবস্থা। কাঁচুমাচু হয়ে সামনে দাঁড়াতেই পুলিশ সাহেব ধমকে বললেন, এক ডজনের বেশি চুরি হয়ে গেল, অথচ একটা চোরকেও ধরতে পারলেন না? এরপর পাবলিকের কাছে পুলিশের ইমেজটা কী হবে বুঝতে পারছেন?

বড় দারোগা আমতা আমতা করে বলল, খুব চেষ্টা করছি স্যর। ইয়ে—মনে হচ্ছে শীগগির একটা ফয়সালা হবে।

কিস্যু হবে না। আসলে আপনি একটা অকর্মার ধাড়ি। পুলিশ সাহেব হুংকার ছেড়ে বললেন, যান, তিন দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত চাই, নইলে—

তপেশরঞ্জন বিমর্ষ মুখে থানার চেয়ারে এসে বসল। এমন অকূলেও মানুষ পড়ে! হঠাৎ টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠতেই সে রিসিভার তুলে শুনতে পেল কলকাতা থেকে ট্রাংককল। অপর প্রান্তে রতীশ, তার ক্লাশফ্রেন্ড রতীশ মিত্র। চাকরি-বাকরি করে না, কিন্তু অপরাধ বিষয় নিয়ে বিস্তর পড়াশুনো। দেশী-বিদেশী নানা ধরনের কেস, চুরি-ডাকাতির বিভিন্ন কলাকৌশল সমস্ত কিছু নিয়ে দীর্ঘকাল স্টাডি করছে। কলকাতা পুলিশ অনেক জটিল কেসে ওর সাহায্য নেয়। এতক্ষণে তপেশরঞ্জনের মুখখানা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কী ব্যাপার? তুই হঠাৎ ফোন করলি যে।

তোর ওখানে আজ সন্ধ্যেবেলা গিয়ে পৌঁছব, বুঝলি?

টেলিফোনে রতীশের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সে বলল, কাল সকালে মুকুটমণিপুরে যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আছে। তুই সুদ্ধ সঙ্গে যাবি।

আমি? তপেশরঞ্জন একটা ঢোক গিলে কথা কইল, কিন্তু আমি যে ভীষণ গাড্ডায় পড়ে গেছি ভাই।

গাড্ডা? গাড্ডা কিসের?

এলে জানতে পারবি।

ঠিক আছে। তোকে গাড্ডা থেকে তুলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে, কী বল?—টেলিফোনে জবাব এলো।

রতীশ অমনি ভীষণ ফূর্তিবাজ। তবু টেলিফোনটা পেয়ে তপেশরঞ্জনের সাহস ফিরে এলো। এখন অন্ধকারের বুকে ঈষৎ রূপোলী ঝিলিক সে দেখতে পাচ্ছে। বুদ্ধি খাটিয়ে রতীশ যদি এই চুরির একটা কিনারা করে দেয় তাহলে মুখ রক্ষে। নইলে ভালো অফিসার বলে তার এতদিনের সুনাম তো যেতে বসেছে!

সন্ধ্যের মুখে রতীশ হুড়মুড় করে এসে পৌঁছল। কলকাতা থেকে এতখানি রাস্তা একাই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। ঢুকেই বলল, আরি ব্বাস! তোর মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে যেন সাতবার পরীক্ষায় ফেল করেছিস।

এক ডজনের বেশি চুরি হয়ে গেল, অথচ একটা চোরকেও ধরতে পারলেন না।

সাতবার নয়, তেরোবার,—তপেশরঞ্জন অম্লান বদনে জবাব দিল।

রতীশ ভ্রূ কুঁচকে শুধোল, কী হয়েছে খুলে বল, নইলে তোকে গাড্ডা থেকে তুলব কেমন করে?

অগত্যা তপেশরঞ্জনকে বারো দিনের চুরির ঘটনা ব্যাখ্যা করে বলতে হলো।

রতীশ মন দিয়ে শুনল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, আগে চা খাই। তারপর চল যে সমস্ত বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে সেগুলো একবার সরেজমিনে দেখে আসি।

তপেশরঞ্জন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই চুরির একটা কিনারা করতে না পারলে আমার এখানে পরমায়ু ফুরিয়ে এলো জানবি।

তার মানে?—রতীশ অপাঙ্গে তাকাল।

তপেশরঞ্জন বলল, বড় সাহেব তেরাত্তির সময় দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা বিহিত করতে পারলে ভালো। অন্যথা নির্ঘাৎ কোনো পানিশমেন্ট স্টেশনে বদলি করে দেবে।

ঘাবড়াও মৎ।—রতীশ তাকে আশ্বাস দিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, তোর কেসটা ভারি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

মিনিট দশ পরে জীপ নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পাঁচ-ছ জায়গা ঘুরে রতীশ বলল, থাক, আর যাবার প্রয়োজন নেই। সব কেসে একই কৌশলে চুরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

জীপে উঠে তপেশরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, কিছু আন্দাজ করতে পারলি?

আন্দাজ করব কেন? স্বচক্ষে দেখলাম,—রতীশ জবাব দিল।

কি দেখলি তাই বল।

রতীশ হেসে উত্তর দিল, যে সমস্ত ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি গেছে সেগুলো রাস্তার ধারে।

হ্যাঁ, তা ঠিক! তপেশরঞ্জন ঈষৎ চিন্তা করে জবাব দিল।

ঘরগুলো সব একতলায় মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, তাই না?

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।

রতীশ এবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা, যে সমস্ত জিনিস মিসিং মানে খোয়া গেছে তার একটা লিস্ট নিশ্চয় তোর কাছে রয়েছে?

অবশ্য, তুই চাইলে এক্ষুণি দেখাতে পারি।

রতীশ তালিকাটি দেখতে চাইল। বার কয়েক চোখ বুলিয়ে সেটি টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, থালা-বাসন, ধুতি-শাড়ি, ঘড়ি-কলম, এই সমস্ত চুরি গেছে বেশি।

হ্যাঁ। ওর চেয়ে দামী জিনিস নেয় নি। শুধু পাঠকপাড়ার একটা বাড়ি থেকে সোনার হার চুরি গেছে।

শুনে রতীশ হো হো করে হেসে উঠল।

হারটা নিশ্চয় ঘরের মধ্যে কোথাও রেখেছিল?

একজাক্টলি। –তপেশরঞ্জন স্বীকার করল। বলল, ভদ্রমহিলা রোজকার মতো শোবার আগে গলার হারটা খুলে বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন সেটি লোপাট হয়েছে।

রতীশ ফের প্রশ্ন করল, কোনো ভারি কিংবা বড়ো জিনিস তো চুরি যায় নি? এই ধর সাইকেল, সেলাইকল, পেতলের কলসি কিংবা রেডিও?

না,–তপেশরঞ্জন ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল।

রতীশ বলল, যে ঘরগুলো থেকে চুরি হয়েছে তার জানালায় লোহার কিংবা কাঠের শিক, নকশা করা গ্রীল কোথাও ছিল না।

ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল এবং দুর্বোধ্য হচ্ছে দেখে তপেশরঞ্জন একটা অসহায় ভঙ্গি করল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, ভিতর থেকে ঘরের দরজা তো বন্ধ ছিল। সাইকেল কিংবা সেলাইকল নিয়ে চোরটা পালাবে কেমন করে?

রতীশ হঠাৎ বলল, আমার মনে হচ্ছে চুরিটা মানুষের কাজ নয়।

তাহলে?–তপেশরঞ্জন বোকার মতো তাকাল।

রতীশ জবাব দিল, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে। বছর দুই আগে কালিকট শহরে এই ধরনের চুরি হচ্ছিল। কেউ তার সমাধান করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত চোরটা অবিশ্যি ধরা পড়ল। সে এক মজার ব্যাপার–

তপেশরঞ্জন বলল, এখানকার লোকের ঠিক তোর মতো ধারণা। চুরিটা মানুষের কর্ম নয়। এ হলো অপদেবতার কাজ। প্রেতাত্মা কিংবা ভূতে এই চুরি করছে। তাই পুলিশ নয়, গুণিন কিংবা ভূতের ওঝাকে অনেক বাড়িতে ডেকে পাঠাচ্ছে।

শুনে রতীশ হো-হো করে হেসে উঠল।

তপেশরঞ্জন দুঃখ করে বলল, তুই হাসছিস। কিন্তু কী রকম ইনসাল্ট বল। চুরির কেসে পুলিশকে খবর না দিয়ে লোকে গুণিন আর ভূতের ওঝা ডেকে আনছে।

হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রতীশ বলল, গাড়ি থামা। আচ্ছা, এ বাড়িতে এখনও চুরি হয় নি?

না,–তপেশরঞ্জন মাথা নাড়ল। বলল, ভদ্রলোক কলেজে পড়ান। দিন পনের ছুটি নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। সম্ভবত গতকাল ফিরেছেন।

রাস্তার ধারের ঘরে দুটো বড় জানালায় লোহার শিক।

মাঝখানে একটা চৌকি, ওপাশে চেয়ার-টেবিল। কোনো আলনায় শাড়ি-জামা রয়েছে।

রতীশ হঠাৎ যেন ভবিষ্যদ্বাণী করল, আজ রাত্তিরে এই বাড়িতে চুরি হতে পারে।

কেমন করে জানলি ?—তপেশরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

রতীশ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, বাড়িতে ক'জন মেম্বার ?

শুনেছি তিনজন। স্বামী-স্ত্রী আর একটি মেয়ে।

বাড়ির মালিককে এই ঘরটা আজ ছেড়ে দিতে বল। একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল রাত্তিরে শুয়ে থাকবে।

তারপর ? —তপেশরঞ্জন প্রশ্ন করল।

রতীশ বলল, তার কাজ খুব সামান্য। ঘরে বেল বেজে উঠলেই সে তাড়াতাড়ি জানালার পাল্লা দুটো টেনে দেবে।

বেল বাজবে কেমন করে ?

ওটা সোজা ব্যাপার।—রতীশ হাসল। বলল, একটা ছোট অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেই বেল বাজবে। তুই ভদ্রলোকের সংগে কথা বল। তারপর একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে নিয়ে এলেই আমি সব বুঝিয়ে দেব।

সমস্ত ব্যবস্থা করতে একঘন্টাও লাগল না। টেবিলের ওপর মণিব্যাগ, হাতঘড়ি আর কলম পড়ে রইল। এছাড়া একটা চকচকে পানের ডিবে, বাইরে থেকে দেখলে সেটি রুপোর বলে মনে হবে। সুকৌশলে ইলেকট্রিক তারের এমন কনেকশন করা হলো যে টেবিলের জিনিসপত্রে হাত দিলেই বেলটা বেজে উঠবে। আর চৌকিতে সেই সাদা পোশাকের পুলিশমশায় গাঢ় নিদ্রার ভান করে শুয়ে থাকল।

জানালা দুটো হাট করে খোলা। তবু তপেশরঞ্জন সন্দেহ প্রকাশ করল, ধর, চোর ব্যাটা যদি এদিকে না আসে।

সেটা তোর কপাল, রতীশ মুচকি হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আমার মন বলছে ঘুঘু আজ ফাঁদে পড়বে।

রাত্তির আড়াইটের সময় অকস্মাৎ বাঁশির সুতীক্ষ্ণ শব্দ কানে যেতেই বড় দারোগাকে সংগে নিয়ে রতীশ অকুস্থলে এসে পৌঁছল। কনস্টেবলকে নির্দেশ ছিল জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে বাঁশিটা যেন সে বাজিয়ে দেয়। তাছাড়া চোর ধরা পড়েছে শুনে কলেজের সেই প্রফেসর এবং পাড়ার অনেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু চোর কোথায় ? বন্ধ ঘরের ভিতর কে যেন এদিক-ওদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

তপেশরঞ্জন ধমক দিয়ে সেই কনস্টেবলকে বলল,—লোকটাকে তুমি অ্যারেস্ট করতে পার নি ?

কে একজন জবাব দিল, কাকে অ্যারেস্ট করবে মশায় ? ও তো চোর নয়, একটা লালমুখো মেনী বাঁদর।

মেনী বাঁদর ? তাহলে চোর ধরা পড়ে নি ?—তপেশরঞ্জন অসহায় চোখে তাকাল।

রতীশ তাকে আশ্বাস দিল, একটু ধৈর্য ধর। সে ব্যাটাকেও এখুনি দেখতে পাবি।

আসল চোর বাঁদর নয়, বাঁদরের মালিক। সে ততক্ষণে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সটকে পড়েছে। কিন্তু রতীশ আগেই শহর থেকে বেরোবার মুখে পুলিশ মোতায়েন রেখেছিল। আরো দুটি বাঁদর সহ হলধর ধরা পড়ল তাদের হাতে।

মারের ভয়ে হলধর সব কবুল করল। দিনের বেলা পাড়ায় পাড়ায় সে বাঁদর নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। বাড়িঘর লক্ষ্য করে। আর রাত্তির বেলা এই কম্মো। চুরির কৌশলটা সে মাথা খাটিয়ে বের করেছিল। ছোট বাঁদরটাকে ঘরে ঢুকিয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলত। পোষা বাঁদরকে শিখিয়েছিল যে বস্তুর ওপর আলো ফেলবে সেটি এনে তার হাতে দেবে। এমনি করেই থালা-বাসন, শাড়ি-জামা, রিস্টওয়াচ-কলম, এমন কি একটা সোনার হার পর্যন্ত চুরি করেছে।

তপেশরঞ্জন চোখ দুটি বড় বড় করে বলল,—আরি ব্বাস! চোরের পেটে এত বুদ্ধি থাকলে কখনও চুরি ধরা পড়ে ?

রতীশ মৃদু হেসে বলল, তোর মুখ থেকে আদ্যোপান্ত সব শুনে আমার সন্দেহ হলো। বছর পাঁচ আগে কালিকট শহরে এমনি চুরি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বাঁদরটা ধরা পড়তেই সব ফাঁস হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত থামল রতীশ। বন্ধুকে লক্ষ্য করে ফের বলল, কাল সকালেই কিন্তু মুকুটমণিপুর। কথাটা মনে থাকে যেন ?

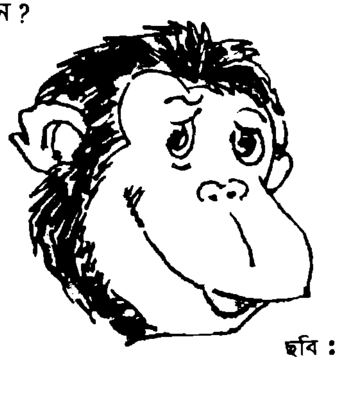

ছবি : সরোজ সরকার

পিনডিদার তেলতত্ত্ব

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আমার বাবা মা দু'তিন দিনের জন্য কোথাও গেলে আমি একেবারে খুশি যে হই না এমন নয়। আমার জন্য মায়ের উতলা ভাবটুকু দেখে খুশি হই। বাবার গুরুগম্ভীর উপদেশের পিছনে আমার জন্য একটু চাপা দুশ্চিন্তা আছে জেনেও খুশি হই। এ-টুকু বুঝতে পারি এক-মাত্র ছেলেকে রেখে বাবা-মায়ের কোথাও যেতে মন সরে না। কিন্তু সামাজিকতার দায়ে মাঝে-সাজে তাদের যেতেই হয়। আর বলতে লজ্জা করে, কোথাও যাবার আগে মা আমাকে বেশ কয়েকটা টাকা বাড়তি দিয়ে আমার মন ভালো করে দিয়ে যায়। সে-টাকা বাবার খরচের টাকা দিয়ে যাওয়ার হিসেবের মধ্যে পড়ে না! আর বাবাও খরচের টাকা দরাজ হাতে দিয়ে যায়।

আমাকে তো গুরু দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে থাকতেই হয়। আমিসুদ্ধু চলে গেলে বুড়ী ঠাকুমাকে দেখে কে? তার তো আর হুট-হাট কোথাও যাবার উপায় নেই। আমিও ভাব দেখাই যেন কর্তব্যের দায়ে থেকে যেতে হচ্ছে। একদিকে যেমন খুশি হই, অন্য দিকে একটু মন খারাপও কি হয় না? তখনই তো বুঝতে পারি, উঠতে-বসতে আমার যত খুঁতই ধরা হোক, তলায় তলায় আমাকে তারা ভালই বাসে।

কিন্তু আমার মনের ভাব যা-ই হোক, বাবা-মা দু'পাঁচ দিনের জন্যে কোথাও যাচ্ছে শুনলে কেবলু কার্তিক হাবুল এমন কি চটপটিও অমন নেচে ওঠে কেন? যেন ওদেরই কোনো দুর্গ্রহ সরে যাচ্ছে। আর পিনডিদা? তার মুখ দেখে কি মন বোঝার উপায় আছে? তবু খুব বুঝতে পারি ভিতরে ভিতরে সে-ই সব থেকে খুশি হয়। আর, কাউকে বুঝতে না দিয়ে কল-কাঠি সেই নাড়ে।

এবারে বাবা-মাকে দু'দিনের জন্য কলকাতা যেতে হচ্ছে বাবার এক খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে। না গিয়ে উপায় নেই। একে আমরা বর্ধমানে থাকি, খুব একটা যোগাযোগ নেই। এর ওপর না গেলে একটাই কথা সকলে বলবে, মস্ত বড় লোক এখন, আসবে কেন!

মা আর বাবার এই গোছের আলোচনা তাদের অলক্ষ্যে আমি নিজেই শুনেছি।

তারা দু'দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে, বোকার মতো এ-খবরটা মাঠে বসে আমি নিজেই দিয়েছিলাম। আমারও যদি পেটে কোনো কথা থাকত। শুনেই চটপটি তিড়িং করে নেচে উঠল, বলল, তাহলে আদায়-টাদায় যা করার ঠিক মতো করে রাখিস।

কেবলু সংস্কৃত ঝাড়ল, একঘেয়ে মরুভূমিতে ওয়েসিস্ দর্শনম্! একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম অবশ্য করণীয়ম্!

আমার রাগ হয়ে যাচ্ছিল। মনের দিক থেকে চটপটি কেবলু আর কার্তিক অনেকটা আমার দিকে। পিন্‌ডিদার নাগাল পাবার আগে আমিই তো দলের লিডার ছিলাম! কার্তিক অবশ্য চুপচাপ, তবু আমার মনে হল ওর মুখেও খুশির জেল্লা দেখছি। আমার রাগ হবে না তো কি? কিছু বাড়তি লাভ হয় বলে কি বাবা-মাকে আমি ভালোবাসি না?

কিন্তু গা জ্বলে গেল হাবুলের কথা শুনে। ও কেবলুকে সাপোর্ট করে বলল, স্পেশাল প্রোগ্রাম তো একটা করাই উচিত—কিন্তু সোনার তো আবার সর্ব ব্যাপারে মুখ শুকনোর স্বভাব—হয়তো বলবে বাবা মা বাড়তি তেমন কিছুই দিয়ে যায়নি।

আমার আর সহ্য হল না। বলে উঠলাম, তোর বপুখানা যেমন হাতীর মতো, বুদ্ধিও তেমনি ...

শুনেই হেবো হোঁতকা খাপ্পা হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে দুই হাঁটুর ওপর উঠে বসল।—পিন্‌ডিদা, ওকে তুমি সাবধান করো, আমি কিন্তু ওর মাথাটা ছাতু করে দিয়ে জেলে যাব!

চটপটি মন্তব্য করল, ফাঁসি যাবি।

পিন্‌ডিদা অলস চোখে হেবোর দিকে তাকালো। বলল, সোনা ঠিকই বলেছে, বাবা মা যাচ্ছে ওর দুঃখু হচ্ছে কিনা খোঁজ নিয়েছিস? বাবা মা কি কম জিনিস?

হাবুল চুপসে গেল।

কেবলু উপযুক্ত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলল, পিতা-মাতাহি ধর্মঃ, পিতা-মাতাহি কর্মঃ, স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বিরক্তিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তোর গালে এক চড় কশায়সি—মা সংগে আছে বলে বাবাসুদ্ধ স্ত্রীবাচক গরীয়সী হয়ে গেল!

কেবলু সংশোধন করল, গরীয়ান্ হবে।

—মাতা গরীয়ান্ হবে কি করে?

—তাহলে পিতা-মাতাহি গরীয়ান-গরীয়সী হবে।

পিন্‌ডিদা বলল, তুই মুখ সেলাই করে বসে থাকলে সব থেকে ভালো হবে।

পিন্‌ডিদা আজ খুব মুডে নেই। তাকে মুডে আনার মতো আমি কোনো ব্যবস্থাও করিনি। খানিক মুখ গোঁজ করে থেকে পিন্‌ডিদা মুখ তুলল।—ভালো লাগছে না, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিবি চল্‌তো হেবো—

ঢিবির আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ঢোসকা হাবুলও সংগে সংগে উঠে দাঁড়ালো। পিন্‌ডিদার কাছ থেকে যেন একটু বাড়তি কদর লাভ হল তার। আমার দিকে একবার চোখের ঝাপটা মেরে বলল, এমন শুকনো মুখে আর কাঁহাতক ভালো লাগে—চলো পিন্‌ডিদা।

তারা খানিক এগোতে চটপটি আর কার্তিকের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।—আমার বাবা-মা থাকবে না এটা তোদের কাছে খুব একটা উৎসব—কেমন?

গলা শুকিয়ে চটপটি বলল, তা কেন, ওঁরা না থাকলে একটু বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা হয় তো, তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

—আমার মন খারাপ থাকে বলে বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা করি—তোরা এত হ্যাংলার মতো করিস কেন?

বেজায় চটেছি এটা কেবলুও বুঝতে পারছে। তা না হলে পিন্‌ডিদাকে ফেরাতাম, একটু আনন্দ দেবার ব্যবস্থাও করতাম। হাত জোড় করে বলল, সত্যি অন্যায় হয়েছে, তুই আমাদের ক্ষমা করে দে সোনা—ক্ষমাহি পরমং তপঃ।

পিন্‌ডিদা কেন এগিয়ে দেবার জন্য হাবুলকে ডেকে নিয়ে গেল এটা পরদিন বিকেলে বোঝা গেল। দারুণ কিছু কাজের ভার পেলে যেমন খুশি উপছে ওঠে তেমনি থলথলে মুখ ওর। উঁচু ঢিবির আসনে বসে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। হাবুলের যেন হঠাৎই কিছু মনে পড়ল।—হ্যাঁরে চটপটি, সোনার বাবা-মা মানে আমাদের মাননীয় মেসোমশাই মাসিমা দু'দিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছেন...তুই কি যেন স্পেশাল প্রোগ্রাম করার কথা বলছিলি?

চটপটি গত কালের দাবড়ানি ভোলেনি। দায়টা কেবলুর ঘাড়ে চাপালো।—আমি টাকা-কড়ি আদায় করে রাখার কথা বলেছিলাম...বাবা, মা দু'দিন থাকবে না, সোনার তো একটু মন খারাপ হবেই—তাই একটু ফূর্তি-টুর্তির মধ্যে থাকার জন্যে—স্পেশাল প্রোগ্রামের কথা কেবলু বলেছিল—ওর যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত।

বেগতিক দেখে কেবলু কবুল করল, আমি তো মূর্খ, নইলে বার বার ফেল করি—মূর্খস্য বচনম্ বালভাষিতং—সোনা কালই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

শেখানো-পড়ানো হোঁতকা হাবুল কথার মাঝে এ-রকম বিঘ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, খেই হারিয়ে অসহায় চোখে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো। পিন্‌ডিদা ধমকে উঠল, কি বলতে যাচ্ছিলি—তোর মাথায় কি আছে যে আমি বলব? ইডিয়েট কোথাকারের—

হাবুল হাঁসফাঁস করে উঠল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে—

ও পিন্‌ডিদার শেখানো বুলি কিছু আওড়াবে ধরতে পেরে আমি ওঁর টুঁটি টিপে ধরার মতো করে বলে উঠলাম, মনে পড়েছে মানে কি, তুই তোর নিজের কথা বলছিস না?

—চটপটি আর কেবলুটার জন্য নিজের কথাই তো তালগোল পাকিয়ে গেছল—খাঁটি নিজের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, যাকে

বলে ওরিজিন্যাল–

–আচ্ছা বল্।

–শোন্ সোনা, তুই তো খাঁটি সোনাই বটে একখানা, বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে–তাঁরা দু'দিন থাকছেন না শুনে আমাদেরই কেমন লাগছে–তোর তো ভিতরটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে–করছে কিনা বল্–

শুরুতেই বুঝতে পারছি শেখানো বুলি। এ-রকম বেঁধে কথা বলার সাধ্য হেবো হোঁতকার নেই। আমি গম্ভীর।–বলে যা।

–তাই বলছিলাম তোর মন খারাপ হতে বাধ্য।...তা তোর প্রতি তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তাই বলছিলাম, মাসিমা মেসোমশাই চলে গেলে আমরা যদি একটা রাত সকলে মিলে তোদের ওখানে কাটিয়ে দিই–তাহলে দারুণ হয় না? তোর আর অত খারাপ লাগবে না–আমরাও একটা রাত নতুনভাবে কাটিয়ে দেব।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-প্রস্তাব হেবো হোঁতকার মগজের নয়। হতেই পারে না। একটা রাত সক্কলে মিলে আমাদের বাড়িতে কাটানো মানে বড় খরচের ব্যাপার। হাবুলের প্রস্তাব শুনে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। বললাম, দারুণ বলেছিস রে হেবো–তোর সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল–কিরে এ-ভাবে একটা রাত কাটাতে তোদের কি রকম লাগবে?

প্রশ্নটা চটপটি কেবলু কার্তিকের দিকে। ওরা একসংগে বলে উঠল, ওয়ানডারফুল, সুপার ফাইন, হাবুলের সত্যিই মগজের ধার বাড়ছে।

আমি বললাম, কিন্তু সব নির্ভর করছে পিন্‌ডিদার ওপর–পিন্‌ডিদা তো কিছুই বলছে না।

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা রায় দিল, আমার আবার জায়গা বদলালে রাতে ভালো ঘুম হয় না–তবু সকলের আনন্দের জন্য একটা রাতের ঘুম জলাঞ্জলি দিতে এমন আর কি অসুবিধে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, জানি আমাদের তুমি কত ভালবাসো–তাহলে কাল সকালেই তোমার ওখানে এসে দু'জনে চেক সই করে ফেলি–একশ সোয়াশো টাকা তুললেই নিশ্চয় হয়ে যাবে–তারপর বিনোদের ওখানে একেবারে অর্ডার প্লেস করে ফেরা যাবে।

এবারে পিন্‌ডিদা সচকিত, চেক সই মানে–কিসের চেক সই?

অন্য সবাইও একটু থতমত খেয়ে গেছে।

আমি বললাম, বা রে একটা ফিস্টের ব্যবস্থা করতে হবে না! আমাদের ফান্ডের টাকা খরচ করার মতো এমন মওকা আর কবে পাব। আমাদের ফান্ডে তো প্রায় সুদে আসলে চার হাজার টাকা হয়ে গেছে (পিন্‌ডিদার সব গল্প পড়লে তোমরা ফান্ডের হদিস পাবে),তার থেকে এ ক'টি টাকা খরচ করতে তুমি আপত্তি কোরো না পিন্‌ডিদা।–প্লীজ। কি বলিস রে তোরা?

ক্লাবের ফান্ড ব্যাংকে জমা আছে। এ-পর্যন্ত সুদে আসলে বাড়ছেই। এক পয়সাও খরচ হয়নি অর্থাৎ তোলা হয়নি। সকলের ফূর্তি করার জন্য টাকা তোলার প্রস্তাব অনেক বার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে পিন্‌ডিদা পাশ কাটিয়ে গেছে। ক্লাব ফান্ড থেকে টাকা তোলা যাবে পিন্‌ডিদা আর আমার জোড়া সইয়ে। তাই আমার এ-প্রস্তাব।

আমার প্রশ্নের জবাবে কেউ আর কিছু মন্তব্য করতে সাহস করল না। ওরা পিন্‌ডিদার মুখখানাই দেখছে, আর প্রতি মুহূর্তে ওদের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কারণ পিন্‌ডিদার মুখ দেখে মন বোঝা ভার।

মাথা নিচু করে পিন্‌ডিদা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ও টাকাটা তো আমার নয় সকলের। সকলেই যদি তাই চাস আমি আপত্তি করব কেন...তবে আমার ইচ্ছে ছিল, টাকা আরো বাড়ুক...ওই টাকা নিয়ে খুব বড় স্টাইলে আমরা একবার আউটিং-এ বেরুবো। ঠিক আছে, কাল সকাল আটটা নাগাদ আমার বাড়ি এসে চেক সই করে দিয়ে যাস। আচ্ছা, তোরা গল্প কর, আমার মাথাটা কেমন ভার ভার লাগছে–উঠি।

মোসায়েব হেবো হোঁতকা ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমাকে গিলল কয়েক পলক। তারপর গলা দিয়ে 'হুঁ' করে একটা ঘেন্নার শব্দ বার করে তাড়াতাড়ি উঠে পিন্‌ডিদার সংগ নিতে চলল।

অন্য সকলেরও মুখ একটু ভার-ভার। দু'দিন ধরে আসর জমছে না, আজও পিন্‌ডিদা এ-ভাবে চলে গেল এ জন্য যেন আমিই দায়ী।

বড় নিঃশ্বাস ফেলে কেবলু বলেই উঠল, মা করু ধনজন যৌবন গর্বং–

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, কি বললি? অজ্ মুখ্খু কোথাকারের, যখন তখন গাধার মতো সংস্কৃত ঝাড়িস, কিছু বলি না বলে–কেমন? তোরাও আমার টাকার গাছ দেখেছিস–তাই না? অথচ অত টাকা ব্যাংকে পচছে–তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক আমার বাবার দেওয়া টাকা–তাছাড়া আমাকেই টোপের মতো ব্যবহার করে পিন্‌ডিদা রাম বাদশাকে ধরে দু'হাজার টাকার সরকারি পুরস্কার ক্লাব-ফান্ডে জমা করল–আয়ুর জোর না থাকলে আমি যে রাম বাদশার হাতে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়ো) খুনও হয়ে যেতে পারতাম–আর এত কষ্টের সেই টাকা ব্যাংকে পচে মরছে, একটা পয়সা খরচ করার নাম নেই–আর তোরা কেবল আমার দোষ দেখছিস–কেন আমি হেঁ-হেঁ করে গাঁটের টাকা খসাচ্ছি না বলে।

আমার মেজাজ দেখে সকলেই বোবা মেরে গেল। খানিক বাদে কার্তিক মুখ খুলল। দলের মধ্যে সে-ই একটু ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। খুব মোলায়েম করে বলল, দ্যাখ্ সোনা, তোর রাগ হকের রাগ–এ হতেই পারে। পিন্‌ডিদা যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর ওপরেই সব থেকে জুলুম করে, এ কি আমরা

কেউ বুঝি না বলতে চাস? কিন্তু আমাদের সক্কলকে ছেড়ে কেন কেবল তোর ঘাড়েই পিন্‌ডিদা চেপে বসে এ কি তুই বুঝিস না? কারণ পিন্‌ডিদা খুব ভালো করে জানে, চেপে বসা দূরে থাক, আমাদের ঘাড় মটকালেও তুই যা করতে পারিস আমরা তা পারি না। ভগবান আমাদের কারোই সে অবস্থা দেননি। ...এখন পিন্‌ডিদা আর আমাদের সব দোষ স্বীকার করেও বলছি, পিন্‌ডিদা যদি কোনো কারণে আমাদের ত্যাগ করে—সে অবস্থাটা কি তুইও কল্পনা করতে পারিস? পিন্‌ডিদা যখন ছিল না—ছিল না, কিন্তু যে-কোনো কারণে পিন্‌ডিদা এখন আমাদের মধ্যে নেই, তোর ভাবতে কেমন লাগে?

কার্তিকের কথাগুলো সত্যিই আমার মনে দাগ কেটে বসল। না, বসন্তের কোকিল ডাকে না, আর পিন্‌ডিদা আমাদের মধ্যে নেই—এ যেন একই ব্যাপার।

কার্তিকের কথা শুনে একেবারে হামলে পড়লাম না বটে। মনে মনে ঠিক করলাম, আগামী কাল ক্লাব ফান্ড থেকে টাকা তোলা হোক—বাবা মা দু'দিন দু'রাত থাকবে না, দ্বিতীয় দিন না হয় আমিই খরচা পাতি করে বাড়িতে আসর জমাব। একদিন অন্তত ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বোঝা যাক, সেখানকার গচ্ছিত টাকা আমাদেরই টাকা।

পরদিন সকাল সাতটার গাড়িতে বাবা-মা কলকাতা চলে গেল। আমার মেজাজ-পত্র ভালো। বাড়তি যা হাতে পাব ভেবেছিলাম তার থেকে বেশিই পেয়েছি। মা অবশ্য সর্বদাই বলে, হিসেব করে খরচ করবি, আর যা বাঁচবে সেটা আমরা এলে ফেরত দিবি। কিন্তু এটা যে কথার কথা তা আমি যেমন জানি মা-ও তেমনই জানে। এ-ও খুব ভালো করেই জানে, রেজাল্ট বেরুলে ছেলে কলেজে পড়বে—তার খরচের হাত একটু বাড়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া দিনে দিনে সব কিছুর বাজারও চড়ছে। ফলে আগে খরচের বাবদ যেখানে দু'দিনের জন্য সত্তর আশি টাকা রেখে গেলে চলত, এখন সেখানে কম করে দু'শ টাকা রেখে যাওয়াই উচিত। এর ওপর একজনের বুড়ী মা আর একজনের বুড়ী শাশুড়ী থাকল, তার জন্য হঠাৎ কখন কি দরকার হয় ঠিক আছে? এ-জন্যেও কোন না একশ দেড়শ টাকা বাড়তি রেখে যাওয়া দরকার। বাবা প্রত্যেক বারেই বলে যায়, এ-টাকা খরচ করার দরকার হবে না—ফিরে এলে তোর মা-কে দিয়ে দিবি। কিন্তু আমি জানি, বাবা সে-টাকার কথা মা-কে বলেই না, আর বললেও মা আমার কাছে টাকা ফেরত নেবার জন্য হাত পাতে না। এ-ছাড়া বাবা-মা এ-ভাবে চলে গেলে বরাবরই মায়ের কাছ থেকে আমার কিছু ঘুষ বরাদ্দ। আমাকে চাইতে হয় না। যাবার আগে চুপচাপ মা নিজেই দিয়ে যায়। মোট কথা আমার বাণিজ্যটুকু ভালোই হল এটা স্বীকার করতেই হবে।

চেক সই করার জন্য পিন্‌ডিদা সকাল আটটায় আসতে বলেছিল। আমি মিনিট কতক আগেই এলাম। পিন্‌ডিদা চেক-বই বার করবে কি করবে না সেই সন্দেহ আমার এখনো আছে। আর একবার চেক সই করতে এসে দেখি সে নেই—

আমাকে আসতে বলে সেই ফাঁকে ঠাকুমার কাছে গিয়ে সেবারের খাওয়ার খরচ তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুমা বুড়ীর গোপাল বলতে তো ওই পিন্‌ডিদা।

কিন্তু না। পিন্‌ডিদা বাড়িতেই আছে। আমার ডাক শুনে চেক-বই হাতে করেই নেমে এলো। ফলে আমার একটু তোয়াজের মুখ। বললাম, একেবারে রেডিই ছিলে দেখছি।

–না থেকে আর উপায় কি–পিন্‌ডিদা গম্ভীর, সক্কলের ভাগের টাকা খরচ করা হবে বলে যখন ঠিক করেছিস, তখন আমার আর বলার কি আছে–নে কত টাকা তুলবি লিখে সই কর। সই কর। চেক-বই এগিয়ে দিল।

কথাটা খট্ করে কেমন কানে লাগল। পরে ভাবলাম, এই টাকার ওপর সকলের সমান অধিকার আছে বলেই আমাকে একটু ঠেস দিয়ে সকলের ভাগের টাকা কথাটা শোনালো। আমার মনে হল, চেক সই-টই করা হলেই বলবে, বিনোদের দোকান থেকে খাবার-দাবার আর তোর বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্টি করে লাভ কি, ভাগের টাকায় খাওয়া হচ্ছে যখন, বিনোদের দোকানে বসেই হোক। অর্থাৎ টাকা তোলার রাগে সকলে মিলে আমার বাড়িতে রাত কাটানোর ফূর্তিটাই পিন্‌ডিদা বরবাদ করে দিতে চায়।

আমিও এক-রোখা কম নই। আমার মনে যা আছে, অর্থাৎ আমার নিজস্ব খরচে পরদিনের প্রোগ্রামে ওটাই শর্ত থাকবে, সকলের আমার বাড়িতে রাতে থাকতে হবে। একবার তবু ব্যাংক থেকে টাকা তোলা হোক। তাছাড়া পিন্‌ডিদা যদি ওই কথা বলে তখন আমিও শোনাবো, বাবা-মা থাকবে না, তাই আমার মন ভালো করার জন্যই সকলে মিলে এক-সংগে বাড়িতে রাত কাটানোর প্রস্তাবটা হয়েছিল। হাবুলের কথায় আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম।

চেক বইটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে ধরে জিগ্যেস করলাম, কত টাকা তোলা হবে?

নিরীহ মুখে পিন্‌ডিদা ফিরে জিগ্যেস করল, তুই কি বলিস?

–আমি আর কি বলব…সকলের ভাগের টাকা বলছ, আমার তো মাত্র এক-ভাগ…সকলের হয়ে তুমিই বলো, সবাই মেনে নেবে।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা বলল, যে দিন-কাল পড়েছে, তার ওপরে বিনোদের আবার যে লাভের খাঁই…পার হেড পঁচিশ টাকার নিচে কি হবে?

এবারে সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। টাকা তুলতে হচ্ছেই বলে পিন্‌ডিদা এত উদার হবে ভাবব কি করে? বকা-ঝকি করে পিন্‌ডিদাকে পার হেড পনেরো টাকায় রাজি করানোর কথাই ভাবছিলাম। সেখানে কিনা নিজেই পার হেড পঁচিশ টাকা প্রস্তাব করে বসল! খুশি হয়ে জবাব দিলাম, পঁচিশ টাকা পার হেড বেশ ভালোই হবে পিন্‌ডিদা–বিনোদকেও আচ্ছা করে সমঝে দিতে হবে, বেশি লাভ-টাভ রাখা চলবে না! তাহলে ছ পঁচিশং একশ পঞ্চাশ টাকা লিখি?

–লেখ্…।

চেক লিখে প্রথমে পিন্‌ডিদাকে সই করতে দিলাম। তার সই হতে নিচে আমি সই করলাম।

…না, পিন্‌ডিদার মুখে এখনো কোনো রাগের চিহ্ন দেখছি না। বলল, এক কাজ কর, বেলা সাড়ে দশটা নাগাত চটপটি আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে তুই আর একবার আমার এখানে চলে আয়, তার মধ্যে আমি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসছি। কি মেনু হবে তখনই ঠিক করে বিনোদের কাছে অর্ডার প্লেস করে বলে দিতে হবে, রাত ঠিক আটটার মধ্যে সব কিছু রেডি করে তার লোক দিয়ে তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।

শুনে ভিতরে ভিতরে এবারে আমিই অনুতপ্ত। টাকা তোলার রাগে পিন্‌ডিদা আমার ওখানে সকলে মিলে ফূর্তি করে রাত কাটানোর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল না। আর আমি কিনা পিন্‌ডিদা কি বলবে ধরে নিয়ে বাতাসে ঝগড়া করছিলাম!

তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে পিন্‌ডিদা, চটপটি কার্তিককে নিয়ে…আর বলো তো হাবুলকেও ডেকে নিয়ে ঠিক সাড়ে দশটায় তোমার কাছে আসছি।

–আর শোন, এই দিনেই আমার আবার এমন কাজ পড়ে গেল, সন্ধ্যের পরেও ফুরসত পেলে বাঁচি। যদি দেখিস বেলা এগারোটার মধ্যেও আমি এলাম না, তোরা তোদের বাড়িতেই অপেক্ষা করিস, আমিই ফাঁক-মতো একবার হয়ে আসব'খন–তোরা মোটামুটি একটা মেনু ঠিক করেই ফেলিস, আমার অপেক্ষায় থাকিস না–আর যেন কি বলছিলি? না, হেবোকে আর ডেকে আনতে হবে না, যা মাথা মোটা ওটার।

পিন্‌ডিদাকে খুশি করার জন্যেই হাবুলকেও ডাকার কথাটা বলেছিলাম। পিন্‌ডিদা আবার আমার খুশি হবার মতো কথাই বলল। ফলে গলায় এবারে আব্দারের সুর চড়ালাম, সন্ধ্যের পরেও ফুরসত পেলে বাঁচি মানে! না পিন্‌ডিদা, আজকের দিনে তোমার ব্যস্ত-ট্যস্ত থাকা চলবে না–

স্নেহের সুরে পিন্‌ডিদা বলল, তোদের ছেড়ে এমনিতে কি আর ব্যস্ত থাকতে ইচ্ছে করে রে, পরের ঝামেলা সামাল দিতে দিতেই আমার এ জীবনটা কেটে গেল–এসে ধরা-করা করলে আর কথা না দিয়ে পারি না–যাক্‌গে সন্ধ্যার মধ্যে ফ্রি হয়ে যেতে চেষ্টা করব–তোরা সাড়ে দশটায় আসিস, আর না পেলে ফিরে গিয়ে তোদের বাড়িতেই অপেক্ষা করিস।

চলে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, পিন্‌ডিদাকে আজ খুশি রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মেজাজ বিগড়লে সত্যি আমি বড় কচ-কচ করে কথা শুনিয়ে বসি। অথচ আসরের মধ্যমণি এই পিন্‌ডিদা না থাকলে আমাদের পৃথিবীটাই যে ধূসর নীরস হয়ে যাবে তাতে কোনো ভুল নেই। সমস্ত রাত সকলে এক-সংগে থাকব, পিন্‌ডিদার মেজাজ সরিফ করে দিতে পারলে–রাতটা স্মরণীয় হয়েও থাকতে পারে। মুডে থাকলে পিন্‌ডিদা যে অভিজ্ঞতার বাস্তব গল্প ফেঁদে বসবে–রাত কোথা দিয়ে কেটে যাবে আমরা হয়তো টেরও পাব না।

চটপটি আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে বেশ খোশ মেজাজে ঠিক সাড়ে দশটায় আবার পিন্‌ডিদার বাড়ি এলাম। কিন্তু ডাকাডাকি করে সাড়া পেলাম না। কে একজন মুখ বাড়িয়ে বলে দিল, বাড়ি নেই–

আমরা তবু আরও মিনিট দশেক তার জন্য অপেক্ষা করে সকলে মিলে আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। না পেলে পিন্‌ডিদাই ওখানে হয়ে আসবে বলে দিয়েছে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিতে না দিতে ঠাকুমার যাকে বলে একেবারে উগ্র মূর্তি। চটপটি আর কার্তিকের সামনেই এক থোকা দশটাকার নোট আমার মুখের সামনে নাড়িয়ে দিয়ে খনখন করে উঠল, হ্যাঁরে দাদা, এ কি কান্ড! কলারশিপ পেয়ে আজ বাদে কাল তুই কলেজে পড়বি–আর এই বুদ্ধি এই বিবেচনা তোর! একটা বাচ্চা ছেলের বুদ্ধি বিবেচনাও কি তোর নেই?

আমি (সঙ্গে কার্তিক আর চটপটিও) হতভম্ব। বললাম, কি হয়েছে? তোমার এই মেজাজ কেন? এই টাকাই বা কিসের।

–এই মেজাজ কেন? টাকা কিসের? এই মেজাজ নিয়েই তোর কাঁধে চেপে আমি যেন ড্যাং ড্যাং করে চলে যাই! আর এই টাকা হল তোর বুদ্ধি বিবেচনার টাকা–আমার মুখে তুই কত চুন-কালি দিতে পারিস এটা দেখানোর জন্যেই আমার গোপাল এ-টাকা রেখে গেছে–তোকে দিতে বলে গেছে–নে এবারে বেঁচে থাকতেই তুই আমার শ্রাদ্ধ কর।

ঠাকুমার রাগ আর দুঃখ দেখে আমি হতচকিত।

...এরপর ব্যাপারখানা বোঝা গেল। খানিক আগে পিন্‌ডিদা এসেছিল। আর এই দেড়শ টাকা আমাকে দেবার জন্য ঠাকুমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে। কিসের টাকা কেন টাকা জিগ্যেস করতে পিন্‌ডিদা নাকি ঠাকুমাকে বলতেই চায়নি কিছু। কিন্তু মুখ দেখেই ঠাকুমার মনে হয়েছে সে কিছু চেপে যাচ্ছে। ঠাকুমা চেপে ধরতে বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছে। বলেছে, সোনার বাবা-মা অর্থাৎ তাদের এত ভক্তি-শ্রদ্ধার মেসোমশাই কলকাতা চলে গেলেন বলে সোনার বেজায় মন খারাপ দেখেছে সকলে। তাই ঠিক হয়েছে, ঠাকুমাকে দেখার জন্য আর সোনার মন ভালো করার জন্য সকলে মিলে এই রাতটা এখানে সোনার সঙ্গে কাটাবে। তখন সোনা প্রস্তাব করেছে, রাতে সকলের খাওয়া-দাওয়ার খরচ আছে–তাই সকলের ভাগের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে খাওয়ার খরচা চালাতে হবে–তাহলে কারোই আর কিছু গায়ে লাগবে না। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী সকলের ভাগের টাকা সমানভাবে ব্যাংক থেকে তুলে এনে ঠাকুমার হাতে দিয়ে গেছে–সোনা ওরা এলে এটা দিয়ে দিতে হবে–সে ভয়ংকর ব্যস্ত, পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করার উপায় নেই। টাকা ফেরত দেবার জন্য ঠাকুমা তার পিছনে ধাওয়া করেছে। কিন্তু পিন্‌ডিদার দাঁড়ানোর ফুরসত নেই–কেবল বলে গেল, যা বলার আপনার নাতিকেই বলবেন–তার কথা মতোই এ-টাকা সে রেখে গেল। তার সময় নেই, কি খাওয়া হবে না হবে তারাই যেন ঠিক করে বিনোদ বা বিনোদের দোকানে অর্ডার দিয়ে দেয়। বলেই ঝড়ের মতো চলে গেছে।

ব্যাপারটা বলার পর ঠাকুমার আবার উগ্র মূর্তি। আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল, লেখা-পড়া শিখে এই মন আর এই জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে তোর হারামজাদা। তোর মন খারাপ বলে সকলে মিলে এখানে থাকবে খাবে আর যে যার ভাগের টাকা খরচ করবে! তোর বাবার এত দরাজ মন আর তোর এই মন! এখনো যোগ শিখিসনি, একেবারে ভাগ শিখে বসে আছিস? রাগে নিজের ট্যাঁক মুচড়ে কি বার করল। –নে হারামজাদা নে, দেড়শ টাকার জায়গায় এই দু'শ টাকা নে–গোপালেরা সব পেট ভরে আনন্দ করে খাবে সেই ব্যবস্থা কর–এই দেড়শ টাকা আমি তার হাতে ফেরত দিয়ে বলব, তোমার মতো দাদাটার যাতে একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি হয় তুমি আমার মুখ চেয়ে কেবল এইটুকু দেখো গোপাল।

রাগের চোটে দুটো একশ টাকার ভাঁজ করা নোট আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরে ঠাকুমা তার পুজোর ঘরে ঢুকে গেল।

যা বোঝবার বুঝলাম। বুঝল চটপটি আর কার্তিকও।

রাগে আমার সর্বাংগ রি-রি করছে। চটপটি বলল, এর জবাব কি হতে পারে রে সোনা?

বলে উঠলাম, এর একটাই জবাব হতে পারে–পিন্‌ডিদাকে গিয়ে বলা, আমাদের ঘাট হয়েছে–তোমার জুড়ি কেবল তুমিই! চল্ বিনোদের দোকানে।

সন্ধ্যার পরে পিন্‌ডিদা আসতেই কাতর মুখে ঠাকুমা তার ওপর চড়াও হল। হাতের নোটের গোছা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, বাবা গোপাল, আমার দাদা পড়াশুনায় ভালো হলে কি হবে, তোমার বুদ্ধির কানা-কড়িও নেই–তা'বলে কি ওকে এভাবে আক্কেল দিতে হবে–ও তুলতে বলল আর তুমিও সকলের ভাগের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে ফেললে? এটা কি হোটেল বাড়ি–যে-যার চাঁদা দিয়ে তবে খাবে! ছি ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

নোট ক'টা ভালো করে ভাঁজ করে পিন্‌ডিদা প্যান্টের পকেটে গুঁজল। তারপর এগিয়ে এসে ঠাকুমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ঠাকুমা আরো বিগলিত, পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, বাবা আমার, গোপাল আমার–সকলের তোমার মতো মতি বুদ্ধি হোক–

প্রণাম সেরে পিন্‌ডিদা আমার চোখ এড়িয়ে অন্য সকলের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল, হাঁ করে বসে আছিস যে সব! ঠাকুমার পায়ের ধুলো নে হাঁদাগুলো–এমন ঠাকুমা এদেশ ছেড়ে আর কোনো দেশের মাটি চষলে পাবি?

সবার আগে হোঁতকা হাবুল ঠাকুমার পায়ে পড়ল। তারপর শুধু আমি ছাড়া একে একে আর সকলে প্রণামের জন্য লাইন দিল। আমি পিন্‌ডিদার মুখখানাই দেখছি। কিন্তু উদ্ভাসিত দু'চোখে পিন্‌ডিদা ঠাকুমাকেই পুজো করছে।

এই রাগের মুখে সব থেকে যা যোগ্য জবাব, আমি সেই জবাবই দিলাম। সকলের প্রণাম সারা হতে আমি উঠে ঠাকুমার দিকে এগোলাম না। পিন্ডিদার দিকে এগোলাম। হঠাৎ ঝুঁকে তার পা ছুঁয়েই একটা প্রণাম করে উঠলাম।

পিন্ডিদা সত্যিই হকচকিয়ে গেল। ঠাকুমা আহ্লাদে বলে উঠল, আ-হা, তুমি ওকে আশীর্বাদ করো গোপাল—তোমার মতো মতি বুদ্ধি হোক দাদার।

অগত্যা পিন্ডিদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সক্কলে হৈ-হৈ করে উঠল। ঠাকুমা হাসি মুখে চলে যেতে হাবুল পিন্ডিদার দিকে এগোলো। তার কাজটা আমি আগে ভাগে করে ফেলেছি ভেবে ভুল শোধরানোর জন্য ও পিন্ডিদার পায়ের ওপর চড়াও হতে গেল। পিন্ডিদা আঁতকে উঠে তিন হাত সরে গেল। থতমত খেয়ে হাবুল বলল, বা রে, আমরা তোমাকে প্রণাম করব না?

পিন্ডিদা প্রায় ভেঙচি কেটে উঠল, কেন করবি—সোনা করল বলে? প্রণাম করে সোনা আমার গালে একখানা চড় বসালো কিনা সেটা বোঝার বুদ্ধি তোর আছে?

হাবুল ফ্যালফ্যাল করে খানিক পিন্ডিদার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর আমার দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে কৈফিয়ত তলব করল, পিন্ডিদার সংগে ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি?

পিন্ডিদা ওই কথা বলাতে আমার রাগ অনেকটা জল। বললাম, আ-হা ভক্তকে হতাশ করতে নেই পিন্ডিদা, প্রণাম করতে দিয়ে আশীর্বাদ করো ও-যেন জন্মজন্ম তোমার হনুমান হয়ে থাকে।

কেবলু সংস্কৃতের খিচুড়ি পাকিয়ে মন্তব্য করল, রামভক্ত হনুমান লম্ফদানে সাগরং লংঘয়তি।

কেবলুর দিকে পিন্ডিদা কটমট করে তাকালো। ওর সংস্কৃত বুলি পিন্ডিদার সব থেকে অসহ্য। একটা চেয়ার টেনে গ্যাঁট হয়ে বসে হুকুমজারি করল, আর নো বাজে কথা, সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। তোরা কি দিয়ে কি করলি কে জানে—ঠাকুমা তোদের দেড়শ টাকাই দিয়েছে না আরো বেশি?

কেবলু আবার বলে উঠল, দ্বি শতং—দ্বি শতং পিন্ডিদা! ঠাকুমা কড়কড়ে দু'শ টাকা দিয়েছে—চটপটি আর কার্তিকের মুখে মেনু শুনে ভোজনং শরণং গচ্ছামি করো!

এক চোখ ছোট করে পিন্ডিদা চটপটিকে জিগ্যেস করল, দু'শ টাকারই মেনু করে বসে আছিস নাকি—কালকের জন্য পঞ্চাশটা টাকাও হাতে রাখিস নি?

জবাব আমি দিলাম, দু'শ টাকার বেশি না হলে বাঁচি—কালকের জন্য ভাবনা কি—কড়কড়ে দেড়শ টাকা তোমার পকেটেই আছে—ও টাকা তো আর ব্যাঙ্কে ফেরত যাচ্ছে না—

তেল দেওয়া নেওয়ার এই কারবার তুই বুঝিস...তোর কোনও ধারণা আছে?

শুনে পিন্‌ডিদা হাঁ হয়ে চেয়ে রইলো খানিক–হল কি তোর সোনা–অ্যাঁ? এত করে ফান্ডের টাকাটা বাঁচিয়ে দিলাম আর তোর কিনা সেই ভাগাড়ের শকুনের মতো চোখ! এমন বাবা এমন ঠাকুমা তোর–তাদের ঘরে এ তুই কোন্ শাইলক এসে জন্মালি! ব্যাংক খোলা থাকলে আমি এক্ষুণি গিয়ে এ-টাকা আবার জমা করে দিয়ে আসতাম–কাল সকালে এই কাজ করে পাশ বই তোদের নাকের ডগায় ফেলে দেব–বুঝলি?

বুঝে এক হাবুল ছাড়া আর কেউ খুশি হল না। হাবুল ফোড়ন কাটল, তুমি না থাকলে আমাদের এত সাধের ফান্ড ঝাঁঝরা হতে এক মাসও সময় লাগবে না পিন্‌ডিদা–

রাগের চোটে আমি হাবুলকে নিয়েই পড়লাম।–এই আনন্দের দিনে তোর অলুক্ষণে কথা মুখে এলো কি করে? পিন্‌ডিদা না থাকলে মানে কি? পিন্‌ডিদা থাকবে না কেন? মনে তোর কি আছে আমরা জানতে চাই!

হাবুলের হোঁতকা মুখ চুপসে গেল। চটপটি মওকা পেয়ে চিড়বিড় করে উঠল, এই ভর সন্ধ্যায় তুই এই কথা বললি হতভাগা–পিন্‌ডিদার আঙুল কামড়ে বালাই-ষাট করে দে শীগগীর!

কেবলু আশ্বাস দিল, ওর কথা বাল-ভাষিতং–কিছু ভাবিস না–ন ফলিতং।

পিন্‌ডিদার স্নেহের টানটা আজ আমার দিকেই বেশি। হেসে বলল, হাবুলের মুখখানা দ্যাখ্ একবার–ওর সংগে লাগিস কেন, তোর নখের ডগার বুদ্ধি কি ওর মগজে আছে!

মন্তব্য পিন্‌ডিদার, অতএব ভেবাচাকা খেয়ে হাবুল চুপ মেরেই রইলো। পিন্‌ডিদার সংগে আজ যে আমার অদৃশ্য একটা টাগ-অব-ওয়ার চলছে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা হেবোর নেই।

ভোজন-পর্ব শেষ হতে এক পিন্‌ডিদা ছাড়া আর সকলেরই হাঁসফাঁস দশা। যাকে বলে ফাঁসির-খাওয়া। কেবল পিন্‌ডিদারই বোধহয় পায়ের আঙুল থেকে নাকের নিচে পর্যন্ত পেট–খাবার সর্ব অংগে ছড়িয়ে থাকে বলেই তার অস্বস্তি চোখেও পড়ে না। সব থেকে বড় ঘরের খাট-পালঙ সরিয়ে মেঝে ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। এই রাতে কেউ আলাদা শুতে রাজি হবে না জানা কথাই, আর ভাগ হয়ে শুলে আসরও জমবে না।

পিন্‌ডিদার বরাবরই সকলের থেকে একটু উঁচু আসনে বসা অভ্যাস। একটা মোটা তাকিয়ার ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পান চিবুতে লাগল। আমরাও যে যার শুয়ে বসে বা-গড়িয়ে পান চিবুচ্ছি। আমাদের মধ্যে সব থেকে কম কথা বলে কার্তিক। সে প্রস্তাব করল, রাতে ঘুমনো চলবে না–সকলের জেগে থাকার মতো তুমি একটা মজাদার প্রোগ্রাম করো পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা দু'চোখ বুজে মৌজ করে পান চিবুচ্ছে। আমি আড় চোখে দেখলাম, হাবুল চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে–বেশি খাওয়ার দরুন ওর ভুঁড়িটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। বললাম, তার আগে একটা শর্ত হোক, যে ঘুমিয়ে পড়বে–আমরা সকলে মিলে তাকে ঘুমের মধ্যে চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরের উঠোনে রেখে আসব।

এমন শর্ত কার জন্য করা সেটা হাবুলও বুঝেছে। গোঁ-গোঁ করে বলল, সক্কলকে জাগিয়ে রাখার ক্ষমতা এক পিন্‌ডিদা ছাড়া এখানে আর কার আছে শুনি? প্রোগ্রাম করে পিন্‌ডিদা ছাড়া আর কেউ জিভ নাড়লে বাকি সকলেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাবে–কে কাকে চ্যাংদোলা করে উঠোনে নিয়ে যাবে?

এই আই-ঢাই অবস্থাতেও হেবো হোঁতকার গলার স্বর তোষামোদে টইটম্বুর।

কার্তিক সায় দেবার মতো করেই বলল, তাহলে পিন্‌ডিদারই সোলো প্রোগ্রাম হোক্।

চটপটি তাড়াতাড়ি হাত তুলে প্রোগ্রামের ভাগীদার হওয়ার থেকে নিজেকে বাঁচালো।–আমি হাবুল আর কার্তিকের সংগে এক মত সোলো প্রোগ্রাম করে পিন্‌ডিদা এই রাতের মতো আমাদের চোখের ঘুমকে নির্বাসিন দন্ড দিক।

কেবলুরও নিজেকে বাঁচানোর দায়।–সর্বসম্মতঃ নিষ্পত্তিং–গুরুভোজনান্তং পিন্‌ডিদা মধুরভাষিতং মধুরেণ সমাপয়েৎ কুরু।

চোখ বুজে পান চিবুতে চিবুতে পিন্‌ডিদা রায় দিল, তুং একটা আস্ত গোরু। সোনার শর্তের সংগে আর একটা শর্ত থাকবে–সমস্ত রাতের মধ্যে কেবলু একটাও সংস্কৃত বুলি কচকচ করবে না!

একটু নড়েচড়ে বসে আমিও ঠেসের সুরে বললাম, ঠিক আছে–কিন্তু সেই সংগে আরো একটা শর্ত থাকবে–হাবুল একবারও কাউকে তেল দেবে না–বা তেল দিতে চেষ্টা করবে না।

হাবুল তেল একমাত্র কাকে দেয় সে বোধহয় পিন্‌ডিদাই সব থেকে ভালো জানে। হেবো আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। কার্তিক কেবলু আর চটপটি পিন্‌ডিদার রি-অ্যাকশন দেখছে।

...পিন্‌ডিদা এবারে চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো যেন আমার মুখখানা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো দেখার জিনিস। দেখছে তো দেখছেই। এই দেখার ভিতর দিয়েই মানুষটা যেন কোন্ দূরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলোও যেন কেঁপে কেঁপে দূরে সরছে।–কি বললি...কি বললি রে সোনা তুই! ...হাবুল তেল দেবে না...তেল দিতে চেষ্টা করবে না। ...তেল দেওয়া-নেওয়ার এই কারবার তুই বুঝিস...তোর কোনো ধারণা আছে?

শুধু আমি কেন, আমরা বাকি পাঁচ মূর্তিই হকচকিয়ে গেলাম। না জেনে না বুঝে পিন্‌ডিদার কোন্ স্মৃতির উৎসে নাড়া-চাড়া দিয়ে বসলাম! এই উৎস ব্যথার না দুশ্চিন্তার তা-ও ছাই বুঝছি না।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ দূরের কোথাও পাড়ি দিয়ে আবার আমার মুখের ওপরেই চড়াও হল। তার কথাগুলোও কেটে কেটে মুখের ওপর বসতে লাগল। –তেল কাকে দেওয়া হয়–পৃথিবীতে তেল দেবে এমন পোড়া ভাগ্য ক'জনার হয়–কার হয়?

আমি বিস্ময়ে হাবুডুব খেতে লাগলাম। চটপটি কেবল্‌ কার্তিকের জোড়া-জোড়া চোখ একবার আমার দিকে আর একবার পিন্‌ডিদার দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। হেবো তাড়া দিয়ে উঠল, হাঁ করে আছিস কেন–পিন্‌ডিদা কি জিগ্যেস করছে জবাব দে না!

পিন্‌ডিদার গলার স্বর নির্মম গোছের মোলায়েম।–হ্যাঁ রে সোনা, এ-তো খুব সহজ প্রশ্নের সহজ জবাব–আমাকে এমন ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে পারছিস না! ...তেল পাওয়ার, তেল খাবার ভাগ্য কার হয়–যার অঢেল-তেল তার না যার ভাঁড়ার তেল-শূন্য তার?

বললাম, যার অঢেল তেল তাকেই লোকে তেল দেয়...কিন্তু তোমাকে আমি ত্রাসের মধ্যে ফেললাম কি করে পিন্‌ডিদা?

–ত্রাস বলে ত্রাস! এখনো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সেই ত্রাসের গ্রাসে পড়ে আমি হাবুডুবু খাই। আগে আমার কথার জবাব দে–আর, কে তেল দেয় যার অঢেল তেল সে, না যার ভাঁড়ে তেল ঠন-ঠন সে? চট্‌পট্‌ বল্‌, আমার গলা কাঁপছে দেখছিস না?

উত্তেজনায় সত্যিই গলা কাঁপছে পিন্‌ডিদার। তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, তেল থাকলে আর তেল দিতে যাবে কেন–তেল যার নেই সে-ই তেল-অলাকে তেল দেয়।

–ঠিক বলেছিস সোনা, খুব ঠিক বলেছিস। তেল যার নেই সে-ই তেল দেয়, হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে আমারও এই কপাল হয়েছিল–এক তেল-অলাকে তেল দিতে গেছলাম। কিন্তু তখন যদি জানতাম, তেল-অলার আমার তেল পছন্দ হলে আর মুক্তি নেই, তাহলে কি তার ধারে কাছে ঘেঁষতাম! কোনো তেল-অলার তোর বুদ্ধির তেল পছন্দ হলে আদর করে সে তোকে তার তেলের পিপেয় এমন ডুবিয়ে রাখবে যে দম-বন্ধ হয়ে মরার আগে আর তোর মুক্তি নেই। উঃ, জিন জেকব আজও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন–তেল দিতে গিয়ে তার স্নেহের তেলে পা হড়কে হড়কে আমি যাকে বলে একেবারে আম-তেল হয়ে মরতে বসেছিলাম–সোনা রে অত তুচ্ছ করে কাউকে তেল দেওয়ার কথা বলিস না–তেল যে সত্যি দিতে জানে–তেলই তাকে মেরে মমি বানিয়ে ঘরে রেখে দেবে, তবু হাতছাড়া করবে না–জিন জেকবের পাল্লায় পড়ে তেল দেওয়ার কথা শুনলেই আমার প্রাণ-পাখি বুকের খাঁচা ভেঙে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

পিন্‌ডিদার রীতি জানি। এবারে শোনার মতো কিছু রসদ আসছে বুঝেই সময়োচিত ইন্ধন জোগালাম।–বলো কি পিন্‌ডিদা, হাবুলকে তো তাহলে বড় বে-ফাঁস কথা বলে ফেলেছি–তা জিন জেকব কে? কোন্‌ দেশের মানুষ?

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল পিন্‌ডিদা, বলল, তেল যার জগৎ তার, তেল যার আছে তার অন্য কোনো দেশ নেই, সে কেবল তেল-জগতের মানুষ–মরে গেলেও সে এই জগৎ ছাড়া হতে চায় না। জিন জেকবের কথা পরে হবে, আগে এই মানুষদের একটা গপ্প শোন–তাহলে এদের মন-মেজাজ বুঝতে পারবি।–এক মস্ত তেলের খনির মালিক মারা যেতে তার আত্মা সাঁই-সাঁই করে স্বর্গের দিকে চলল, পৃথিবীর অনেকটা তার তেলের বশ ছিল, তার ঠাঁই স্বর্গে ছাড়া আর কোথায় হবে? কিন্তু গিয়ে দেখে স্বর্গের দরজার চাবি এঁটে সেখানকার দরোয়ান ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

তেল- অলা রেগে গেল, এ কেমন ডিউট দেওয়া, পৃথিবীর লোকের মরা থেমে নেই, কিন্তু এ-দিকে স্বর্গ দরজার চাবি বন্ধ করে পাহারাদার ঘুমোচ্ছে! তাকে ঠেলেঠুলে তুলে তেল-অলা হুকুম করল, দরজা খোলো বাপু, আমাকে ভিতরে যেতে দাও, নইলে তোমার পাহারাদারের চাকরিখানা আমি খেয়ে ছাড়ব।

আধঘুম অবস্থায় পাহারাওলা বলল, বিরক্ত কোরো না, স্বর্গের হাউস ফুল দেখেই দরজা বন্ধ করে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছি–আর একটি আত্মারও আপাতত স্বর্গে জায়গা হবে না–তুমি নরকে যাও।

তেলের খনির মালিক খাপ্পা হয়ে উঠল, কি আমি পৃথিবীকে তেলে ভাসিয়ে এসেছি, রাজা বাদশারা পর্যন্ত আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খোশামোদের তেল মাখিয়ে খাতির করেছে–আর আমি কিনা নরকে যাব!

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে স্বর্গের দরোয়ান তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, বড় বিরক্ত করো তো তুমি–তোমার মতো অমন অনেক তেল- অলা স্বর্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে–বলছি হাউস ফুল–আর একটি আত্মারও এখন সেখানে জায়গা হবে না–সোজা নরকের পথ দেখো বাপু–জায়গা পাবে।

তেল-অলা গুম হয়ে রইল। শেষে কিনা নরকে যেতে হবে তাকে! স্বর্গে জায়গা হবে না! বেগতিক দেখে নিজের তেল-তেলে হাতখানা আধ-ঘুমন্ত প্রহরীর গায়ে বুলিয়ে আর গলার স্বরেও তেল ঢেলে তেল-মালিক বলল, ওহে হেভেনলি দরোয়ান, দয়া করে একটু চোখ খুলে তাকাও না, তুমি তো আর নরকের দরোয়ান নও যে এই মেজাজ করছ?

তেল পেলে কে আর না তেল-তেলে হয়? দরোয়ান একটু সদয় হল, কি বলবে বলো?

–স্বর্গে আর একটা সিটও খালি নেই বলছ?

–বলছি তো। আমার কাছে চার্ট আছে–হাউস ফুল!

–কত দিনে খালি হবে?

–তা কি বলা যায়, কারো নরক মতি হলে তবে হবে–পাঁচ দশ হাজার বছর লেগে যেতে পারে।

–কি সর্বনাশ! ...তা স্বর্গে অনেক তেল-মালিকের আত্মা

আছে বলছ?

—অনেক, কম করে দু'চার হাজার।

—সদ্য পৃথিবী থেকে এসেছে, তেল-অলার মাথা সাফ। নরম গলায় বলল, দরোয়ান ভাই, একটু উপকার যদি করো, তেল-মালিকের আত্মারা যেখানে আছে সেই এলাকায় যদি একটু রটিয়ে দাও, নরকে তেলের খনি বেরিয়েছে—সেখানকার আত্মারা দেদার তেল তুলছে—তাহলে আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব প্রহরী ভাই।

দরোয়ান মজা পেয়ে হাসল, বলল, তোমার মতলব বুঝেছি...ঠিক আছে রটিয়ে দিচ্ছি।

পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর ছেড়ে পাঁচ দশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। দুড়দাড় করে কয়েক হাজার তেল-মালিকের আত্মা নরকের পথে নেমে চলেছে। প্রহরী বাধা দিতে চেষ্টা করল, বোঝাতে চাইলো, কিন্তু তাদের দাঁড়ানোর বা শোনার সময় নেই।

সদ্য পৃথিবী-ছাড়া এই তেল-মালিক হেসে জিগ্যেস করল, এখন আর হাউস ফুল নয়তো—এবার জায়গা হবে তো?

প্রহরী বলল, যাও, এন্তার জায়গা খালি—হাত পা ছড়িয়ে সুখে থাক গে।

তেল-অলা আনন্দে স্বর্গে চলে গেল। কিন্তু একটা বছর না ঘুরতে সে আবার বেরিয়ে এলো। মুখ চোখের মিনমিনে ভাব। প্রহরী বলল, কি হল, এরই মধ্যে চললে কোথায়?

আমতা আমতা করে তেল-অলা জবাব দিল, নরকেই যাই...সেখানেই কিছুকাল থেকে আসি।

প্রহরী অবাক।—সে কি হে, চালাকি করে এতগুলো লোককে তুমি নরকে পাঠালে এখন নিজেও যাচ্ছ—কি ব্যাপার?

তেল-অলা বলল, চালাকির ফাঁদে নিজেই পড়লাম কিনা কে জানে—এতগুলো লোক নরকে নেমে গেল—এক বছরের মধ্যে কারো ফেরার নাম নেই কেন?...সত্যিই সেখানে তেলের খনি বেরিয়েছে কিনা ওরা তেল তুলছে কিনা কে জানে। না ভাই, এখানে আর আমার মন টিকছে না—নরকেই যাই।

গল্পটা শেষ করে পিন্‌ডিদা আমার দিকে তাকালো। তেলের স্বাদ একবার যে পেয়েছে তার মরজি আর বিবেচনা বোঝ—জিন জেকব হল এমনি তেলজগতের ভুঁই-ফোঁড় চাঁই একজন—তোয়াজের তেলে তাকে যে বশ করবে তার আর জীবনে নিষ্কৃতি আছে না মুক্তি আছে?

ভনিতার গল্পই যা জমে উঠেছে, আমাদের আশা এখন তুঙ্গে। হোঁতকা হাবুল পর্যন্ত গড়াগড়ির লোভ ছেড়ে উঠে বসেছে। হাবুলের মুখেও এখন আর চট করে সংস্কৃত বুলি বেরুবে না। চটপটি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ভিতরে ছুটল। আধ-মিনিটের মধ্যে এক হাতে কুঁজো আর অন্য হাতে তিনটে গেলাস নিয়ে ফিরল। এক গেলাস জল ভরে পিন্‌ডিদার সামনে রাখলো। তারপর নিজে ঢকঢক করে এক গেলাস জল গিলে বলল, আর যার দরকার গড়িয়ে খাও—পিন্‌ডিদা শুরু করো, আমরা রেডি—

ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে পিন্‌ডিদা বলল, বলতে পারি, কিন্তু তেলের কথা তোরা আর আমার সামনে উচ্চারণ করবি না—তেল মানেই পা পিছলে আলুর দম—তা সে যে তেলই হোক।

আমি কবুল করলাম, রান্না-বান্না, মাথায় মাখা আর শীতকালে গায়ে মালিশ করা ছাড়া আমরা আর তেলের মুখ দেখব না পিন্‌ডিদা—তেলের কথাও কইব না।

পিন্‌ডিদা জিন জেকবের কাহিনী শুরু করল। জেকবের কাহিনী মানে নিজের কাহিনীও। শুনতে শুনতে গোড়ার দিকে আমি অন্তত বার কয়েক উসখুস করে উঠেছি। কার্তিক আর চটপটিও আমার দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে। আগে কেউ গুল-গপ্প ছাড়লে আমরা বলে উঠতাম, মিটার চাপা—কত পারসেন্ট দ্যাখ। কেবল আর কার্তিকও মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে মুখে বলতে চাইছে, মিটার চড়িয়েছিস না কি রে সোনা—কত পারসেন্ট ধরে নেব?

কিন্তু শুনতে শুনতে একসময় আমরা এমনিই তন্ময় হয়ে গেলাম যে সত্য-মিথ্যার ফারাক কখন ঘুচে গেছে কারো হুঁশ নেই।

জিন জেকব তখনো তেল-জগতের কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে ওঠেনি। হবে এমন স্বপ্নও মনের কোণে নেই। অতি সাধারণ মানুষ। সাধারণ অবস্থা। লেখা-পড়া তেমন কিছুই করেনি। তাই অভিজাতদের সংশ্রব এড়িয়ে চলে। তার স্ত্রীও মুখ্যু সুখ্যু ভালো মানুষ। টেক্সাসের মানুষ দু'জনেই। রোজগারের জন্য ব্রেজিলে পড়ে থাকে। জেকবের এক মাত্র আনন্দ আর অবসর বিনোদনের বিষয় হল ফুটবল। এমন অন্ধ ফুটবলপ্রেমিক আর কোথাও আছে কিনা পিন্‌ডিদার জানা নেই। অন্ধ বলাটা তাৎক্ষণিক অর্থেও একেবারে ভুল নয়। চোখের অসুখে জেকবের দুটো চোখই যেতে বসেছিল। অনেক ভাগ্যের জোরে একেবারে দৃষ্টিহীন হয়ে যায়নি। এখন পঁচিশ পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে তবে দেখতে পায়। চশমা খুললে যাকে বলে অন্ধ। দু'হাত দূরের মানুষের মুখও দেখতে পায় না। আর ভালো মানুষ বউটা কখনো খুব রেগে গেলে নাকি টুক করে তার চশমাটা খুলে নিত। ব্যস, তখন হাঁসফাঁস দশা জেকবের—হাতড়ে হাতড়ে স্ত্রীর নাগাল পেলে তার পা জড়িয়ে ধরে চশমা ফেরত দেবার জন্য মিনতি করত। এক বার স্ত্রীর বদলে জেকব ঝাড়ুদারনির পা জড়িয়ে ধরেছিল। সেই থেকে রেগে গেলেও তাঁর স্ত্রী আর চশমা খুলে নেয় না।

যাক, ফুটবলের যে এত ভক্ত সে ফুটবলের জাদুকর 'পিন্‌ডি'কে কোন চোখে দেখবে? বয়স পিন্‌ডিদার থেকে সতেরো কি বিশ বছরেরও বড় হতে পারে। কিন্তু জেকবের কাছে পিন্‌ডিদা আকাশ-সমান উঁচু মাথার মানুষ। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ফুটবল আকাশের জাদু-

পিন্‌ডিদা মাঠে কাটা ছাগলের মতো গড়াচ্ছে

নক্ষত্র 'পিন্‌ডি'র সংগে পরিচিত হবে–'পিন্‌ডি'র বন্ধু হবে পয়সা খরচ করে একবার সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, 'ফুটবলের রাজা পিন্‌ডি–তোমার সংগে আলাপ পরিচয়ের সাধ কি আমার এই জীবনে পূর্ণ হবে না?'

পিন্‌ডিদার এক অন্তরংগ ভক্ত কাগজের সেই ছাপা আবেদন দেখালো। আর দেখার পরে পিন্‌ডিদাও কি জবাব না দিয়ে পারে? তখন কি জানত এই জবাবই তার কাল হবে। জিন জেকব হাতে স্বর্গ পেল। তারপর থেকে পিন্‌ডিদাই তার ধ্যান জ্ঞান। উদার হয়ে পিন্‌ডিদা হৃদ্যতার হাত বাড়িয়েছে, প্রাণ গেলেও সেই হাত কি আর ছাড়তে পারে জিন জেকব?

...এক খেলায় দেশময় দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। বেশ শক্ত টিমের সংগে ফাইন্যাল খেলা। কিন্তু পিন্‌ডিদা যে টিমে আছে সেই টিমের তো আর হারার প্রশ্ন নেই। ক' গোলে জিতবে তাই নিয়ে গবেষণা, তাই নিয়ে বাজি ধরা-ধরি। আগের রাতে জিন জেকব একান্তে পিন্‌ডিদাকে ধরল। মুখ কালো করে বলল, বউ শাসিয়েছে আমাকে।

লোকটাকে এখন পিন্‌ডিদা সত্যিই খুব পছন্দ করে। তাই উতলা হয়ে জিগ্যেস করল, কেন– কি হয়েছে?

–আমার রোজগারে মন নেই, দিনের বেশির ভাগ সময় তোমার কাছে পড়ে থাকি–তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত কাটে–সংসারের অচল অবস্থা–সেই রাগে আলটিমেটাম দিয়েছে।

...এখন তুমিই কেবল আমাকে রক্ষা করতে পারো পিন্‌ডি।

পিন্‌ডিদার সহানুভূতির কমতি নেই। জিগ্যেস করল, কি-ভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

–আমি ধার করে কিছু টাকা যোগাড় করছি, তোমাদের কালকের খেলার ওপর বাজি ধরতে চাই–এটাই আমার শেষ আশা–এখন তুমিই বলে দাও কি বাজি ধরব?

পিন্‌ডিদা একটু ভেবে জিগ্যেস করল, বাজারে হাইয়েস্ট দর কি যাচ্ছে?

–হাইয়েস্ট দর তোমাকে নিয়েই–তুমি চার গোল দেবে–ওয়ান ইজ্‌ টু এইট দর যাচ্ছে–জিতলে এক ডলারে আট ডলার পাব।

পিন্‌ডিদা বলল, আচ্ছা কাল আমি মাঠে তোমার জন্য প্রাণ ঢেলে দেব। তুমি কত টাকার খেলতে চাও?

–একশ ডলার পর্যন্ত খেলতে পারি, কিন্তু পিন্‌ডি, হারলে একেবারে পথে বসব–বরং তিনের দরে তোমার ওপর দু'গোলের বাজি ধরি।

–না, বললাম তো তোমার জন্য কাল আমি মাঠে সংহার মূর্তি ধরব–আমি কম করে ছ'গোল দেব বাজি ধরলে কি দর পাও দেখো।

উত্তেজনায় জিন জেকবের দু'চোখ গোল একবারে।–বলো কি পিন্‌ডি! অপনেন্ট তো কাঁচা দল নয়–তুমি ছ' গোল না

দিতে পারলে আমি তো এই বাজি ধরে মাঠেই হার্টফেল করব!

পিন্‌ডিদা বলল, বাজি ধরে যদি ভাগ্য একটু ফেরাতেই চাও—যা বললাম তাই করো।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জেকব চলে গেল, তারপর আরো দু'গোল দেবে বাজি ধরে ষোলর দর পেয়েছে। অর্থাৎ পেলে এক ডলারে ষোল ডলার পাবে—একশ ডলারই খেলে এসেছে—জিতলে ষোল শ ডলার পাবে। তারপর কাতর মুখে বলল, কিন্তু পিন্‌ডি—আমার আশা দেখে ওরা যে হাসছে!

—হাসুক। খেলার পরে তুমি হাসবে। এখন যাও, আমাকে কনসেনট্রেট করতে দাও।

...হ্যাঁ জিন জেকব খেলার পরে হেসেছে তো বটেই—কিন্তু কেঁদেছেও তার ডবল। শুধু জিন জেকব কেন, মাঠ ভরতি সাপোর্টাররা সবাই প্রথমে হেসেছে পরে কেঁদেছে।

আগে হেসেছে কারণ, খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে পর্যন্ত পিন্‌ডিদা গুনে গুনে ছয় গোলই দিয়েছে।...পিন্‌ডিকে রুখতে পারে মাঠে সেদিন এমন শর্মা কেউ ছিল না। আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি-পিন্‌ডি রবে মাঠসুদ্ধ মানুষ পাগল। পিন্‌ডিদার এমন পাগলের মতো খেলা ফুটবলের ইতিহাসে কেউ দেখেনি।

...তারপর? তারপরেই বজ্রাঘাত। মাঠের আকাশ বিষাদের কালো মেঘে ছেয়ে গেল।...পিন্‌ডিদা মাঠে কাটা-ছাগলের মতো গড়াচ্ছে। তার হাঁটুর মালাইচাকি সরে যায়নি শুধু, ভেঙেই গেছে।

স্ট্রেচারে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দেশের সেরা সার্জনরা হাসপাতালে এসে কনফারেন্স বসিয়ে দিল। বড় বড় কাগজের প্রতিনিধিরাও হাসপাতালে হত্যা দিয়ে পড়ল। ও-দিকে জনতার ভিড়ের চাপে কত ছেলে মেয়ে পিষে মরল, কত জখম হল তার হিসেব কে রাখে?

পরদিন সমস্ত কাগজের প্রথম পাতায় পিন্‌ডিদার ছবি—পাশাপাশি তাজ্জব খবর আর শোকের খবর।...বন্ধু জিন জেকবকে বাজি জেতাবার জন্য জীবনের সেরা খেলা মরিয়া হয়ে খেলেছে পিন্‌ডি—প্রতিজ্ঞা করেছিল ছ'গোল দিয়ে জিন জেকবকে ষোলর দরে বাজি জেতাবে। তাই জিতিয়েছে। গুনে গুনে ছ'গোলই দিয়েছে।...তারপর সকলের বুক দুমড়ে ভাঙার মতোই শোকের খবর।...পিন্‌ডির হাঁটুর মালাইচাকি অপারেশন হয়েছে—ভাঙা অংশ বাদ দিতে হয়েছে। অতএব পিন্‌ডির খেলার জীবন শেষ।

সমস্ত দেশের সেটা শোকের দিনই বটে। জাতীয় শোকের দিন। পিন্‌ডিদার মন কারো থেকে কম খারাপ হয়নি। দেশসুদ্ধ লোকের এত শোকই তার যা সান্ত্বনা। ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরাও এসে কান্নাকাটি করেছে। বলেছে, তোমার হাঁটুর মালাইচাকি গেছে—কিন্তু তুমি তো আছ পিন্‌ডি—তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব—তুমি আমাদের ক্লাবের মহা-মর্যাদার কোচ হয়ে থাকবে।

কিন্তু পিন্‌ডিদা মুশকিলে পড়ল জিন জেকবকে নিয়ে। ষোল শ' ডলার জিতেও তার মতো শোকাচ্ছন্ন আর কেউ না। পাগলই হয়ে গেছে। বলছে, আত্মহত্যা করবে—করবেই। পিন্‌ডির খেলা গেল তার আর এই জীবন রাখার কোনো মানে হয় না। আত্মহত্যাই তার জ্বালা জুড়োনোর একমাত্র পথ।

পিন্‌ডিদা তাকে যত বোঝায় তার গোঁ ততো বাড়ে। কারো কথা শুনবে না, কোনো কথা শুনবে না—আত্মহত্যাই তার একমাত্র শান্তির পথ।

অগত্যা পিন্‌ডিদাকে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। বলল, ডাক্তাররা আশা করছে, নতুন মালাইচাকি আবার একটা গজাতেও পারে। যদি গজায় তাহলে তো আর ভাবনা নেই। তাই পিন্‌ডিদার প্রস্তাব, এক বছরের জন্য অন্তত জেকব আত্মহত্যা স্থগিত রাখুক—ততদিনে যদি পিন্‌ডিদার হাঁটুতে নতুন মালাইচাকি না গজায় তখন না হয় আত্মহত্যা করবে।

জিন জেকব রাজি হল। কিন্তু একটা বছর পিন্‌ডি যখন আর ফুটবল মাঠে নামবেই না, তার আর ব্রেজিলে বসে থেকে লাভ কি—সে বরং এই একটা বছর নিজের দেশ টেক্সাসেই কাটাবে—আত্মহত্যার জন্য তৈরি হবে। মরতে তো এমনিতেই হবে বাজির ষোল শ' ডলারে ক'দিন আর চলতে পারে—তারপর তো আবার রোজগারের ধাক্কায় আধ-মরা হতেই হবে। বছরটা ঘুরলে তার থেকে পুরো মরাই ভালো।

জেকব সস্ত্রীক টেক্সাসে চলে গেল।

তরপর ন' মাস না যেতে এক তাজ্জব খবর। জিন জেকব টেক্সাসের পাঁচ জন ধনীর মধ্যে একজন হয়ে বসেছে। সে বিরাট এক তেলের খনি পেয়ে গেছে। এত বড় খনি আবিষ্কার গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ করতে পারেনি। সেদিনের সেই অর্ধশিক্ষিত জিন জেকব রাতারাতি কোটি-কোটি কোটি-কোটি ডলারের মালিক।

কিন্তু যত বড় লোকই হোক, জিন জেকব কি পিন্‌ডিকে ভুলতে পারে! হাঁটুর মালাইচাকি গেছে? তাতে কি? পিন্‌ডির হাঁটুতে সোনার মালাইচাকি বসিয়ে দিতে কতক্ষণ লাগবে। হাঁটুর মালাইচাকি কেন—পিন্‌ডির পা দুটোই তো সে সোনায় বাঁধিয়ে দিয়ে তাকে তার কাছে রেখে দিতে পারে!

একদিন এরোপ্লেনে উড়ে ব্রেজিলে এসে হাজির। পিন্‌ডিদার তার ভাগ্যের সিকে ছেঁড়ার খবর আগেই পেয়েছিল। টেলিগ্রাম করে জেকবই তাকে জানিয়েছিল। এবারে সশরীরে এসে সোজা তাকে টেক্সাসে তুলে নিয়ে গেল। পৃথিবীর কোনো চিকিৎসায় যদি মালাইচাকি সারে, তো পিন্‌ডিকে সে সারিয়ে তুলবেই। আর যদি না সারে, সমস্ত জীবন পিন্‌ডিকে সে রাজার হালে রাখবে। মোট কথা, পিন্‌ডিকে না নিয়ে সে এখান থেকে নড়বে না।

...পিন্‌ডিদাও লোভেই পড়ল। জিন জেকব তো এখন আর সেই লোক নয় যে একটুও হেলাফেলা করা যাবে। উল্টে এখন তাকে একটু তোয়াজ তোষামোদে খুশি রাখতে পারলে আখেরে অনেক লাভ। তাছাড়া খেলার মাঠ তো এখন তার কাছে

অনুপস্থিত, বড় লোকের বাড়িতে কিছুদিন ফূর্তিতে কাটিয়ে এলে মন্দ কি?

সেই আসাই কাল হল। ফূর্তি বলে ফূর্তি—এমন আনন্দেও মানুষ থাকতে পারে! মানুষ কত ভালো খেতে পারে? কত ভালো ভালো জিনিস দেখতে পারে? রাজা বাদশারা কি এর থেকেও বেশি সুখে বেশি আনন্দে থাকে?

একটা বছর ঘুরে গেল। খেতে খেতে পিন্‌ডিদার খাওয়ায় অরুচি এসে গেল।

ও-দিকে ব্রেজিলের মানুষেরা পিন্‌ডিদাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ক্লাবের খেলোয়াড় পিন্‌ডি নেই, কিন্তু কোচ পিন্‌ডির দামও কি কম নাকি! কিন্তু একবছর ধরে কোথায় সে হাওয়ায় মিলিয়ে আছে? কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগল—পিন্‌ডি, তুমি কোথায় আছ? যেখানেই থাকো দয়া করে চলে এসো—সমস্ত ব্রেজিলের মানুষ তোমার ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে—এবারে এসে তুমি তোমার ক্লাবের কোচ হয়ে আমাদের কর্ণধার হয়ে বোসো।

সেই সব কাগজ পড়ে জিন জেকব হাসে। বলে, খবরদার, যাবার নাম করেছ কি তোমাকে মেরে মমি বানিয়ে নিজের কাছে রেখে দেব। তুমি শুধু আমার—আর কারো নয়।

...এদের মন এমনি সাংঘাতিকই বটে। এর অনেক পরে পিন্‌ডিদা যখন ব্রেজিল থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল তখনো ওই রকম লোকদের হাতে পড়ে পিন্‌ডিদার প্রাণান্ত দশা হয়েছিল—সে-গল্প তো আমরা বর্ধমানের এই বাবুগঞ্জের পাঁচ-পিন্‌ডিদা-ভক্তরা কত আগেই শুনেছি।

যাক, এত বড় লোক জিন জেকব আর তার রোগে-ভোগা বউয়ের কিন্তু মনের তলায় একটা বড় খেদ থেকে গেছে। টেক্সাসের সাধারণ মানুষ তো গরিব আর খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের কাছে যতই হোমরাচোমরা হয়ে উঠুক জিন জেকব—তাতে কি মন ভরে। ও-দিকে অভিজাত আর শিক্ষিত যারা আছে তাদের কাছে খুব একটা পাত্তা পায় না। কারণ তারা তাকে গরিব দশা থেকে জানে—আর পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি কত, তা-ও জানে। টাকা থাকলে লোকের অনেক রকমের খাতির কদর পেতে সাধ যায়। জেকব আর তার বউয়ের অদৃষ্টে তা আর জোটে না।

খেদের কথা একদিন বন্ধু পিন্‌ডিকে বলেই ফেলল জেকব।

ভেবে চিন্তে পিন্‌ডিদা বলল, এখানে তুমি এত চেনা লোক, অভিজাত লোকেরা তোমাকে পাত্তা দেবে না, কতবার তো কতজনকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে, তারা কেবল পেট-ভাসিয়ে খেয়েই গেল—ফিরে তোমাদের কেউ ডাকে না।

জেকব মাথা নেড়ে সায় দিল।—সেই কথাই তো বলছি—আগে ওরা আমাকে বলত ব্যাটা চোখে দেখতে পায় না, অন্ধ—এখন আবার বলে, টাকায় অন্ধ হয়ে সকলকে টেক্কা দেবার মতলব।...পিন্‌ডি ভাই, আমি চোখে দেখি না, আধা অন্ধ—ওপরওয়ালার এই মার সহ্য হয়—কিন্তু টাকার মারেও লোকে আমাকে অন্ধ বলবে, এ বরদাস্ত হয় না—এ-দিকে আমার রোগা-পটকা বউটা কোনদিন পটাশ করে মরে যাবে—তার অভিজাত হবার সাধও মিটবে না—তুমি একটা রাস্তা দেখাও।

পিন্‌ডিদা মোক্ষম রাস্তাই দেখালো। বলল, টেক্সাস ছেড়ে তুমি ডালাসে ঘর বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করো। ডালাসের মতো বিলাসের জায়গা পৃথিবীতে আর ক'টা আছে। ডালাস হল গিয়ে অভিজাত বিলাসী মানুষদের স্বর্গভূমি—সেখানে তো আর তোমার পুরনো দিনের পরিচয় কারো জানা নেই—বিরাট অয়েল-মারচেন্ট হিসেবেই সেখানে সবাই তোমাকে খাতির করবে।

যেমন প্রস্তাব তেমনি কাজ। পিন্‌ডিদা আর বউ জোসেফিনকে নিয়ে জিন জেকব ডালাসে এসে বিরাট বাড়ি-ঘর কিনে জাঁকিয়ে বসল। টাকার জোরে কি না হয়। সব কিছু ছবির মতো সাজানো।

পিন্‌ডিদা পরামর্শ দিল, এবারে বেশ কিছু বাছাই করা অভিজাত প্রতিবেশীকে ডেকে তুমি একটা জোরদার পার্টি দাও—আর এই সংগে তুমি দুটি জিনিসের অর্ডার দাও—একটা রেমব্রান্ড্‌ট্‌ আর একটা জাগুয়ার—পার্টি চলা কালে এই দুটো জিনিস এসে পৌঁছনো চাই—অভিজাত আমন্ত্রিতরা তাহলে তোমার টাকার জোর আর টেস্ট দুইই বুঝতে পারবে।

বন্ধু পিন্‌ডির ওপর জেকবের অন্ধ বিশ্বাস। বলল, অর্ডার-ফর্ডার তুমিই দাও বাপু, ও-সব আমি বুঝি-টুঝি না—জিনিস এলে আমি চেক্ কেটে দিয়ে খালাস।

পার্টির ঢালাও আয়োজন হল। এলাকার অভিজাত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা সব আসতে লাগল। জেকব আর জোসেফিনের সংগে পরিচিত হতে লাগল। আমন্ত্রিতরা সোসাইটির নামকরা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা। তারাও নতুন অয়েল মারচেন্ট দম্পতীকে যাচাইয়ের চোখ নিয়েই এসেছে। এ-দিকে পিন্‌ডিদা একটা জাগুয়ার আর এক-প্রস্থ রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ অর্ডার দিয়ে রেখেছে—পার্টি চলা-কালিন এতটার থেকে এতটার মধ্যে এসে পৌঁছনো চাই। দুই কোম্পানিই রাজি হয়েছে, যথাসময়ে পাঠাবে।

পার্টি সবে জমে ওঠার মুখে। একজন কর্মচারী বাড়ির মালিক জেকবের হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল। জেকব বাইরে চলে এলো। একটু বাদে ফিরে এসে সকলকে শুনিয়ে পিন্‌ডিদাকে বলল, আমাদের অর্ডারের একটা জিনিস এসে গেছে।

সকলকে শুনিয়ে পিন্‌ডিদাও তাকে জিগ্যেস করল, কোনটা এসেছে—রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ না জাগুয়ার।

জেকব কাগজটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চট্‌পট্ জবাব দিল, তা ঠিক বলতে পারছি না—দুটোর মধ্যে একটা এসেছে দেখলাম—তুমি দেখে এসে ও.কে করলে আমি চেক কেটে দিচ্ছি।

জেকবের এই জবাব শুনে পিন্‌ডিদার মাথাতেই বুঝি বাজ

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন!

গ্রহরত্নে বিশ্বস্ত
অলঙ্কার শিল্পে অগ্রণী

সেনকো
জুয়েলারী হাউস

হেড অফিস ঃ ১৭০/২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। **কলকাতা-১২**

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ১৯৫/১ রাস বিহারী এভিনিউ। কলকাতা-১৯

জ্যোতিষ বিভাগ/সাক্ষাতের সময়-হেড অফিস ১১টা-৭টা এবং ব্র্যাঞ্চ অফিস ৩টা- ৭টা

পড়ল একটা। কারণ আমন্ত্রিত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা ততক্ষণে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসা-হাসি শুরু করেছে। করবে না?

গপ্‌প থামিয়ে পিন্‌ডিদা আমাদের পাঁচ মূর্তির দিকে তাকালো।—নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের মধ্যে কেন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসা-হাসি শুরু হয়ে গেল বল দেখি?...রেমব্র্যান্ডট্ বা জাগুয়ার দুটোর একটা এসেছে বলতে লোকে হাসবে কেন?

এবারে কেবল আমিই হেসে উঠে বললাম, রেমব্র্যান্ডট্ হল পৃথিবীবিখ্যাত ডাচ্ চিত্রকর—রেমব্র্যান্ডট্ আসা মানে তার এক প্রস্থ ছবি আসা। আর জাগুয়ার হল গিয়ে—

হেবো-হোঁত্‌কা ফস করে বলে উঠল, জঙ্গলের চারপেয়ে হিংস্র জানোয়ার—

মওকা পেয়ে বলে উঠলাম, গাধার মতো গোরু কোথাকারের, পার্টির সময়ে ডেলিভারি দেবার জন্য জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ার অর্ডার দিতে গেছে পিন্‌ডিদা? এই জাগুয়ার হল গিয়ে পৃথিবীর মধ্যে নাম-করা ফ্যাশানেবল ঢাউস মোটরগাড়ি!...এখন একটা এসেছে চোখে দেখেও জিন জেকব বুঝতে পারছে না জাগুয়ার এলো না রেমব্র্যান্ডট্ এলো—তার বিদ্যে বুদ্ধির দৌড় অভিজাত নিমন্ত্রিতদের কাছে ফাঁস হয়ে গেল না? তারা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসবে না?

পিন্‌ডিদা মন্তব্য করল, সোনা সোনার ছেলেই বটে—এগুলো সব দু'পেয়ে গাধা।

মন্তব্য গায়ে না মেখে আবার আমরা গপ্পের জগতে ফিরে ডালাসের আসরে পৌঁছে গেলাম।

...পিন্‌ডিদা কি করল? হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠে জিন জেকবকে জড়িয়ে ধরে পার্টির ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আড়ালে এসে জেকবকে এই মারে তো সেই মারে। অভিজাত আমন্ত্রিতদের সে কি হাসির খোরাক জুগিয়েছে বুঝতে পেরে জেকবের মুখ চুন। আবার সঙ্গে সঙ্গে কোটি-কোটি পতির মেজাজ চড়ল। পিন্‌ডিদাকেই দোষ দিল, অর্ডার যা দিয়েছিলে তার কোনটা কি আমাকে আগে থাকতে বলে রাখবে তো? তুমিই আমার সর্বনাশ করলে—

পিন্‌ডিদা বলল, শোনো, আর সময় নষ্ট করার সময় নেই—এক্ষুণি তিন চারটে বড় কাগজের রিপোর্টারকে ফোনে নেমন্তন্ন করে চলে আসতে বলো—ঘরোয়া পার্টিতে তারা আসতে চাইবে না—তাদের বলো ফুটবলের মালটি সুপার-স্টার পিন্‌ডি এই পার্টিতে উপস্থিত আছে—তাহলেই ছুটে আসবে তারা—এই বিপাকে নিজের পরিচয় ফাঁস না করে আর উপায় কি—তোমার মুখ রক্ষা তো করতে হবে!

দশ মিনিটের মধ্যে চার-চারটে বড় খবরের কাগজের রিপোর্টার হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। পিন্‌ডি পার্টিতে উপস্থিত জানার পরেও তারা না এসে পারে? আর এ-দিকে জাগুয়ার ডেলিভারি দেবার জন্যও লোক এসে গেছে। জাগুয়ার আর রেমব্র্যান্ডট্ দেখে রিপোর্টাররা খুব খুশি।...হ্যাঁ, জেকব লোকটার টাকা যেমন আছে রুচিও তেমনি বটে।

তাদের সামনেই পিন্‌ডিদার হঠাৎ কি মনে পড়তে জেকবের গলা জড়িয়ে ধরে বেদম হাসতে লাগল। বলল, মাই ডিয়ার জেকব, তোমার রসিকতার ধার আর সাহস দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গেছে—অভিজাত সোসাইটির ওপর তুমি যে ব্যঙ্গের চাবুক হানলে তার তুলনা নেই—ফুটবল সুপার স্টার পিন্‌ডি তোমার কাছে মাথা নত করছে।

ব্যাপার সঠিক না বুঝেও কাগজের রিপোর্টার সেই জড়াজড়ির ছবি আর ফুটবল সুপার স্টারের মাথা নত করার ছবি তুলে ফেলল। তারপর জানতে চাইলো, অভিজাত সোসাইটির ওপর অয়েল মার্চেন্ট কি ব্যঙ্গের চাবুক হানলো যে ফুটবল সুপার স্টার এত মুগ্ধ?

পিন্‌ডিদা হাসতে হাসতে ব্যাপারখানা খুলে বলল তাদের। টাকার জোরে আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায় কি বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে সমাজের মাথায় চড়ে আছে—তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখালো অয়েল মারচেন্ট ধনপতি জিন জেকব। নিজেকে সেই নির্বোধের দলে ফেলে অভিজাত সমাজের ওপর এমন ব্যঙ্গ পৃথিবীর ক'জন ছুঁড়ে দিতে পেরেছে। এই একটি রসিকতার জন্য ফুটবল সুপার স্টার পিন্‌ডি'র তাকে অভিজাত সমাজের রসিক-চূড়ামণি বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই।

রিপোর্টারেরাও মহা খুশি হয়ে ছবি আর নোট নিয়ে তাড়াতাড়ি যে-যার কাগজের অফিসে ছুটল। খাওয়া মাথায় থাক—আজকের নাইট এডিশনেই এমন মজাদার খবরটা ছাপতে না পারলে অন্য প্রতিযোগী কাগজের কাছে মার খাবে। দেড় ঘন্টার মধ্যে এই দারুণ খবরটা চার চারটে কাগজের মারফৎ ডালাসে ছড়িয়ে পড়ল।

এ-দিকে পার্টি তখনো চলছে। কারণ প্রোগ্রাম তো ইলাহী। সে-ব্যাপারে তো আর কার্পণ্য করা হয়নি! অভিজাত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা তখনো হোস্ট জিন জেকবের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে জটলা করছে আর রুমালে মুখ চেপে দম-ফাটা হাসি হাসছে। এরই মধ্যে আসরে কতগুলো নাইট্ এডিশনের কাগজ এসে গেল। সেই কাগজ দেখে পার্টির সমস্ত অভিজাত আমন্ত্রিতের চক্ষুস্থির। তারপর পার্টিতে আরো কাগজ আসছে—আসছে তো আসছেই। সমস্ত কাগজে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডি আর অয়েল মারচেন্ট জিন জেকবের জড়াজড়ির ছবি—আর অভিজাত সমাজের প্রতি জিন জেকবের রেমব্র্যান্ডট্ আর জাগুয়ার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রহসন। সেই সঙ্গে তার সম্পর্কে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডির মন্তব্য।

পার্টির চেহারাই বদলে গেল। কি আশ্চর্য, এটা যে হোস্টের এত বড় একটা রসিকতা তারা কিনা বুঝতেই পারেনি! কেবল, তাদের অগোচরে কাগজের রিপোর্টার যারা উপস্থিত ছিল তারা বুঝেছে। বুঝে বাইরে এসে জিন জেকব আর ফুটবল মালটি সুপারস্টার পিন্‌ডিকে ছেঁকে ধরে রিপোর্ট আর ছবি

নিয়ে ফলাও করে ছেপেছে! হ্যাঁ, জিন জেকবের মতো এমন নির্ভীক বাস্তব রসিক অভিজাত সমাজে কত জন আছে! কাড়াকাড়ি করে তারা এসে এসে জিন জেকবের সংগে হ্যান্ডশেক করতে লাগল আর জেকব দম্পতীর সংগে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডিকেও নিজেদের পার্টিতে নেমন্তন্ন করে যেতে লাগল। একজন তো ঘোষণাই করে বসল, তার পরবর্তী পার্টিটাই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জিন জেকব আর ফুটবল সুপার স্টার পিন্‌ডির সম্মানার্থে।

দিন-কতকের মধ্যে পিন্‌ডিদা জিন জেকবের নতুন কেনা জাগুয়ার গাড়ি নিয়ে আরো চমকের ব্যবস্থা করল। কাগজে অয়েল মারচেণ্ট জিন জেকব আর তার জাগুয়ার গাড়ি সম্পর্কে অভিনব খবর বেরুলো। যেমন, জিন জেকব চশমা ছাড়া অন্ধ, মাইনাস পঁচিশ তার চশমার পাওয়ার—চশমা ছাড়া এক হাত দূরের মানুষও দেখতে পায় না। সেই মানুষ কিনা তার জাগুয়ার চালাবার সময় চশমা পাশে খুলে রাখে—সে সময় তার চশমার দরকারই হয় না—এর রহস্য কি? এ-ভাবে গাড়ি চালালে তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ডালাসের লোক তো রোজ একশ দেড়শ করে খতম হবার কথা। অথচ একটিও অ্যাকসিডেণ্ট হয় না—জাগুয়ার গাড়ি চালাবার সময় চশমা খুলে রেখেই মনের আনন্দে গাড়ি চালায় জিন জেকব। পাশে স্ত্রী আর ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডিকে নিয়ে জেকবের গাড়ি চালানোর ছবিও কাগজে ছাপা হয়েছে। পরে অয়েল মারচেণ্ট জিন জেকবের বাদশাই মেজাজ বোঝা গেছে। নিজের সামনের দিকের কাচের খানিকটা অংশে নিজের চশমার পাওয়ার বসিয়ে নিয়েছে জেকব। তাই চালাবার সময় আর চশমার দরকার হয় না। সুইচ টিপলেই তার দিকের সামনে পাওয়ার বসানো উইন্ড-শেল বেরিয়ে আসে। অন্য ড্রাইভার চালানোর সময় আবার সুইচ টিপলেই সেটা সরে যায়।

এই অভিনব বুদ্ধি পিন্‌ডিদার। তার দৌলতেই অভিজাত মহলে জিন জেকব আর তার রোগা পটকা স্ত্রীর খাতির কদর তুংগে।

...পিন্‌ডিদা এবার ছুটি চায়। তাকে ব্রেজিলে ফিরতে হবে। কোচের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু যাবার কথা বললেই জেকবের মেজাজ খাপ্পা। পিন্‌ডিদা বুঝতে পারে জেকব তার পিছনে অন্তত পনেরো জন স্পাই লাগিয়ে রেখেছে। হঠাৎ গা-ঢাকা দেবার রাস্তা নেই। জেকবের স্পষ্ট কথা, এ জীবনে সে আর পিন্‌ডি বিচ্ছিন্ন হবে না। ছাড়াছাড়ির মতলবকরলে জেকব আগে বন্ধু পিন্‌ডিকে গুলি করে মারবে তারপর নিজেকে। না পিন্‌ডিদার এ-জীবনে আর বোধহয় নিষ্কৃতি নেই। সে হাত বাড়ালে জেকব তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু মুক্তি দেবে না।

এমন দিনে একটা অঘটন ঘটে গেল। বলা নেই কওয়া নেই জেকবের রোগা-পটকা বউ জোসেফিন চোখ বুজে বসল। জেকব শোকে কাতর। পিন্‌ডিদা তাকে অষ্টপ্রহর সান্ত্বনা দিচ্ছে। জেকবের নাজেহাল দশা।

একদিন পিন্‌ডিদাকে বলল, আর তো পারি না, চলো কিছুকালের জন্য আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি পিন্‌ডি—ডালাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

পিন্‌ডিদা এক পায়ে প্রস্তুত। এক জায়গায় বসে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গিয়ে (পিন্‌ডিদা পর্যন্ত নাকি মুটিয়ে গেছল) কোটি-কোটিপতির ধামা ধরে থাকতে আর কাঁহাতক ভালো লাগে। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করল, স্থল-পথে নয় জল-পথে পাড়ি জমাবে তারা। কোথায় যাবে? ভেবে কাজ নেই, যেদিকে দু'চোখ যায়। কোন্ জল-পথ ধরবে—রেড্ রিভার না গালফ্-অফ মেক্সিকো? না রিভার টিভারের ছোট-খাটো জল-যাত্রা ভালো লাগবে না। তার থেকে গালফ্ অফ মেক্সিকোয় ভেসে পড়া যাক। পরে ওটাই তো বিশাল ক্যারেবিয়ান সী হয়েছে—সেখানে কত জানা অজানা দ্বীপ, কত জানা অজানা পাহাড়।

অজানার হাত-ছানির এই রোমাঞ্চের কি তুলনা আছে। দারুণ একটা মডার্ন লঞ্চ কিনে ফেলা হল। জেকব তার পুরনো লঞ্চ বাতিল করল কেবল পুরনো সারেঙ আর তার জুনিয়ার মেট্ আর খালাসি দু'জন থাকল। তারা অভিজ্ঞ লোক, প্রস্তুত হয়ে সব-রকম সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তবে রওনা হতে চায়।

কিন্তু জেকবের আর দেরি সয় না। বউ মরে যেতে মেজাজ খিটখিটে। যাবার দিন দু'দুবার বাতিল করা হয়েছে। সারেঙকে ডেকে জেকব শাসিয়ে দিল, ফের যাত্রা পিছোলে দলবলসুদ্ধ তোমাকে বরখাস্ত করা হবে—এটা লাস্ট ওয়ার্নিং মনে রেখো!

মুখ কালো করে সারেঙ চলে যেতে পিন্‌ডিদা বলল, ওর ওপর নির্ভর করেই আমরা ভেসে পড়তে চলেছি, আর যাত্রার আগেই ঘা বসিয়ে ওর মনটা খারাপ করে দিলে!

জেকব তক্ষুণি ফোঁস করে উঠল, কি বললে—ওর ওপর নির্ভর করে আমরা ভেসে পড়তে চলেছি! তুমি কি সেই পিন্‌ডি আছ না তোমার মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে? আমি অয়েল মারচেণ্ট জিন জেকব—মালটি মালটি মালটি মিলিয়নেয়ার—আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তে চলেছি লঞ্চের একটা সারেঙের ওপর নির্ভর করে! এই কথা কিনা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো?

পিন্‌ডিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল, আমি ঠিক সেই কথা বলছি না— লঞ্চ চালিয়ে নিয়ে যাবার আর ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা তো ওর—কখন কি দরকার হয় ভেবে চিন্তে গোছগাছ করে নিয়ে তবে তো বেরুবে—একটু কিছু গন্ডগোল হলে তুমি তো তখন ওর টুঁটি চেপে ধরবে।

—আলবত্ ধরব, গন্ডগোল হলে লোকের টুঁটি চেপে ধরার আমার রাইট আছে! আসলে ওই সারেঙ হোম-সিক্ হয়ে পড়েছে বলে নানা অছিলায় দেরি করছে—বউ তো আর ওর মরেনি, আমার মরেছে। এত গোছগাছ করার কি আছে?

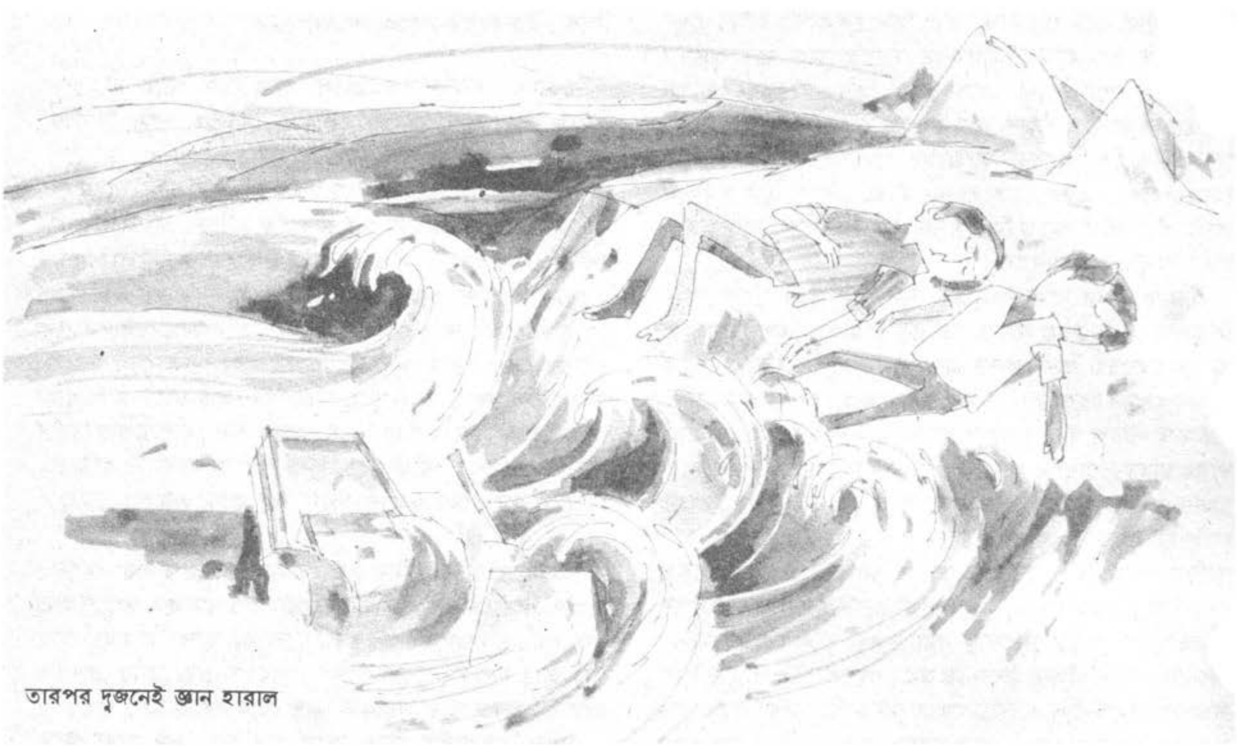
তারপর দুজনেই জ্ঞান হারাল

মালটি মালটি মালটি মিলিয়নেয়ার কাকে বলে তুমি জানো না বলেই এ-কথা বলছ পিন্‌ডি—যার তেল আছে দুনিয়ায় তার সব আছে—বুঝলে? তেল থাকা মানেই সংগে ডলারের বস্তা থাকা, আর পকেটে ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাংকের চেক বই থাকা—এই দুটো জিনিস সংগে থাকলে সমুদ্রের মাছ আর হাঙর কুমিরও নিজের গায়ের ছাল খুলে তোমার দরকারি জিনিসের যোগান দেবে-গোছগাছের নামে অত সময় নষ্ট করার দরকার কি?

কি মানুষের সংগে ভেসে পড়তে চলেছে ভেবে পিন্‌ডিদার মন খারাপ হয়ে গেল। তেল যখন ছিল না তখন এই মানুষই কি ছিল। আর তেল হবার পর দুনিয়ার মানুষও বোধহয় তাকে তেল দিয়ে খুশি করতে পারবে না। কিন্তু সাহস করে যাবে না বলারও কি উপায় আছে পিন্‌ডিদার? ওর পকেটে সর্বদা রিভলভার মজুত থাকে। মেজাজ তিরিক্ষি হলে হয়তো গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে—তারপর টাকার জোরে সকলের মুখ বন্ধ করে শেষে কাঁদতে কাঁদতে মিশরে টিশরে গিয়ে দেহটাকে মমি বানিয়ে এনে নিজের শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখবে।

দুর্গা দুর্গা করে এক সকালে যাত্রা করা গেল। সর্বাধুনিক লঞ্চ গালফ্ অফ মেক্সিকোর জলে ভেসে চলল। প্রথম তিন চারটে দিন বেশ আনন্দেই কাটল। জিন জেকব বউয়ের শোক ঝেড়ে ফেলেছে। নাচ গান খাওয়া দাওয়া আনন্দ ফূর্তির মধ্যেই একসময় পিন্‌ডিদাকে বলল, নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে মনের মতো নতুন ধরনের কোনো ব্যবসা ফেঁদে ফেলতেও আপত্তি নেই। পুরনো কোনো কিছুই জিন জেকবের আর পছন্দ নয়।

এরপর সারেঙকে ডেকে হুকুম করল, নতুন পথে চলো, নতুন দিকে চলো—আমি পুরনো দ্বীপ পুরনো পাহাড় পুরনো জল-জংগল কিছুই দেখতে চাই না—তোমার কম্পাস বন্ধ করে দাও—যে-দিক চোখ টানে সেই দিকে চলো!

...দিন দশ বারোর মধ্যে লঞ্চ সত্যিই এমন অজানা পথে পাড়ি জমালো যার হদিস কেউ জানে না। দূরে দূরে জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে আছে ছোট বড় পাহাড়। দূরে দূরে কখনো একটা দ্বীপ চোখে পড়ছে। সেই সব দ্বীপে জন-মানুষ জীবন জন্তুর চিহ্নও নেই। কিন্তু জিন জেকবের তবু ভেসে চলার তাড়া।

বে-গতিক দেখে সারেঙ চুপিচুপি পিন্‌ডিদার সংগেই পরামর্শ করে। খাবারের স্টক কমে আসছে, এ ভাবে চললে বিপাকে পড়তে হবে। পিন্‌ডিদা বলল, তোমাদের সাহেবকে বুঝতে না দিয়ে ফেরার রাস্তা ধরো। কিন্তু সারেঙ ফেরার রাস্তারও ঠিক হদিস পাচ্ছে না—দু'দিন আগের ঝড়ে লঞ্চের

কম্পাস্‌টা বিগড়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

তবু মাথা খাটিয়ে এবার ফেরার চিন্তাই করা উচিত। পিন্‌ডিদাই জেকবকে বিপদের আভাস দিল। খাবার ফুরিয়ে গেলে সর্বনাশ—তেল ফুরিয়ে গেলেও সর্বনাশ। এমন একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে না যেখানে খাবার বা তেল পাওয়া যেতে পারে।

জেকব খাপ্পা।—কি! আমি মালটি মালটি মালটি মিলিয়নেয়ার অয়েল-মারচেন্ট—আমার খাবার ফুরোবে তেল ফুরোবে? ঠিক আছে, ফিরতে বা কোনো লোকালয় পেতে কত দিন লাগবে?

সারেঙ মাথা চুলকে জবাব দিল, তিন দিন লাগতে পারে আবার তিন সপ্তাহও লাগতে পারে—লঞ্চ সমুদ্রের কোথায় ভাসছে এখন তারই তো হদিস মিলছে না—তাছাড়া অজানা জায়গায় লোকালয় কোথায় বা কতদূরে সে কি করে জানবে?

জেকবের থমথমে মুখ।—তিন সপ্তাহ সময় লাগলে খাবার বা তেল ফুরিয়ে যাবে না?

—ফুরোনোই সম্ভব সার...

—তবে আর কি, আনন্দ করে হাত তুলে নাচো সকলে! ইডিয়েট কোথাকারের।...শোনো, তেল ফুরোলে চলবে না, মাঝে মাঝে লঞ্চ চালাবে আর মাঝে মাঝে মেশিন বন্ধ করে সকলে মিলে কাঠের পাটাতন টাটাতন দিয়ে নৌকোর মতো করে লঞ্চ চালাবে- সক্কলে হাত চালাবে, তুমি সুদ্ধু—কেবল আমি তখন স্টিয়ারিং ধরব, আর পিন্‌ডি আমার পাশে থাকবে। বুঝলে?

পুরনো লঞ্চ একটু আধটু চালাতে শিখেছিল জিন জেকব। তাইতেই তার ধারণা সে এই বিদ্যেয় বিশারদ একজন। হুকুম শুনে সারেঙ চোখে সর্ষেফুল দেখছে। মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

কিন্তু মালিকের এটাই শেষ হুকুম নয়। পরের হুকুম আরো মারাত্মক।—শোনো, যতদিন না কোনো লোকালয়ে গিয়ে খাবার যোগাড় করা হচ্ছে, ততোদিন লঞ্চের খাবারের স্টক তোমরা ছোঁবেও না—এই খাবার শুধু আমার আর পিন্‌ডির জন্য রিজারভ থাকবে। শুধু লঞ্চের জল ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না—সমুদ্রের লবণ-জল খাবার জল করে নেবার অটোমেটিক যন্ত্র আছে যখন লঞ্চে—জলের ভাবনা নেই—কিন্তু খাবারের স্টকে হাত দিলে আমি গুলি করে মারব—তোমরা জাল ফেলে সমুদ্রের মাছ ধরে খাবে।

সারেঙ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কাঁপতে শুরু করেছে। হাত জোড় করে তার জুনিয়র মেট্ জানালো, জাল তো সঙ্গে আনা হয়নি সার...মাছ কি করে ধরা যাবে...?

—ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস! রাগে তিনখানা হয়ে ফেটে পড়ল জিন জেকব—একটা জাল পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে আমাকে নিয়ে তোমরা সমুদ্রে ভেসেছ—সমুদ্রে আমার ফিশিংয়ের শখ হতে পারে এটা পর্যন্ত মাথায় আসেনি!

সারেঙ মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে হুইল বঁড়শি টড়শি আছে—জাল নেই।

—তবে তাই দিয়ে মাছ পেলে ধরে খাবে নইলে খাবে না—পিন্‌ডি! এখন থেকে তুমি খাবারের স্টকের চার্জে থাকবে—ও-দিকে কেউ এগোলে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

ফেরার চেষ্টায় আরো দুটো দিন কাটলো। ফেরা হচ্ছে না সকলে মিলে আরো অথৈ জলে পড়ছে কেউ জানে না। জেকবকে বুঝ দেবার জন্য মাঝে মাঝে লঞ্চ থামিয়ে সকলে মিলে হাত লাগিয়ে জল কেটে এগোতে চেষ্টা করে। আসলে একটুও এগোয় না, স্রোতের টানে যেটুকু ভেসে চলে। বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে চেষ্টাও হয়। একটি মাছও ওঠেনি।

সকলের মনের যা অবস্থা, কে ঠান্ডা মাথায় বসে মাছ ধরতে পারে? জেকবের অগোচরে তাদের একে একে ডেকে পিন্‌ডিদা লঞ্চের স্টক থেকেই খাবার দেয়।

সেদিন বিকেলের পরে সারেঙ আর লঞ্চ নিয়ে এগোলো না। একটা ছোট পাহাড়ের ধারে মাটির নাগাল পেয়ে নোঙর ফেলল। জানালো, বাতাস দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের অবস্থা ভালো নয়। অন্ধকার হয়ে গেলে চোরা পাহাড়ে লেগে লঞ্চের ক্ষতি হতে পারে।

ওদের মনে কি ছিল তা কেবল ওরাই জানে।

রাত্রি। জেকব দেদার মদ গিলে ঘুমোচ্ছে। আর মাথাটা নানা চিন্তায় ধরেছিল বলে পিন্‌ডিদাও কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিল। লঞ্চ হঠাৎ বিষম দুলতে লাগল আর ঠোক্কর খেতে লাগল। ঘুম ভেঙে পিন্‌ডিদা আর জেকব দু'জনেই উঠে বসল। কিন্তু বসেও থাকতে পারছে না, লঞ্চ এলো পাথাড়িভাবে দুলছে আর কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ভীষণ ঝড় উঠেছে। সমুদ্র অশান্ত উত্তাল। আসলে ধাক্কা নয়, বিরাট বিরাট ঢেউয়ের আঘাতে লঞ্চ ভেঙে পড়ার দাখিল। তখন প্রায় ভোরই হয়ে গেছে কিন্তু এই বিপর্যয়ে চারদিক অন্ধকার—মনে হয় গভীর রাত।

জেকব চিৎকার করে উঠল, সারেঙ উল্লুকের দল কি করছে—নোঙর তুলে নিচ্ছে না কেন—লঞ্চ যে এক্ষুণি চুরমার হয়ে যাবে।

পিন্‌ডিদা তাকে ছেড়ে কোনরকমে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। কোথায় সারেঙ আর কোথায় তার সব লোক! লঞ্চ ফাঁকা, কেউ নেই। পিন্‌ডিদার তক্ষুণি সন্দেহ হল, লঞ্চ আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল পিছনে লাইফ বোটটা বাঁধা নেই আর লাইফ-বেল্ট বাঁধা রবারের বয়াগুলোও উধাও। অর্থাৎ ওগুলো নিয়ে লাইফ বোটে উঠে সারেঙ সদলে পালিয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে পিন্‌ডিদা খাবারের স্টকের খুপরিতে এলো। প্রায় সব খাবারই তুলে নিয়ে গেছে তারা—জলের ড্রাম দুটো পর্যন্ত।

আবার হামাগুড়ি দিয়ে এসে পিন্‌ডিদা জেকবকে খবরটা দিল। তাদের পাগলের মতো গালাগাল দিতে দিতে জেকব

এন্জিনের দিকে এগলো। পিন্ডিদাকে বলে গেল আমি সিটি বাজালেই তুমি নোঙর তুলে নেবে— নইলে এক্ষুণি লঞ্চ আছড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—নোঙর ছিঁড়ে পাহাড়ে গিয়ে লাগলে আর রক্ষা নেই।

তিন মিনিটের মধ্যে উত্তাল ঝড়ের সমুদ্রে নোঙর তোলা লঞ্চ খেলনার মতো ঢেউয়ের বাড়ি খেতে খেতে তীরের মতো কোন্ দিকে চলল কে জানে।

কিন্তু এ-ভাবে তিন চার ঘণ্টাও কাটল না। পিন্ডিদা পাশের কিছু আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর ডলারের থলে পিঠে শক্ত করে বেঁধে আর ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেক বইও তার মধ্যে ফেলে জেকব প্রাণপণে স্টিয়ারিং ধরে আছে। ঝড় আর ঢেউয়ের আছাড়ি-বিছাড়িতে দু'জনে ঠোক্কর খাচ্ছে ওলট-পালট খাচ্ছে। তারপরেই একটা বিরাট শব্দ, লঞ্চ কোনো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খান-খান। একটা বড় পাথর দু'দিক থেকে আঁকড়ে ধরে জেকব আর পিন্ডিদার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা।

একটু দম নেবার পর দু'জনে শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে নিজেদের সেই পাহাড়ের ওপর টেনে তুলে পাথর আঁকড়ে পড়ে রইলো। তারপর দু'জনেই জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান হতে পিন্ডিদা চোখ মেলে দেখল ঝড় আর ঢেউয়ের চিহ্নও নেই। সমুদ্র শান্ত। মাথার ওপর সূর্যের কড়া তাপ। অদূরে জেকব মাথা গোঁজ করে বসে আছে আর আপন মনে বিড়বিড় করে কি বকছে।

হামাগুড়ি দিয়ে পিন্ডিদা তার পাশে আসতে সে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ডলারের ওয়ালেট আর তার মধ্যে চেক-বইটা ফেলে পিঠে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম—এগুলো খোয়াতে হয়নি—নগদ কম করে এক লক্ষ ডলার সংগে আছে...ঘাবড়ে যেও না।

শুনে পিন্ডিদার কি ইচ্ছে করল ? ইচ্ছে করল একটা ধাক্কা মেরে জেকবকে পাহাড় থেকে জলে ফেলে দিতে। তেলের মানুষ এখনো ডলার দেখাচ্ছে—এ জীবনে তাকে তেল দেওয়ার আর কি দরকার হবে ?

হাত নিশপিশ করলেও মেজাজ সামলালো। অদূরে কিছু দেখা যাচ্ছে।...শ পাঁচেক গজ দূরে বেশ বড়সড় একটা দ্বীপের মতো। সেই দ্বীপে গাছপালা আছে।...অ্যাঁ! আর কি আছে ? ওটা কি ? ও-গুলো কি ?

দুটো গোরু! চার পাঁচটা ছাগল! ওই তো কুকুরও কয়েকটা! পিন্ডিদা উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, ইউরেকা! ওই দ্বীপে নিশ্চয় মানুষ থাকে—নইলে ওগুলো ওখানে কেন!

জেকবও উঠে দাঁড়িয়ে দেখল।—কিন্তু মানুষ বা ঘর বাড়ি তো দেখছি না।

—মানুষ নিশ্চয় আছে—ঘর বাড়িও আছে—ওই গাছপালার সারির ওধারে আছে বোধহয়!

তাই হবে। আরো কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল দশ বারোজন মানুষও এসে দ্বীপের ধারে দাঁড়ালো। পিন্ডিদা গায়ের জামাটা খুলে মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগল আর নাচতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল।

হ্যাঁ লোকগুলো দেখতে পেয়েছে তাদের। অবাক হয়ে দেখছে। পিন্ডিদা নেচেই চলেছে আর মাথার ওপর হাত তুলে জামা নেড়ে ইশারা করেই চলেছে।

লোকগুলো হাত তুলে তাদের কিছু আশ্বাসই দিল বোধহয়। কয়েকজন ছুটে চলে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে ধরাধরি করে তারা একটা ভেলা এনে জলে রাখল। চারজন লোক তাতে উঠে বসে ভেলা নিয়ে এদিকে আসতে লাগল।

...হ্যাঁ পিন্ডিদার আবার মনে হল জীবন বড় প্রিয়। এত সংকট এত বিপর্যয়ের পরেও এই প্রিয় জীবন হয়তো খাঁচা-ছাড়া হবে না।

পাহাড় থেকে নেমে এসে পিন্ডিদা আর জেকব ভেলায় উঠে বসল।

লোকগুলোকে দেখে খুব সাদাসিধে গোছের মনে হল। খুব সাধারণ বেশবাস। আর পাঁচটা সভ্যদেশের মানুষের মতোই কথা-বার্তা। তারা জিগ্যেস করল, তোমরা কে ? কোথা থেকে এলে ? ওই পাহাড়ের ডগায় গিয়ে উঠলে কি করে ?

জেকব নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম জিন জেকব। আমি একজন বিখ্যাত তেলের কারবারী, আমার নিজের তেলের খনি আছে—আর ইনি আমার বন্ধু পিন্ডি, ফুটবল সুপার স্টার। আমরা মেক্সিকোর মানুষ, সমুদ্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, লঞ্চ-ডুবি হতে আমাদের এই হাল—তোমরা পৃথিবীর নামজাদা দু'জন মানুষকে উদ্ধার করেছ, এরপর নির্বিঘ্নে আমাদের দেশে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে আমি তোমাদের বিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেব।

ভেলা দ্বীপের দিকে চলেছে। লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে জেকবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি জিগ্যেস করল, ডলার কি ?...পুরস্কার তো কেবল ঈশ্বর দিতে পারে, তোমরা তো দেখছি আমাদের মতো মানুষ, তোমরা পুরস্কার দেবে কি করে ?

এ-কথা শুনে জিন জেকব হাঁ। ডলার কি জানে না, পুরস্কার কি করে দেবে জানে না, তেল কি জিনিস তা-ও জানে কিনা সন্দেহ—এরা আবার কি রকম মানুষ!

পিন্ডিদা লোকগুলোকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছিল। সেই বয়স্ক লোকটিকে জিগ্যেস করল, এটা কোন দ্বীপ ?

সে জবাব দিল, এটা জ্ঞানী পুরুষের দ্বীপ।

—জ্ঞানী পুরুষ! তিনি কে ?

—আমাদের দ্বীপের রাজা।...জ্ঞানী পুরুষ জানো না, তোমরা কেমন লোক...তোমাদের দেশে জ্ঞানী পুরুষ নেই ?

জেকব ফড়ফড় করে বলে উঠল, এন্তার আছে—আমরা

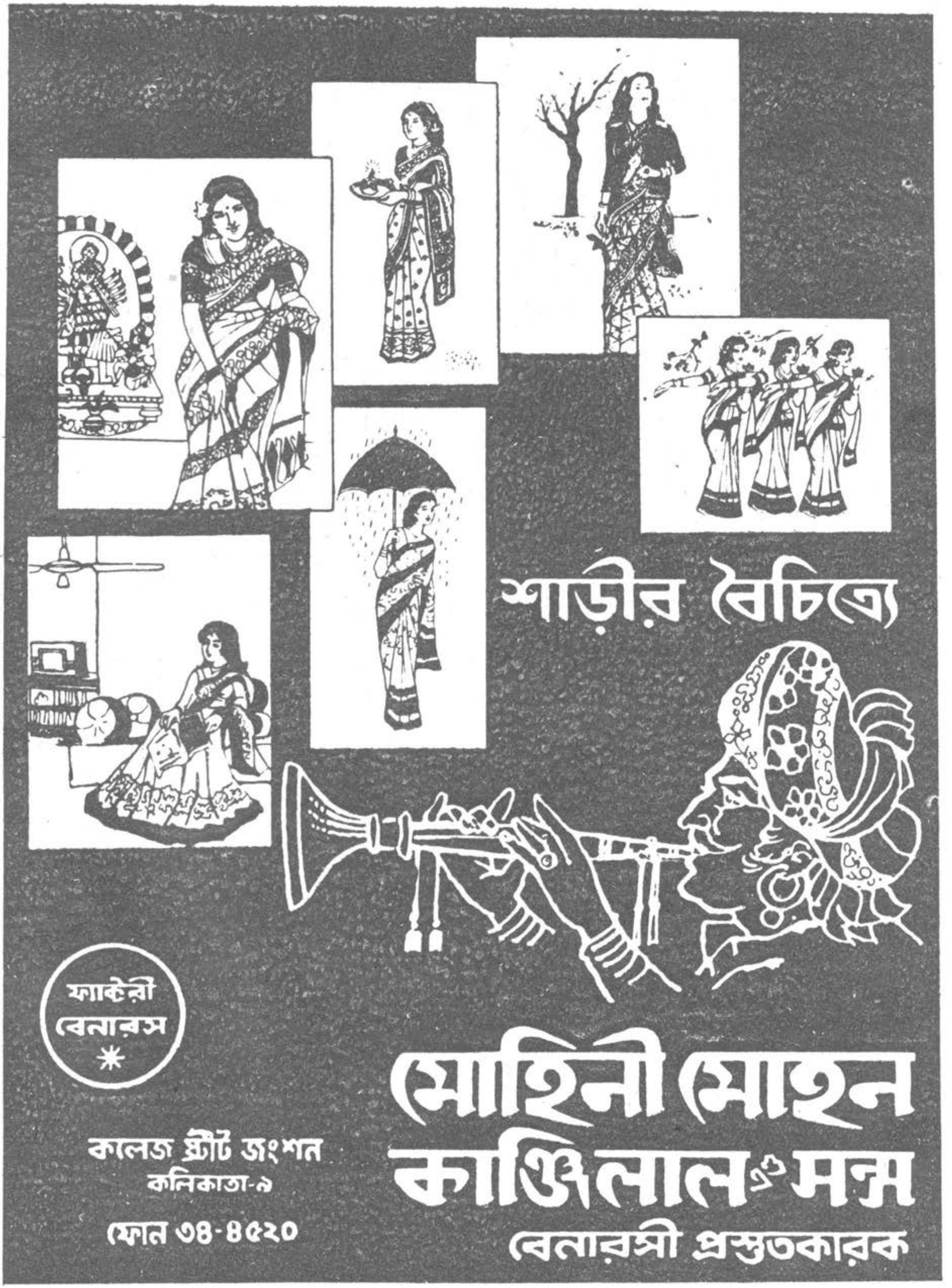

শাড়ীর বৈচিত্র্যে
ফ্যাক্টরী
বেনারস
মোহিনী মোহন
কাঞ্জিলাল এণ্ড সন্স
বেনারসী প্রস্তুতকারক
কলেজ ষ্ট্রীট জংশন
কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-৪৫২০

সকলেই জ্ঞানী পুরুষ।

শুনে লোক ক'জন যেন ধড়ফড় করে উঠল। বড় বড় চোখ করে দু'জনকে দেখতে লাগল।

জেকব বলল, তোমরা ডলার চেনো না, খাও কি করে?

সেই লোক জবাব দিল, আমরা তো খাবার জিনিস তৈরি করে বা রান্না করে হাত দিয়ে খাই–তোমরা ডলার দিয়ে খাও...সে কেমন দেখতে?

জেকবের মেজাজ চড়ল, ডলারের দেমাকে যে ফুলে ফেঁপে বেলুন হয়ে আছে–কেউ সেই ডলার চেনে না শুনলে কেমন লাগে? পিঠে বাঁধা ওয়ালেট থেকে ডলার বার করে দেখাতে পারে, কিন্তু দেখিয়ে লাভ কি! খিটখিটে সুরে জিগ্যেস করল, তেল চেনো, না তা-ও চেনো না?

জেকবের মেজাজ দেখে লোকগুলো ভড়কে যাচ্ছে। সেই বয়স্ক লোকই বলল, আমরা বীজ পিষে রান্নার তেল প্রদীপের তেল বার করি–সেই তেলের কথা বলছ?

রাগে আর হতাশায় জিন জেকব সমুদ্রের দিকে ঘুরে বসল। যে মানুষেরা ডলার চেনে না তাদের কাছে তার কি কদর হবে?

পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, তোমাদের দ্বীপে কেনা-বেচা নেই?

–কেনা-বেচা! সে কি মরা-বাঁচার মতো কিছু? মরা-বাঁচা আছে...কিন্তু সে তো ঈশ্বরের হাতে, আর কিছুটা আমাদের রাজা জ্ঞানী পুরুষের হাতে। ঘোর পাপীকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, আবার অল্প স্বল্প দোষ করলে বাঁচিয়ে রেখে দোষ মুক্ত হবার সুযোগও দিতে পারেন।...কিন্তু মৃত্যুদণ্ড আমাদের জ্ঞানী পুরুষ বলতে গেলে দ্যানই না–কারণ তাঁর দ্বীপে সে-রকম পাপী কেউ নেই, বেশি দোষ করলে দুই একজনকে নির্বাসন দিয়ে আমরা অন্য জগতে পাঠিয়ে দিতে দেখেছি–জ্ঞানী পুরুষ মন্দ লোক বা লোভী লোক পছন্দ করেন না–তারা থাকলে দ্বীপের মানুষ খারাপ হয়ে যায়–তাই তিনি ভিন্ন জগৎ থেকে জাহাজ-পুরী ডাকিয়ে এনে তাতে উঠিয়ে দিয়ে তাকে দ্বীপ-ছাড়া করান। কারো চরিত্র-দোষ দেখলে জ্ঞানী পুরুষ সব থেকে রেগে যান।

পিন্‌ডিদা এবারে খুব উৎসুক।–ভিন্ন জগৎ থেকে তোমাদের জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী ডাকিয়ে আনান...সেই জাহাজ-পুরী সমুদ্রের জলে ভেসে আসে?

–তাই তো আসে। আমাদের দ্বীপে হয় না বা পাওয়া যায় না এমন কত কি তো অনেক সময়েই দরকার হয়, বেশি অসুখ-বিসুখ লেগে গেলে এখানে তৈরি হয় না এমন ওষুধও দরকার হয়–সাধারণত সে-রকম দরকারের সময়েই জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী তলব করেন, আর তখনই অপছন্দের লোককে তিনি সেই জাহাজ-পুরীতে তুলে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেন।

পিন্‌ডিদা সাগ্রহে জিগ্যেস করল, তোমাদের জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী কি করে তলব করেন?

–জ্ঞানী পুরুষের যন্ত্রপাতি আছে, সেটা নাড়া-চাড়া করেই তিনি খবর পাঠাতে পারেন–তার কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজ-পুরী জলে ভেসে চলে আসে।

জিন জেকবও ভুরু কুঁচকে বেশ মন দিয়ে শুনছে।

পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, এই দ্বীপে তোমরা কত মানুষ আছ?

–তা মেয়ে পুরুষ বুড়ো বুড়ী বাচ্চা কাচ্চা মিলিয়ে হাজার দশেক হবে।

–এই জ্ঞানী পুরুষ কত কাল ধরে তোমাদের রাজা হয়ে আছেন?

–ইনি চল্লিশ বছর ধরে আমাদের রাজা হয়ে আছেন। এঁর আগে এঁর বাবা জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন । এঁকেও ঈশ্বর ডেকে নিলে এঁর বড় ছেলে জ্ঞানী পুরুষ হবেন।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল,–তা আমরা তো এখন তোমাদের আশ্রিত–আমাদের দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে?

–তোমরা আমাদের আশ্রিত হতে যাবে কি জন্যে, আমরাই তো জ্ঞানী পুরুষের আশ্রিত...আমরা তোমাদের তো জ্ঞানী পুরুষের কাছে নিয়ে যাব, তোমরা কেমন লোক তোমাদের মুখ দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন। তাঁর বিচার আর তাঁর-বিবেচনা, আমরা আশ্রয় দেবার কেউ না।

পিন্‌ডিদা আর জিন জেকব ভেলা থেকে নেমে দ্বীপে উঠতে অনেক লোক তাদের ঘিরে ধরল। এই মানুষগুলোও বেশ সোজা সরল মনে হল পিন্‌ডিদার। অথচ বন্দীর মতোই তারা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে সংগে সংগে আসতে ইশারা করল।

চলতে চলতে খাটো গলায় জিন জেকব বলল, ওদের এই জ্ঞানী পুরুষ মহা ঝানু লোক বুঝতে পারছ?...দশ হাজার লোককে বোকা বানিয়ে তাদের রাজা হয়ে বসে আছে, অয়্যারলেসে তার সংগে নিশ্চয় কোনো মেন-ল্যান্ডের যোগাযোগ আছে, খবর দিয়ে সেখান থেকে দরকার মতো জাহাজ আনায়–বুঝলে?

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, আমি সবই বুঝেছি, তুমি কেবল তার কাছে গিয়ে তোমার তেলের মেজাজ দেখিও না–আর ডলার দেখিও না–আশ্রয় পেতে চাও তো তাকে বরং বুদ্ধিমানের মতো একটু তেল দিতে চেষ্টা কোরো।

খুব চিন্তিত মুখে জেকব বলল, তেলেভেসে ডলারের পাহাড়ে উঠে বসে তেল দেওয়া যে প্রায় ভুলেই গেছি পিন্‌ডি ভাই–বেমক্কা যদি মুখ দিয়ে কিছু বেরিয়ে যায়?

–তাহলে মরবে। তার থেকে মুখ সেলাই করে থাকো–আমি কি করি দেখো।

তারা যত এগোচ্ছে, সামনে পিছনে লোক ততো ভেঙে পড়ছে। সকলেরই দেখার আর জানার কৌতূহল কোন জগৎ থেকে কারা এখানে এলো। দ্বীপে একটিও পাকা ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল না পিন্‌ডিদার। সবই বাঁশ হোগলা আর খড়ের

ঘর। একটিও যানবাহন চোখে পড়ল না। দূরে দূরে লাঙল গোরু দিয়ে জমি চষছে কেউ কেউ। দু'দিকে গাছ-পালা ফুলে ফলে ভরে আছে।

জ্ঞানী পুরুষ রাজার বাড়িও অন্য রকম কিছু নয়। একই ধরনের একটু বড়সড় ছাপরা ঘর। লোকটা বাইরেই একটা উঁচু ঢিবিতে বসে আছে। পিন্‌ডিদার মনে হল বছর পঁয়ষট্টি বয়েস হবে। বেশ সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি। বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ির বোঝা। চোখের চাউনি উজ্জ্বল। তারও অতি সাধারণ বেশ-বাস। পরদেশী দু'জনকে নিয়ে এসে দ্বীপবাসীরা মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তাকে অভিবাদন জানালো। দেখা-দেখি পিন্‌ডিদা আর জেকবও তাই করল। উঠে জেকব আশ্বস্ত সুরে কানে কানে বলল, লোকটা দেখতে তো দুশমনের মতো নয় পিন্‌ডি—ভিতরে কেমন কে জানে।

জবাবে সকলের অলক্ষ্যে পিন্‌ডিদা তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারল। রাগে চাপা গলায় জেকব গজগজ করে উঠল, এখানে তেলের দাম নেই বলেই তোমার এত সাহস।

তেমনি চাপা-গলায় পিন্‌ডিদা বলল, এখানে কেবল তেল দেওয়ার দাম আছে—সেটা তোমার আমার জীবনের দাম মনে রেখো।

এদিকে ভেলার সেই ক'জন লোক আগে রাজার কাছে গিয়ে পরদেশীদের সম্পর্কে বিবরণ পেশ করছে বোধহয়। জ্ঞানী পুরুষ রাজা মন দিয়ে শুনছে। না রাজার কোনো বডি-গার্ড বা প্রহরী-টহরি নেই। তবু লোকজন কাছে গিয়ে ভিড় করছে না, শ্রদ্ধা সহকারে দূরে দাঁড়িয়ে রাজার বিচার-বিবেচনা বোঝার অপেক্ষায় আছে।

প্রাথমিক খবর শোনার পর রাজার সামনে পিন্‌ডিদা আর জেকবের ডাক পড়ল।

তারা রাজার সামনে এসে সবিনয়ে দাঁড়ালো। রাজা হাতের ইশারায় সক্কলকে আরো দূরে সরে যেতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হুকুম পালন করে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে সরে গেল। তারা বুঝে নিল পরদেশীদের সঙ্গে রাজার কথা-বার্তা তাদের শোনার জন্য নয়।

দু'জনকে ভালো করে একটু দেখে নিয়ে জ্ঞানী পুরুষ রাজা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, দ্বীপবাসীদের হয়ে আমি রাজা জ্ঞানী পুরুষ তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি—বোসো।

পিন্‌ডিদা আনত হয়ে ধন্যবাদ জানালো। দেখাদেখি জেকবও কোথায় বসবে সে ভেবে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। পিন্‌ডিদা ধুপ করে মাটিতে বসে পড়তে সে-ও তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল।

হাসি হাসি মুখে রাজা জেকবের দিকে তাকালো। তোমাদের মধ্যে ভেলায় আমার লোকেদের তেল আর ডলার দেখাচ্ছিল কে—তুমি বোধহয়?

চুপসে গিয়ে জেকব মিনমিন করে বলল, বেগ্ টু বি এক্সকিউজড্ মি লর্ড—এখানকার রীতি তো আমার জানা ছিল না...

—এখানে মি লর্ড কেউ নয়, উই আর অল্ ফ্রেন্ড্স হিয়ার। হাসি মুখে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো।—তুমি খেলোয়াড় হয়ে

লোকটা বাইরেই একটা উঁচু ঢিবিতে বসে

এই তেল-ডলার সংগে ভিড়লে কি করে—তেলের কারবারীকে তেল দেওয়ার জন্য?...তা শোনো বন্ধুরা, এখানকার সহজ সরল মানুষেরা তেল বা ডলার চেনে না। তেল দেওয়া নেওয়ার কারবারও বোঝে না। আমার এখানে নিজের কাজ-নিজে-করো সিসটেম, প্রত্যেকের কাজের ফল আর প্রোডাকশন আমার আড়তে মজুত হয়—তারপর সব জিনিসই যার যেমন দরকার তেমনি বিলি করা হয়। ছেলে-মেয়েদের যারা লেখাপড়া শেখায় আর গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় নিয়ে গবেষণা করে আর চিকিৎসা করে—তাদের কেবল অন্য কোনো প্রোডাকশনের কাজ করতে হয় না। এছাড়া মেয়ে-পুরুষ সক্কলকে যার যার যোগ্যতা আর সাধ্য অনুযায়ী কাজ করতে হয়।...তোমরা আপাতত এই দ্বীপের অতিথি, পরে যদি এখানে থাকার ছাড়পত্র পাও তখন কাজ নিয়ে ভাবা যাবে—এখন তোমরা খাবে দাবে আর অতিথির মতো সব দেখে শুনে বেড়াবে।...কিন্তু একটা কথা, তোমাদের মেন ল্যান্ডের জ্ঞান-বুদ্ধি এই এক্সপেরিমেণ্টাল আইল্যান্ডের সরল মেয়ে পুরুষদের মগজে ঢোকাতে চেষ্টা করবে না—সেটা করলে অপরাধ হবে জেনে রেখো।...আরো একটা কথা খুব ভালো করে মনে রেখো, অতিথি হিসেবে এই দ্বীপের তোমরা সর্বত্র বেড়াতে পারো, কেবল ওই পূব-দক্ষিণ কোণে প্রথম যে পাহাড় আছে—সেটা ছাড়িয়ে তার ও-দিকে কখনো যাবে না—এই হুকুম অমান্য করলে আরো বেশি অপরাধ হবে। এই দুটি নির্দেশ সর্বদা মনে রেখো। এই দ্বীপের মানুষেরা সক্কলে ঈশ্বরবিশ্বাসী, এই বিশ্বাসে আঁচড় পড়ার মতো কোনো কাজ তোমরা করবে না।

জোড়-হাত করে পিন্‌ডিদা বলল, জো হুকুম ধর্মাবতার...কিন্তু আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা কি হবে কবে পর্যন্ত হবে মহামান্য জ্ঞানী পুরুষ?

হাসতে লাগল। জবাব দিল, ঈশ্বর জানেন, তাঁর দয়া হলে ব্যবস্থা হবে না হলে এই দ্বীপেই থেকে যেতে হবে।...এখান থেকে ওখানে যাবার কথা ভেবে কি লাভ, একদিন না একদিন অনেক দূরেই তো সক্কলকে যেতে হবে—তার থেকে উচিত মতো বিবেক-মতো সেই ভীষণতম দিনের জন্য এখন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হতে পারলে দেখবে সেই ভীষণতম দিনেও তোমার মনে মহা-শান্তি —এখানকার মানুষেরা সব করে আর সেই ভীষণতম দিনের জন্যও প্রস্তুত থাকে বলে যাবার সময় মহাশান্তিতেও চলে যায়।

জিন জেকব বলল, ভীষণতম দিন ভালো মানুষের জীবনে আসতে যাবে কেন...আর সেটা কি-রকম দিন না জানলে প্রস্তুত হবই বা কি করে?

মুচকি হেসে জ্ঞানী পুরুষ জবাব দিল, প্রস্তুতির প্রথম পাঠ হিসেবে তোমাকে তেলের ভাবনা আর ডলারের ভাবনা ছাড়তে হবে। তারপর পিন্‌ডিদাকে বলল, তোমাকেও তেল দেওয়ার বিদ্যে ভুলতে হবে।

পিন্‌ডিদা ভাবতে চেষ্টা করে নতুন দ্বীপের নয়া মানুষদের আদরে যত্নে সে বহাল তবিয়তেই আছে। আরো শান্তি, তেলে হাবুডুবু জিন জেকবের মুখ চেয়ে বা মন বুঝে চলার দিন গেছে। হ্যাঁ, জেকব মনে মনে এখনো তার তেলের খনিতেই সাঁতার কেটে চলেছে। তার এক চিন্তা কবে দেশে ফিরে তেলের স্রোতে সাঁতার কেটে আবার ডলারের কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠে বসবে। তার সবেতে খুঁতখুঁতুনি। এই খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে? মাটিতে শুয়ে কেউ ঘুমুতে পারে? এমন ধাপসা মোটা বেশ-বাসে গায়ের ছাল উঠে যায় না? আর এমন নির্বোধ মানুষদের সংগেই বা কত দিন কাটানো যায়? সে দিন-রাত পিন্‌ডিদাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, পালাবার ফিকির বার করো—তেলের মর্ম জানে না বোঝে না—এটা কি একটা ভদ্রলোকের বাসের জায়গা?

বেড়াতে বেড়াতে জেকব আর পিন্‌ডিদা একদিন দ্বীপের পূব-দক্ষিণ কোণের দিকে চলেছে। যত এগোচ্ছে ততো নির্জন। শেষে একসময় জন-মানব ছেড়ে পশু-পাখিও নেই। তারপর সামনে একটা পাহাড়! পিন্‌ডিদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, আর এক পা-ও এগিও না—জ্ঞানী পুরুষ নিষেধ করে দিয়েছিল মনে নেই, এই পূব-দক্ষিণের পাহাড় ছাড়িয়ে এক পা-ও ও-দিকে যাওয়া চলবে না!

জেকব থমকে দাঁড়ালো। নিষেধ মনে পড়েছে। কিন্তু এ ক'দিন দ্বীপের রাজাকে দেখে তার ভয়-ডর কমে গেছে। যা পোশাক-আশাক আর যে-ভাবে থাকে, সকলের সংগে মেলা-মেশা করে রাজা—শুনলে হাসি পায়। এখন আবার জেকবের তেলের মেজাজ। বলল, নিষেধ করল তো বয়েই গেল, চলো গিয়ে দেখা যাক ও-দিকটায় কি আছে।

ভিতরে ভিতরে কৌতূহল একটু পিন্‌ডিদারও আছে। কিন্তু নিষেধ অমান্য করতেও মন সরে না। এই রাজাটিকে তার অন্তত ভালো লেগেছে। বলল, থাক বারণ যখন করেছে গিয়ে কাজ নেই—আপদে বিপদে পড়ব কিনা কে জানে।

কিন্তু তক্ষুণি একটা অদ্ভূত চিন্তা মাথায় এলো জেকবের। সংগে সংগে ভীষণ উত্তেজিত। বলে উঠল, এই, পিন্‌ডি—এমনও তো হতে পারে ও দিকটায় তেলের খনি টনি কিছু আছে, তাই ও-দিকটায় সক্কলের যাওয়া নিষেধ!...লোকটা এখান থেকে অয়্যারলেসে খবর পাঠালে মেন-ল্যান্ড থেকে এখানে জাহাজ আসে—টাকার জোর ছাড়া এটা আর কোন জোর হতে পারে? নিশ্চয় জাহাজে এখান থেকে ক্রুড অয়েল পাঠিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার রোজগার করে এখানে ভালো মানুষ দ্বীপের রাজা হয়ে বসে আছে—উঃ! ব্যাটা কি ধাপ্পাবাজ, আমি যাবই ও-দিকে—কি আছে দেখবই।

উত্তেজনায় বড় বড় পা ফেলে জিন জেকব এগিয়ে চলল। অগত্যা পিন্‌ডিদাও তাকে অনুসরণ করল।

খানিক এসে দু'জনেরই পা থেমে গেল। সামনে একটা গির্জা। আগাগোড়া সুন্দর পাথরের তৈরি। কি অপূর্ব তার

ভাস্কর্য! মার্বেলের মেঝে। অদূরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। কিন্তু সব-কিছুর ওপর পুরু ধুলোর আস্তরণ। কোথাও একটা বাইবেল পর্যন্ত নেই। ঘণ্টাগুলো বিবর্ণ। এত সুন্দর গির্জা কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় বহুকাল এখানে মানুষের পা পড়েনি বা কোনরকম উপাসনা হয়নি।

ব্যাপারখানা কি না বুঝে দু'জনে আবার এগলো। সামনেই একটা ছোট পাহাড়, কিন্তু পাহাড়ে এ আবার কি ভৌতিক কান্ড হয়ে চলেছে! অদূরে দাঁড়িয়ে দুজনে হাঁ করে দেখতে লাগল। পাহাড়ের নিচে থেকে প্রায় এক মণ ওজনের একটা গোল পাথর আপনিই গড়গড় করে প্রায় চূড়ায় উঠে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে আপনিই আবার গড়গড় করে গড়িয়ে নিচে নেমে আসছে। নামছে উঠছে, উঠছে নামছে— কেবল এই করে যাচ্ছে।

পিন্‌ডিদা বলল, দেখো জেকব, ভালো মনে হচ্ছে না, চলো কেটে পড়ি। এ এক ভূতুড়ে জায়গা কিনা বুঝতে পারছি না।

জেকব বলল, এসেছি যখন দেখেই যাই–আরো এগিয়ে হয়তো দেখব খনি থেকে তেল বেরিয়ে আপনিই পিপেতে ভরাট হয়ে চালান হয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছুটা এগোতে চোখ জুড়ানো দৃশ্য। অপূর্ব সুন্দর একটা মস্ত পাখি। যেন আলগা সোনা গুলে গুলে তার দেহ আর বিশাল পাখা তৈরি হয়েছে। দুটো চোখে যেন দুটো হীরে বসানো। মুগ্ধ হবার মতোই পাখির রূপ। সেটার শরীরে সর্বত্র আর দুই ডানায় বাইবেলের গীতার কোরাণের আর বুদ্ধের চমৎকার চমৎকার বাণী বড় বড় হরপে লেখা। স্পষ্ট পড়া যায়। পড়লে মন ভরেও যায়। কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র পাখিটা এ কি কান্ড করছে! যত সব নোঙরা ময়লা ক্লেদাক্ত আবর্জনা তুলে তুলে খাচ্ছে। দেখলে গা ঘিন-ঘিন করে, বমি পায় এমন সব জিনিস খাচ্ছে!

দু'জনে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলল। বাঃ, এবারেও ভারী মনোরম দৃশ্য। চমৎকার সুন্দর একটা বাগান। তাতে হাজারে রকমের ফুল ফুটে আছে। কিন্তু সব ফুলই উঁচু ডালে। একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে সেখানে ঘুরছে আর ফুল পাড়তে চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা ফুলও সে পাচ্ছে না। সব গাছের সমস্ত ফুলই তার নাগালের বাইরে। অনেকক্ষণ ধরে ফুল পেতে চেষ্টা করছে বোঝা যায়, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখ। পিন্‌ডিদা আর জেকবকে দেখে করুণ নেত্রে তাদের দিকে তাকালো। পিন্‌ডিদার ভারী মায়া হল। এগিয়ে এসে বলল, আমার কাঁধে উঠে কিছু ফুল পেড়ে নাও।

ছেলেটা পিন্‌ডিদার কাঁধে উঠে ফুল পাড়তে লাগল। কিন্তু পাড়ছে তো পাড়ছেই, কাঁধ থেকে আর নামার নাম নেই। পিনডিদা নামাতে চেষ্টা করলে সে দু'পায়ে কাঁধ-গলা এমন আঁকড়ে ধরছে যে দম বন্ধ। পিন্‌ডিদার জিভ বেরিয়ে পড়ার দাখিল, চোখে অন্ধকার দেখছে। কিন্তু মাটিতে বসে পড়তে গেলেও ছেলেটা দু'পায়ে সাঁড়াশির মতো এমন গলা চেপে ধরছে যে আবার তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। জেকব তাকে কাঁধ থেকে নামাতে চেষ্টা করতে সেই ছোট্ট ছেলে এমন পা ছুঁড়ল যে সে মাটিতে গড়াগড়ি। পিন্‌ডিদার প্রাণ যায় যায়।

...তারপরেই দেখা গেল সব ভ্যানিশ! বাচ্চা ছেলে-টেলে কেউ নেই। পিন্‌ডিদা মাটিতে বসে জিভ বার করে ধুঁকছে।

এবারে জেকবও ঘাবড়েছে। বলল, চলো চলো, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়–এ নিশ্চয় কোনো মায়াবীর এলাকা।

দু'জনে পা চালিয়ে ফিরে চলল।

যেখান থেকে আর এগনো নিষেধ ছিল ঠিক সেখানে এক দল জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে। এই দ্বীপেরই লোক সব, কিন্তু তাদের মুখ-ভাব কঠিন মনে হল। পিন্‌ডিদা আর জেকব আসতেই তিনজন করে জোয়ান লোক তাদের জাপটে ধরল, একজন লোক চোখের পলকে দু'জনকেই শক্তপোক্ত দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

জেকব বলে উঠল, এ কি রকম ভদ্রতা তোমাদের–আমরা দ্বীপের অতিথি, আমাদের এ-ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবার মানে কি?

একজন ব্যঙ্গ করে বলল, অতিথির মর্যাদা খুব রেখেছ তোমরা–নিষেধ সত্ত্বেও তোমরা নিষিদ্ধ এলাকায় গেছ–রাজার কাছে চলো, মানেটা এরপর খুব ভালো করে বুঝবে।

তারা তাদের সোজা জ্ঞানী পুরুষ রাজার কাছে নিয়ে এলো। বিচার দেখার জন্য সেখানে এরই মধ্যে অনেক মেয়ে-পুরুষ এসে জমেছে। জ্ঞানী পুরুষ রাজার তেমনি সৌম্য মূর্তি। মুখ দেখলে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করে না, এই মূর্তির রাজা তাদের কোনো কঠিন শাস্তি দিতে পারে।

রাজা হুকুম করল, হাতের বাঁধন খুলে দাও, শাস্তি যখন পাবেই কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি...।

বাঁধন খুলে দেওয়া হল। ফলে পিন্‌ডিদার আর জেকবের ধারণা, শাস্তি হলেও লঘু শাস্তিই হবে।

রাজা জিগ্যেস করল, নিষেধ সত্ত্বেও তোমরা অমান্য করলে কেন? ও-দিকে গেলে কেন?

জেকব মিনমিন করে বলল, খুব অন্যায় হয়েছে রাজা, আমি ভেবেছিলাম ও-দিকে তেলের খনি আছে তাই তুমি যেতে নিষেধ করেছ।

–ওঃ...। জ্ঞানী পুরুষ পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো।–আর তুমি গেছলে কেন, তেলের কারবারীকে তেল দেবার জন্য?

পিন্‌ডিদার মাথা নিচু। প্রায় স্বীকার করেই নিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজা বলল, এই নিষেধ অমান্য করলে তার শাস্তি মৃত্যু। আজ পর্যন্ত দ্বীপের কেউ এই নিষেধ অমান্য করেনি–তোমরাই প্রথম করলে। তোমাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আজ থেকে তিন দিন বাদে তোমাদের মরতে হবে। আমার তিন জন করে জোয়ান লোক পাথর দিয়ে মেরে তোমাদের হত্যা করবে–তোমাদের

আরো কিছুটা এগোতে চোখে
পড়লো একটা মস্ত পাখি।

বেশি কষ্ট দেব না—কয়েক ঘায়ে শেষ করে দিতে পারে এমন লোকই দেব।

দু'জনেরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কোমল মুখ থেকে এমন নির্মম দণ্ড ঘোষণা কানে শুনলেও যে বিশ্বাস হয় না।

কাঁপতে কাঁপতে জেকব বলে উঠল, রাজা, জ্ঞানী পুরুষ, আমরা তোমাদের নির্বোধ অতিথি, এই একটি বার আমাদের মার্জনা করে দাও!

জ্ঞানী পুরুষ উঠে দাঁড়ালো। সদয় গলায় জবাব দিল, মার্জনা করার মালিক আমি নয়, আমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করছি—তিনি যদি তোমাদের মার্জনা করেন তাহলে আমার মারফত সেই নির্দেশও পাবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-আশা কম বন্ধুগণ...দেখো মাঝে তিন দিন সময় আছে—তোমাদের ভাগ্য।

বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে রাজা উঠে চলে গেল।

মৃত্যুদণ্ডের আসামী হলেও পিন্ডিদা আর জেকব তাদের ঘরেই বাস করছে। ইচ্ছে মতো ঘোরা-ফেরার স্বাধীনতাও আছে। প্রহরী মোতায়েন এমনও নয়। কারণ দ্বীপ থেকে তারা পালাবে কোথায়? তবু পিন্ডিদার ধারণা, দ্বীপের মানুষ কেউ না কেউ দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা তাদের দিকে চোখ রেখেছে।

না, ঘর থেকে বেরুবার মতো মানসিক শক্তিও আর পিন্ডিদা বা জিন জেকবের নেই। দু'দিনের মধ্যে জেকবের মাথার সমস্ত চুলই তো সাদা হয়ে গেল। পাগলের মতো অবস্থা তার।

তৃতীয় রাত। এই রাত পোহালেই দু'জনের মৃত্যুদণ্ড। জোয়ানেরা পাথর দিয়ে তাদের মাথা ছাতু করবে। জেকব চিৎকার করে বলছে, এমন বর্বর দেশ আর আছে! অন্যভাবে মানুষ মারতে পর্যন্ত জানে না এরা! যে-দেশে তেল নেই ডলার নেই সে কি মানুষের দেশ!

দরজা খুলে গেল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বীপের রাজা জ্ঞানী পুরুষ।

জেকব আর্তনাদ করে উঠল, রাজা তুমি এসেছ—আমরা কি তাহলে ক্ষমা পেলাম? বলো—বলো?

রাজা জবাব দিল, কি করে বলব, এ-দেশে যে তেল দিয়ে বা ডলার দিয়ে মার্জনা মেলে না ভাই। মার্জনা যিনি করেন, তোমরা তো তাঁরও শরণ নিয়েছ বলে মনে হয় না।...সেই কবে শেষের ভীষণতম দিনের জন্য তোমাদের আমি প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিয়েছিলাম?

জেকব উন্মাদের মতো বলে উঠল, এই ভীষণতম দিনের জন্য কে প্রস্তুত হতে পারে?

রাজা ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় জবাব দিল, এই ভীষণতম দিন এক-ভাবে না এক-ভাবে সকলেরই আসে—এখানকার সকলেই ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে এই দিনের জন্য প্রস্তুত হয়—এই দিন যখন আসে তখন আর কারো একে ভীষণতম দিন বলে মনে হয়

না-আশীর্বাদ মনে হয়। কিন্তু তোমরা অপরাধ করেও তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শরণ করতে পারলে না? কি আর বলব...

...কিন্তু পিন্‌ডিদার তবু কেন মনে হচ্ছে, চরম দন্ড বহাল আছে শোনাবার জন্যেই এখানে আসেনি এর মুখের দিকে চেয়ে গোড়া থেকেই পিন্‌ডিদা কেন এই চরম দন্ডে বিশ্বাস করতে পারছে না? অথচ ভয়ে শিরদাঁড়া বেঁকে আছে এ-ও ঠিক।

হঠাৎ কি মনে হতে জিগ্যেস করল, নিষিদ্ধ এলাকায় যাবার ফলে আমাদের এই শাস্তি তা তো বুঝলাম—কিন্তু যা দেখলাম সে সবের মানে কি?

—কি দেখলে বলো?

—প্রথমেই ওই চমৎকার গির্জা...

জ্ঞানী পুরুষ বলল, ওই গির্জা হল ভবিষ্যতের ধর্মস্থানের চেহারা—জাঁক-জমকের গির্জা আছে কিন্তু কোনো রকমের উপাসনা নেই।

—দ্বিতীয়, পাহাড়ে মস্ত পাথর, আপনা থেকে গড়িয়ে প্রায় শেষ পর্যন্ত উঠছে, তারপর পড়ে যাচ্ছে— উঠছে আর পড়ছে...

—ওটা ভবিষ্যতের ভালো মানুষদের ভাগ্য। চেষ্টা-চরিত্র করে তারা উঠবেই আবার ধাক্কা খেয়ে পড়তেও হবে—তাদের ওপরে উঠে স্থির হয়ে থাকাটা কেউ বরদাস্ত করবে না—ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবেই।

—তৃতীয়, অমন সুন্দর পাখি, সমস্ত গায়ে ধর্মের কি সুন্দর বাণী লেখা—কিন্তু কি ঘেন্নার নোংরা জিনিস সব খাচ্ছে!

—ওই পাখি ভবিষ্যতের ধর্মগুরুদের চেহারা। বাইরে সর্বদা পবিত্র নামাবলীতে সর্বাঙ্গ মুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে—কিন্তু ভিতরে নিজেরা অমনি নোংরা।

—আর শেষের ওই সুন্দর বাচ্চা ছেলেটা? যে ফুল পাড়ার জন্য আমার কাঁধে উঠে আর নামে না—আমাকে আধমরা করে তারপর ভ্যানিশ হয়ে গেল?

—সে ভবিষ্যতের দুর্বলের অত্যাচারের প্রতীক। অযোগ্য দুর্বল যোগ্য লোকের কাঁধে চড়ে তাকে মেরে মেরে নিজের জীবনের সঞ্চয়ের ফুল কুড়োবে—তারপর হাওয়া হয়ে যাবে—তুমি মরলে কি বাঁচলে ফিরেও দেখবে না।

পিন্‌ডিদা আর জিন জেকব স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো।

খানিক চুপ করে থেকে রাজা জ্ঞানী পুরুষ বলল, তোমরা ক্ষমা পেতে পারো যদি তোমাদের ভুল বুঝে থাকো...

জেকব পাগলের মতো বলে উঠল, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি রাজা—আমরা নির্বোধের মতো ভীষণ-ভীষণ ভুল করেছি—ভবিষ্যতে আর এ-রকম ভুল কক্ষণো করব না—এই কান মলছি, এই নাকে খত্ দিচ্ছি!

রাজা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু।—কি ভুল করেছ? নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়ে তোমরা এই সব দেখে এমন কি অন্যায় করেছ যার জন্য তোমাদের মৃত্যুদন্ড দিতে বাধ্য হলাম? বলো—নিষেধ অমান্য করার জন্য অর্থাৎ এ-সব দেখার জন্য কেন তোমাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে—এটুকু বলতে পারলেই তোমরা মুক্ত—মাত্র তিন মিনিট সময় পাবে এর জন্য।

জেকব প্রাণপণে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

দেড় মিনিট হয়ে গেল, তোমার দ্বারা হবে না—রাজা পিন্‌ডিদার দিকে ফিরল, এই সহজ প্রশ্নের জবাব তুমি দিতে পারবে—দেখো আর দেড় মিনিটও নেই!

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম। এই পর্যন্ত বলে পিন্‌ডিদা ড্যাব-ড্যাব করে আমাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। চটপটি চড়বড় করে উঠল, কি হল পিন্‌ডিদা, ক্লাইম্যাক্সের মুখে থেমে গেলে কেন—তুমি বলতে পারলে?

—না পারলে আজ আর আমি তোদের সংগে শুয়ে বসে আছি কি করে—বা-বা, সকাল যে প্রায় পাঁচটা বাজে রে!

আমি বলে উঠলাম, প্লীজ পিন্‌ডিদা, আর এ-টুকুর জন্য ঝুলিয়ে রেখো না—তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি, আজ রাতেও আমার খরচেই এত বড় না হোক ছোট গোছের প্রোগাম কিছু হবে—এইবার বলে ফেল, নিষিদ্ধ এলাকার ব্যাপার জেনে ফেলেছ বলে জ্ঞানী পুরুষ তোমাদের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিল কেন?

—তোদের মাথায় তো আর মৃত্যুদন্ড ঝুলছিল না, দেড় মিনিট ছেড়ে এই প্রায় চার মিনিটের মধ্যেও ওই সহজ প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেলি না?...নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়ে ভবিষ্যতের যে চেহারাটা আমরা দেখে ফেলেছি, জ্ঞানী পুরুষের দ্বীপের ঈশ্বর-ভক্ত সরল মানুষেরা তা জেনে ফেললে আর ভবিতব্য বুঝলে আর ঈশ্বর ভক্ত থাকবে না সরল থাকবে? তাদের সব বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে নৈতিক সর্বনাশ হয়ে যাবে না? তাই ওই এলাকায় যাওয়া নিষেধ—গেলে শাস্তি।...আমি যখন জ্ঞানী পুরুষকে জবাবটা দিলাম তখন সে হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের আমি কোনদিনই মারতাম না, কেবল দ্বীপের মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যই ও-রকম ঘোষণা করেছিলাম—কাল তারা দেখবে ঈশ্বরের নির্দেশে তোমাদের আমি নির্বাসিত করেছি—কাল জাহাজ এসে তোমাদের মেন-ল্যান্ডে নিয়ে যাবে। তারপর তির্যক চোখে আমার দিকে চেয়ে রাজা বলল, তোমার মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি তো বেশ আছে দেখছি, তবু তেল-অলাকে তেল দিতে গেছলে কেন?

জিন জেকব ফসফস করে বলে উঠল, এরপর পিন্‌ডি আর তেল না দিলেও তেল-অলাকে তেল দেবার লোক পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে জেনে রেখো—এ-ও প্রায় ঈশ্বরের নির্দেশ।

আড়মোড়া ছেড়ে পিন্‌ডিদা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বলল, না ঘুমিয়ে রাতের খাওয়াটাই ভালো করে তল হয়নি, আজ রাতে আবার সোনার প্রোগ্রাম—যাই, কম করে এখন এক ঘণ্টা মর্নিং ওয়াক করব আমি।

চলে গেল।

আমরা এ-ওর মুখ তাকাচ্ছি।

ছবি—সব্রত চৌধুরী

সুফি
স্কুলের সেক্রেটারির বাগানে আম পেকেছে!
হিমসাগর, গোলাপখাস; দুপুরে এসে লুকিয়ে সব সাফ করতে হবে!
!
আস্তে, বিচ্ছুটা ঝোপের আড়াল থেকে সব শুনছে। ও ঠিক স্কুলের নতুন গোমড়া টিচারকে গিয়ে সব বলে দেবে!
দুপুরে
হুম, দলবেঁধে সবাই আম চুরি করতে যাচ্ছে! এই সুযোগে সবকটাকে শায়েস্তা করতে হবে!
স্যার তৈরি থাকুন, আমার সংবাদ বাহক এখুনি সাংঘাতিক খবর বয়ে নিয়ে আসবে!
ওই দেখ বাচ্চু, বিচ্চুটা পিছু নিয়েছে!
ঘাবড়াস না, এত দূর থেকে স্যারকে খবর দেবার আগেই আমরা পালিয়ে যাবো!

ওরা কেউ আমার নতুন ডাক হরকরার সন্ধান জানেনা, ও গিয়ে ঠিক স্যারকে এখুনি খবর পৌঁছে দেবে!
বিচ্ছু খবর পাঠিয়েছে
কী সর্বনাশ, দিনদুপুরে আম চুরি! দেখাচ্ছি মজা!
বেয়াদব ছাত্রদের কী করে পোষ মানাতে হয় আমি জানি। সবকটাকে ধরতে পারলে বেত মেরে ঠাণ্ডা করবো!
এইরে স্যার আসছেন!
শীগগির পালা!
কোথায়রে পাষণ্ডের দল!
ওফস! আমের খোসায় পা পিছলে গেছে!

পিছু ধাওয়া করে ধরবার আগেই সব কটা হাওয়া হয়ে গেল!
বিচ্ছুর কাছ থেকে স্যার এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন কী করে বলতো?
চুপিচুপি সন্ধান নিতে হবে!
এই হচ্ছে আসল রহস্য! পোষা পায়রা দিয়ে খবর পাঠিয়েছে!
আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। বাজারে চল।
ঠিক একরকম দেখতে।
বিচ্ছু ও চিনতে পারবেনা।
চটপট এই পায়রাটা এখানে রেখে বিচ্ছুর পায়রাটা নিয়ে নিই।
নিশ্চয়ই আবার কোন অপকর্মে দুজন যাচ্ছে!
বিচ্ছু আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে!
এখুনি স্যারকে খবর পাঠাচ্ছি
মাছ ধরা নিষেধ

যারে পাখি, শীগগির স্যারকে গিয়ে মাছ চুরির খবরটা দে!
এবার বিচ্ছুর পোষা পায়রাটা দিয়ে আমরা স্যারকে অন্য খবর পাঠাই
হতচ্ছাড়া দুটো লিচু চুরি করতে বাগানে ঢুকেছে। ধোঁকা দিয়ে এবার আর বোকা বানাতে পারবেনা আমাকে
একবার দুজনকে হাতের কাছে পাই!
গ র র
গেছিরে! বাঁচাও!!
ঘেউ, ঘেউ
স্যার কী হলো! মাছ চুরির ওখানে আপনি যাননি!
স্যার আজ বিচ্ছুর আর কিচ্ছু আস্ত রাখবেন না!
পাজি, ছুঁচো বাঁদরামি করে আমাকে কুকুরের মুখে ফেলে দিয়েছিস!

রঘু সরদার আগে ছিল ডাকাত, পরে সে পুলিশের ভয়ে সাধু সেজেছিল, এখন সে হয়েছে রান্নার ঠাকুর। সে গুটুলি আর নীল মানুষের জন্য রোজ ভাত-ডাল রান্না করে।

রঘু সরদারের মনে বড় দুঃখ। সে এখনো বুড়ো হয়নি, তার গায়ে জোর আছে, তবু তাকে কিনা জংগলের মধ্যে বন্দী থেকে এরকম একটা ছোট কাজ করতে হয়! যখন সে ডাকাতের সর্দার ছিল তখন তার দলের দশ বারো জন লোক তার হুকুম শুনতো, গ্রামের লোক তার নাম শুনে ভয়ে কাঁপতো, মাঝ রাত্তিরে মশাল নিয়ে রে-রে-রে-রে করে গ্রামের কোনো বাড়িতে চড়াও হলে সে বাড়ির লোক টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি সব ফেলে দিত তার পায়ের কাছে। কত আনন্দ ছিল তাতে।

নীল মানুষের সংসার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাধু সেজে থাকার সময়েও কম আনন্দ ছিল না। দলের তিনজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার নাম বলে দেওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। অন্য গ্রামে এসে শ্মশানের ধারে সাধু সেজে বসলে গ্রামের মানুষ বেশ ভক্তি করে, পুলিশেও বিরক্ত করে না। সাধু-সাজা অবস্থায় রঘু সরদারের খাওয়া দাওয়া বেশ ভালোই জুটছিল, ভক্তদের হুকুম করলে তার পা টিপে দিত। এখন কিনা ঐ বেঁটে বাঁটকুল গুটুলিটার হুকুম শুনতে হয় তাকে। এমনকি গুটুলির পা-ও টিপে দিতে হয় মাঝে মাঝে।

এখান থেকে পালাবারও কোনো উপায় নেই। রঘু সরদার বুঝতে পেরেছে যে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে ঐ আট ফুট লম্বা নীল মানুষ শুধু তাকে তুলে একটা আছাড় দিলেই সব শেষ। রঘু সরদারের এখনো ধারণা, নীল মানুষ ঠিক মানুষ নয়, ব্রহ্মদৈত্য জাতীয়ই কিছু হবে। ওরকম বিশাল চেহারার কোনো মানুষ কি হতে পারে! গায়ের রং আবার গাঢ় নীল রঙের। তবে নীল মানুষের স্বভাবটা তেমন হিংস্র নয়, বেশির ভাগ সময়েই শুয়ে-বসে আলস্য করে আর হাসি ঠাট্টা করে কথা বলে। বরং ঐ মাত্র তিন ফুট চেহারার গুটুলিটাই পাজী, ওর গাঁটে

গাঁটে বুদ্ধি। নীল মানুষ ওর বুদ্ধিতেই চলে। ঐ গুটুলিই ঠিক করেছে যে রঘু সরদারকে পুরো এক বছর জঙ্গলে থেকে ওদের সেবা করতে হবে। তারপর যদি সে নাক কান মুলে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কোনো দিন ডাকাতি করবে না, কিংবা সাধু সেজে লোককে ঠকাবে না, তা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রঘু সরদার মনে মনে উপায় খোঁজে, কী করে ঐ গুটুলিটাকে জব্দ করা যায়!

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রঘু সরদার ঝর্ণার পাশে বাসন মাজতে বসলো। এটাও তাকে করতে হয়। এই সময়টায় তার সবচেয়ে বেশি রাগে গা জ্বলে যায়। সে ছিল কিনা একজন নাম করা ডাকাত সরদার। তাকে এখন মেয়েদের মতন বাসন মাজতে হচ্ছে!

সে আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো, নীল মানুষ একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে আর গুটুলি একটু দূরে বসে একখানা বই পড়ছে। গুটুলি প্রায়ই একা একা শহরে যায়, আর নানান জিনিস পত্তর জোগাড় করে আনে।

বই থেকে মুখ তুলে গুটুলি বললো, বড্ড পান খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পান খাই নি। রঘু, কয়েক খিলি পান এনে দাও তো!

রঘু সরদার বললো, পান? এই জঙ্গলের মধ্যে আমি পান কোথায় পাবো?

গুটুলি বললো, জঙ্গলের মধ্যে পান পাওয়া যাবে না, জানি। কিন্তু বাঁদিকে এই টিলার পাশ দিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে গেলেই একটা বড় রাস্তা পাবে। একটা হাইওয়ে। সেখানে একটা পেট্রল পাম্পের পাশেই একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসো!

রঘু সরদার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একলা পান আনতে যাবো?

গুটুলি তার দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাও, পান নিয়ে এসো। বেশি দেরি করো না যেন!

রঘু সরদারের ভুরু কপালের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। সে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না। তাকে একলা একলা পাঠানো হচ্ছে জঙ্গলের বাইরে? সেইখানে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি, ট্রাক চলে। কোনো একটা ট্রাকে উঠে তো সে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারে।

গুটুলি কি তাকে লোভ দেখাচ্ছে?

একটা হ্যান্ড ব্যাগে রঘু সরদারের কিছু লুকোনো টাকা ও কয়েকটা জামা-কাপড় রয়েছে। রঘু সরদার একবার সে দিকে তাকালো। ঐ ব্যাগটার মায়া ত্যাগ করতে হবে।

মেঘের গর্জনের মতন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে নীল মানুষ। সে সহজে জাগবে না মনে হয়।

রঘু সরদার বললো, ঠিক আছে, তা হলে পান নিয়ে আসি!

গুটুলি বললো, বেশি দেরি করো না, কেমন? আর হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি দামোদর বলে কারুকে চেনো?

রঘু সরদার বললো, দামোদর? কোন দামোদর?

গুটুলি বললো, তোমারি মতন ডাকাতি টাকাতি করে!

রঘু সরদার জিজ্ঞেস করলো, তার কি বাঁ হাতের দুটো আঙুল কাটা? কথা বলতে বলতে হঠাৎ তোতলা হয়ে যায়?

—ঠিক ধরেছো। সেই দামোদরই বটে!

—সে তো এক সময় আমার দলেই ছিল। পরে নিজের আলাদা দল খুলেছে শুনেছি। তাকে তুমি চিনলে কী করে?

—চেনা হয়েছিল এক সময়। তুমি যে-দোকানে পান কিনতে যাচ্ছো, দামোদরই এখন সেই দোকানের মালিক।

—এঃ, ব্যাটা ডাকাতি ছেড়ে এখন পানওয়ালা সেজেছে!

—ডাকাতি ছাড়ে নি! তুমি যেমন পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য কিছুদিন সাধু সেজেছিলে, ঐ দামোদরও তেমনি পানওয়ালা সেজেছে! তুমি ঐ দামোদরকে এখানে ডেকে আনতে পারবে?

—এখানে?

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। ঐটুকু একটা মানুষ, যাকে রঘু সরদার টিপে মেরে ফেলতে পারে, সে কি না বসে বসে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে! ব্রহ্মদৈত্যটাকে ও কী করে বশ করলো কে জানে!

রঘু সরদার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা হেঁটে তারপর দৌড়োতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে যে নীল মানুষ তাকে তাড়া করে আসছে কি না! না, সে রকম কোনো চিহ্ন নেই। বন একেবারে নিস্তব্ধ।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগলো; বড় রাস্তায় পৌঁছে সে কী করবে? দামোদরের সঙ্গে দেখা করবে? কী দরকার? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সোজা একটা গাড়িতে উঠে পালিয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হাতে একটা কোনো অস্ত্র নেই, সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা নেই, শুধু মাত্র একটা টাকা সম্বল। তবু রঘু সরদার ঠিক করলো এবারে সে পালাবেই।

সে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল বিনা বাধায়। পেট্রল

পাম্পটাও চোখে পড়লো। তার পাশে একটা পানের দোকান আছে ঠিকই। রঘু সরদার আড়াল থেকে দেখলো, আঙুল-কাটা দামোদর সেখানে বসে আছে ঠিকই। তার পাশে একজন বসে আছে। তার নাম ন্যাড়া গুলগুলি। ওর রোগা ছোট্টখাটো চেহারা, কিন্তু দারুণ ছুরি চালায়, চোখের নিমেষে যে-কোনো লোকের পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওরা দু'জনে যখন জাঁকিয়ে বসেছে, তখন নিশ্চয়ই বড় কোনো মতলোব আছে।

রঘু সরদারের একবার লোভ হলো দামোদরের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে। আট দশজন লোক জুটিয়ে যদি একটা দল গড়া যায়, তাহলে ঐ লম্বা নীল মানুষটা আর বাঁটকুল গুটুলিটাকে ভয় কী! ওদের কাছে তো ছুরি-বন্দুক নেই!

কিন্তু নীল মানুষের চেহারাটা মনে পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠলো। ও যদি ব্রহ্মদৈত্য হয় তা হলে তো গুলি গোলাও হজম করে ফেলবে! নীল মানুষটা একদিন গুটুলিকে কী যেন সব বলছিল, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের কথা। ও কি সেখান থেকে এসেছে নাকি? তা হলে বাংলায় কথা বলে কী করে?

দরকার নেই বাবা, এ তল্লাট থেকে একেবারে চম্পট দেওয়াই ভালো।

রঘু সরদার পেট্রল পাম্পটার কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো। এ রাস্তা দিয়ে বাস চলে না। কিন্তু অন্য কোনো গাড়ি পেট্রল পাম্পে থামলেই সে তাতে উঠে পড়বে।

আধঘণ্টা পরে একটা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি এসে থামলো। তাতে দু'জন মহিলা, দু'জন বাচ্চা আর দু'জন পুরুষ মানুষ। রঘু সরদার বিরক্তিতে মুখটা কোঁচকালো। এ গাড়িতে তাকে নেবে না।

দুটো ট্রাক ঝড়ের বেগে চলে গেল, থামলোই না। আর একটা গাড়ি থামলো, তাতে শুধু ড্রাইভার আর পেছনের সীটে একজন মোটা মতন লোক। এবারে রঘু সরদার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে কাচু মাচু মুখে বললো, ভাই, আমার খব জরুরি দরকার, বাড়ি থেকে অসুখের খবর এসেছে, আমাকে সামনের শহরটাতে একটু পৌঁছে দেবে?

ড্রাইভার কিছু না বলে মালিকের দিকে তাকালো।

মালিক খেঁকিয়ে উঠে বললো, না, না। ওসব হবে না, এখানে হবে না!

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মালিক আবার বলতে লাগলো, ডাকাতের মতন চেহারা, ওসব লোককে একদম বিশ্বাস নেই। রাস্তা থেকে অচেনা লোক কক্ষণো তুলবে না!

রঘু সরদারের ভূরু কপালের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে

রঘু সরদার অস্থির হয়ে উঠলো। মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার দেরি দেখে যদি নীল মানুষ তার খোঁজে ধেয়ে আসে। তবে এই ক'দিনে একটা ব্যাপার সে বুঝেছে, সন্ধের আগে ঐ নীল মানুষটা জঙ্গল ছেড়ে বেরুতে চায় না।

এদিকে বিকেলের আলো পড়ে আসছে, সন্ধের আর দেরি নেই।

আরও আধ ঘন্টা পরে একটা ট্রাক এসে থামতেই রঘু সরদার অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাতে উঠে পড়লো। ট্রাক ড্রাইভার বললো, দশ টাকা দিতে হবে। রঘু সরদারের কাছে টাকা না থাকলেও সে বলে উঠলো, দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। আগে আমাকে পৌঁছে দাও–।

মিনিট দশেক যেতে না যেতেই ট্রাকের গতি কমে এলো। রঘু সরদার জিজ্ঞেস করলো, কী হলো, থামলে কেন ভাই? আমার যে খুব জরুরি দরকার। ট্রাক ড্রাইভার উত্তর দিল, সামনে পথ বন্ধ।

রাস্তাটা সেখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। একদিকে ঘন জঙ্গল, আর একদিকে খাদের মতন। চার-পাঁচ খানা গাড়ি থেমে আছে সেখানে। এই সব কটা গাড়িকেই রঘু সরদার আগে চলে আসতে দেখেছে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে জটলা করছে এক জায়গায়। সামনে রাস্তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেটা না সরালে কোনো গাড়িই যেতে পারবে না। অত বড় পাথরটা সরানো যাবেই বা কী করে!

অন্ধকার হয়ে এসেছে, পাশের জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলো। জায়গাটা ভারি সুন্দর, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও রঘু সরদারের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। কোনো রকমে একটা শহরে পৌঁছোতে পারলেই সে বেঁচে যেত। ব্রহ্মদৈত্যই হোক আর যা-ই হোক, শহরে তাদের জারিজুরি খাটবে না।

পাথরটা সবাই মিলে ঠেলে সরানো যায় না?

এমন সময় পাশের জঙ্গল থেকে সরু গলায় একটা গান শোনা গেল, 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে!'

সে গান শুনেই রঘু সরদারের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। সবাইকে ঠেলে সে দৌড় লাগালো সামনের দিকে। বড় পাথরের চাঁইটার ওপরে উঠে লাফিয়ে পার হতে যেতেই জঙ্গল থেকে একটা লম্বা হাত বেরিয়ে এলো। তার কাঁধটা ধরে বেড়াল ছানার মতন শূন্যে তুলে সেই হাতটা তাকে নিয়ে গেল। অন্য একটা হাত পাথরটাকে ঠেলে গড়িয়ে দিল পাশের খাদে।

এমন চোখের নিমেষে ঘটনাটা ঘটলো যে অন্য লোকরা ভাবলো যে রঘু সরদারও বোধহয় পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

নীল মানুষ রঘু সরদারকে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিল গুটুলির পায়ের কাছে। গুটুলি এখন মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে অন্য রকম সেজে আছে। সে কোমরে হাত দিয়ে, চোখ পাকিয়ে বললো, রঘু, আমার পান কোথায়?

নীল মানুষ বললো, এটা তোমার কী রকম ব্যবহার বলো তো, রঘু সরদার? দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর পান খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর এখন সন্ধে হয়ে গেল, তবু তুমি পান নিয়ে এলে না! এখানে কী করছিলে?

রঘু সরদারের মুখে আর কথা নেই। সে বুঝতে পারলো তার শেষ নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এসেছে!

গুটুলি আবার বললো, কী হলো, আমার পান দাও!

রঘু সরদার এবারে বলে ফেললো, পানের দোকান বন্ধ ছিল। তাই আমি শহরে যাচ্ছিলুম পান আনতে!

তাই শুনে গুটুলি হি হি করে হেসে উঠলো আর নীল মানুষ হেসে উঠলো হা-হা করে।

তারপর নীল মানুষ বললো, এসো একটা জিনিস দেখবে এসো!

আবার সে রঘু সরদারের কাঁধ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চললো। গুটুলিকে তুলে নিল অন্য হাতে। অনেক খানি জঙ্গল পেরিয়ে এসে সে এক জায়গায় থেমে বললো, ঐ দ্যাখো। দোকান সমেত পানওয়ালাকে আমরা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

এখন অনেকটা জ্যোৎস্না উঠেছে, তাতে দেখা গেল দুটো গাছের সঙ্গে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। কাছেই পড়ে আছে একটা ছুরি।

পা দিয়ে সেই ছুরিটা ঠেলে দিয়ে নীল মানুষ বললো, এটা দিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দাও! ছুরিটা কোথা থেকে এলো জানো? ঐ ন্যাড়াটা ঐ ছুরি দিয়ে আমার পেট ফাঁসাতে এসেছিল। ভোঁতা ছুরি, আমার পেটে ঢুকলোই না!

ন্যাড়া গুলগুলি বলতে লাগলো, ভূ-ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!

আর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসতে লাগলো।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো রঘু সরদার। প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ঐ ছুরি দিয়ে মানুষের মুণ্ডু কেটে ফেলা যায়, আর সেই ছুরি নীল মানুষের পেটে ঢোকেনি!

নীল মানুষ আবার বললো, ওদের বাঁধন খুলে দাও, আর পান সাজতে বলো।

রঘু সরদার ওদের বাঁধন কেটে দিতেই ন্যাড়া গুলগুলি ধপাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর দামোদর কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

রঘু সরদার বললো, ওরে দামোদর, বাঁচতে চাস তো পান সেজে দে। ওরা যা বলছে কর!

পান সাজার জিনিস পত্তর সব এনে রাখা ছিল, দামোদর সেই রকম কাঁপতে কাঁপতেই দু'খিলি পান সাজলো।

নীল মানুষ বললো, এক খিলি পানে আমার কী হবে? আমার এক সঙ্গে দশটা পান চাই। শিগগির!

তখন আবার পান সাজা হলো। তাড়াতাড়ির জন্য রঘু সরদারও সাহায্য করার জন্য হাত লাগালো।

–দুই ডাকাতে মিলে পান সাজছে!

এই বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো গুটুলি। নীল মানুষ বললো, এখন বেশ শান্ত শিষ্ট দেখাচ্ছে, না?

এক সঙ্গে দশটা পান মুখে পুরে নীল মানুষ একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললো। তারপর সে রঘু সরদারের দিকে ফিরে বললো, এবারে একটা ঘটনা শোনো! মনে করো, একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ, খুব নিরীহ, কারুর সাতে পাঁচে থাকে না, সে একটা দোকানে চাকরি করে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। তারপর একজন দুষ্টু লোক সেই দোকানে ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র করলো। তারপর ডাকাতি করলোও ঠিক কিন্তু সব দোষ চাপিয়ে দিল ঐ ছোটখাটো চেহারার নিরীহ লোকটির ওপর। তার ফলে সে মারধোর খেল, তার চাকরিও চলে গেল। এখন এটা খুব অন্যায় কি না বলো? তুমি ডাকাতি করতে চাও করো। কিন্তু একজন নিরীহ লোকের কাঁধে দোষ চাপাবে কেন? কী, এটা অন্যায় নয়?

লেগে গেল চ্যাঁচামেচি, ঝটাপটি। নীল মানুষ আর গুটুলি হেসে যেতে লাগলো।

রঘু সরদার বললো, হ্যাঁ, অন্যায়, খুব অন্যায়!

নীল মানুষ দামোদরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী বলো?

দামোদরও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা খুব অন্যায়। পরের ওপর দোষ চাপানো মোটেই উচিত নয়!

নীল মানুষ বললো, বাঃ, বাঃ, এই তো চাই। তোমাদের দু'জনেরই তো বেশ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে দেখছি!

গুটুলি এবারে এক টানে মুখের নকল দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে বললো, ওহে দামোদর, আমায় চিনতে পারো? আমিই রঘুনাথপুরের এক মুদিখানায় চাকরি করতুম, আর তুমি সেই দোকানে ডাকাতি করেছিলে!

দামোদর চোখ কপালে তুলে বললো, অ্যাঁ? অ্যাঁ? ওরে বাপরে, আমার মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় তুমি মাপ করো বামুন ঠাকুর। তোমার পায়ে পড়ি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বললো, আমি বামুন ঠাকুর নই, আর তোমাকে মাপও করবো না! অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতে হয় জানো না?

নীল মানুষ বললো, ওহে রঘু সরদার, তুমি আমাদের লোক। তোমার ওপরেই শাস্তির ভার দিলুম। ওকে কী শাস্তি দেওয়া যায় বলো তো?

রঘু সরদার নীল মানুষকে খুশী করবার জন্য বললো, মাটিতে গর্ত করে ওকে বুক পর্যন্ত পুঁতে রাখা উচিত। আর ঐ ন্যাড়া গুলগুলিটা আপনাকে ছুরি মারতে এসেছিল, ওকেও ঐ শাস্তি দিতে হবে!

নীল মানুষ বললো, ওরে বাবা, এত কঠিন শাস্তি!

গুটুলি বললো, আর রঘু সরদার, তুমি যে কথার খেলাপ করে পালাবার চেষ্টা করেছিলে, তা হলে তোমার কী শাস্তি হবে? তুমি যাতে আর পালাতে না পারো, সেই জন্য তোমাকেও মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা উচিত!

নীল মানুষ হা-হা করে হেসে উঠলো, তারপর বললো, তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। ওরা তিনজনেই তিনজনকে শাস্তি দিক।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথায় আটটা করে গাঁট্টা মারুক। নাও, রঘু সরদার, তুমিই শুরু করো!

ন্যাড়া গুলগুলির এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে উবু হয়ে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত চাপা দিয়ে বললো, ওরে বাবারে, আমার মাথা ন্যাড়া, গাঁট্টা মারলে আমার বেশি লাগবে! এটা অন্যায়!

নীল মানুষ বললো, ঠিক আছে, তা হলে গাঁট্টার বদলে থাপ্পড় চলুক।

ন্যাড়া গুলগুলি বললো, আমার গায়ে জোড় কম। আমি জোরে থাপ্পড় মারতে পারবো না, আমি চিমটি কাটবো!

নীল মানুষ বললো, ঠিক আছে, তাই সই!

তারপর শুরু হলো এক মজার ব্যাপার। এ ওকে থাপ্পড় মারে আর এ ওকে চিমটি কাটে। লেগে গেল চ্যাঁচামেচি, ঝটাপটি। নীল মানুষ আর গুটুলি হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।

খানিকবাদে যখন প্রায় রক্তারক্তি শুরু হবার উপক্রম তখন নীল মানুষ হেঁকে বললো, ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। নইলে কিন্তু এবারে আমি শুরু করবো!

অমনি সব চুপ।

গুটুলি বললো, রঘু সরদার যে মাটি খোঁড়ার কথা বলছিল, সেটা কিন্তু মন্দ নয়। এই জঙ্গলে বড় জলের কষ্ট। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়াররাও জলের কষ্ট পায়। ওরা তিনজন এখানকার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটা পুকুর তৈরি করুক না। আমি খন্তা-শাবল এনে দেবো!

নীল মানুষ বললো, ভালো আইডিয়া। পুকুরটা পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে গেলে আমি সেটার নাম রাখবো রঘু-দামোদর-গুলগুলি!

দামোদর বললো, আমরা তিনজনে মিলে একটা পুকুর কাটবো? তাতে যে এক বছর লেগে যাবে!

গুটুলি বললো, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তো অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটতে। তারচেয়ে এখানে এক বছর তো বেশ শস্তায় হয়ে গেল! জেল খানার থেকে এখানে ভালো খাবার পাবে! তোমরা নিজেরাই তো রান্না করবে।

নীল মানুষ বললো, খাবারের কথায় মনে পড়ে গেল। বড্ড খিদে পেয়েছে যে? ও রঘু সরদার, আজ কী কী খাওয়াবে? যাও, যাও, উনুনে আগুন দাও!

গুটুলি বললো, দামোদর, পান সাজো!

ন্যাড়া গুলিগুলি জিজ্ঞেস করলো, আর আমি কী করবো?

গুটুলি বললো, তুমি মাছ-তরকারি কুটবে। তোমার তো ছুরির হাত ভালো!

নীল মানুষ হাসতে হাসতে বললো, আমাদের সংসারটা দিব্যি বড় হয়ে গেল, কী বলো!

ছবিঃ গৌতম বসু

প্রেতাত্মার সন্ধানে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেতাত্মা আছে কি নেই, তা নিয়ে এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা বড় একটা মাথা ঘামাই না। মাথা না ঘামালেও ভূত-পেত্নী, জিন-পরী বা প্রেতাত্মা-ট্রেতাত্মাদের নিয়ে গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে! তাই ওরকম গল্পের যদি কোথাও আঁচ পাওয়া যায়, তাহলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হয়।

সেবার আমরা হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ের দেশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক বৃদ্ধ তিব্বতী লামার সন্ধান পেয়ে গেলাম। লোকটি ভারি সরল। আমাদের সঙ্গে গল্পে গল্পে বেশ জমে গিয়েছিল। প্রেতাত্মা নিয়ে তার মুখে যে সব কথা শুনেছিলাম, তাই আজ তোমাদের বলব।

তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু একথা ঠিক, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তিব্বতীরা এখনো প্রেতাত্মা নিয়ে খুব ভাবে। প্রেতাত্মার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা নানারকম ক্রিয়াকলাপও করে থাকে। ওদের ধারণা মানুষের মৃত্যুর পর দেহের ভেতর থেকে প্রেতাত্মাটা বেরিয়ে আসে। যতদিন না তার সদ্গতি হয় ততদিন সে মানুষের অনিষ্ট করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো মানুষের ওপর ভর করে তাকে নাজেহাল করে ছাড়ে। প্রেতাত্মা কেবল মানুষের ওপরই ভর করে না, ইচ্ছে করলে গরু ছাগল ভেড়া কিংবা কোন গাছ কিংবা কোন পাথর-টাথরের ওপরও ভর করতে পারে। ফলে ওদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিব্বতীরা ওদের পুজোটুজোও করে থাকে। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ওরা ভূত পিশাচের মুখোশ আর পোশাক-টোশাক পরে নাচ-গানও করে থাকে।

তিব্বতী যে বৃদ্ধ লামার মুখে এসব কথা আমরা শুনেছিলাম, তার নাম আঙ দোরজে। ১৯৬২ সালে ভারত আর চীনের মধ্যে গোলমাল শুরু হওয়ার পর সে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসে। ভারতে এসে সে বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ বা ছর্তেনে ঘুরে বেড়ায়। ছোটখাট মঠকে ওদের ভাষায় বলে ছর্তেন।

আমরা সেবার তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি মিলাম হিমবাহ দেখতে বেরিয়েছিলাম। আশ্রয় নিয়েছিলাম মিলাম গ্রামে। এই মিলাম গ্রামের একপাশে গোংখা-গাড়ের ধারে একটা ছর্তেন। সেই ছর্তেনেই দেখা

তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি মিলাম হিমবাহ দেখতে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছি মিলাম গ্রামে।

পেয়েছিলাম আমরা আঙ দোরজের।

ভাবছ মিলাম গ্রামটি কোথায়, তাই না? তাহলে কোথায় সেই গ্রাম, কিভাবে সেখানে যেতে হয় তা একটু বলে নিই।

তোমরা হয়তো গৌরীগঙ্গার নাম শুনে থাকবে। হিমালয়ের গা বেয়ে অসংখ্য নদী নেমে এসেছে। এই সব নদীর অনেকেরই নামের সঙ্গে গঙ্গা জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন কালিগঙ্গা, রামগঙ্গা, ধৌলি গঙ্গা, কর্ণগঙ্গা, বিরহী গঙ্গা তেমনি গৌরীগঙ্গাও। এই গৌরীগঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে মিলাম হিমবাহ থেকে। এই নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে জাউলাজীবীতে মিশেছে কালিগঙ্গায়। জাউলাজীবীতে বাসে বাসেও চলে যাওয়া যায়, কিন্তু মিলাম হিমবাহ যেতে হলে হাঁটাপথ ছাড়া উপায় নেই। হাঁটা শুরু করতে হয় কুমায়ূনের মুন্সিয়ারি থেকে।

কিন্তু মুন্সিয়ারি পৌঁছনও কম ধকলের নয়। হাওড়া থেকে ট্রেনে লখনউ। লখনউ থেকে ট্রেন বদল করে টনকপুর। টনকপুর থেকে শুরু করতে হবে বাসযাত্রা। প্রথম দিন টনকপুর থেকে বাসে সারাদিন কাটিয়ে পৌঁছতে হবে পিথরাগড়ে। পিথরাগড়ে একরাত বিশ্রাম নিয়ে পরদিন আবার বাস। সারাদিন বাসে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় নামতে হবে মুন্সিয়ারিতে।

মুন্সিয়ারি ছোট্ট একটা পাহাড়ী শহর। এখানে সূর্যাস্ত দেখলে কেউ কোনদিন তা ভুলতে পারে না।

যাই হোক, মিলাম হিমবাহে যেতে হলে এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে হয়। গাইড আর মাল বইবার খচ্চর এখানেই দরাদরি করে ঠিক করে নিতে হয়। সঙ্গে পথের র‍্যাশন হিসেবে চাল ডালও নিয়ে নিতে হয়। কেননা পথে কোন হোটেল তো দূরের কথা, কদাচিৎ লোকালয় চোখে পড়ে।

মুন্সিয়ারি থেকে মিলামের দূরত্ব ৭০/৭৫ কিলোমিটার। একদিনে অতটা হাঁটা সম্ভব নয়, সাধারণত, যেতে সময় লাগে চার দিন, ফিরতেও চার দিন। প্রথম দিন মুন্সিয়ারি থেকে লিলাম ১৩ কিলোমিটার। দ্বিতীয় দিন লিলাম থেকে বুগডিয়ার ২০ কিলোমিটার। তৃতীয় দিন বুগডিয়ার থেকে রিলকোট হয়ে মার্তোলি অথবা বরফু। যখন যেটা সুবিধে। চতুর্থ দিন মিলাম।

আমরা যখন মিলাম গ্রামে পৌঁছলাম তখন অক্টোবরের প্রায় শেষ। ওসব অঞ্চলে তখন বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বরফ পড়া শুরু হয়, আবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বরফ ধোঁয়ার মতো উড়ে যেতে শুরু করে। দুপুরে কি সাংঘাতিক বাতাস, যেন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। আবার যেই বেলা পড়ে আসে বাতাসও কমে যায়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কি জানো, আমরা গ্রামে ঢুকে দেখি, গ্রাম প্রায় ফাঁকা। সারা গ্রামে প্রায় আড়াইশ তিনশ লোকের বাস অথচ সব বাড়িই কেমন জনমানবশূন্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে বলেই গ্রামের লোকজন সব মুন্সিয়ারির দিকে নেমে গেছে। শীতের সময়টা ওরা ওখানেই জনমজুরি খেটে কিংবা ব্যবসা-ট্যাবসা করে কাটায়। গরম পড়লে আবার গ্রামে এসে চাষাবাদ শুরু করে।

আরো মজার ব্যাপার, গ্রামের ফাঁকা বাড়িগুলোর একটাতেও তালাচাবি লাগান নেই। ঘরে জিনিসপত্র সবই কিন্তু রয়েছে। ইচ্ছে করলে যে কেউ এসে সে সব তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কেউ নেয় না। পরের জিনিস কেউ ছোঁয় না। আসলে ওরা এত সরল আর বিশ্বাসী যে চোর টোরের কথা ভাবতেই পারে না।

যাই হোক যে কথা বলেছিলাম, এই মিলাম গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ী নদী আমাদের চোখে পড়ল। এরই নাম গোংখাগাড়। এরই পারে সেই বৌদ্ধমঠ বা ছর্তেন।

ওটা যে সত্যি সত্যি একটা মন্দির বা মঠ দূর থেকে তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই। পাহাড়ের ঢালে খানিকটা সমতল জমির ওপর টানা লম্বা একটা টিনের একচালা। অনেকটা কন্ট্রাক্টরদের কুলিটুলি থাকার ঘরের মতো। এক চালার দুপাশে দুটো খুঁটি পুঁতে তাতে দড়ি টাঙিয়ে অসংখ্য ছোটবড় নিশান ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। নিশানগুলো দেখে মনে হয় যেন দরজির দোকান থেকে কিছু ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো এনে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আসলে ওগুলোর গায়ে নাকি ভূত তাড়াবার মন্ত্রতন্ত্র সব লেখা। তিব্বতী ভাষায় ওদের সেই মন্ত্র নাকি এ রকম, 'হুলু হুলু, রুলু রুলু, হুম ফট'। এ মন্ত্রের জোরেই নাকি অপদেবতারা ছর্তেনের কাছাকাছি এগোতে পারে না। ফলে মানুষেরও কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আমরা গ্রাম ঘুরতে বেরিয়েছিলাম বিকেলের দিকে। দুপুরে যে দুর্দান্ত বাতাস বইছিল তখন তা থেমে গিয়ে একেবারে স্থির হয়ে এসেছিল। চারপাশের পাহাড়ের গায়ে তখন একটু একটু করে বরফ জমাও শুরু হয়ে

গিয়েছিল। আর তেমনি ঠাণ্ডা জড়িয়ে ধরছিল আমাদের। গায়ে যত রকম গরম জামা কাপড় তো আছেই, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপও চাপিয়ে নিতে হয়েছিল।

ছর্তেনের কাছাকাছি আসতেই দেখি বৌদ্ধ এক সন্ন্যাসী মসৃণ একটা পাথরের ওপর চুপটি করে বসে আছেন। পরনে আলখাল্লার মতো একটা জামা। অনেকটা ঠিক মেয়েদের ম্যাক্সির মতো, প্রায় পা অবধি ঢাকা। মাথায় মেটে রংয়ের কান ঢাকা একটা উলের টুপি। পায়ে ছেঁড়া ফাটা কাপড়ের জুতো, গেরুয়া রংয়ের।

ইনিই আঙ দোরজে। বয়স যে ওঁর কত, বোঝা মুস্কিল। তবে আশির নিচে যে নয়, তাতে সন্দেহ নেই। বরং বেশিই হতে পারে। চোখ দুটো কেমন শুকনো, গোল গোল। এতখানি বয়সেও লোকটা হিমালয়ে নিজের খেয়াল খুশি মতো ঘুরে বেড়ায়। কোথায় আশ্রয়, কোথায় খাওয়া, তার জন্য বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই।

আমরা আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম, 'নমস্তে সাধুজী।'

আঙ একটু হাসল। প্রতিদানে হাত তুলে নমস্কার জানাল, 'নমস্তে।'

'আপনি এখানেই থাকেন?'

চমৎকার হিন্দী বলতে পারে লোকটা। বলল, 'মাস খানেক আগে এসেছি, আবার কোথাও চলে যাব।'

'কোথায় যাবেন?'

'যাব একদিকে।' একটু থেমে বলল, 'পথের কি শেষ আছে?'

ভারী অদ্ভুত লাগছিল লোকটাকে। কত কথাই না যেন ওর বুকের ভেতর জমে আছে। সে সব শুনতে পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু আমাদের সময় খুব অল্প। সন্ধ্যা হয়ে এলেই বরফের জ্বালায় আর বাইরে থাকা যাবে না। তার আগেই আমাদের রাতের আস্তানায় ফিরতে হবে।

ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখছিলাম। ছর্তেনের গায়ে বেশ কয়েকটা ছোট বড় ঘন্টা ঝোলান। ঘন্টাগুলির এক একটার এক এক রকম শব্দ। কোনটা ভারী গম্ভীর, কোনটা হালকা সুরেলা, কোনটা আবার কাঁসার মতো ট্যাংট্যাংয়ে। কিন্তু সব চেয়ে আমাদের বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছিল ওই মন্ত্র লেখা নিশানগুলি।

ওগুলো সম্পর্কেই আঙের কাছে জানতে চাইলাম।

আঙ তার গোল গোল চোখে আবার একটু হাসল, তারপর শান্ত গলায় যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে, অপদেবতারা যাতে এই পবিত্র স্থানে আসতে না পারে সেজন্য ওগুলো টাঙান হয়েছে!

'অপদেবতা?'

'অপদেবতা বোঝ না? গোস্ট, প্রেতাত্মা।'

'তাই নাকি! আজকাল আবার ওসব আছে নাকি? প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন আপনি?'

কেমন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আঙ। 'সূর্যচন্দ্র যেমন সত্যি, প্রেতাত্মাও নাকি তেমনি সত্যি। অবিশ্বাস করব কেন! মানুষ মরে গেলে তার আত্মা যে প্রেত হয়ে যায় এতে অবিশ্বাস করার কি আছে।'

প্রেতাত্মাকে ওরা তিব্বতী ভাষায় বলে, 'শে'।

আঙ বোঝাতে শুরু করল, মানুষ মরে গেলে এই 'শে' তার দেহের ভেতর দিন কয়েক আটকে থাকে। পণ্ডিতরা মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দেহ থেকে সেই প্রেতাত্মা বার করে দেন। তারপর তাকে সৎকার করতে হয়। অবশ্য লামারা জ্ঞানীগুণী ধার্মিক বলে তাদের প্রেতাত্মা মৃত্যুর সংগে সংগেই দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। সেই প্রেতাত্মা মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

'কী রকম?'

এবার আঙ তিব্বতীদের মৃত্যু আর সৎকার প্রথা বোঝাতে শুরু করল। সংক্ষেপে সেই কাহিনীটাই তোমাদের শোনাচ্ছি।

মনে কর কোন এক অতি সাধারণ তিব্বতী মারা গেল। মৃত্যু তো একদিন হবেই। সে ব্যাপারে তো কারো হাত নেই। কিন্তু কেউ মারা গেলে সেই মৃতদেহ কাউকে ছুঁতে দেওয়া হয় না। ঘরের এক কোণে মৃতদেহটাকে বসিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মৃতদেহের কাছে পাঁচটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। তারপর ডাক পড়ে পোবো লামার। আমাদের যেমন শ্মশান কাজ করার জন্য পুরোহিত থাকে, ওদের তেমনি পোবো লামা।

পোবো লামা এসে যে ঘরে মৃতদেহ রয়েছে সে ঘরে একা একা ঢোকে। ঢুকে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেয়। তারপর মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করে দেখে তার প্রেতাত্মাটা বেরিয়ে গেছে কিনা। স্বভাবতই প্রেতাত্মা দিন তিন চারেকের আগে দেহ ছাড়ে না। তাই পোবো লামা তখন মন্ত্রটন্ত্র পড়ে সেই আত্মাকে বার করার চেষ্টা করে।

প্রথমে মৃতদেহের মাথা থেকে তিন চার গাছি চুল টেনে উপড়ে আনে পোবো লামা। চুল তুলে ফেলায় যে ছিদ্র হলো তাই দিয়ে আত্মা বেরিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু না

বেরুলে ছুরি দিয়ে পোবো লামা মৃতদেহের কপালের খানিকটা কেটে প্রেতাত্মা বেরুবার রাস্তা করে দেয়।

এ সব কাজ মাথার দিকেই করতে হয়। কেননা, মাথার দিক দিয়ে যদি প্রেতাত্মা বেরোয় তাহলে সেই প্রেতাত্মা ঊর্ধ্বগামী হয়। আর শরীরের অন্য কোন অংশ দিয়ে যদি প্রেতাত্মা বেরোয়, তাহলে সেই আত্মা অধোগামী হয়। অধোগামী আত্মা নাকি ভয়ানক ক্ষতিকর।

যাই হোক, পোবো লামা সব সময় চেষ্টা করে প্রেতাত্মাকে ঊর্ধ্বগামী করে পরমেশ্বর বুদ্ধের আশ্রয়ে পাঠাতে। এসব করতে তাঁর প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়, কখনো কখনো আরো বেশিও। এরপর লামা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সৎকারের নির্দেশ দেয়। আর দক্ষিণা হিসেবে অবস্থা বুঝে টাকাপয়সা, চমরী গাই বা ইয়াক বা ভেড়া নিয়ে চলে যায়।

সাধারণত মৃতদেহকে তিন দিনের আগে সৎকার করা হয় না। তিব্বতে সারা বছরই খুব ঠাণ্ডা, তাই মৃতদেহ নষ্টও হয় না। এই তিন দিন মৃতদেহের সামনে নিয়মিত খাবার দাবার, চা মদ এমন কি ধূমপানের তামাকও দেওয়া হয়। ওদের বিশ্বাস প্রেতাত্মা ওসব খেয়ে ছিবড়েটুকু কেবল ফেলে রাখে।

তিন দিন পর মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেলেও মৃত ব্যক্তির খাবার বাসনে ৪৯ দিন পর্যন্ত নিয়মিত তার প্রেতাত্মাকে খাবার পানীয় ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। ওরা বিশ্বাস করে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ৪৯ দিন পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজনের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। তাই ওদের খাবার টাবার দিতে হয়।

তিব্বতীদের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাটাও ভারী অদ্ভুত। প্রথমত মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় কোথাও সেই মৃতদেহকে নামান চলবে না। নামালে সেখানেই তাকে সৎকার করতে হবে। ফলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় শববাহকের পেছন পেছন তার আত্মীয়-স্বজনরা শবের সঙ্গে ছোঁয়া একটা কাপড় ছুঁয়ে শ্মশানের দিকে এগোয়। দু'জনের হাতে থাকে শবকে উৎসর্গ করা চা আর খাবার। সঙ্গে যে লামা থাকে, তার এক হাতে থাকে ডম্বরু আর এক হাতে একটা ঘণ্টা। লামা সেই ঘণ্টাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বাজাতে বাজাতে এগোয়।

এই ভাবে একটা মিছিলের মতো তারা সবাই মিলে শ্মশানে আসে। শ্মশান বলতে একটা বড় আকারে পাথরের টুকরো। সেই পাথরের ওপর মৃতদেহটাকে তারা শুইয়ে দেয়। এর পর বাকি কাজটা জহ্লাদের। জহ্লাদ এবার মন্ত্র পড়তে পড়তে মৃতদেহের শরীরে বেশ কয়েকটা দাগ কেটে ফেলবে। দাগ কাটার পর সেই জহ্লাদই একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সেই দাগ ধরে ধরে মৃতদেহটাকে টুকরো টুকরো কেটে ফেলবে। কাটার পর মাংস হাড় শকুনি-টকুনিকে দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হবে। এমন কি মাথাটাকেও বাদ দেওয়া হয় না। গুঁড়ো গুঁড়ো করে পশুপাখিকে দিয়ে তাও খাইয়ে শেষ করে ফেলা হয়।

কুমায়ূনের মুন্সিয়ারি

তবে সবাইকেই যে এভাবে সৎকার করা হয়, এমন নয়। যারা ধার্মিক ব্যক্তি বা লামা তাদের ঠিক আমাদেরই মতো চিতায় সাজিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরে চিতার ছাই কলসীতে বা অন্য কোন পাত্রে ভরে কোন মঠে বা ছর্তেনে রেখে দেওয়া হয়। ওদের শ্রাদ্ধশান্তিও নাকি করা হয়।

আঙ দোরজের মুখে এ সব গল্প শুনতে শুনতে গাটা কেমন ছমছম করছিল। এমনভাবে লোকটা আমাদের ওসব বোঝাচ্ছিল যে তা অবিশ্বাস করারও উপায় নেই।

ভাগ্যিস সেবার মিলাম হিমবাহ দেখতে গিয়ে আঙ দোরজের দেখা পেয়ে গিয়েছিলাম। তিব্বতীদের প্রেতাত্মা বিশ্বাসের কথা অমনভাবে শোনার তাই সৌভাগ্য হয়েছিল। ভূত প্রেত নিয়ে আমরা আজকাল মাথা ঘামাই আর না ঘামাই, কিন্তু ওদের গভীর বিশ্বাসের কথাই বা উড়িয়ে দেই কি করে।

তুলসীদাস ও তস্কর

মায়া বসু

ঘর সংসার সব ত্যাগ করে সন্ত তুলসীদাস,
পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে করিতেছিলেন বাস।
দিনরাত শুধু রাম নাম জপ, সীতারাম নাম গান,
সীতারাম গতি, সীতারাম পতি, সীতারাম মন প্রাণ।
ইষ্ট আদেশে গঙ্গার তীরে হয়ে রামময় মন,
লিখিতেছিলেন 'শ্রীরাম চরিত' নবরূপে রামায়ণ।
সহজ সরল সুমধুর ভাষা, সে কাহিনী যেই শোনে,
ভক্তিরসের স্রোত বয়ে যায়, তাহাদের প্রাণেমনে।

হিংসুক যত ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণ দল,
তুলসীদাসের খ্যাতি শুনে সবে হলো বড় চঞ্চল।
বলাবলি করে, কোথা থেকে এলো, কে এই তুলসীদাস?
বড়ই স্পর্ধা লেখে রামায়ণ? শ্রীরামের ইতিহাস?
না জানি কেমনে, কোন অধিকারে দেয় সে এ কাজে হাত?
এত অনাচার সহিবেন নাকো কাশীর বিশ্বনাথ!

সকলে মিলিয়া বহু মন্ত্রণা ষড়যন্ত্রের পর–
উৎকোচে বশ করিয়া দুজন কুখ্যাত তস্কর,
কহিল তাদের, "তুলসী যেখানে আপন কুটিরে একা–
সদ্যই শেষ করেছে তাহার 'শ্রীরাম চরিত' লেখা,
চুরি করে এনে দিলে পরে ওই মূর্খের রামায়ণ
নিশ্চয় পাবে আবার তোমরা অপর্যাপ্ত ধন।
ধরা পড়িবার ভয় নাই কোনো, এই কথা রেখো মনে
দ্বিতীয় কেহই থাকে নাকো দীন তুলসীর অঙ্গনে।"

অর্থের লোভে সুগভীর রাতে সেই দুই তস্কর,
'নব রামায়ণ' চুরি করিবারে হলো বড় তৎপর।
কুটিরের কাছে এসে তারা সবে স্তম্ভিত হয়ে যায়,
দিব্য জ্যোতি কিশোর কে এক? বিনিদ্র পাহারায়?

চন্দনে তনু চর্চিত তার, শিরে শোভে শিখি পাখা,
সোনার অঙ্গে স্বর্গলোকের ললিত লাবণি মাখা।
তীর ধনু হাতে পাহারা দিতেছে তুলসীর অঙ্গনে
সাধ্য কাহার সেখানে প্রবেশ করিবে সঙ্গোপনে?

ভয়ে শঙ্কায় বিমূঢ় হৃদয়ে শঙ্কিত কলেবরে
তস্কর দুটি শূন্যহস্তে ফিরে গেল নিজ ঘরে।

পরদিন প্রাতে তুলসীর কাছে এসে,
নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করে শেষে,
"চুরি করিবারে তোমার এই রামায়ণ,
গভীর রাত্রে পাঠাল কাশীর যত ব্রাহ্মণগণ;
বলেছিল তারা, তুমি দীন হীন, থাক একা ভাঙ্গা ঘরে,
বল তবে কে সে, ছিল কুটিরেতে সারাটি রাত্রি ধরে?
সারা কাশীধামে কোথাও কখনো আমরা দেখিনি তাকে,
কে সেই বালক? গৃহ পাহারায় রাখিয়াছ তুমি যাকে?
পীত বাস পরা নীলকলেবর, শিরে শোভে শিখি পাখা,
পদ্ম গন্ধ জড়ানো শরীরে শ্বেত চন্দন আঁকা?
দিব্য কান্তি কিশোর কুমার হস্তে ধনুর্বাণ
দেখিয়া তাহারে কী যে হলো হায়! ভরে গেল মন প্রাণ।"

চোরেদের কথা শুনে তুলসীর দুচোখ ভরিল জলে,
তস্করদ্বয়ে জড়ায়ে ধরিয়া নিঃশ্বাস ফেলে বলে,
"যাঁহাকে দেখেছ, তিনিই আমার ইষ্ট সে নারায়ণ
তাঁরই ইচ্ছায় সরল করিয়া লিখেছি এ রামায়ণ।
তাঁরই ইচ্ছায় মৃত প্রাণ পায়, জলে ভেসে ওঠে শিলা,
আমি দীনহীন মূর্খ, কি করে বুঝিব তাঁহার লীলা?

তিনিই ছিলেন সারা রাত কাল, আমার এ কুটিরেতে,
'শ্রীরাম চরিত মানস'খানিরে আপনি পাহারা দিতে।
ধন্য তোমরা সফল জীবন পেয়েছ যে দেখা তাঁর।
আজি হতে জেনো সব পাপ থেকে পেয়ে গেলে উদ্ধার।"

তুলসীর কথা শুনে চোরেদের দুনয়নে বহে ধারা।
উদাস হৃদয়, সংসারে আর ফিরে গেল নাকো তারা।
রাম নাম গেয়ে, তুলসীর সাথে হয়ে শ্রীরামের দাস,
নির্জন সেই ভাঙ্গা কুটিরেতে করিতে লাগিল বাস।

ছবি–দিলীপ দাস

ক্যাশিয়ার কালাচাঁদ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁথির পরীক্ষা হল থেকে কালাচাঁদকে আবিষ্কার করে তার বাবা অঘোরবাবু টোকার দায়ে পুলিস আর মাস্টারমশাইদের হাতে ছেলের সার্চ তো বন্ধ করলেন। বাসে খড়্গপুর ফেরার পথে এমন বৃষ্টিতে পড়লেন ছেলেকে নিয়ে—যেরকম বৃষ্টি একশো বছরেও হয়নি। তারপর তো এমন ট্রেনে উঠলেন—তার কিছুটা যেন সত্যিকারের ট্রেন—অনেকটাই আবার স্বপ্ন স্বপ্ন। সে বৃষ্টির কথা ভাবতে গিয়ে বাবা আর ছেলের একই সঙ্গে মনে পড়ে—কী পোশাক-আসাক প্যাসেঞ্জারদের! বইয়ে পড়া কবেকার সেইসব গোরাপুলিস হঠাৎ হাজির হয়ে সাতপুরনো গ্যাস বাতির নিভু আলোয় চেঁচিয়ে উঠেছিল, টুমি নানাসাহেব আছো?

কোথায় ইলেকট্রিক আলো! কোথায় আজকের এই সিনেমা!! এরোপ্লেন!!! সবই যেন পিছিয়ে পিছিয়ে মিউটিনির আমলে ফিরে যাচ্ছিল। এমনকি কিছু প্যাসেঞ্জার ছিল সে-ট্রেনে—যারা কিনা মণ্ডামিঠাই নিয়ে জোড়াসাঁকোয় এক বিয়ের কথা বলছিল। সেখানে দেবেন্দ্রবাবুর এক ছেলের বিয়েতে নাকি মহাধুমধাম। দেদার দানসামগ্রী, দক্ষিণা।

কিন্তু কালাচাঁদকে তার বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরতে হয়েছে রেল লাইন ধরে। দু'পাশে মাইলের পর মাইল জলে ডুবে শাদা। রেলের স্লিপার ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ফেরা। দু'জনেরই পা ফুলে ঢোল। এক বছরের ওপর নিরুদ্দেশ কালাচাঁদকে ফিরে পেয়ে তার মায়ের সেঁক দিতেই কেটেছে মাসখানেক। এসবের ভেতর স্বপ্নের কোন স্ব ছিল না।

সারা দেশ এখনো জলে ডুবে। শুধু উঁচু উঁচু জায়গায় গরু ছাগল চরে। জানলার কাছে খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল কালাচাঁদ। শুরুতেই লেখা—

'১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে।

পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখি বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে-ভর্তি ডালে।

হাতের বইখানার মলাট দেখলো। ইছামতী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালাচাঁদ মনে মনে হিসেব কষলো। এখন ১৩৮৪। তাহলে বাংলা ১২৭০-এর ওই বন্যাটাই নিশ্চয় সে-সময়কার সবচেয়ে বড় ঝড়বৃষ্টি। ঠিক একশো চোদ্দ বছর আগে। একদম সেই মিউটিনির ক'বছর পরেই।

এখনো এখানকার পথঘাটে কাদা। মাঠে মাঠে জল জমে আছে। তাহলে একশো সওয়াশো বছর অন্তর অন্তর সব মিলিয়ে মিলিয়েই ঘটে। অত বছর আগে রওনা দিয়ে ট্রেনটা তাহলে মাত্র একশো চোদ্দ বছর লেট ছিল? ভাগ্যিস ছিল। নয়তো আমরা সবাই বাসসুদ্ধ খড়্গপুরের এগারো মাইল আগে নারায়ণগড়ের কাছেই ভেসে যেতাম।

দুপুর ফুরোনোর জোগাড়। বড় রাস্তা দিয়ে সরকারী নার্স শিশুবালা দাসী হাসপাতালে চললো। এমন সময় মাঠে মাঠে জল কাদা ভাঙা হয়রান চেহারা নিয়ে অঘোর একদম হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

এই যে! গপ্পের বইয়ে বেভোর হয়ে আছো। বাপের একটা পাটচারাও বাঁচে নি। সে খেয়াল রাখো?

কালাচাঁদের মা ঘরে ঢুকে ছেলেকে আড়াল করলো, এই দুব্বল শরীরে মাঠে যাবে নাকি আমার কালাচাঁদ?

মায়ে ব্যাটায় ঘরে গুষ্টি সুখ করো। সামনের সনে পাটের টাকা একটিও আসবে না মনে রেখো।

মুনীষ রাখো। তাই বলে আমার কালাচাঁদ এখন জলে কাদায় নাববে নাকি!

মুনীষ রাখবো তো পহয়া কোথায়?

সে তুমি বোঝো। বলে নেমে গিয়েই কালাচাঁদের মা ফোঁস করে উঠলো, গুরুদেব কি বললেন? মনে নেই?

সত্যিই মনে ছিল না অঘোরের। সে অবাক হয়ে বললো, কি বললেন তিনি?

কিছু মনে নেইগো তোমার। ছাব্বিশে পা দিয়ে সাধু কালাচাঁদের আমার রাহুর দশা কেটে গেছে। এবার কেতুর কৃপায় আলটপকা অনেক টাকা পাবে তোমার ব্যাটা। টাকার চিন্তা করছো কেন?

সবই মনে পড়ল অঘোরের। তুমি শেষে গণৎকারী ধরে আছো! আচ্ছা মেয়েমানুষ তো তুমি? সব ঘটে নাকি জীবনে!

তুমি দেখো—আমার কালাচাঁদের জীবনে সবই ঘটবে। গুরুদেব তো বলেছেন, ছোট ছোট ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে কালাচাঁদের আর বিদ্যাভ্যাসের কোন দরকার নেই। এখন ঘরসংসারের বয়েস কালাচাঁদের। এবার মাথা ধরে উঠলে চাইকি একটা কেউকেটা মানুষ হয়ে যাবে সাধু আমার। তুমি সুলক্ষণা একটি মেয়ে দেখো তার চেয়ে। এই আষাঢ়েই আমি কালাচাঁদের বে দেবো।

বে দেবে তো বাধা কি? বলে ভিজে পোড়া শরীর চুলকোতে লাগলো অঘোর। জমির ভাটোই তুলে তুলে হাতের

সেই সুখেই থাকো

পাতার ছাল ছাড়ানো দশা।

গুরুদেব তো বল্লেন, চাকরি কালাচাঁদের কপালে নাচছে—

সেই সুখেই থাকো! দাও—তেল গামছা দাও। জীবনে খাটতে এসেছি—খেটেই চলে যাব।

সেদিনই সন্ধ্যে সন্ধ্যে অঘোরের ছোট ভায়রা এসে হাজির। দাদা আছেন নাকি?

কে?

আমি নৃসিংহ।

আরে! এসো এসো। হাওড়া থেকে বেরোলে কখন?

দাদা। আমি তো আজকাল আর হাওড়ায় থাকিনে—। মেদিনিপুরের দাদনপাত্রবাড় ব্রাঞ্চে বদলি হয়েছি এই হপ্তাখানেক। একটা কাজের কথায়—

এখন কাজের কথা রাখো। খাও দাও জিরোও আগে।

বেশি রাতে নৃসিংহ যখন কাজের কথাটা পাড়লো—তখন অঘোর ঘুমে ঢলে পড়ার যোগাড়।

নৃসিংহ বললো, তাই ভাবছিলাম—ব্যাঙ্ক যখন ফ্লাড

অ্যাফেক্টেড্ এলাকায় ম্যানেজার হিসেবে আমার ব্রাঞ্চে টেমপোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ক্ষমতা আমায় দিয়েছে—ও দাদা! আপনি যে ঘুমুচ্ছেন—

না, না। বল, বল—

তাহলে কালাচাঁদকে কেন ঢুকিয়ে দিই না?

অঘোর পটাং করে উঠে বসলো, কি বলছো? আবার বলো তো ভাই—

এখন কালাচাঁদকে যদি ক্যাশিয়ার করে ঢোকাতে পারি—তো পারমানেন্ট করে নিতে ঠিকই পারবো আমি। কিছু সময় নেবে—

কিন্তু ভাই। ও যে স্কুল ফাইনালও পেরোতে পারেনি—তা তুমি জানো।

জানি দাদা। কিন্তু আমাদের ব্রাঞ্চে দরকার একজন বিশ্বাসী, পরিশ্রমী লোক। একতলায় ব্যাংক। বন্যার জল ঢুকে দলিলপত্র ব্লটিং পেপার করে দিয়েছে। নোট সব ভিজে গিয়ে একটার গায়ে আরেকটা লেগে আছে। তা বলি কি দাদা—কাল ভোরেই কালাচাঁদকে নিয়ে আমি রওনা হয়ে যাই।

তুমি তো ওর মেসো। যা ভাল বোঝো কর।

কালাচাঁদের মা শুনছিল সব এতক্ষণ। এবারে বললো, তা কালাচাঁদ আমার সাধু প্রকৃতির লোক। কোন জিনিসে তেমন লোভ নেই। খুব বিশ্বাসী। খুব পরিশ্রমী। একটু দেখিয়ে দিলে কালাচাঁদ কাজটা ঠিক ধরে নেবে।

কথামত কাজ। পরদিন ভোর ভোর কলকাতার ট্রেন। দুপুরের দিকে আবার ট্রেন। খড়্গাপুরে নেমে দীঘার বাস। সাতমাইল খালের ওপর পোল পেরোতে বিকেল হয়ে গেল। দুধারের মাঠে জল কাদা। পোছাবনী নামতে নামতে রাত হয়ে গেল।

অন্ধকার পিচরাস্তায় নেমে ঠান্ডা বাতাসে কালাচাঁদের গা জুড়িয়ে গেল। নৃসিংহ মেসো বলল, এখন তো রিক্সো, গো-গাড়ি কিছুই পাবে না। এখান থেকে চার মাইল হাঁটলে তবে দাদনপাত্রবাড়। কাল সকালে দেখতে পাবে—নুনের পাহাড়। খানিক দূরেই সাগর।

কিসের সাগর?

বাঃ। বঙ্গোপসাগর। বে অব বেঙ্গল। সারাদিন রাত ঢেউ ভাঙার শব্দ বাতাসে। বাতাস তাই জলের ছাঁটে ভিজে গিয়ে ঠান্ডা। অফিস ঘরে বসেও সে শব্দ কানে আসে। সাগরের নোনাজল টেনে এনেই তো নুনের কারবার। ব্যাঙ্কের পেছনেই বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কারখানা। পৌঁছেই দেখতে পাবে—এখন চল হাঁটি আমরা।

নৃসিংহ মেসোর বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটা। সল্ট কোম্পানির গা থেকে টেনে আনা লাইনে বিদ্যুৎ বোধহয় বেশি থাকে না। দু'খানা ঘর। দু'টো ঘরের নিভু নিভু ডুম কোনমতে জ্বলে উঠলো। ব্যাঙ্কের পিওনের রান্না অখাদ্য। খেতে খেতে কালাচাঁদ মনে মনে ভগবানকে ডাকলো। ঈশ্বর! বার বার তুমি আমায় মেদিনীপুরে টেনে আনো কেন? আমি কি গতজন্মে এই জেলাতেই জন্মেছিলাম? সেই কাঁথি! সেই বঙ্গোপসাগর আবার!!

খাওয়া দাওয়ার পর নৃসিংহ মেসো বললো, সাড়ে ছ'শো টাকা মাইনে হবে তোমার। কিছু অ্যালাউন্সও পাবে। মাসে মাসে অঘোরদাকে চারশো করে টাকা মনি অর্ডার করবে। বাকি টাকা থেকে শ' দেড়েক টাকা খাই খরচা কেটে রাখবে। আর যা থাকবে তা তোমার হাত খরচা। চলবে না?

খুব চলবে। আপনি ঘুমোন।

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কালাচাঁদের। পাশের খাটে নৃসিংহ মেসো হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।

অবিরাম জল ভাঙার শব্দ। লক্ষ কোটি ঢেউ এর ওর গায়ে লেগে ভেঙে যাচ্ছে। আবার নতুন নতুন ঢেউ জন্মাচ্ছে। জানলায় দাঁড়াতেই চোখ ঝলসে গেল কালাচাঁদের। বঙ্গোপসাগর অনেক দূরে। বাতাসে তার আভাস পাওয়া যায় শুধু। প্রচন্ড বাতাস। একদিক দিয়ে টানা, চওড়া মাটির বাঁধ চলে গেছে। দোতলা, তেতলা সমান উঁচু। আরেক দিকে ঢেউ টিনের শেডের গায়ে লেখা—বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি। দাদনপাত্রবাড়। তাদের নুনের পাহাড়প্রমাণ শাদা ঢিবি। ভোরের আলো পড়ে ঝকমক ঝকমক করছে। সাগর থেকে টেনে আনা নোনাজল চৌকো চৌকো মাটির বাঁধে আটকে রাখায় সেগুলোর ওপর রোদ পড়ে ঝলকাচ্ছে। বাঁক কাঁধে লোকজন নুন নিয়ে গিয়ে জমা করছে ঢিবিতে।

মেসো ঘুম থেকে উঠে চা খেল। তারপর কালাচাঁদকে ডেকে বললো, যাও দাড়ি কামিয়ে নাও। আমার সেট রয়েছে তাকে। তারপর আমি কামাবো।

আমার সেট এনেছি। আপনারটায় আপনি কামিয়ে নিন—

ঠিক দশটায় মেসোর সঙ্গে কালাচাঁদকে ব্যাঙ্কে যেতে হলো। তখনো কেউ আসেনি।

সব বুঝে নাও কালাচাঁদ। রোজকার ক্যাশিয়ারি এখনকার মত আমি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিলে সামলে নেব্। তোমায় করতে হবে অন্য একটা কাজ। ভীষণ বিশ্বাসীর কাজ। বিরাট দায়িত্ব কালাচাঁদ—

কি করতে হবে বলুন?

নিজের লোক বলেই এখানে তোমায় এনেছি। একটু পরিশ্রমও আছে। চলো—

নৃসিংহ মেসো সিন্দুকের সামনে গিয়ে থামলো। হাতে বিরাট বিরাট চাবির গোছা। মেসো মুখে বললো, এই বন্যায় জল উঠছিল ওই দাগ অব্দি—

তাহলে তো সিন্দুকের মাথা ছাড়িয়ে যায়—

আমি তো তখন এখানে বদলি হইনি। আমি থাকলে সিন্দুকটা অন্তত লোকজন করে আরও উঁচু কোথাও তুলে দিতাম। তাহলে এই ঝামেলিতে পড়তে হত না।

আগের ম্যানেজার কি করছিলেন?

জল ঢুকে সাতদিন অফিস বন্ধ। ঘরে নাকি সাপে আর মাছে খেলা করছিল। অক্টোপাসের একটা ছানাও নাকি ঢুকেছিল। কাছেই তো বে অফ বেংগল। আগের ম্যানেজার হেঁপো রুগী। জল দেখে সাতদিনের ছুটি ডিক্লেয়ার করে তিনি বাড়ি বসেছিলেন। এখন ঝামেলি পোহাক নৃসিংহ। বলতে বলতে মেসো সিন্দুকের দরজা খুলে ফেললো চাবি ঘুরিয়ে। আধ মানুষ সমান দরজা। ভেতরের পাটা ঘাম ঘাম জলের ফোঁটায় ভিজে। মেসো পিওনকে বললো, টর্চ মার। ফোকাস–

আলো পড়তেই কালাচাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। থাক থাক বড় নোটের গোছা।

এ কি দেখছো! নিচের ভল্টে এর দশগুণ নোট–সব জলে ভিজে আমসত্ত্ব হয়ে আছে। এদের ঠিকঠাক করাই তোমার কাজ। কেউ যেন বুঝতে না পারে। তাহলেই ব্যাংক ডাকাতি হয়ে যাবে। নয়তো লুঠপাট।

কালাচাঁদ কিছু বুঝতে পারলো না। মুখে বললো, আমি ক্যাশিয়ার–অথচ কেউ বুঝতে পারবে না? সে কি করে হয়!

নোটগুলোর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে তখন বলা যাবে– কালাচাঁদবাবু আমাদের নতুন ক্যাশিয়ার। আগের ক্যাশিয়ার, আগের ম্যানেজার–দু'জনই তো সাসপেন্ড। তোমার পরিচয় এখন থেকে–ম্যানেজারবাবুর বড়শালীর ছেলে। সমুদ্রের ধারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মেসোর বাড়িতে বেড়াতে এসেছো। ব্যাংকে এসে ঠিক দশটায় একটু আধটু বসবে। চা খাবে। তারপর কাসটোমার নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত–তখন তুমি নিজের কাজে লেগে যাবে এক ফাঁকে। কেউ খেয়ালও করবে না। আসল ব্যাপার জানবো–শুধু আমি আর অ্যাকাউন্টান্ট বাবু।

কিন্তু অ্যাতো টাকার সব আমসত্ত্ব নোট–আমি ঠিক করবো কি করে?

ঘাবড়ে যেও না। বেশি টাকা নয়। মাত্র তিনকোটি পঁচাশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছ'শো পঁচানব্বই টাকার নোট আছে। বাকি তো সব কয়েনস্। সেগুলো আমরা দুজনে মিলে মুছে মুছে ঠিক করেছি।

কি বললেন? মাত্র তিনকোটি পঁচাশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছ'শো পঁচানব্বই টাকার নোট? তাইতো? একটা নোট বই দিন। লিখে রাখি। নয়তো ভুলে যাবো।

কারেক্ট। একবার শুনেই এই তো ঠিক বলেছো ফিগারটা। নোট বইয়ের কোন দরকার নেই। আসল কথা–যা নিয়ে যাবে–তাই নিয়ে ফিরে আসবে। এরকম একজন বিশ্বাসী লোকই তো আমাদের দরকার ছিল।

কালাচাঁদের সব গুলিয়ে গেল। ফিগারটা অ্যাতো লম্বাই চওড়াই। এখন যদি নৃসিংহ মেসো আবার জানতে চান–তো আমি ঠিক ঠিক বলতে পারবো না। সে সব গুলিয়ে ফেলে মেসোর কাছে জানতে চাইলো, খুব সরল ভাবেই। কি নিয়ে যাবো? কোথায় যাবো? আবার সে জিনিস নিয়ে কোথায় ফিরে আসবো?

হো হো করে হেসে উঠলো মেসো। খুব দশাসই গোঁয়ার গোছের শরীরটা মেসোর হাসির সংগে খানিকক্ষণ ওঠা পড়া করলো। তারপর মেসো বললো, বিশ্বাসী গো-গাড়ি বলা আছে। রোজ ঠিক এগারোটায় আসবে। আর ফিরবে সেই সন্ধ্যে সন্ধ্যে। চারটে বস্তাও আনতে বলে দিইছি শরৎ গাড়োয়ানকে। তবে সে আসল ব্যাপার কিছুই জানে না। শরতকে গাড়িসুদ্ধু উঁচু মাটির বাঁধের এপাশে দাঁড় করাবে। তারপর একটা একটা বস্তা নিয়ে দিব্যি বাঁধে উঠে ওপারে চলে যাবে জলের ধারে। নুড়ি, পাথর–এসব চাইতো! কি না? ফিরবে বস্তা ভরে। একদম গুনে গেঁথে!

এবার একদম ঘাবড়ে গেল কালাচাঁদ। তার দু'চোখ মেসোর কপালে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এটা কি ক্যাশিয়ারের কাজ? বিশ্বাসী গো-গাড়ি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কালাচাঁদ। খুব বিশ্বাসী। শরৎ গাড়োয়ান ব্যাংক লোন নিয়েই দু'দুটো সা-জোয়ান হরিয়ানা ষাঁড় কিনেছে। চাকা টিউব টায়ারের। চলবে ঠিক মোটর গাড়ির মতই। বুঝলে হে!

চারটে বস্তা? শরৎ গাড়োয়ান? বস্তা নিয়ে বাঁধ পেরিয়ে একা একা জলের ধারে চলে যাবো? তারপর নুড়ি? পাথর? সেগুলো আবার গুনতে হবে? বস্তায় ভরে ফিরতে হবে? কি বলছেন আপনি? বস্তায় পাথর ভরা কি ক্যাশিয়ারের কাজ? আগে জানলে আসতুম না। আমি দুপুরের বাসেই বাড়ি ফিরবো। টাকা না গুনে কোন ক্যাশিয়ার কি পাথর গোনে?

নৃসিংহ মেসোর আবার সেই হাসি। থামতেই চায় না। হাসির সংগে মেসোর বুক উঠছে পড়ছে।

কালাচাঁদ বললো, বস্তায় পাথর ভরা এমন কি আসল ব্যাপার–যে, শরৎ গাড়োয়ানকে জানানো হয়নি?

এবার নৃসিংহ মেসো যাকে বলে অট্টহাসি হাসতে লাগলো। হাসির দমকে অনেক দূরে পেছনে দাঁড়ানো পিওনটি দফায় দফায় কাঁপতে লাগলো। তার হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নেভানো। মেসোর চোখ সে-হাসিতে কুঁচকে ছোট হয়ে গিয়ে জল এনে ফেলেছে।

ঘ্যাচ করে অট্টহাসি কেটে দিয়ে নৃসিংহ ম্যানেজার ইংরাজিতে বললো, দ্যাট ইজ দ্য মিস্ট্রি মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান। এসো। বোসো। আগে চা খাও। প্রথমদিন তো আজ।

চেয়ারে বসে কালাচাঁদ বুঝলো, বিষম ফেরে পড়া গেছে। এখন বেরোনো যায় কি করে? মুখে বললো, এই তো ভাত খেয়ে এলাম। আমি এখন চা খাবো না।

তাহলে আমি একটু খাই। বলে ঢাকা দেওয়া কাপের ওপর থেকে প্লেট সরিয়ে এক চুমুক দিলো মেসো। তাহলে কাজের কথা শোনো। ঘাবড়াবার কিছু নেই। বস্তা ভরে গোছা গোছা একশো টাকার নোট নিয়ে শরতের গাড়িতে উঠবে। বে অব বেংগলে অনেক নুড়ি পাথর ভেসে আসে। শুকনো বালির

ওপর নোটগুলো আলাদা আলাদা পেতে দিয়ে তাতে নুড়ি চাপা দেবে। সারাদিন বাতাসে রোদে নোট শুকোলে বস্তা ভরে নিয়ে তবে ফিরবে। শুকোনোর সময় একখানা ছড়ি হাতে পাহারা দেবে। বুঝেছো। এখনকার মত এই তোমার ক্যাশিয়ারি।

তাহলে এখন এখানে বসে রোজকার টাকা গুনতে হচ্ছে না আমায়।

না। যা কিছু গোনাগাঁথা সে সেই সমুদ্রতীরে। নির্জনে। আলো হাওয়ায়। বায়ুপরিবর্তনও হচ্ছে! কি বল?

কালাচাঁদ প্রথমে কিছু বলতে পারলো না। শেষে বললো, কিন্তু অত টাকা?

সেজন্যে কোন অসুবিধে নেই। ক্ষেপে ক্ষেপে নেবে। ক্ষেপে ক্ষেপে শুকিয়ে নিয়ে সিন্দুকে তুলে দেবে। সন্ধ্যের দিকে। যখন আমি আর অ্যাকাউন্টেন্টবাবু ছাড়া কেউ থাকবে না ব্যাঙ্কে। আবার পরদিন নুতন থাকগুলো ভল্ট থেকে বস্তায় ভরে নেবে। খুব বিশ্বাসী লোক ছাড়া এ কাজ কি হয়? আজই কাজে লেগে যাও কালাচাঁদ।

দুপুরের দিকে শরৎ গাড়োয়ানের গো-গাড়িতে বস্তাগুলো তোলার সময় কেউ দেখতে পেল না কালাচাঁদকে। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজা দিয়ে সে গিয়ে গো-গাড়ির পেছন দিকে দাঁড়িয়ে একে একে চার বস্তা ছইয়ের নিচে সেঁধিয়ে দিল। আগে জানা ছিল না, একশো টাকার নোটের গোছারও এত ওজন হয়। ঘাড় ভেঙে যাওয়ার দশা। কালাচাঁদ মনে মনে বললো, এ হলো গিয়ে ক্যাশিয়ারি করতে আসার আক্কেল সেলামী। এখন ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি!

কিন্তু টায়ার লাগানো গো-গাড়িতে শরতের পাশে বসে গল্প শুনতে শুনতে যেতে ভালই লাগছিল কালাচাঁদের। চারদিকে জল নেমে যাওয়া ভিজে মাঠ। এখন আর ধানের আশা নেই। সব পচে গেছে ক'দিনের জলে। গরু ছাগল নেমে পড়েছে নধর নধর ঘাস খেতে। ঘাসের ডগায় ডগায় কোথাও কোথাও ছোট্ট বেগুনী ফুল সারা মাঠের সবুজে বিঁধে আছে।

ডান হাতে সন্ট কোম্পানি পেরোনোর পর আর লোকজন নেই। সামনেই সেই বিশাল উঁচু আর চওড়া মাটির বাঁধ। জলে ভেজা সবুজ ঘাসে আগাগোড়া ঢাকা। খানিকক্ষণ চলার পর কালাচাঁদ বুঝলো, উঁচু বাঁধটা খুব সামনে নয়। যতই এগোয় গো-গাড়ি—ততই পেছোয় বাঁধটা।

শরৎ গাড়োয়ান পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই হবে। হাট্টাকাট্টা জোয়ান। তার গাড়ির ষাঁড় দুটোও পেল্লাই। দুলকি চালে ওদের বয়ে নিয়ে চলেছে। শরৎ জানতে চাইলো, আপনি হাওয়া বদলাতে সাগরের কাছাকাছি যাবেন—আবার ফিরে আসবেন। তা অত বড় বড় বস্তা বইতে গেলেন কেন? কি করবেন বস্তা নিয়ে—

ডাক্তারের পরামর্শ শরৎ। খাচ্ছি দাচ্ছি মেসোর বাড়ি। একটু আধটু পরিশ্রম করবো না?

তাই বলে চার বস্তা মাল!

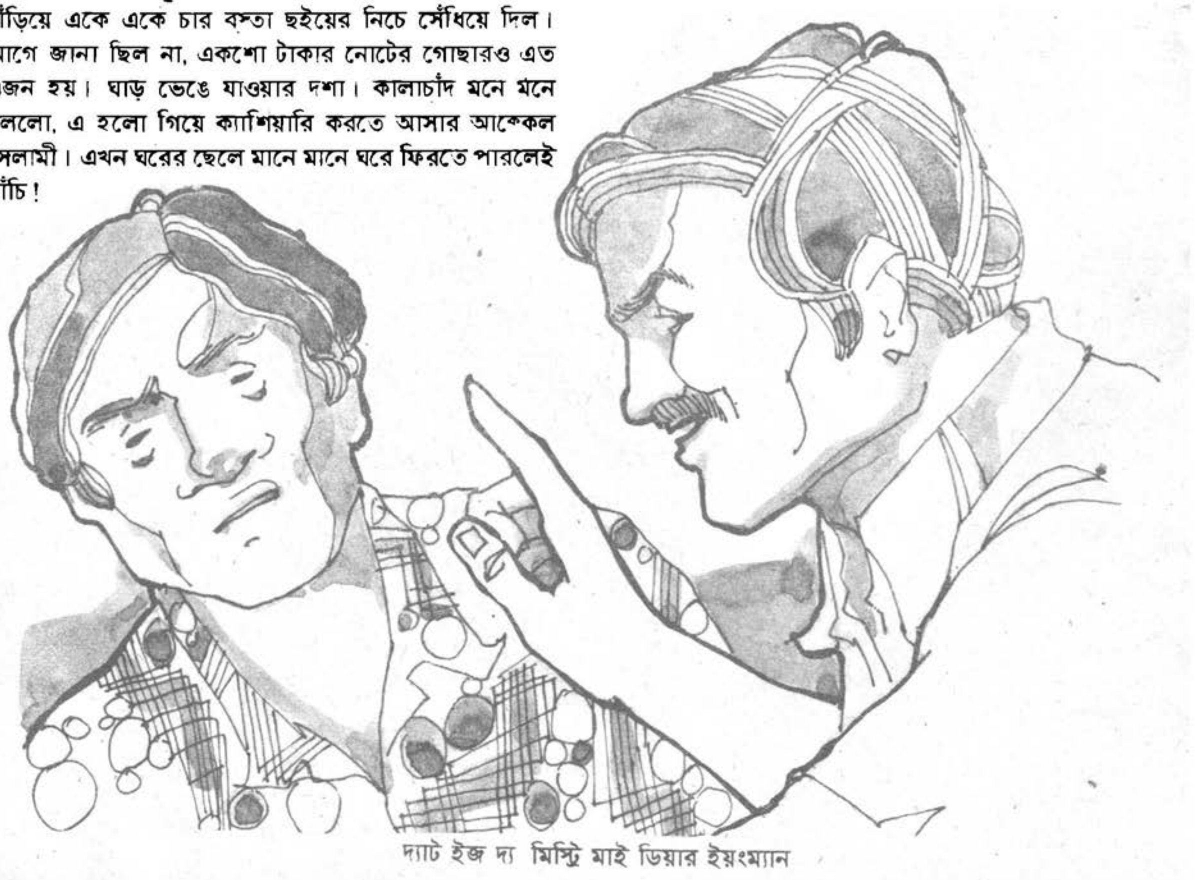

দ্যাট ইজ দ্য মিস্টি মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান

ওতে ভারি কিছু নেই। আমার এই ক' বছরের বুকের ছবি। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। হাসপাতালের টিকিট।

অ্যাতো ছবি? অ্যাতো কাগজপত্তর।

হবে না? যাকে বলে রাজরোগ। দফায় দফায় কত ছবি তুলেছে বুকের তার ইয়ত্তা নেই। আজকাল ওগুলো দেখতেও আমার ভাল লাগে। সংগে সংগে নিয়ে ঘুরি।

তাই বলে চার চার বস্তা!

রাজযক্ষ্মা কি যে সে জিনিস শরৎ? দেখো—এই বস্তা নিয়ে বাঁধে উঠবো। ওপারে গিয়ে কাগজ আর প্রেসক্রিপশন ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকবো।

বাঁ হাতের ষাঁড়কে ছিপটি মেরে শরৎ বললো, সব উড়ে যাবে তাহলি। সাগরের বাতাস কি জিনিস—তা জানেন না—

দরকারে নুড়ি চাপা দেবো।

তা দিয়ে দেখেন। তাও কিন্তুক উড়ে যেতি পারে—বিষম হাওয়া তো সাগরপাড়ে।

বস্তা রহস্য থেকে শরৎ গাড়োয়ানের মন সরিয়ে আনতে পেরে কালাচাঁদের নিজের উপর ভরসা বেড়ে গেল। নোটের গোছা বোঝাই চার চার বস্তা একে একে কাঁধে করে বাঁধ পেরোতেই কালাচাঁদের ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তারপর ভিজে আমসত্ত্ব হয়ে যাওয়া নোটগুলো আলাদা আলাদা করে বালিতে নুড়ি চাপা দিতেই বেলা প্রায় দু'টো আড়াইটে।

খেজমত কম নয়। উবু হয়ে ঢেউয়ের কাছাকাছি গিয়ে ভিজে বালির ওপর থেকে নুড়ি, বড় শামুক বা শংখ কুড়োও। মাজা ধরে গেলে টান টান দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে বংগোপসাগরে তাকালে বুক সত্যি সত্যিই কেঁপে ওঠে। সেটা সামলে আবার কুড়োও।

সাবধানে এক একখানা করে নোট খুলে বালিতে পাতা। তারপর সাইজমত নুড়ি চাপানো তার ওপর। কাছে পিঠে কোন মানুষ নেই। ডিঙি বা বজরা—তাও নেই। না আছে কোন জেলে। শুধু ঢেউ ভাঙার শব্দ। সে-শব্দের কোন থামা নেই। পাগলা বাতাসের সংগে চড়চড়ে রোদ। এর ভেতর কোন কোন নোটকে উলটেপালটে দিতে হচ্ছিল। কোনটা ভিজে গিয়ে একদম ন্যাতা। খুব সাবধানে কালাচাঁদ তাদের বেছে বেছে বালিতে শোয়াচ্ছিল।

এর ভেতর একখানা একশো টাকার নোট শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে বাতাসের চোটে চাপানো নুড়ি উল্টে ফেললো। ফেলেই বাতাসে উড়তে লাগলো নোটখানা। কখনো উঁচু দিয়ে—কখনো নিচু দিয়ে।

খাঁ খাঁ নির্জন বালিয়াড়ি। এখানে সেখানে গুচ্ছের নুড়ি, বড় ঝিনুক আর ভাঙা ভাঙা খুচরো শংখ। এদের ভেতর দিয়ে কালাচাঁদ পড়ি মড়ি দৌড়লো। উড়ন্ত নোটখানাকে ধরতে। হাজার হোক—নতুন চাকরির আজ পয়লা দিন। তার মাস মাইনের প্রায় ছভাগের একভাগ এই উড়ন্ত নোটখানা।

উড়ছিলোও বটে। যেই দৌড়ে কাছে যায় কালাচাঁদ অমনি নোটটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে দিক পালটায়। এক একসময় বংগোপসাগরের বুকের ওপর খানিকটা উড়ে যায়। তখন কালাচাঁদ ঢেউগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে নোটের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। আবার নোট ভেসে পড়ে বাঁধের দিকে ছুটে যায়। তখন তার পেছন পেছনে কালাচাঁদ দৌড়োয়। এক সময় সে যখন হাঁপিয়ে পড়ে নোটের আশা ছেড়ে দিয়েছে—ঠিক তক্ষুণি বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গিয়ে নোটখানাকে আমপাতার মত কালাচাঁদের সামনে ধরে ফেলে দিল। অমনি সে বুক সুদ্ধ ঝাঁপ খেয়ে দু'হাতে নোটখানাকে ধরে ফেললো। ধরে সে বালির ওপরেই খানিকক্ষণ শুয়ে পড়ে থাকলো। ওঠার মত জোর নেই গায়ে। এলোপাথাড়ি দৌড়োনোয় পা ভাঙা শংখে লেগে কেটেকুটে একসার।

যখন সে উঠে দাঁড়ালো—তখন আরও চারখানা নোট আকাশে উঠে পড়েছে। একখানা বংগোপসাগরের বুকে বাতাসের সংগে খেলছে। একখানা বাঁধের দিকে নিচু দিয়ে ভাসছে। আর দু'খানা দাদনপাত্রবাড় ছাড়িয়ে পিছাবনীর দিকে যাবে বলে মনে হলো কালাচাঁদের। আগে হাতের শুকনো নোটখানা বড় একটা নুড়ি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এরা যখন ভিজে থাকে—তখন চাপান কতটা হবে বোঝা কঠিন। বাতাসে শুকিয়ে পাঁপড় হলেই নুড়ি উলটে দিব্যি পাখা মেলে। এখন উপায়?

কালাচাঁদের পায়ের সামনে শোয়ানো নোট তা একশো হাত অব্দি পাতা। চওড়াই প্রায় সত্তর আশি হাত। এরা সবাই যদি উড়তে থাকে?

ভাবতে গিয়েই কালাচাঁদের মাথা ঘুরে গেল। সে বালিতেই বসে পড়লো। তখনো নোট চারখানা উড়ছে। হাতের কাছাকাছি ফিরেও আসছে দু একখানা। আবার ফিরেও যাচ্ছে। তাদের ইচ্ছেমত উড়তে দিয়ে কালাচাঁদ সবার আগে ভারি ভারি নুড়ি কুড়োলো ভাঙা ঢেউগুলোর মুখ থেকে-ভিজে বালিতে গাঁথা অবস্থাতেই। তারপর ভিজে, আধ ভিজে, প্রায় শুকোনো নোটগুলোর ওপর লাইন ধরে ধরে কালাচাঁদ সেই বড় নুড়িগুলো চাপালো।

ততক্ষণে বংগোপসাগরের আকাশ থেকে উড়ন্ত নোটখানা ডাঙার আকাশে ফিরে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ নোটগুলোকে উড়তে দেখলো। এখন দৌড়ে দৌড়ে ওদের ধরা দরকার। বিশ্বাসী বলেই নৃসিংহ মেসো তাকে ক্যাশিয়ারির চাকরি দিয়েছে। মেশোর বিশ্বাসের মান রাখা দরকার।

তার মানে আবার দৌড়োও। আবার পা কাটো!! আবার হাঁপাও!!! কিন্তু একখানার পেছনে দৌড়েই এই অবস্থা। এখন চারখানার জন্যে ছুটতে হবে।

সন্ধ্যের মুখে দুখানা নোট নামাতে পারলো। বাকি দু'খানা আচমকা বাতাস পড়ে যেতেই বালিয়াড়িতে পড়লো। ওদের সবাইকে বস্তাবন্দী করে কালাচাঁদ নুড়িগুলো পা দিয়ে দিয়ে এক জায়গায় ঢিবি করলো।

বস্তাগুলো একে একে নিয়ে গো-গাড়িতে তুলতেই

রীতিমত সন্ধ্যে। গাড়ি চালু করে শরৎ গাড়োয়ান বললো, এ কেমন হাওয়া বদল বাবু? চার চার বস্তা বুকের ছবি, হাসপাতালের টিকিট—সেগুলো সাগরের ধারে পেতে ফেলে নুড়ি চাপা দেওয়া—তারপর দু'চারখানা উড়িয়ে দিয়ে তাদের পেছন পেছন দৌড়োনো?

তখনো কালাচাঁদ হাঁফাচ্ছিল। এরকম ক্যাশিয়ারি করতে থাকলে—হপ্তাখানেকের ভেতর রাজরোগ সত্যি সত্যিই ধরবে তাকে। এখনো বুক ধড়ফড় করছে। একটু দম নিয়ে কালাচাঁদ বললো, অ্যাতো সুন্দর হাওয়া, রোদ্দুর। তার ভেতর ডাক্তারের আদেশ তো মানতেই হবে শরৎ ভাই।

হাওয়া বদল মানে অ্যাতো দৌড়োদৌড়ি? বাঁধে উঠে দেখি—সার দিয়ে কাগজপত্তর পেতেছেন। তারপর একখান দু'খান উড়িয়ে দিয়ে তাদের পেছন ছুটছেন।

ওদের আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই ঘুরি। উল্টেপাল্টে দেখি শরৎ।

কি জানি!

সন্ধ্যে সন্ধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরে দেখলো, নৃসিংহ মেসো আর অ্যাকাউন্টেন্টবাবু তার জন্যে বসে আছে। ঘরে বস্তা নামিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লো কালাচাঁদ। তখন ওরা দু'জন শুকনো কড়কড়ে নোট গুনতে বসলো।

শরৎ গাড়োয়ান নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে। অফিসঘর চুপচাপ। দুজন অফিসঘরে বসে কোন শব্দ না করে আলাদা আলাদা গুনে চলেছে। রোদে ভাজা শুকনো কড়কড়ে সব নোট। গোনা গাঁথা যোগাযোগ শেষ হতে হতে রাত ন'টা। হাই উঠছিল কালাচাঁদের। সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নৃসিংহ মেসো তার পিঠে চাপড় দিতেই কালাচাঁদ লাফিয়ে উঠলো।

বোসো। বোসো। পয়লা দিনেই ন'লাখ সতের হাজার তিনশো পাঁচ টাকা শুকিয়ে এনেছো। কনগ্র্যাচুলেসনস্! এই তো চাই।

একথা শুনে কালাচাঁদ চেয়ারের ভেতর গুটিয়ে গেল। তাহলে তো প্রায় মাস দুই লেগে যাবে এ কাজে। আমায় ছেড়ে দিন মেসো। আমি বাড়ি যাব।

কেন? দিব্যি সি-সাইডে ঘুরে আসবে রোজ। টেবিলে বসে রোজ আঁক কসতে হচ্ছে না—আবার পুরো মাইনেও পাবে!

একাজ আর ক'দিন করলেই টি বি হয়ে যাবে আমার।

পরিষ্কার টাটকা বাতাসে গিয়ে টি বি হয় কারও!

আমার হবে। আমায় ছেড়ে দিন।

কি হয়েছে—খুলে বলবে তো।

লাখ লাখ টাকার দায়িত্ব। নোটগুলো পেতে তাতে নুড়ি কুড়িয়ে চাপা দেওয়া—একখানা একখানা করে নোটের ওপর—মাজায় ব্যথা হয়ে গেছে—তার ওপর একখানা নোট বাতাসে উড়ে গেল তো দশ মিনিটের রিলে রেস—তবে তো নেট পাকড়াও করা যাবে—চাই কি জলেও ভেসে যেতে পারে।

বেশ তো—রোজ ছ'লাখের বেশি নোট নিও না। তিন বস্তা নোট নাও—আরেক বস্তা আমি অন্য জিনিসে ভরে দেব।

আপনি অন্য লোক দেখুন।

বাড়ি চল। খাবে এখন। তারপর দেখা যাবে—

খাওয়া দাওয়ার পর কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কালাচাঁদের। নিয়মমত তালে কাছেই কী যেন পেটানো চলছে।

নৃসিংহ মেসোর দেওয়া ছোট টর্চটা জ্বেলে পাশেই আলো ফেললো কালাচাঁদ। এ কি? মেসো তো বিছানায় নেই। এ কি রে বাবা। জানলার বাইরের অন্ধকার আকাশ বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে গেছে।

সাবধানে আলো ফেলে উঠোনের দিকে এগোলো কালাচাঁদ। ও কে বসে? হাতুড়ি উঠছে—পড়ছে। খুব সাবধানে আলো ফেলেই নিভিয়ে ফেললো।

তুমি আবার উঠলে কেন? যাও শুয়ে পড়োগে—। কাল আবার বেরোতে হবে তোমায়—

আপনি কি করছেন?

কিছু খোয়া ভেঙে রাখছি। বাড়ি তৈরির সময় মিস্ত্রিরা এসব রেখে গিয়েছিল। এক বস্তা এই খোয়া নিয়ে যাবে। তাহলে আর নুড়ি কুড়োতে হবে না।

পরদিন সকালে চচ্চড়ে রোদ উঠলো। কালাচাঁদও সকাল সকাল রওনা হয়ে গেল। ব্যাঙ্ক খোলার আগেই। বাঁধে পৌঁছে হাতঘড়ি দেখলো কালাচাঁদ। স'এগারোটা। কষ্ট হলো ভাঙা খোয়া বোঝাই বস্তা নিয়ে বাঁধে উঠতে। নোটগুলোকে শোয়ানো, খোয়ার চাপান সারতে সারতে প্রায় সাড়ে বারোটা। এ-রোদে বসতে হলে চাই মাথার ওপর ছায়া।

বুদ্ধি করে মাথায় দেবার তালপাতার টোকাটা শরৎ গাড়োয়ানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল কালাচাঁদ। সেটা মাথায় দিয়ে বস্তা পেতে বসলো সে। বঙ্গোপসাগরের দিকে পেছন ফিরে। টোকার দৌলতে পিঠে সাগরের ভিজে হাওয়ার ঝাপটা—আর মাথায় রোদ লাগবে না।

কখন যে কালাচাঁদ এই আরামে ঘুমিয়ে পড়লো—তা সে টের পেল না। বসে বসেই নুড়ির ঢিবিতে বস্তা ঢাকা দিয়ে সেই কাতে হেলে পড়ে তার চোখ বুজে এলো। ঘড়ি ধরে তো ঘুমোনো যায় না।

গভীর ঘুমের ভেতর কিসের ধাক্কায় কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে জেগে গিয়ে সে উঠে বসলো। তার সামনে অদ্ভুত পোশাকে—অদ্ভুত চেহারার একজন লোক দাঁড়িয়ে। পেছন ফিরে দেখলো—একই পোশাকে একই ধরনের চেহারার আরও তিনজন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওদের পেছনেই বঙ্গোপসাগরের বুকে অদ্ভুত চেহারার একটা ছোটখাটো জিনিস ভাসছে। কালাচাঁদ কাগজে ছবি দেখেছে—ওটা নিশ্চয় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলার। শাদা রংয়ের ওপর কালো

নড়বার চেষ্টা কোরো না

হরফে কিসব লেখা। বোধহয় ইংরাজিতে। কাছে এলে পড়ে ফেলতে পারতো কালাচাঁদ।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সে। অমনি চারজন তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। গায়ে বর্মের কায়দায় পোশাক। বুকে, পায়ে–সব জায়গাতেই তাই। মাথায়ও তাই। কোমর থেকে ওরা পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়েছে। শরৎ গাড়োয়ান নিশ্চয় এখন তার গাড়িতে ঘুমোচ্ছে। ষাঁড় দুটো ছাড়া পেয়ে দিব্যি চরে বেড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে। কিন্তু বাঁধের ওপারে আমার চিৎকার তো এখন পৌঁছবে না।

কালাচাঁদের মুখ দিয়ে পরিষ্কার বেরিয়ে এলো, কি গেরো!

সংগে সংগে বর্মপরা একজন মুখ খুললো, পরিষ্কার বাংলায়, নড়বার চেষ্টা কোরো না। নড়েছো কি এই নল থেকে একটা বুলেট বেরোবে–সংগে সংগে সব শেষ।

আজ্ঞে আমি নড়ছি না। দেখুন তো নড়ছি কিনা?

বর্মের ভেতর থেকে একজন একটু হাসলো। আন্দাজে ঠোঁট দেখে কালাচাঁদের তাই মনে হলো। বর্ম বললো, একটু কাঁপছো। অত ভয় পাবার কিছু নেই।

কালাচাঁদ প্রায় ককিয়ে কেঁদে উঠলো, দয়া করে শুকোতে দেওয়া নোটগুলো নেবেন না। তাহলে আমার ক্যাশিয়ারির চাকরিটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমায় জেলে গিয়ে পচতে হবে। আর কোথাও কোনদিন চাকরি পাবো না। নৃসিংহ মেসোরও জেল হয়ে যাবে–

পিস্তল উঁচিয়ে সেই বর্ম জানতে চাইলো, নৃসিংহ মেসো কে?

কালাচাঁদ দেখলো, বাকি তিন বর্ম তার দিকে তাকিয়ে। সে আস্তে কুঁথে কুঁথে বললো, আজ্ঞে মেসো আমার এখানকার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বানে ভেজা নোট আমায় বিশ্বাস করে মেসো শুকোতে পাঠিয়েছে। দয়া করে ওসব নোট নেবেন না। সবই ব্যাঙ্কের। নিলে আমি মরে যাবো। মেসোকে মুখ দেখাতে পারবো না। কাল সারারাত তিনি খোয়া ভেঙেছেন উঠোনে বসে।

কালাচাঁদ কেঁদেই ফেললো। চার বর্ম এগিয়ে এসে

কালাচাঁদের পিঠে হাত বোলালো। কেঁদো না। কেঁদো না বলছি। খোয়া ভাঙলো কেন মেসো? আঃ! কেঁদো না বলছি।

এবারের ধমকে কাজ হলো। চোখ মুছে কালাচাঁদ বললো, নোট চাপা দেবার নুড়ি কুড়োতে কুড়োতে মাজা ব্যথা হয়ে যায়। তাই মেসো নিজেই সারারাত ধরে–

ওঃ! তা শোন। আমরা টাকা পয়সা লুট করতে আসিনি।

দয়া করে লুট করবেন না। আমি একা চারজনকে আটকাতে পারবো না।

বলছি তো। থামো।

থেমেও কালাচাঁদ চারদিক দেখে একটুও স্বস্তি পেল না। ভাঙা ঢেউগুলোর মাথায় ট্রলারটা দুলছে। চকচকে রোদের ভেতর বর্মে ঢাকা চার মূর্তিকে অন্য গ্রহের লোক মনে হবে। তবে কথা বলছে বাংলায় এই যা ভরসা। কালাচাঁদ জানে, এখনো কোন বাঙালী মহাকাশে যায় নি।

দমকা বাতাসে খোয়া চাপানো একশো টাকার নোটগুলো আধশুকনো অবস্থায় বাতাসের সংগে একটানা পত্‌পত্‌ শব্দ করছে। চারিদিক নির্জন খাঁ খাঁ।

কালাচাঁদ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। আপনারা কারা জানি না স্যার! একখানা নোটও এদিক ওদিক হলে মেসো আমায় ছাড়বে না।

কেঁদো না বললাম। চারজন একসংগে ধমকে উঠলো। কালাচাঁদ নিজের কান্না গিলে খেল।

প্রথম বর্ম হেসে বললো, একখানা নোটও আমরা সরাবো না।

এ কথায় কালাচাঁদ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাহলে স্যার?

আমরা তোমায় অনেক নোট দেব। টাটকা–আনকোরা–একদম সদ্য সদ্য ছাপানো।

আপনারা নোট ছাপান স্যার?

বেশি প্রশ্ন কোরো না। আজ দু'দিন ধরে তোমাকে আমরা লক্ষ্য করছি।

কোত্থেকে স্যার? আমি তো এখানে সারাদিন বসে থাকি। আপনাদের তো দেখিনি।

দেখার কথা নয়। ওই জাহাজে বসে বাইনাকুলারে তোমার সবকিছু আমরা দেখেছি। কাল তুমি বাতাসে উড়ে যাওয়া নোটের পেছন পেছন অনেক দৌড়েছো।

নৃসিংহ মেসো আমায় বিশ্বাস করে একাজের ভার দিয়েছেন। দৌড়োবো না?

নিশ্চয় দৌড়োবে। এখন চলো তো আমাদের জাহাজে–

নোট পাহারা দেবে কে? যদি উড়ে যায়?

উড়লে আমরা তো আছি। যে ক'টা উড়বে আমরা দিয়ে দেব। বলে দ্বিতীয় বর্ম হাসলো।

সে হাসির কোন মানে না বুঝে কালাচাঁদ ওদের সংগে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এ জল ভেঙে যাবো কি করে?

কোন ভয় নেই। হাঁটুজলের বেশি নয়।

না। আমি যাবো না। শেষে ভেসে যাবো।

আমরা তো আছি। বর্মসুদ্ধ জল আমাদের ভাসাতে পারবে না। সেজন্যেই তো বর্ম পরা! বলতে বলতে ওরা চারজন কালাচাঁদকে প্রায় চ্যাংদোলা করে জলের ওপর দিয়ে নিয়ে চললো। কালাচাঁদ চোখ বুজে ফেললো। তার পায়ের জুতোর গোড়ালি ছুঁয়ে ঢেউয়ের ফেনা জলে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ট্রলারটার ঝোলানি সিঁড়িতে পা দিয়ে তবে কালাচাঁদের স্বস্তি। সবার আগে ওপরে উঠে তার মনে হলো–এটা তো মাছ ধরার ট্রলার নয়। মাছের কোন গন্ধই নেই এখানে। অনবরত একই ধরনের একটা শব্দ ট্রলারের ভেতর থেকে আসছিল। ওরা চারজন ওপরে উঠে ভিজে বর্ম খুলে ফেললো।

ভেতরে চলো। ভেতরে চলো ভাই।

ভেতরে গিয়ে দেখলো, এটা একটা ছোটখাটো দোতলা জাহাজ। বর্মওয়ালারা বর্ম খোলায় কালাচাঁদ সহজ হয়ে এলো। তবে ওদের মতলব কিছুই বুঝতে পারলো না। চারজনই তার চেয়ে বেশ বড়। চল্লিশের কাছাকাছি।

ভেতরে কাচের ঘরে ওদের চারজনের সংগে বসলো কালাচাঁদ। দূরে বালিয়াড়ি জুড়ে নোট চাপা দিয়ে শোয়ানো–দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে মাটির উঁচু বাঁধ। নির্জন খাঁ খাঁ।

আমায় এখানে আপনারা আনলেন কেন স্যার? আমি তো কিছু করিনি। আপনারা পুলিস?

না।

আপনারা কারা?

সবই দেখতে পাবে এখন। ধীরে–ভাই ধীরে–

আমায় তো নোট গুছিয়ে বস্তাবন্দী করে ফিরতে হবে স্যার।

তোমায় আর শুধুমুদু নোট বস্তাবন্দী করতে হবে না। আমরা গুছিয়ে নেবো।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো কালাচাঁদ। ওরে বাবা! তাহলে আমি মরে যাবো। সব নোট মিলিয়ে মিলিয়ে হিসেব দিতে হবে মেসোকে। গোনাগাঁথা নেই সব।

আমরাই গুনে গেঁথে দেবো।

ও সব্বনাশ। দয়া করে স্যার আমায় ধনে প্রাণে মারবেন না। দোহাই স্যার।

ঠিক হয়ে বোসো। তোমায় আর নোট গুছোতে হবে না। নোট পেতে ইট চাপা দিয়ে শুকোতেও হবে না।

তার মানে?

ভিজে অবস্থাতেই নোটগুলো আমরা নিয়ে নেব।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো কালাচাঁদ। আমায় বাঁচান স্যার–

থামো বলছি। তার বদলে তোমায় আমরা বস্তাবন্দী তাজা কড়কড়ে নোট দেব।

তা যদি দশ টাকা বিশ টাকার নোট হয়?

তা হবে কেন? নিচে চল। নিজের চোখে দেখে নাও।

কালাচাঁদের তো চক্ষু চড়কগাছ

নিচে গিয়ে কালাচাঁদের তো চক্ষু চড়কগাছ। কাঠের পাটাতনে থাক থাক একশো টাকার নোট সাজানো। দোতলা জাহাজের সিলিং অব্দি। একদম নতুন চকচকে। আর সেই অবিরাম একটানা শব্দের কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল কালাচাঁদের কাছে। একটা দামী ঝকঝকে মেশিনে একশো টকার নোট ছাপা হচ্ছে। দু'জন মেশিন-ম্যান মন দিয়ে কালির অবস্থা দেখছে।

কালাচাঁদের ভিরমি খাওয়ার দশা। মনে মনে বললো, এ কোথায় এলাম। এখানে নোট জাল হয়। এরা তো জালিয়াৎ। মুখে বললো, শুনেছিলাম, নাসিকে নোট ছাপা হয়?

নাসিকেই তো হয়।

তাহলে?

আমরা ভাই আগে স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারির কোশ্চেন ছাপতাম।

জাহাজে?

হুঁ। এসব কোশ্চেন তো মাঝসমুদ্রেই ছাপা হত। আমরা বছর পাঁচেক আগে একবার বেতন বৃদ্ধির দাবিতে স্ট্রাইক করি। তখন ক্যাপ্টেনের কাছে ওয়ারলেসে খবর এলো, লক আউট কর। জাহাজে ছাপা বন্ধ করে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে এসে জাহাজ ভেড়াও।

তারপর?

সে অর্ডার আমরা পাত্তাই দিলাম না। মাছ ধরতে ধরতে শ্রীলঙ্কা হয়ে ভারতের ম্যাপ ধরে সেই বিখ্যাত দন্ত-স-এর ডগায় গিয়ে হাজির। খাটুনীই সার। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর চষে যখন পোরবন্দরে গিয়ে হাজির—তখন দেখি সামুদ্রিক মাছ মাত্র একটাকা কিলোয় বিকোচ্ছে সেখানে। রাগে রাগে সব মাছ সমুদ্রে ফেলে দিলাম। হাতে নেই পয়সা। চুপচাপ বন্দরের ন'নম্বর জেটিতে বসে আছি—এমন সময় বিকেলের দিকে দুই কারিগর এসে হাজির। সঙ্গে ঝোলায় যেন কিসব জিনিস। তারা শুদ্ধ বাংলায় বললো, আমাদের নেবেন। আমাদের কোন জায়গা নেই।

গোড়ায় ভালো লাগলো না। হাজার হোক ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির ভেসেল। গায়ে তখন লেখাও ছিল—সি ইউ ভেসেল। জানতে চাইলাম—তোমরা কোথাকার?

ওরা বললো, আমরা নাসিক থেকে আসছি। পায়ে হেঁটে। আমাদের সংগে নোট ছাপানোর ছাঁচ আছে। যদি একটা প্রেস পেতাম।

মনে মনে আমরা তো লাফিয়ে উঠলাম। তারপর ওদের গম্ভীর হয়ে বললাম–এসো। ওরা দু'জন ভেতরে ঢুকে প্রেস দেখেই তো তিনলাফ। তুড়ি দিয়ে দিয়ে। বললাম–কী হলো ?

এখুনি জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে চল।

কিন্তু নোট ছাপবে যে–কাগজ কোথায় ? স্পেশাল কাগজ লাগে। তারপর কিছুটা লালচে রংও তো লাগে।

ভাবনা নেই। আমাদের সংগে দু'দিস্তে কাগজ আছে। রিট্রেঞ্চ করেছিল আমাদের–আসার সময় কাগজ আর ছাঁচ হাতিয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

রং ? রং পাবে কোথায় ?

রং-এর পড়তা আমরা জানি। নোটই তো ছাপতাম আমরা। একশো টাকার একশো খানা নোট ছাপার কালচে কালিতে প্রমাণ সাইজের একটা পান একশো কুড়ি নম্বর পিলাপাতা জরদা দিয়ে খেয়ে চারবার পিক ফেলে কালিটা ঘুটে নিলেই সাম সাম পড়তা এসে যায়। এই করেই তো আমরা নোট ছাপতাম আর অক্সব্লাড লাল কালিটা নাসিক বাজারে ঝেড়ে দিতাম। দুটো পয়সা হত তাতে। ধরা পড়ে রিট্রেঞ্চ হলাম। হাতে পয়সা নেই কোন। অথচ একশো কুড়ির জরদা দিয়ে পান খাওয়া হ্যাবিট হয়ে গেল। সংগে অবিশ্যি ক'টা পান আছে। দেখি, আপনারা সরেন তো–বলেই ওরা দু'জন জরদা দিয়ে ভালো করে দু'টো পান সেজে মুখে পুরলো। খানিকক্ষণ চিবিয়ে দু'জনে গুনে গুনে চারবার পানের পিক ফেললো কালির ডিব্বায়। তারপর সে কালি ঘুটে নিয়ে ওরা কোশ্চেন ছাপার রোলারে সে কালি মাখালো ভালো করে। শেষে কয়েকখানা স্পেশাল কাগজ ঝোলা থেকে বের করে প্রেসের বেডে মেপেঝুঁকে বসালো। দশ মিনিটের ভেতর দু'শোখানা একশো টাকার নোট। যে টাকার জন্যে আমরা হন্যে হয়ে মাছ ধরে ধরে জলে ভাসছি–সে টাকা হাতের মুঠোয়! ভাবো ?

ওরা দু'জনেই বুঝি তারা ?

হুঁ। ওরা কয়েক মাসে তা কয়েক কোটি টাকার নোট ছেপেছে।

কাগজ, পান, জরদা এসব পান কোত্থেকে ?

কালাচাঁদের একথায় লোকটা খুব একচোট হো হো করে হাসলো। থেমে বললো, মাস খানেক অন্তর একবার আমরা এলাহাবাদের গংগায় গিয়ে ভিড়ি।

এলাহাবাদে ?

হুঁ। জাহাজ ভিড়লে আমাদের একজন চলে যায় লখনউ, আরেকজন জামশেদপুর–একজন যায় এলাহাবাদের একটা প্রেসে।

কেন ?

লখনউর ক্যানটনমেন্ট বাজার থেকে আসল জরদা কেনা হয়। জামশেদপুরের সাকচি বাজার থেকে কেনা হয় পাঁচ বিড়ে বিলকুলি পান পাতা, সুপুরি। আর এলাহাবাদের ওদের প্রেস থেকে আসে নোট ছাপার দশ দিস্তে কাগজ আর তিন ডিব্বা কালি। ওরাই তো নাসিক প্রেসকে অর্ডার সাপ্লাই করে। জানো, এখন আমরা সবাই পান খাই! ডিব্বা পিছু আট পিক লাগে। ডিব্বা পিছু দু'জনের পিক। তারপর কালিটা ভালো করে ঘোটো। ব্যস! এক কোটি টাকার একশো টাকার নোট ছাপতে এইতো পড়তা। পাঁচ বিড়ে বিলকুলি পান পাতা, দু'শিশি লখনউর আসল জরদা, তিন ডিব্বা কালি আর দশ দিস্তে কাগজ।

এ প্রেস অ্যাতোটা সইতে পারে ?

ব্রিটিশ আমলের গ্লাসগো মেশিন। খুব জবরদস্ত। এই মেশিনেই নাইনটিন থার্টি টু অব্দি বি. এ, বি এস সি-র কোশ্চেন ছাপা হত। একটা পান খাও ভাই।

দিন। জরদা কম করে দেবেন।

পড়তা মতই দিচ্ছি। একটা ছোট ডিব্বা আছে আলাদা। তাতে চারবার পিক ফেলবে। লাখ পঞ্চাশেক টাকার একশো টাকার নোট ছাপার কালি হয়ে যাবে।

পান খেয়ে সেই ছোট্ট ডিব্বায় গুনে গুনে চারবার পিক ফেললো কালাচাঁদ। তারপর কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। ভিজে নোটগুলো বালিয়াড়িতে শুকোচ্ছে। উরি

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক।

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধশতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ— অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

ব্বাস! এ তো বিকেল হয়ে গেল। আমি এক্ষুণি ফিরে যাবো। নয়তো অন্ধকার হয়ে যাবে।

কোন চিন্তা নেই ভাই। বলে চারজনই আবার তাদের বর্ম পরে নিল। সংগে নিল শুকনো একবস্তা নোট। জলে নেমে বললো, ভয় নেই ভাই—এবার মাটিতে পা ফেলে চলো। হাঁটু জল মাত্তর।

কালাচাঁদ দেখলো, ওদের একজনের কাঁধে শুকনো নোটের সেই বস্তা। সে-ই হেসে বললো, তীরে পৌঁছেই আমাদের নোটের বস্তাটা নিয়ে তোমার একবস্তা নোট দেবে ভাই। ছোট ছোট গঞ্জে ভিড়ে আমাদের নোট দিয়ে সাবান সোডা কিনি। তারপর ভাঙানী নিয়ে পরের গঞ্জে ভিড়ে হোটেলে ভাত খাই। জিনিসপত্তর কিনি। এবার আমরা অন্তত কিছুকালের জন্যে সে ঝামেলা থেকে বাঁচবো।

একথা শুনে কালাচাঁদের মাথা টিপ টিপ করতে লাগলো! এ তো নৃসিংহ মেসোর সংগে জালিয়াতি। অসম্ভব। এ আমি পারবো না। হাঁটু জল বলে হাঁটু জল। কালাচাঁদকে ভাসিয়ে নেবার যোগাড় করলো ঢেউগুলো। জলে চোরা টান পায়ের দিকে। মুখে বললো, জরদাটা কড়া ছিল। মাথা ঘুরছে। ও বর্ম দাদারা! আমি আর পারছি নে—

বলেই কালাচাঁদ গা আলগা দিল। অমনি তার পা বেঁকে গিয়ে কালাচাঁদ জলে পড়লো। পয়লা বর্ম তাকে ঘাড় ধরে টেনে তুললো। ততক্ষণে যা করার তা করা হয়ে গেছে কালাচাঁদের।

তার বেঁকে যাওয়া পা গিয়ে জলের নিচে সেই লোকটার পায়ে ল্যাঙ মারলো। কালাচাঁদকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওরা দেখলো, শুকনো নোটের বস্তাটা পা-হড়কানো বর্মের কাঁধ থেকে জলে পড়ে গিয়ে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভাসতে ভাসতে চলেছে—আর আগাগোড়া ভিজে উঠছে।

সংগে সংগে পয়লা বর্ম চেঁচিয়ে বললো, ওকে ডাঙায় তোল। আমি বস্তা দেখছি। বলেই পয়লা বর্ম জলে ঝাঁপ দিল—বস্তা ধরতে।

বাকি তিন বর্ম কালাচাঁদের কাঁধ খামচে ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে তীরে নিতে গেল। চারিদিকে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কাঁধের ব্যথার জায়গাটায় হাত দিয়েই লাফিয়ে উঠলো সে।

দাঁড়িয়ে দেখে তার হাতে মস্ত বড় এক সামুদ্রিক কাঁকড়া উঠে এসেছে কাঁধ থেকে। এটাই এতক্ষণ কামড়াচ্ছিল তাহলে—দাঁড়া দিয়ে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কোথায় সি ইউ ভেসেল! সব ভো ভাঁ!!

নষ্ট করার সময় নেই একটুও। নিচু হয়ে রোদে শুকোনো নোটগুলো বস্তায় ভরতে লাগলো। চার হাত পায়ে।

নয়তো—শরৎ গাড়োয়ানও চাই কি উঠে আসতে পারে বাঁধে।

ছবি: অলয় ঘোষাল

হক কথা

মুস্তাফা নাশাদ

ওহে বাপু আমওয়ালা
একটু দাঁড়াও ভাই।
ল্যাঙড়া আম বলে চেঁচাও—
অন্য আম কি নাই?

আমের রাজা বলতে বাবু
বোঝায় ল্যাঙড়া আম!
মিষ্টি-মধুর রসাল আর—
বলার মতো দাম।

দামের কথা পরে হবে
জানতে আগে চাই,
সত্যিকারের ল্যাঙড়াই যে—
প্রমাণ কী তার ভাই?

বাবুর আমার শুনলে কথা
হেসেই মরে যাই।
ল্যাঙড়া বলে পায়ে হাঁটে না,
মাথায় ঘোরে তাই!

ছবি: দিলীপ দাশ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

তোমরা নিশ্চয়ই খুব খুশি। এতোদিন ধরে শুকতারার পুজো সংখ্যা চাইছিলে তোমরা। এবার পেলে। কেমন লাগলো জানিও কিন্তু।

বছরের মধ্যে এই মাসটাই বোধহয় সব থেকে আনন্দের। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো—কেমন নীলে নীল। তার ওপর সাদাটে মেঘগুলো পাখির মতো ডানা মেলে উড়ছে। দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। তারই সঙ্গে যেন তাল দিয়ে মাথা নাড়ছে কাশ ফুলে ভরা গাছগুলো। শহরের বাইরে গেলেই দেখতে পাবে সবুজের সমারোহ। মাঠে মাঠে সবুজ ধান গাছের ওপর কাঁচা সোনা রংয়ের রোদ্দুরের যেন লুকোচুরি খেলা। কী যে ভালো লাগে।

ভোরবেলায় শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর শিউলি ফুলের ঢল। তার মিষ্টি গন্ধে শরতের সকালে মন ভালো হয়ে যায়। সকালবেলায় শিউলি আর সন্ধ্যেবেলায় হাসনুহানার গন্ধ বাগান মাতিয়ে রাখে। তারই মাঝে চোখে পড়বে দোপাটি, জবা, টগর, অপরাজিতা আর জিনিয়া ফুল।

পুজোর জন্যেই বুঝি প্রকৃতিও সাজে এমন অপরূপ সাজে। এই আশ্বিন মাসেই (এবার অবশ্য কার্তিক মাসে পুজো), ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপুজো করেছিলেন। দুর্গার বরে বলিয়ান হয়ে তিনি রাক্ষসরাজা রাবণকে বধ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অকালে মায়ের আরাধনা করেছিলেন বলে আশ্বিন মাসের এই পুজোকে অকাল বোধন বলা হয়। আশ্বিন মাসের দশমীর দিন শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ করেছিলেন। সেইদিন সারা ভারতে 'দসেরা' উৎসব পালন করা হয়। রাবণের একটি বিরাট মূর্তি তৈরি করা হয়। বিশাল সেই মূর্তিটা থাকে বাজিতে ঠাসা। সেই বাজিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দুমদাম শব্দে বাজি ফাটে। রাবণও পুড়ে যায়। কলকাতাতেও দসেরায় রাবণ পোড়ানো হয় তবে দিল্লি-টিল্লিতে মস্ত বড় করে এই উৎসব হয়। সেদিন তো আমাদের সময়ই থাকে না। ঠাকুর বিসর্জন। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়া করা।

সত্যি পুজো আসছে আসছেই ভালো। এসে গেলে কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে যায় বোঝাই যায় না। প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে গিয়ে ঠাকুর দেখতে দেখতেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর দিন কেটে যায়। তারপরই মন খারাপ। পুজোর জন্যে আবার এক বছরের প্রতীক্ষা।

এই মাসটা সব দিক দিয়েই ভালো লাগে। নতুন জামা-কাপড়। নতুন বই। কতো গল্প, মজার মজার উপন্যাস। সে সব পড়তে পড়তেই ছুটির দিনগুলো শেষ। এগিয়ে আসে কালীপুজো, ভাইফোঁটা তারপর জগদ্ধাত্রী পুজো। কি মজা তাই না!

আকাশের তারা দেখতে ভালো লাগে বলে তোমাদের অনেকেই চিঠি দিচ্ছো। সত্যি তারা চেনা ভারী মজার খেলা। এখন তো রাতের আকাশ ঝকঝকে। মেঘ টেঘ নেই। এখন যদি রাত্তিরে আকাশের দিকে তাকাও তা'হলে কি দেখবে বলো দেখি? প্রথমেই চোখে পড়বে ছায়াপথ। আকাশের ঠিক মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে। উত্তর পশ্চিম আকাশে আর সপ্তর্ষি মণ্ডলকে দেখতে পাবে না। পাবে না ক্রতু আর পুলহ নক্ষত্রকেও। তেমনি পশ্চিম আকাশ থেকে কন্যা রাশিও চোখের আড়ালে চলে যেতে চলেছে। পুব আকাশে দেখতে পাবে মীন আর মেষ রাশি। এ মাসের নাম আশ্বিন কেন জানো তো? মেষ রাশির অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম থেকেই এই মাসের নাম আশ্বিন।

আজ তাহ'লে এই পর্যন্তই। পুজো আসছে ভালো থেকো সকলে। আদর আর ভালোবাসা নাও।

দাদুমণি

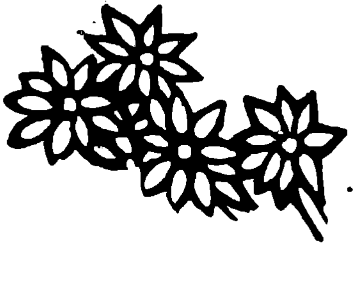

তোমাদের পাতা

সুপ্রতিম চৌধুরী, বয়স আট
বালিচেলা প্রাইমারী স্কুল
সেনারি-জামশেদপুর

মা আসছেন

নীল নীল ঐ আকাশ দেখে
খুশিতে মন নাচে,
মা আসছেন বছর পরে
ছেলেমেয়েদের সাথে।
পরবে সবাই নতুন জামা
নতুন নতুন শাড়ি,
পাঁচদিন পরে মা আবার
যাবেন শ্বশুরবাড়ি।

সুপর্ণা চৌধুরী, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
লরেটো স্কুল, শিয়ালদহ, কলকাতা

স্বপ্নপুরী

ঠিক দুপুরে তালপুকুরে
যেই দিয়েছি ডুব,
আজব ব্যাপার, বিরাট পুরী,
লোকলস্কর খুব।
গগনপথে উড়ছে গরু,
হাঁটছে অলি তলে,
মানুষগুলো উল্টো হয়ে
হাঁটছে দলে দলে।

সুস্মিতা দত্ত, বয়স নয়, ষষ্ঠ শ্রেণী
শ্রীদুর্গা বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া

পূজার দিনে

শরৎ এলো ফুরফুরিয়ে
খুশির নিশান দেয় উড়িয়ে,
দুর্গাপূজার বাদ্যি বাজে
খোকা খুকী নতুন সাজে।
মণ্ডপেতে বসছে মেলা,
ঘুরছে কত নাগর দোলা।
চলছে পূজা দর-দালানে,
খুশির আমেজ সবার প্রাণে।
বৌ-ঝিয়েদের ভিড় যে খালি,
সবার হাতে পূজার ডালি।
দুই পুরুতে উচ্চস্বরে,
মায়ের পূজার মন্ত্র পড়ে।
হঠাৎ নেচে উঠলো ঢুলি,
কাঁপিয়ে ঢোলের পালকগুলি।
এবার বুঝি হবে বলি,
তার পরেতেই পুষ্পাঞ্জলি।
সবার শেষে প্রণাম করে,
প্রসাদ নিয়ে ফিরবে ঘরে।

মঞ্জিষ্ঠা বসু।
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
সেন্ট জন্ ডায়োসেশন গার্লস স্কুল
কলকাতা

হরিদ্বারের হনুমান

আমি, বাবা, মা ও ভাই পূজার ছুটিতে হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। ধর্মশালার ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যেত। ছাদে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতে আমার খুব ভালো লাগত।

একদিন আমি ছাদে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছি। বাবা ভাইকে নিয়ে দোকানে গেছেন। মা ঘরে বাক্স গোছাচ্ছেন। হঠাৎ আমার মনে হলো কে যেন আমার চুলের ফিতে ধরে টানছে। আমি ভাবলাম ভাই বোধহয় ফিরে এসে দুষ্টুমি করছে। আমি 'এই ভাই, কী হচ্ছে?' বলে পিছন ফিরে দেখি, একটা বাচ্চা হনুমান দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। ওর মা কাছেই ছিল। সে বোধহয় ভাবল আমি ওর বাচ্চাকে মারছি। মা হনুমানটাও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসে আমাকে আঁচড়ে দিল। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে নিচে ছুটলাম। আমার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল। তারপর রিক্সা করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তখনও কাঁদছি। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? হনুমান তো ভাল কথাই বলছিল। ও বলছিল, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। তাহলে পুজোর ছুটি ফুরোলেও আর ইস্কুলে যেতে হবে না। পড়াশুনো করতে হবে না। গাছে গাছে থাকবে, ফল খাবে।'

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। আমারও এত হাসি পেল যে আমি কান্না ভুলে গেলাম।

শর্মিলা মুখার্জী, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়

সেই দেশ

আমি সেই দেশেতে যাব–
যেথায় সবাই হাসে, সবাই নাচে, সবাই গাহে গান,
যেথায় আছে বাঁশির সুরে মন মাতানো তান,
যেথায় শুধু সোনার আলোয় উচ্ছ্বসিত প্রাণ
আমি সেই দেশেতে যাব।

মাঠে মাঠে ফসল ফলে, পুকুর ভরা জল,
পথের ধারে গাছের সারি মিষ্টি তারই ফল,
দ্বেষ হিংসা নেইকো সেথায়, নেই চাতুরী ছল
আমি সেই দেশেতে যাব।

জয়দীপ আচার্য
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী, জামশেদপুর

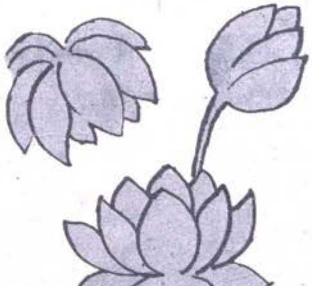

শরৎ

একঘেয়ে বর্ষা গেল
শরৎ গেল এসে,
দোপাটি আর শিউলি ফোটে
মাঠ ভরে যায় কাশে।
নীল আকাশের তুলো মেঘে
পুজোর খবর ঐ,
মা দুর্গা আসছে এবার
ঢাকীরা সব কই?
পুজোর গন্ধে আকাশ বাতাস
মেতে আছে সদা,
দোকান বাজার কেনাকাটা
ভিড় হয়েছে গাদা।
শরৎ দেবীর পুজোর সময়
করব মোরা পণ,
ঝগড়াঝাঁটি করব না আর
শান্তি রাখব সারাক্ষণ।

বিশ্বজিৎ দে
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন, হাওড়া

কোথায় হারায়

আমের গাছে ধরে মুকুল,
পথের ধারে ঝরে বকুল,
কৃষ্ণচূড়া লালে লাল,
এই নিয়ে হয় মোর সকাল।
বিকেল বেলায় নানান কাজে
এদের আমি পাই না খুঁজে।

সোমা রায়
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা

শর্মিলা দাস
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী
ডি.পি.টি. গার্লস হাইস্কুল
দুর্গাপুর

মানসকুমার চক্রবর্তী
বয়স ষোলো
মোংলাপোতা উচ্চ বিদ্যালয়
পাথরতোড়িয়া, মেদিনীপুর

দেবব্রত হাজরা
বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়
খড়গপুর

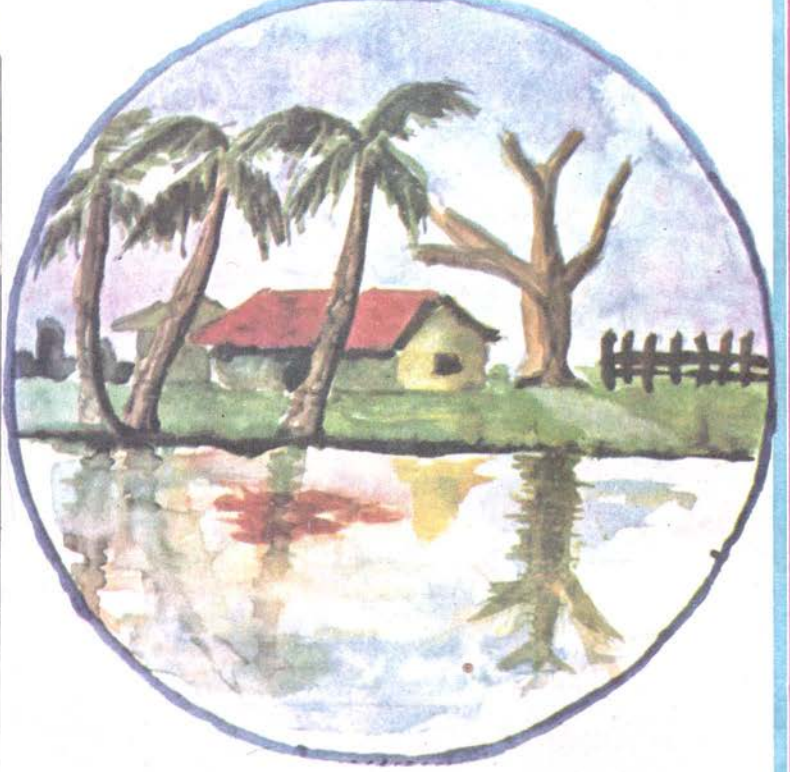

রূপক ঘোষাল বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, কালাচাঁদ হাইস্কুল, আড়িয়াদহ

প্রতীতি ব্যানার্জী বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, দমদম কলকাতা

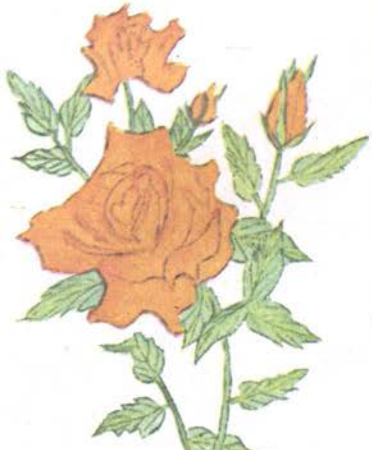

উজ্জ্বল সিন্‌হা
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী
খাসজিরসা, ধানবাদ

বাহাদুর বেড়াল

আর একটা আয়না আঠা দিয়ে সাঁটলেই আমার পেরিস্কোপ তৈরি হয়ে যাবে।
ফলের বাগান প্রবেশ নিষেধ
আমি এটা দিয়ে গেঁদুবাবুর ফলের বাগানে একবার উঁকি দিয়ে দেখি।
ওর কুকুর পাহারা দিচ্ছে! পেরিস্কোপ না থাকলে জানতেই পারতাম না!
চমৎকার, বাহাদুর! বড় ম্যাচ দেখার জন্য ঠিক এই জিনিসটাই আমার দরকার!
দারুণ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি!
ফুটবল উত্তরপাড়া বনাম দক্ষিণপাড়া
কিন্তু ও এখানে আমাকে দেখতে পায় নি!
হোঃ হোঃ!
আমার পেরিস্কোপ ছিনতাইয়ের জন্যে এটাই ওর পাওনা!
পাজিটাকে তুমি উচিত শিক্ষা দিয়েছো বাহাদুর। তাই তুমি ভেতরে এসো এবং ম্যাচ দেখো!

ছবিতে রূপকথার গল্প
সিন্দারেলা
অনেক,অনেকদিন আগের কথা। এক ব্যবসায়ী আর তাঁর মেয়ে একটি শহরে থাকতেন। মেয়েটি খুব ভালো। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তার মিষ্টি স্বভাব। কিন্তু বেচারির মা নেই। অনেকদিন পরে সেই ব্যবসায়ী আবার বিয়ে করলেন। কাজের জন্যে তাঁকে নানা জায়গায় যেতে হতো।
অনেক সময় এক বছর, দু বছর কিংবা তারও বেশি তিনি দেশের বাইরে থাকেন। সেবারও তিনি একদিন অনেক দূরের এক দেশে চলে গেলেন।
মেয়েটির নতুন মা কিন্তু মোটেই ভালো না। যেমন দুষ্টু তেমনি হিংসুটে। তাঁর আবার দুটি মেয়ে। তারাও মায়ের মতো বদ।
অন্যকে কষ্ট দিয়েই ওদের আনন্দ। মেয়েটি দারুণ দেখতে। কতো গুণ তার। নতুন মার দুই মেয়েকে দেখতে মোটেই ভালো না। তেমন কাজেরও নয় তারা। তাই নতুন মার যতো রাগ সব ঐ সৎ মেয়ের ওপর। বাড়ির সব কাজই তিনি তাকে দিয়েই করান।
বাড়ির কাজ করা ছাড়াও তাকে তার দুই সৎবোনের সব কাজও করে দিতে হতো। তারা শুতো সুন্দর ঘরে পালকের বিছানায়। আর ওর জন্যে শুধু একটা ভাঙা-চোরা খাট। শক্ত বিছানা। দিন রাত হাড়ভাঙা খাটুনি, মা আর দুই বোনের বকুনি খেয়েও কিন্তু সে সব সময় হাসিখুশি থাকে। কাউকে কিচ্ছু বলে না।
সব কাজ শেষ হয়ে গেলে সে রান্নাঘরের এক কোণে গিয়ে বসে। সেখানে ডাঙকরা ছাই আর আধপোড়া কয়লা (ইংরাজিতে সিন্ডার বলে)। ওখানে বসে থাকে বলে ওকে সকলে সিন্দারেলা বলে ডাকে। সেদিন সিন্দারেলাদের বাড়িতে দারুণ হৈচৈ।
াজবাড়ি থেকে নেমন্তন্নর চিঠি এসেছে। রাজ ুমার সেই শহরের সক্কলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সক্কলে রাজবাড়ি যাবে। নাচ, গান
হবে। খাওয়াদাওয়া হবে। সিন্দারেলার কাজ বেড়ে গেলো। তার দুই সৎ বোনকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে হলো তাকে। চুল আঁচড়ে ফুল গুঁজে দিতে হলো। এতো সব করে দেওয়া সত্ত্বেও বোনরা সিন্দারেলাকে না নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রাজবাড়িতে চলে গেলো। সিন্দারেলা খুশি মনেই বোনদের বিদায় জানালো।
তারপরই মনের দুঃখে কেঁদে ফেললো।

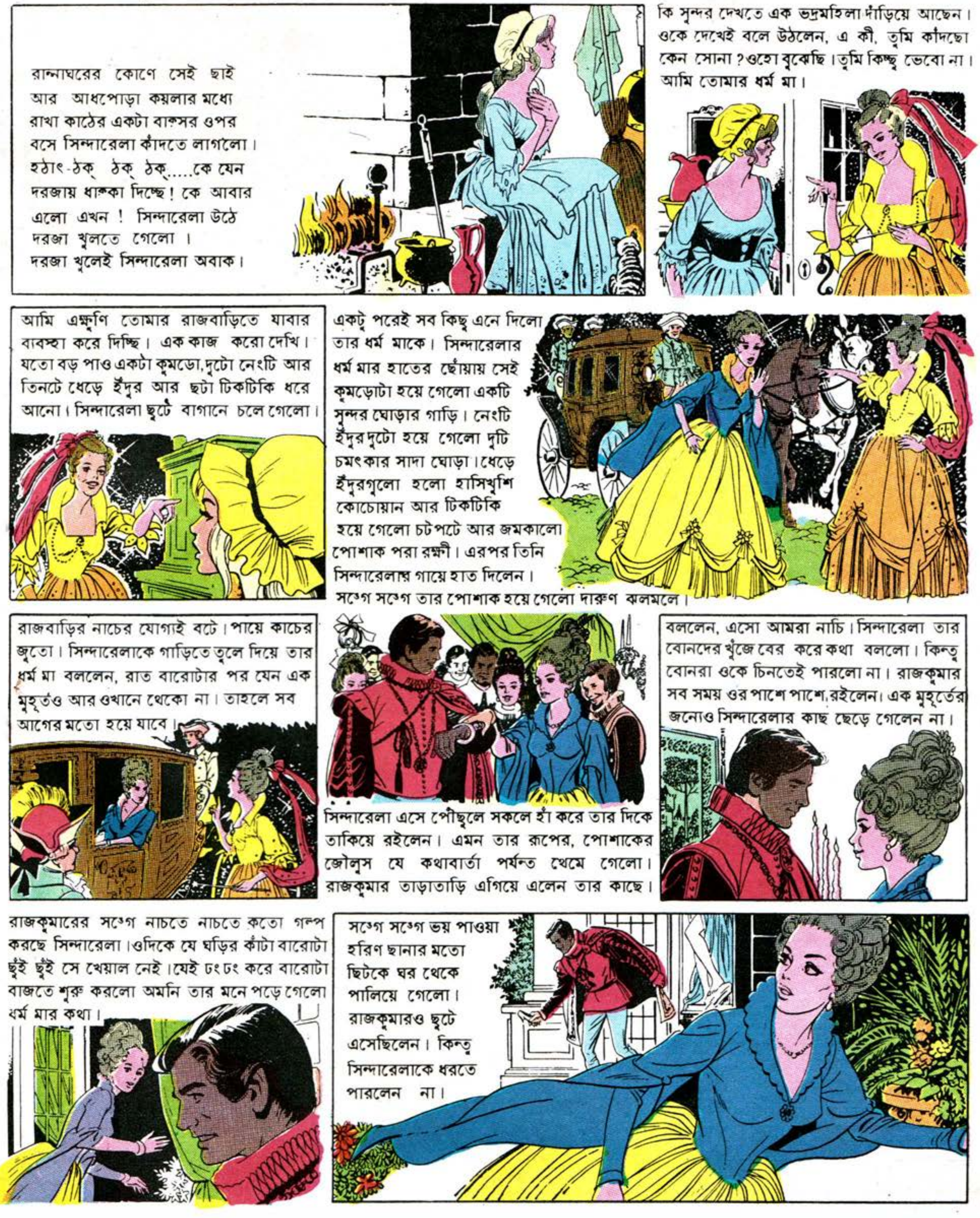
রান্নাঘরের কোণে সেই ছাই আর আধপোড়া কয়লার মধ্যে রাখা কাঠের একটা বাক্সর ওপর বসে সিন্দারেলা কাঁদতে লাগলো। হঠাৎ-ঠক্ ঠক্ ঠক্.....কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! কে আবার এলো এখন! সিন্দারেলা উঠে দরজা খুলতে গেলো। দরজা খুলেই সিন্দারেলা অবাক।
কি সুন্দর দেখতে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখেই বলে উঠলেন, এ কী, তুমি কাঁদছো কেন সোনা? ওহো বুঝেছি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি তোমার ধর্ম মা।
আমি এক্ষুণি তোমার রাজবাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এক কাজ করো দেখি। যতো বড় পাও একটা কুমড়ো, দুটো নেংটি আর তিনটে ধেড়ে ইঁদুর আর ছটা টিকটিকি ধরে আনো। সিন্দারেলা ছুটে বাগানে চলে গেলো।
একটু পরেই সব কিছু এনে দিলো তার ধর্ম মাকে। সিন্দারেলার ধর্ম মার হাতের ছোঁয়ায় সেই কুমড়োটা হয়ে গেলো একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি। নেংটি ইঁদুর দুটো হয়ে গেলো দুটি চমৎকার সাদা ঘোড়া। ধেড়ে ইঁদুরগুলো হলো হাসিখুশি কোচোয়ান আর টিকটিকি হয়ে গেলো চটপটে আর জমকালো পোশাক পরা রক্ষী। এরপর তিনি সিন্দারেলার গায়ে হাত দিলেন।
সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাক হয়ে গেলো দারুণ ঝলমলে।
রাজবাড়ির নাচের যোগ্যই বটে। পায়ে কাচের জুতো। সিন্দারেলাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তার ধর্ম মা বললেন, রাত বারোটার পর যেন এক মুহূর্তও আর ওখানে থেকো না। তাহলে সব আগের মতো হয়ে যাবে।
সিন্দারেলা এসে পৌঁছুলে সকলে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন তার রূপের, পোশাকের জৌলুস যে কথাবার্তা পর্যন্ত থেমে গেলো। রাজকুমার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন তার কাছে।
বললেন, এসো আমরা নাচি। সিন্দারেলা তার বোনদের খুঁজে বের করে কথা বললো। কিন্তু বোনরা ওকে চিনতেই পারলো না। রাজকুমার সব সময় ওর পাশে পাশে রইলেন। এক মুহূর্তের জন্যেও সিন্দারেলার কাছ ছেড়ে গেলেন না।
রাজকুমারের সঙ্গে নাচতে নাচতে কতো গল্প করছে সিন্দারেলা। ওদিকে যে ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁই ছুঁই সে খেয়াল নেই। যেই ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে শুরু করলো অমনি তার মনে পড়ে গেলো ধর্ম মার কথা।
সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়া হরিণ ছানার মতো ছিটকে ঘর থেকে পালিয়ে গেলো। রাজকুমারও ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু সিন্দারেলাকে ধরতে পারলেন না।

ওদিকে ছুটতে গিয়ে সিন্দারেলার পা থেকে সুন্দর এক পাটি জুতো ছিটকে বেরিয়ে গেলো। রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন সেটি। রাজকুমার হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, কী সুন্দরই না জুতোটা। অমন জুতো তিনি কোনো দিন দেখেন নি। অবাক হলেন। ঠিক করলেন, জুতো যার তাকে যে করেই হোক খুঁজে বের করবেন তিনি।
সিন্দারেলা ছুটছে। তার গাড়ি নেই, কোচোয়ান নেই, রক্ষী নেই, সুন্দর পোশাক নেই। এক পাটি জুতো হারিয়ে গেছে। অন্য পাটিটি সে ধরে আছে বুকের কাছে।
রাজকুমারের কাছে একপাটি জুতো রয়েই গেলো। কয়েকদিন পরে রাজকুমার ঘোষণা করলেন যে ঐ জুতো যার পায়ে ঠিক ঠিক ভাবে হবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন।
প্রথমে সব রাজকুমারী, তারপর বড় বড় বাড়ির মেয়েদের পরানো হলো সেই জুতো। কিন্তু কারো পায়েই হয় না। বড় হয়, নয়তো ছোট। সেই রাজ্যে যত মেয়ে ছিলো
সবার পায়েই পরানো হতে লাগলো জুতোটা। একদিন রাজার লোক জুতোটা নিয়ে সিন্দারেলাদের বাড়ি এলেন। পরালেন ওর দুই বোনকে। হলো না। তখন তাঁর চোখ পড়লো সিন্দারেলার দিকে। ছেঁড়া পোশাক,
তবু কি সুন্দরই না দেখতে। বললেন, আরে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন? পরে দেখো। বলে নিজেই তার পায়ে জুতোটা পরিয়ে দিলেন। জুতোটাও ঠিক হলো। হবেই তো! ও তো সিন্দারেলারই জুতো।
আর ঠিক তখনই সিন্দারেলার ধর্ম মা সেখানে এসে হাজির। এসেই ছুঁয়ে দিলেন সিন্দারেলাকে। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দারেলা রাজকুমারীর মতো সুন্দরী হয়ে গেলো।
দুই বোন তো অবাক। সিন্দারেলাই তাহলে সেই ভোজসভার সুন্দরী। হিংসেয় জ্বলতে লাগলো তারা।
রাজবাড়ি থেকে দারুণ সুন্দর একটা গাড়ি এসে গেলো সিন্দারেলাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই গাড়িতে চেপে সিন্দারেলা চলেছে রাজবাড়িতে।
© Copyright by STRIP ART FEATURES
সিন্দারেলা রাজবাড়িতে এলে সক্কলে এগিয়ে এলেন। রাজকুমার তো খুব খুশি। ক'দিন পরেই রাজকুমারের সঙ্গে সিন্দারেলার বিয়ে হয়ে গেলো।
চার্লস পাররল্টের গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছেন ফ্রাংক বোল্ট।

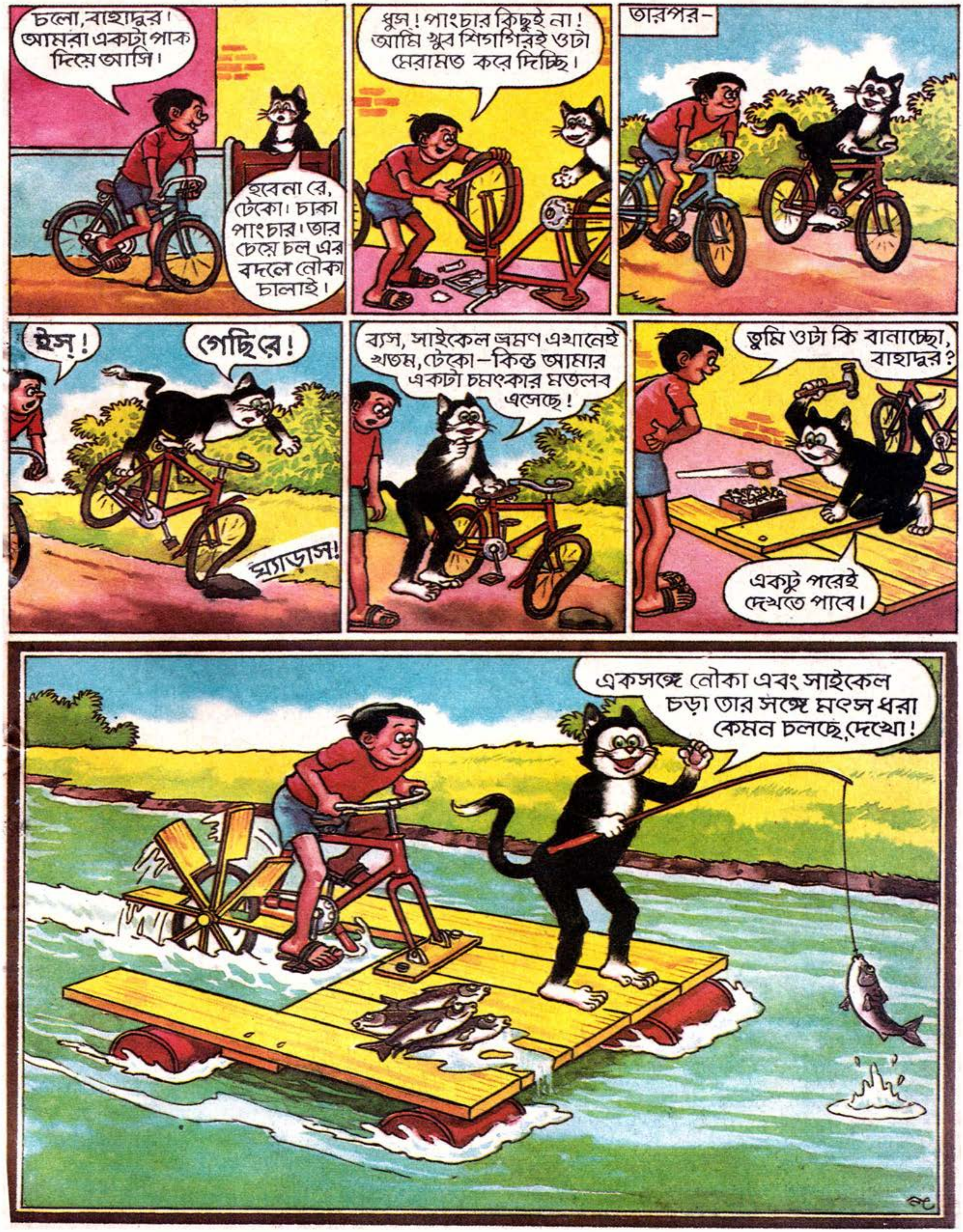
চলো, বাহাদুর। আমরা একটা পাক দিয়ে আসি।
হবেনা রে, টেকো। চাকা পাংচার। তার চেয়ে চল এর বদলে নৌকা চালাই।
ধুস্! পাংচার কিছুই না! আমি খুব শিগগিরই ওটা মেরামত করে দিচ্ছি।
তারপর–
ইস্!
গেছিরে!
ঘ্যাড়াস!
ব্যস, সাইকেল ভ্রমণ এখানেই খতম, টেকো–কিন্তু আমার একটা চমৎকার মতলব এসেছে!
তুমি ওটা কি বানাচ্ছো, বাহাদুর?
একটু পরেই দেখতে পাবে।
একসঙ্গে নৌকা এবং সাইকেল চড়া তার সঙ্গে মৎস ধরা কেমন চলছে, দেখো!

চামড়ার নৌকোয় আটলাণ্টিক পার

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

চামড়ার নৌকো? নিশ্চয়ই ভাবছ, লোকটার মাথায় ছিট আছে; নইলে এমন বিদ্ঘুটে কথা কেউ বলে! কাগজের নৌকো, শালতি নৌকো, কাঠের নৌকো—সব বাদ দিয়ে কিনা চামড়ার নৌকো। চামড়ার তো জুতো হয়, কিন্তু নৌকো—এমন কথা তো কখনই শোনা যায় না। নাঃ, কখনও শোনা যায় নি, এমন কথা বলা যায় না। আর একটু খুলে বলতে গেলে, সেই আদ্যিকালের কথা। ইতিহাসের ভাষায় ষষ্ঠ শতাব্দী। আইরিশ সাধু সেন্ট ব্রেনডান সত্যি সত্যিই একটা চামড়ার নৌকো বানিয়েছিলেন। বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি, তাইতে করে একদল শিষ্য নিয়ে আটলাণ্টিক সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। ল্যাটিন পুঁথি-পত্তরে এই ব্যাপারে বিস্তর লেখা-জোকা আছে। এক হিসেবে, বলতে গেলে, কলম্বাসের হাজার বছর আগে, আর ভাইকিংদের চারশো বছর আগে সেন্ট ব্রেনডান—সাত বছর ধরে নানা দ্বীপ টহল দিয়ে আমেরিকায় যান, আবার আমেরিকা থেকে ওই নৌকোতেই ফেরত আসেন আয়ার্ল্যাণ্ডে।

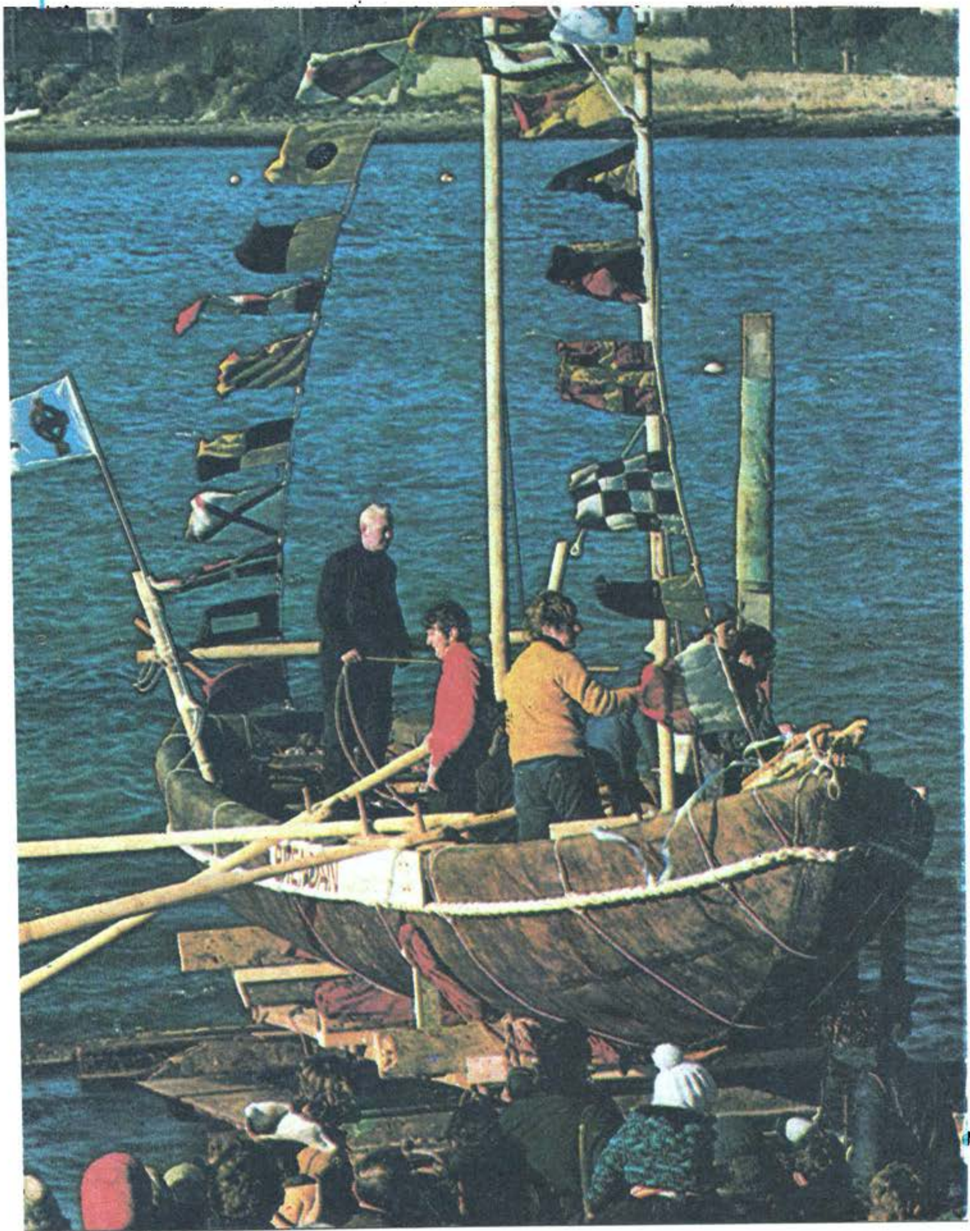

অকসফোর্ডে করা, হার্ভার্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হার্কনেস ফেলো' টিম সেভেরিন নামে এক ভদ্রলোক একটি ল্যাটিন পুঁথি পড়ে এই ব্যাপারটা জেনে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। চামড়ার নৌকোয় আটলাণ্টিক, এ কী অসম্ভব কথা! তিনি ব্রেনডান সম্পর্কে আরও খোঁজখবর যোগাড় করতে লেগে গেলেন।

মানচিত্র দেখতে বসলেন। ব্রেনডান আয়ার্ল্যাণ্ডের হেব্রিডেস থেকে ফারোস, ফারোস থেকে আইসল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড— সেখান থেকে ল্যাব্রাডর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকায়। উত্তর ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় যাওয়ার এইটাই শর্টকাট। ভাইকিংরা এই পথ দিয়েই যাতায়াত করত। সবই তো হলো, কিন্তু চামড়ার নৌকোয় তিনি গেলেন কী করে? চামড়া তো সমুদ্রের নোনা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। ব্রেনডানের পুঁথিপত্রে নৌকোটা কীভাবে

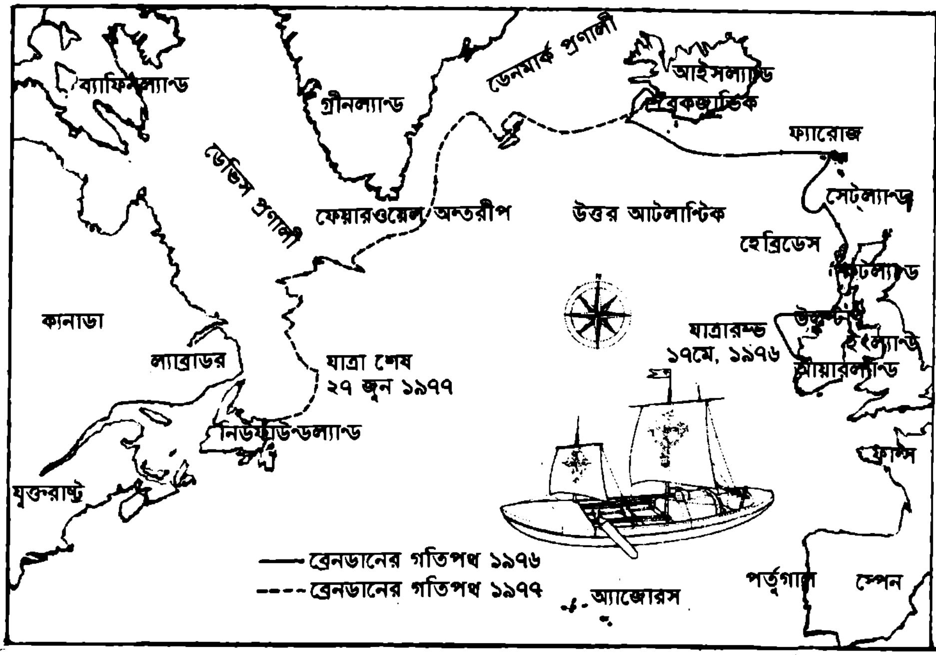

১৭ মে, ১৯৭৬ থেকে ২৭ জুন। ১৯৭৭ ব্রেনডান এই পথে চলেছিল।

তৈরি হয়েছিল, তারও হিসেব-নিকেশ দেওয়া আছে। এখন, চামড়ার নৌকো বানিয়ে আটলান্টিকে ভাসা সম্ভব কি না দেখতে গেলে, ব্যাপারটা নিজেকেই পরখ করতে হয়। অতএব, টিম এবার চামড়ার নৌকো বানাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

প্রথমেই গেলেন লন্ডন লাইব্রেরিতে। চামড়ার ঐতিহাসিক ব্যবহার সম্পর্কে নানা রকম বই পড়তে পড়তে তিনি বারবার যে নামটি পেলেন, সেই নামটি হলো জন ওয়াটারার। তিরাশি বছর বয়েস এই চর্ম-বিশেষজ্ঞের। তাঁর সংগে টিম দেখা করতে, তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চামড়ার নৌকো বানানো সম্ভব, এবং আটলান্টিক পাড়ি জমানোও সম্ভব।' জন তাঁকে পাঠালেন বিখ্যাত চর্ম-বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট শিকেশের কাছে। ডক্টর শিকেশ সব শুনে জনের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন হ্যারল্ড বার্কিনের। হ্যারল্ড সারা পৃথিবীতে বাছাই করা চামড়া বিক্রির ব্যবসা করেন।

এরপরই শুরু হলো নৌকো বানাবার চামড়া সংগ্রহ করা। মুশকিল হলো এক জায়গায়, ব্রেনডানের নৌকোয় যে চামড়া ব্যবহার হয় তা ট্যান করা হয়েছিল ওক গাছের ছাল দিয়ে, কিন্তু ওক গাছের ছাল আজকাল আর পাওয়াই যায় না! শেষ অবধি, ডক্টর শিকেশ ওক গাছের ছাল যোগাড় করলেন। সবই হলো, এবার দরকার একটা ডিজাইন। কলিন ম্যুডি ও প্যাট্রিক এলাম–সোপ্রানিনো নামে ছোট্ট একটি ইয়ট-নৌকোয় ১৯৫০ সালে আটলান্টিক পার হয়েছিলেন। তিনি সব দেখে শুনে বললেন, 'চামড়ার নৌকো অসম্ভব কিছু নয়। ল্যাটিন পুঁথিপত্র অনুসরণ করে আমি ডিজাইন বানিয়ে দিচ্ছি–কিন্তু এটা কী করে চলবে আমি জানি না। এই ধরনের নৌকো চালাবার জ্ঞান এখন আর কারুর নেই–কাজেই, সে বিদ্যে তোমাকেই অর্জন করতে হবে'।

ক্রসহেভেন বোট ইয়ার্ডে ষষ্ঠ শতাব্দীর নকশা অনুসারে টিম সেভেরিনের 'ব্রেনডান' নৌকো তৈরি হলো। কাঠের ফ্রেমে উনপঞ্চাশটা ষাঁড়ের চামড়া থেকে টুকরো জুড়ে, কেটে, সেলাই করে। চামড়ার 'হালে' আগাগোড়া চর্বি লাগিয়ে। ১৭মে ১৯৭৬–টিম, ব্রেনডান ক্রিক থেকে তাঁর এই দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। সংগী চারজনঃ জর্জ মোলোনি, রলফ হ্যানসেন, আর্থার বুটস ও ট্রোনডুর পাটুর্সন। চারজনেরই অবসর সময়ে নৌকো নিয়ে যত্রতত্র ভ্রমণের বাতিক বেশ প্রবল, এবং নাবিকী কাজকর্মও তাদের বেশ ভালই জানা।

এখন নৌকোটা দেখতে হলো কেমন? বেশ কায়দাদুরস্ত। আগাগোড়া চামড়ায় তৈরি একটা বিরাট ভাসমান কলার মতো! কাঠের ফ্রেমে চামড়ার পুরু তোশক এঁটে দিলে, ঠিক যেমনটি হয়–তেমনই। মজার নৌকো হলেও, এতে কিন্তু বিপদ অনেক। যেমন, ঢেউয়ের ধাক্কায় চামড়া ফেটে যেতে পারে, চামড়ার

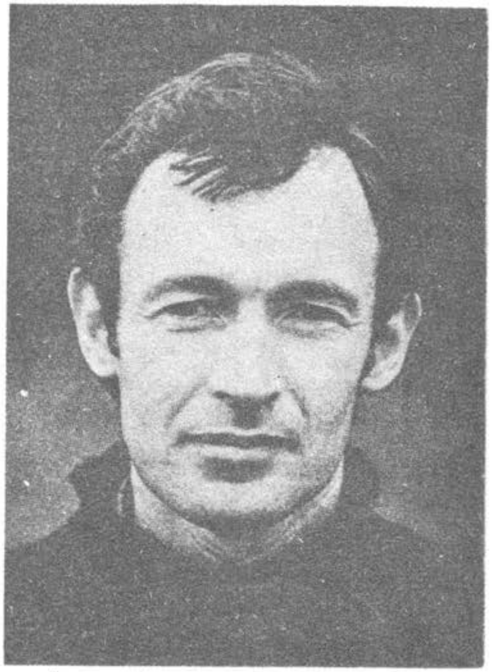
টিম সেভেরিন: ব্রেনডান-এর প্রধান নাবিক।

সেলাই ছিঁড়ে যেতে পারে, নৌকোর নিচে 'কীল' না থাকায় এলোমেলো ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে ওটা ধাঁ করে উলটে যেতে পারে। কিন্তু, টিম আর সংগী-সাথীরা ওসব ভয়-ভাবনা করলেন না। তাঁরা নৌকোটা নিয়ে দিব্যি ভেসে পড়লেন।

নতুন বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৭-এর গোড়ার দিকে ব্রেনডান মোটামুটি চলেছে। খুব একটা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়তে হয় নি। ঠিক তিমি মাছের মতোই নৌকোটার চালচলন, কিন্তু একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ল সবার, নৌকোর মুখ ঠিক যেদিকে ঘোরানো হয়, ঠিক তার উলটো দিকে নৌকোটা সরে যায়! ব্যাপারটা কী ধরার আগেই, ব্রেনডান পড়ল এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র এলাকায়। বিরাট বিরাট ঢেউ দেখে মনে হলো এই বুঝি নৌকোটা ওলটালো, না—শেষ অবধি কিন্তু ওলটায় না, ঢেউগুলোই যেন নৌকোটাকে নিয়ে খেলা করে।

প্রথম ঢেউটা এতো ধীরে ধীরে নৌকোটাকে ওপরে তুলে নিয়ে যায় যে মনে হয় যেন একটা গোটা যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, তারপরই আর একটা ঢেউ ওটাকে সট করে প্রথম ঢেউয়ের মাথা থেকে নিজের মাথায় টেনে আনে। অবিরাম এই দম আটকানো খেলায় নাবিকদের প্রাণ ভয়ে খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়। এইভাবেই একদিন জর্জ লক্ষ্য করলেন তাঁদের নৌকো সামনের দিকে না গিয়ে পেছন দিকে চলছে তরতর করে!

অন্য দিকে, ঝড়ের দাপটে পালের দড়ি-দড়া সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। কী করা যায়? জর্জ আবার একটা মতলব বের করলেন, নৌকোর সামনের দিকটা তিনি পেছনে, আর পেছনের দিকটা করে দিলেন সামনে—ব্যস, আর কোনো সমস্যা রইল না দিগ্‌নির্ণয় করতে! ব্যাপারটা অবশ্য বিদ্‌ঘুটে হলো, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর নৌকোর নকশাতে সবই তো একটু বিদ্‌ঘুটে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও, ব্রেনডানের নৌকোর রহস্য যেন অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হলো।

এইভাবে ঝড়ের প্রথম ধাক্কা সামলানো গেল। এখনও ৩,000 মাইল পথ বাকি। মাঝে মাঝে কৌতূহলী তিমি মাছের ছানা-পোনারা নৌকোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে লাগল। ১৩ মে অবধি বেশ ভালই কাটল। তারপরই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ১৬ মে'র পর থেকে শুরু হলো অনবরত বৃষ্টি কুয়াশা আর হিম। একটা তেরপল দিয়ে পুরো নৌকোটা ওরা ঢেকে দিলেন। পশ্চিমের হাওয়া ধরে চলতে গিয়ে দেখা গেল ব্রেনডান দুর্দান্ত বেগে উত্তরের দিকে ছুটে চলেছে। কোনো মতেই আর সামলানো যাচ্ছে না।

ব্রেনডান থেকে ঠিক নব্বুই মাইল দূরে গ্রীনল্যান্ডের বরফে ঢাকা পূর্বাঞ্চল। এখনও অবধি আশপাশে জল আছে, আর কিছু দূরে গেলেই বরফের সংগে ধাক্কা অনিবার্য। ২0 মে খবর এলো সকাল বেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে এক ঝড়-তুফান ছুটে আসছে। খবর আসার ঘণ্টাখানেক পরেই বিরাট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল নৌকোর ওপর—নৌকোর অর্ধেক জলে ভরে যেতে, সবাই মিলে পাম্প চালিয়ে জল ছেঁচে ফেলত ব্যস্ত হলেন।

আরও খানিকক্ষণ পর প্রচন্ড গর্জনে আর একটা ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৌকোর মধ্যে। জলের ঘূর্ণিতে ভেসে উঠল স্লিপিং ব্যাগ থেকে রান্নার জিনিসপত্র অবধি। এদিকে বই ভাসছে, ওদিকে ম্যাপ, আর একদিকে রেডিও। অদম্য সাহসে ওই চার নাবিক আবার জল ছেঁচে চললেন, মাঝে মাঝে একজন গিয়ে ঢেউয়ের মাথার ওপর নৌকোটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে জল ছেঁচে বের করার পর আবার একটা ঢেউ! অর্থাৎ আরও এক ঘণ্টা জল ছেঁচা। কিন্তু এইভাবে জল ছেঁচে কতক্ষণ চলবে? হঠাৎ টিমের

মনে পড়ে গেল, তেরপলের বদলে চামড়া দিলে কেমন হয়? নৌকোর মধ্যে বাড়তি কিছু চামড়া আছে! মিনিট পনেরোর মধ্যে চামড়ার একটা চাদর নৌকোর ছাউনির সঙ্গে বেঁধে একেবারে মজবুত করে সেলাই করে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একটা ঢেউ। এবার কিন্তু সেই ঢেউ চামড়ার চাদরের ওপর দিয়ে আর এক পাশে গড়িয়ে পড়ল নৌকোর মধ্যে আর ঢুকতে পারল না। এইভাবে চলল ১৮ জুন অবধি। আশ্চর্যের ব্যাপার, এতো দুর্যোগের মধ্যেও ব্রেনডানের গতি কিন্তু ব্যাহত হয় নি।

সেই দিনই বিকেলে চারজনেই চমকে উঠলেন।

ক্র্যাক...ক্র্যাক...ক্র্যাক...

আশপাশ থেকে কিছু একটা ভেঙে পড়ার আওয়াজ, এবং আওয়াজটা বেশ জোরেই হচ্ছে। জর্জ মুখ বাড়িয়েই আঁতকে উঠলেন। ব্রেনডান প্রচন্ড গতিতে বরফের ওপর ধাক্কা মারছে! আর বরফগুলো আশপাশ থেকে চাড় খেয়ে ভেঙে পড়ে নৌকোর চারপাশে গোল হয়ে ভাসছে।

টিম চেঁচালেন, 'পাল নামাও! পাল নামাও!'

পাল খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো অবধি ঠান্ডায় জমে যাওয়ার যোগাড়। আশপাশ ঘন অন্ধকারে জমাট। টর্চের আলো ফেলে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা আরও ভয়ংকর–প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বিরাট বিরাট বরফের চাঙড় রাক্ষসের মতো দাঁত বের করে আছে! এই বরফের মধ্যে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।

এঁরা কোনোক্রমে নৌকোর মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, এতো করেও কিছু করা গেল না, ব্রেনডান সোজা একটা রাক্ষুসে বরফের গায়ে এসে ধাক্কা মারল! আর অন্য দিক থেকে, ভাসমান একটি বিরাট বরফের টুকরো ধীরে সুস্থে গড়িয়ে এলো ব্রেনডানের দিকে। সেই সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া বরফের কিছু চাঙড় প্রচন্ড শব্দে ব্রেনডানের ওপর ভেঙে পড়ে তার মাস্তুল প্রায় আটকে দিল।

কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত, আর ঠিক সেই অবসরে আচমকা ছুটে আসা একটি ঢেউ ব্রেনডানকে ঠিক আগের মতোই মাথায় তুলে বরফের আর একপাশে–জলের এলাকায় নামিয়ে দিল!

এইভাবে রাতটা কেটে গেল।

সকালে আরও এক গা-ছমছমে দৃশ্য।

মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর ফাঁকে ফাঁকে জল। স্রোতের ধাক্কায় বরফ কাটাতে কাটাতে ব্রেনডান এগুতে লাগল, তারপরই পড়ল এক ভয়ংকর বিপদের সামনে। বরফ হালকা হয়ে এসেছে, কিছুটা গেলেই খোলা সমুদ্র–ঝড়ও ততটা নেই। জলের এলাকার মধ্যে একটা বরফের পুরু আস্তরণের ফাঁক দিয়ে ব্রেনডান একটু এগিয়েছে–সেই মুহূর্তে বরফের সামনের দিক জুড়ে গেল! পেছনে ফেরারও পথ নেই–সেখানে ইতিমধ্যে বরফের একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে গেছে। দুদিক থেকে বরফের চাপে ব্রেনডান হঠাৎ যেন বরফের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে

চামড়ার নৌকো ব্রেনডান সেলাই হচ্ছে।

জলে পড়ল। তারপরই এক অঘটন। নৌকোর মধ্যে ফোয়ারার মতো জল ঢুকছে! অর্থাৎ কোথাও একটা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। আবার চলল জল ছেঁচে বের করার কঠিন পরিশ্রম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

টিম এবার কানাডিয়ান কোস্টগার্ডের সেণ্ট এ্যাণ্টনি কেন্দ্রে বেতার-বার্তা পাঠালেন। ওপার থেকে জবাব এলো, 'গুজ্‌বে থেকে একুশ ঘণ্টার মধ্যে আইসব্রেকার পৌঁছবে আপনাদের কাছে।'

আরও খবর এলো ওই কেন্দ্র থেকে, যে জায়গায় ব্রেনডান আটকা পড়েছে, ঠিক ওই জায়গাতেই কয়েক দিন আগে কার্সন নামে একটা আইসব্রেকার জাহাজ ডুবে গেছে। কাজেই, এই রকম একটা জায়গা থেকে একটা চামড়ার নৌকো কি ভাবে রেহাই পাবে, সে বিষয়ে কোস্টগার্ডের বেশ সন্দেহ আছে।

সারা রাত ধরে জল ছেঁচতে ছেঁচতে সবাই ছ্যাঁদাটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন, ভোর রাতের দিকে টিম হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নৌকোর এক কোণে ফোসফোর-সেনসের আলো ঝিলিক দিচ্ছে। নৌকোর মধ্যে ফোসফোরসেনসের আলো এলো কী করে? ওইখানেই তাহলে ছ্যাঁদাটা আছে। সবাই মিলে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, আঙুরের মতো ছোট্ট একটি ছ্যাঁদা, আর জলের চাপে চামড়া প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বাটে হয়ে চিরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডুবুরির পোশাক পরে—ফোয়ারার মতো ছিটকে আসা জলের মধ্যে নেমে পড়ে চামড়ার পট্টি লাগিয়ে সেলাই করতে বসে গেলেন। জিরো সেণ্টিগ্রেড ঠাণ্ডায় দুদিন ধরে এই সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ চলল একটু একটু করে।

তন্নতন্ন করে নৌকোটা দেখলেন ওঁরা। না—আর কোথাও কোনো ক্ষতি হয় নি। সেণ্ট এ্যাণ্টনিতে টিম খবর পাঠালেন, 'আইসব্রেকার পাঠাতে হবে না।' আর সমস্ত খবরও তাঁরা জানালেন ওই কেন্দ্রে। এই কদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও, ওই চার নাবিকের মধ্যে তখন নতুন উদ্যম। প্রত্যেকেই বললেন, 'নৌকোটা চামড়ার ছিল বলেই মেরামত করতে পারা গেছে—কাঠ কিংবা ফাইবার গ্লাস হলে ডুবে মরতে হতো।'

না, এর পর, আর কোনো বিপদ হয় নি। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ব্রেনডান, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের পেকফোর্ড আইল্যাণ্ডে নিরাপদেই পৌঁছেছিল।

ছোটদের মনের মত বই

মহাশ্বেতা দেবী
হারে-রে-রে ১২·০০

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
রক্তমাখা গুপ্তধন (২য় সংস্করণ) ৬·০০
সুন্দরবনের শয়তান ৫·০০

প্রফুল্ল রায়
কাবুল আর টাবুল ৭·০০

অনিল ভৌমিক
অদৃশ্য জলদস্যু ৯·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
পাতালপুরী অভিযান ৭·০০

সংকর্ষণ রায়
রক্ত প্রবাল ১০·০০
কাল নাগিনীর আক্রোশ ৬·০০

কবিতা সিংহ
চার পলাতকের কাহিনী ৭·০০

নির্বেদ রায়
মুছে গেল পদচিহ্ন ৮·০০

শচীন দাস
আবিষ্কারের গল্প ৯·০০

নটরাজন
ডানপিটে ভগবান ১০·০০

কমল লাহিড়ী
ভক্তের ভগবান (১ম খণ্ড) ৭·০০
(২য় খণ্ড) ৮·০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
পুস্তক তালিকার জন্য যোগাযোগ করুন

খেলোয়াড়

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ কদিন ধরে প্রিতমের মনে একটা ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছে। এবারের আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তাকে ভাল খেলতেই হবে। এই খেলায় ভাল খেললে রণজি ট্রফিতে সে বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পাবে। তারপর...না, আর ভাবতে পারছে না প্রিতম।

হুগলী মহসিন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র প্রিতম। বাড়িতে খেলাধূলার ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ নেই। অবশ্য মামাবাড়ির কথা আলাদা। একই বাড়িতে অতগুলো বিদ্বান মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। প্রিতম মামাবাড়িতেই শুনেছে মা-ও নাকি পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। অবশ্য প্রিতমও পড়াশুনায় খারাপ নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পড়ার চেয়ে ক্রিকেটই যেন প্রিতমকে বেশি আকর্ষণ করে। কিন্তু সে কথা বলা তো দূরের কথা, যদি কোন রকমে হাবে ভাবেও প্রকাশ পায়, তাহলে মা একেবারে বাড়ি মাথায় করবেন।

এ ব্যাপারে বাবা একেবারে নির্বিকার। বাবার একটা পা একটু ছোট। খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বাবা একটু খুঁড়িয়ে চলেন। প্রিতম দেখেছে চুঁচড়োর যে কোনও মাঠে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হলেই বাবা দেখতে চলে গেছেন। অথচ আশ্চর্য,খেলা চলাকালীন বা পরেও বাবার মুখে কোন আলোচনা নেই, কোন মন্তব্য নেই। যেন দেখতে হয় তাই দেখা।

মায়ের শুধু একটাই কথা, ভালভাবে পড়াশুনা করো। একজন খেলোয়াড়ের জীবন তার ভাল খেলার সময়টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজন বিদ্বান মানুষ সারাজীবন সম্মান পান। প্রিতম নিজেও বোঝে এই বিশাল প্রতিযোগিতার যুগে একমাত্র পড়াশুনায় ভাল হলেই দাঁড়ানো যাবে, নইলে নয়। অবশ্য খুব ভাল খেলোয়াড় হতে পারলেও চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রিতম যদি খুব ভাল খেলোয়াড় না হতে পারে? তবু কী এক আকর্ষণ প্রিতমকে নেট প্র্যাকটিসে নিয়ে যায়। জিতেনদা বলটা ছুঁড়ে দেন প্রিতমের দিকে। ব্যস পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা যেন প্রিতমের মাথা থেকে কর্পূরের মত উবে যায়। বলটা হাতে নিয়ে প্রিতম প্রায় বাউন্ডারি লাইন থেকে ছুটতে শুরু করে। ও পেস বোলার হবার স্বপ্ন দেখে।

জিতেনদারও অনেক আশা প্রিতমকে নিয়ে। নেট প্র্যাকটিসের সময় নানা রকম উপদেশ দেন। প্রতি মুহূর্তে উৎসাহ দেন। এক বিরাট সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখান। সেই সময়টুকু প্রিতম যেন ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু ভাবতে

সংগে সংগে বসে পড়লেন ক্রিজের ওপর।

পারে না। অথচ বাড়িতে ফিরলেই স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মায়ের সামনে দাঁড়ালে মনে হয় ক্রিকেট খেলাটা এক বিরাট অপরাধ।

মুখ নিচু করে প্রিতম পড়ার ঘরে ঢোকে। স্বপ্নগুলো ফিকে হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়। অথচ খেলার জন্য খেলতে গিয়েই সে ইন্টার কলেজে খেলবার সুযোগ পায়। সেখান থেকেই হুগলী জেলার হয়ে খেলে। এখন ওর সামনে এক বিরাট অগ্নি-পরীক্ষা। এই খেলাটা হবে বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলের সংগে বাংলা একাদশের। এই খেলার ফলাফলের ভিত্তিতেই গঠিত হবে নতুন বাংলা দল।

নেট প্র্যাকটিস জোর কদমে চলছে। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। জিতেনদা স্টাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিটি বল লক্ষ্য করছেন। আরেকটু স্যুয়িং করা প্রিতম। গ্রিপটা ভাল করে... ইত্যাদি একের পর এক উপদেশ। কোন ব্যাট্স্ম্যান নেই। শুধু নেটের ভেতরে তিনটে উইকেট পোঁতা। নেটের বাইরে উইকেট কিপিং-এর ভংগিমায় দাঁড়িয়ে আছেন জিতেনদা। উনি যেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সবটুকু অভিজ্ঞতা নিংড়ে ঢেলে দিচ্ছেন প্রিতমকে গড়ে তুলতে। প্র্যাকটিসের শেষে যেন আপন মনেই বলেন, প্রিতম তুই শুধু টাউন ক্লাবের নস, হুগলী জেলারও নস, তুই সমস্ত বাংলার কথা ভেবে খেলবি।

জিতেনদার কথা শুনতে শুনতে কান্না পায় প্রিতমের। উনি তো জানেন না তার মা এসব খেলাধূলা একেবারেই পছন্দ করেন না। প্রিতমকে খেলতে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। বাবা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। বাবা উৎসাহও দেন না আবার নিরাশও করেন না। অথচ খেলা দেখাটা বাবার নেশার মতো। প্রিতম বোঝে না যে মানুষটি এত খেলা পাগল, তার মুখে খেলার কোন কথা নেই কেন! প্রিতম যদি কখনও একটু আধটু আলোচনা করার চেষ্টা করেছে, বাবা শুধু 'হুঁ' বা 'হাঁ' ছাড়া আর কোন জবাব দেননি। প্রিতম নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অবশ্য জিতেনদাকে মাঝে মাঝে বাবার সংগে কথা বলতে দেখেছে। কিন্তু সেখানেও বাবা যেন নির্বাক শ্রোতার ভূমিকায়। বাবাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না প্রিতম। তবে বাবা কোনদিন তাকে খেলাধূলা করতে বারণ করেন নি। হয়ত সেটাই ওঁর উৎসাহ।

সেদিন নেট প্র্যাকটিসের সময় হঠাৎ প্রিতম লক্ষ্য করে মাঠের ধার দিয়ে একটা পা একটু টেনে টেনে এগিয়ে আসছেন একজন মানুষ। এ হাঁটা প্রিতমের খুবই পরিচিত। একসময় নেটের পেছনে এসে মানুষটি দাঁড়ান। বাবাকে নেটের পেছনে দেখে অবাক হয়ে যায় প্রিতম। প্রিতম বল করছে আর তার বাবা নেটের পেছনে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন। ঠিক জিতেনদা যেমন করে দেখেন। এক সময় কথাচ্ছলে জিতেনদা বলেন—মেসোমশায় একটু ব্যাট করবেন নাকি? প্রিতমের কয়েকটা বল খেলুন না!

বাবার দৃষ্টিটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখে একটু হাসির রেখা টেনে বাবা প্যাড গ্লাভ্স্ পরতে থাকেন। প্রিতম বোধহয় এত অবাক কোনদিন হয়নি। বাবার দাঁড়ানোর ভংগি দেখে তো একেবারে আনকোরা মনে হচ্ছে না! তবে কি...

জিতেনদা প্রিতমের হাতে বলটা দিয়ে বলেন—সাবধানে বল করিস, মেসোমশায়ের বহুদিন প্র্যাকটিস নেই, লেগে যেতে পারে। প্রিতম প্রথম দুটো বল অল্প দৌড়ে ছোঁড়ে। কি আশ্চর্য দুটো বলই অদ্ভুতভাবে কভার ড্রাইভ করেন বাবা। প্রিতম যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বলটা হাতে ফিরে আসতেই প্রিতম দেখে ওর বাবা প্রৌঢ় প্রতাপ রায় ওকে কাছে ডাকছেন। প্রিতম কাছে যেতেই উনি বলেন—তুই তোর

সেরা বলগুলোই কর। আমার জন্য ভাবিস না। প্রিতম আস্তে আস্তে বোলিং মার্কের দিকে ফিরে যায়।

পপিং ক্রিজের দিকে ছুটতে ছুটতে প্রিতমের মনে হয় প্রতাপ রায় যেন মৃদু মৃদু হাসছেন। প্রিতম সমস্ত শক্তি দিয়ে বলটা ডেলিভারি করে। মুহূর্তে একটু ডানদিকে হেলে দারুণ জোরে অন ড্রাইভ করলেন প্রতাপ রায়। কিন্তু সংগে সংগ বসে পড়লেন ক্রিজের ওপর। জিতেনদা অবাক চোখে ওর খেলা দেখছিলেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন–মেসোমশায় আপনার লেগেছে? ঋজু দৃষ্টিতে প্রতাপ রায় একবার জিতেনদার দিকে তাকিয়ে বলেন, বয়েস অনেক কিছুই কেড়ে নেয় জিতেন। শরীরে সেই জোর তো আর নেই। খেলছি শুধু অভিজ্ঞতার জোরে।

ব্যাটে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান প্রতাপ রায়। ইশারায় প্রিতমকে কাছে ডেকে বলেন–ফলোথ্রুতে ডিসব্যালান্স্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছিস কেন? নে এবার একটা ক্যাচ ধর তো! বল ডেলিভারির পর নিজের ভারসাম্য বজায় রাখাও একজন ভাল বোলারের দায়িত্ব।

প্রিতম যেন এক অপরিচিত মানুষকে দেখছে। এ যেন ওর বাবা প্রতাপ রায় নয়। মনে হচ্ছে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্রিকেট শিল্পী। প্রিতম ছুটে এসে বল করে। বলটা ব্যাটে লেগে সজোরে ছুটে আসছে তার হাঁটুর দিকে। প্রিতমকে ধরতেই হলো, নইলে হাঁটুটাই জখম হয়ে যেত। কিন্তু বলটা ধরার সংগে সংগে যন্ত্রণায় বসে পড়ে প্রিতম। ওর তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানে খানিকটা ফেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান দিয়ে। এত জোরে আসা বল এর আগে কোনদিন ধরেছে বলে মনে পড়ে না।

ওদিকে প্রতাপ রায়ও বসে পড়েছেন ক্রিজের ওপর। কিন্তু দৃষ্টি প্রিতমের দিকে। তাড়াতাড়ি ব্যাট ফেলে খোঁড়া পা নিয়ে কোনরকমে ছুটতে ছুটতে আসেন। জিতেনদাও ততক্ষণে এসে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি হাতটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় প্রিতমকে। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি প্রতাপ রায়ের দুই চোখে। অপরাধীর মতো মুখ করে বলেন–ইস্‌ আমিই বোধহয় ওর সুযোগটা নষ্ট করে দিলাম। ডাক্তারবাবুর হাত দুটো ধরে কাতর সুরে বলেন, ডাক্তারবাবু যত টাকা লাগে আপনি নিন। আপনি শুধু ওকে তিন চার দিনের মধ্যে ফিট করে দিন। সামনের সপ্তাহে ওর খেলা।

বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনটা বলতে মা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে মায়ের বুক চিরে। টপ্‌ টপ্‌ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে। প্রিতমের কৌতূহলী চোখের দিকে চেয়ে মা যেন পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিতে ফিরে যান।

দারুণ ভাল ছাত্র প্রতাপ রায়ের নাকি ক্রিকেট খেলাই কাল। অবশ্য চাকরিটা ভালই এবং পেয়েছিলেন ভাল ক্রিকেট খেলার সুবাদেই। তবু প্রিতমের মা প্রতাপ রায়কে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন ছেলের সামনে যেন কোনদিন খেলার আলোচনা না করেন। প্রতাপ রায় সেই প্রতিজ্ঞা মেনেও চলেছেন। কিন্তু হলে কি হবে, সেই বাবারই ছেলে প্রিতম। ওর রক্তের মধ্যে ক্রিকেট।

আজ বোধহয় আর স্থির থাকতে পারেননি। তাই ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়েছিলেন। ট্রাংক ভর্তি প্রাইজ মা লুকিয়ে রেখেছিলেন প্রিতমের ভয়ে। আজ আর কোন লুকোচুরি না করে সেগুলো সব মেলে ধরলেন প্রিতমের সামনে। ধুলো মাখা নানা আকারের কাপ মেডেলগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল এক বিস্মৃত ক্রিকেটারকে। ওগুলো দেখতে দেখতে গর্বে বুক ভরে উঠছিল প্রিতমের। শ্রদ্ধায় চোখে জল আসছিল। অস্ফুটস্বরে প্রিতম মাকে জিজ্ঞাসা করে–মা, বাবার পা-টা...

–হ্যাঁ ক্রিকেট খেলতে গিয়েই উনি চোট পান। অনেক দিন প্লাস্টারবন্দী হয়ে ছিলেন। তার পর থেকেই পা-টা একটু টেনে টেনে হাঁটেন।

প্রিতম আস্তে আস্তে বাবার ঘরের দিকে যায়। শান্ত মানুষটি একটা ইংরিজি বই পড়ছেন। প্রিতমকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবার মুখ তুলে তাকান। প্রিতম ওর বাবার পায়ের কাছে বসে বলে, এতদিন তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন বাবা?

বিমর্ষ প্রতাপ রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, তোর মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রিতম। তবে সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারলাম না। সেই সংগে তোরও ক্ষতি করে ফেললাম।

প্রিতম সোজা হয়ে বসে। বাবার হাঁটুতে হাত রেখে বলে, না বাবা আমার কোন ক্ষতি হয় নি। তুমি খোঁড়া পা নিয়ে যদি অত ভাল খেলতে পার, তাহলে আমি হাতে সামান্য একটু ক্ষত নিয়ে খেলতে পারবো না! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো বাবা, আমি নিশ্চয়ই পারবো।

প্রতাপ রায় থরথর করে কেঁপে ওঠেন। চোখে জল টলটল করে ওঠে। মুখে কোন কথা বলতে পারছেন না। শুধু হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে প্রিতমের মাথায় এসে স্থির হয়ে যায়।

ছবি : দিলীপ দাস

ফাদার আলফানসো

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ফাদার আলফানসোকে দূর থেকেই চেনা যায়। পায়ের প্রায় গোড়ালি অব্দি ঝুলছে সাদা আলখাল্লা। কোমরে জড়ানো সাদা দড়ির কোমরবন্ধনী। পায়ে চপ্পল। একমাথা সাদা চুল। সাবাইওর দাস-বাজার ধরে তিনি হপ্তায় দুদিন হেঁটে যান।

মূলগাঁওএর ভাঙা চার্চ বাড়ি থেকে সাবাইওর বাজার অনেকখানি দূর। মাঠ, ঘাট, টিলা, লোকালয় পেরিয়ে তবু এ বুড়ো বয়সেও ফাদারকে নেমে আসতে হয়। পিঠে একটা মশক (জল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য চামড়ার থলে)। বাজারে কেনাকাটা সেরে, ফেরার পথে একটি বিশেষ জলাশয় থেকে মশকে জল ভরে পিঠে বয়ে নিয়ে যান নিজের আস্তানায়।

এত কষ্ট করা কেন! ফাদারের মূলগাঁও গ্রামটিতে কি পুকুর, ঝরণা কিছুই নেই? হ্যাঁ ছিল। এককালে ওখানে গড়ে উঠেছিল একটা বেশ সম্পন্ন গ্রাম। ফাদারের মূলগাঁওতে আসার অনেক অনেক বছর আগে মিশনারীরা এসে ওখানকার গাঁয়ের মানুষদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। পর্তুগীজরা ওখানে বেশ কিছু কাজুবাদামের গাছও লাগায়। কাছে দূরে কয়েকটা টিলা আর পাহাড়। বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল না, তবে অনেক দূরের পাহাড় থেকে একটা ঝরণা ঐ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বয়ে নিচে নেমে যেত। সেই ঝরণার জলেই সব কাজ চলত গাঁয়ের লোকের। ফাদার আলফানসো যখন এদেশে আসেন তখন মূলগাঁওএর আজকের মতো অবস্থা ছিল না। চার্চের কাজে যোগ দিয়ে, মানুষের সেবা করে তিনি বড় আনন্দ পেতেন। কিন্তু বছর পনের পরে ঘটল দারুণ একটা বিপর্যয়। এক রাতে বড় রকমের একটা ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সারা অঞ্চল। ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল ঘরবাড়ি। চার্চের বাইরে ঝোলান বিশাল ঘণ্টাখানা আপনিই বেজে বেজে উঠতে লাগল ঢং ঢং ঢং। চার্চের চূড়া থেকে তলা অব্দি দেখা দিল মস্ত বড় একটা ফাটল। ভোরে মূলগাঁওএর ভয়ার্ত মানুষরা অবাক হয়ে দেখল, তাদের পানীয় জলের যোগান দেয় যে একমাত্র ঝরণা, সেটাতে এক ফোঁটা জল ওপর থেকে নেমে আসছে না। ভূমিকম্পের ফলে দূরের পাহাড়ে ঝরণাটির গতিপথে

নিশ্চয়ই ঘটে গেছে কিছু অঘটন। অতএব গাঁ ছেড়ে, ভাঙা বাড়িঘর ছেড়ে মান্ডবী নদীর দিকে নতুন বসতি পত্তনের জন্য লোকে হাঁড়িকুড়ি আসবাবপত্র মাথায় করে বেরিয়ে পড়ল। দু'চার দিনের ভেতরেই উজাড় হয়ে গেল গাঁ। শুধু ভাঙা চার্চের মায়া ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারলেন না ফাদার আলফানসো।

ওদিকে মান্ডবী নদীর তীরে নতুন একটা শহর গড়ে উঠেছিল। সেখানে বসবাস শুরু করেছিল পর্তুগীজ সরকারের লোকজনেরা। তারা নতুন গড়ে তোলা চার্চে যেত। অঢেল আয় উপায় ছিল, তাই ফূর্তিতে কাটত তাদের দিন। তারা পালতোলা জাহাজে করে ভারতের মশলাপাতি চালান দিত বিদেশের বাজারে। আর একটি বিশেষ ব্যবসায়ে তাদের তখন খুব নামডাক। তারা নদীপথে নৌকো নিয়ে ঢুকে পড়ত হাটবাজার, গাঁগঞ্জে। তলোয়ারের জোরে শক্তসমর্থ মেয়ে পুরুষ ধরে এনে তাদের অনেক চড়া দামে বিক্রি করে দিত বিদেশীদের কাছে। মান্ডবী নদীর ধারে সাবাইওতে বসত এমনি একটা দাসদাসীর বাজার।

ফাদার আলফানসোকে কেনাকাটার জন্য আসতে হলে পেরুতে হত দাসদাসীর এই বাজারটি। তিনি যাবার সময় এই হতভাগ্য দাসদাসীদের জন্য প্রার্থনা করতেন ঈশ্বরের করুণা। এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য ঘৃণা করতেন নিজের দেশের নাবিক আর শাসকদের।

সপ্তাহে দু'দিন হাটবাজার করতে নিচে যখন নেমে আসতেন তখন গাঁয়ে গাঁয়ে প্রভু যীশুর প্রেমের কথা প্রচার করতে করতে আসতেন। তাঁর সারা মুখে সব সময় লেগে থাকত প্রসন্ন এক ধরনের হাসি। ক্ষেতের চাষাভূষো, নদীর জেলেজোলা থেকে প্রতিটি পথচারী তাঁকে মনে করত ভগবানের দূত। দাসদাসীদের বাজার পেরিয়ে যাবার সময় হতভাগ্য মেয়ে পুরুষরা তাঁর দিকে তাকিয়ে যখন চোখের জল ফেলত তখন ফাদারের চোখদুটিও শুকনো থাকত না।

সেদিন ফাদার আলফানসো সাবাইওর বাজারে এসেছিলেন। কেনাকাটা সেরে ফিরছিলেন মূলগাঁওএর চার্চে। দাসদাসীর ভাঙা হাটে তখনকোনো লোকজন ছিল না। সামনের নীল আকাশে ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় ভরা চাঁদ। তিনি সবে দাসদাসীদের বাজার ছাড়িয়ে মেঠো পথে নামতে যাচ্ছেন এমন সময় দেখতে পেলেন একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছের তলায় ঘুমিয়ে আছে পরীর মতো একটি ছোট্ট মেয়ে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গালে তখনও লেগে আছে কান্নার দাগটুকু। মেয়েটির বয়স পাঁচ বছরের বেশি নয়।

ফাদার ফুলের কুঁড়ির মতো মেয়েটির সামনে বসে পড়লেন। না, এ মেয়ে এসব অঞ্চলের নয়। মুখের আদল দেখে মনে হল, মেয়েটি আরব সাগরের তীরের এই গোয়া অঞ্চলের নয়।

ফাদার আলফানসো জানতেন, যে সব হতভাগ্য মেয়েদের এখানে দাসদাসীদের হাটে বিক্রির জন্য ধরে আনা হয় তাড়াহুড়োতে কারু কারু সঙ্গে তাদের বাচ্চারাও এসে যায়।

ঐ বাচ্চাগুলোকে দালালরা ধারে কাছে কোথাও ছেড়ে দিয়ে মাকে বেচে দেয়। ঐসব অসহায় ছেলেমেয়ে বাজারের এদিক ওদিকে কোথাও পড়ে থাকে। কেউ কিছু দিলে খেয়ে বাঁচে। অবশ্য এমন ঘটনা খুবই কম ঘটে।

যাই হোক, ফাদার অনেকক্ষণ মেয়েটির পাহারায় বসে রইলেন। যদি কেউ আসে, যদি দয়া করে কেউ নিয়ে যায়। কিন্তু কেউ সে পথে এল না। মেয়েটি একসময় ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই মা-মা বলে কান্না জুড়ে দিল।

ফাদার আলফানসো তাঁর ঝোলা থেকে এক টুকরো খাবার বের করে মেয়েটির হাতে দিলেন। কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে হাত বুলোতে লাগলেন তার কচি দেহে। কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু শিশুটির কাছ থেকে এমন কোনো উত্তর পাওয়া গেল না যাতে তার বাবা মা ঘরবাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। শেষে অনেক কষ্ট করে শিশুটিকে ফাদার কিছুটা হাঁটিয়ে কিছুটা কাঁধে বয়ে মূলগাঁওএর চার্চবাড়িতে নিয়ে এলেন।

ফাদার আলফানসো মেয়েটির নাম রাখলেন রোশনী। রোশনী মানে আলো। হয়ত ফাদারের মনে হয়েছিল, এ মেয়েটি একদিন চারদিকে আলো ছড়িয়ে দেবে।

ক'দিনের ভেতরেই এক ফোঁটা রোশনী একেবারে মস্ত কাজের মেয়ে। সে ফাদারের হাতের কাছে ছোট ছোট কাজের জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়। গুটি গুটি পায়ে ফাদারের পেছনে পেছনে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। প্রভু যীশুর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে ফাদার যখন প্রার্থনায় বসেন তখন ছোট্ট রোশনীরও তাঁর দেখাদেখি তাই করা চাই। সন্ধ্যায় ফাদার শেকলে বাঁধা বড় ঘণ্টার দড়ি ধরে টানেন। অমনি বিশাল ঘণ্টাখানা ঢং ঢং করে বাজতে

থাকে। রোশনীর সে কি আনন্দ! সে ফাদারের আলখাল্লার ঝোলা প্রান্তটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে ফাদারের সংগে ঘন্টার দড়ি ধরে টানার চেষ্টা করে যায়।

যখন আরাধনার বেদীর চার কোণে চারটি মোমবাতি জ্বলে ওঠে তখন সে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কখনো চার্চের ভেতর হাওয়া ঢুকে পড়লে মোমবাতির শিখাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। তখন আলো আর ছায়ার নাচ শুরু হয়ে যায় রোশনীও তাই দেখে এদিক ওদিক দুলে দুলে নাচে। ফাদার তাকে নিয়ে বাদাম গাছের তলায় তলায় ঘুরে বেড়ান। গুচ্ছ গুচ্ছ মাখন রঙের ফুলে ভরে থাকে ডালপাতা। প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, মৌমাছি গুন গুন করে গান করে, তাদের পেছন পেছন ছুটে বেড়ায় রোশনী। তারপর বাদাম গাছে হলুদ আর লাল ফল দেখা দেয়। ফলের নিচে খোসার ভেতর থাকে কাজুবাদামের বিচি। ফাদার ঠিক সময় সেগুলো সংগ্রহ করে সাবাইওর বাজারে থলে ভরে নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে আসেন। ফল কুড়োনো থেকে বাজারে যাওয়া-আসা অব্দি ফাদারের সংগে সংগে ছুটে চলে রোশনী।

দু'তিন বছর পরে রোশনী ফাদারের হাত থেকে বাজারের থলে কেড়ে নিয়ে নিজেই বইতে শুরু করল।

বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিতে যখন আকাশ ভেঙে পড়ত, তিন চারদিন সূর্যের মুখ দেখা যেত না তখন রোশনী ফাদারের মুখের দিকে চেয়ে বলত, ফাদার নোয়ার সেই গল্পটা বল না?

ফাদারের মুখে এ গল্প তার বহুবার শোনা। তবু বর্ষার দিন এলেই তার মনে পড়ে যায় নোয়ার কথা। অমনি ফাদারের মুখের দিকে চেয়ে শোনা গল্পটা আবার তার শোনা চাই।

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত আকাশ ফুটো হয়ে হুড় হুড় করে বৃষ্টি পড়ছে। পৃথিবীর ঘরবাড়ি, গাছপালা—এমন কি, সবকটা পাহাড়ের মাথাও ডুবে একাকার। কেবল আকাশের দিকে উঁচু হয়ে ভেসে উঠছে নোয়ার নৌকোখানা।

রোশনী গল্প শুনত আর তার চোখের ওপর ভেসে উঠত নোয়ার সেই নৌকো।

রোশনী বলত, ভগবান কেন পৃথিবীর সবাইকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল ফাদার?

ওরা খুব দুষ্টু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কাউকে একটুও ভালোবাসত না। ছুতো পেলেই শুরু হয়ে যেত মারমারি।

নোয়া বুঝি খুব ভালো লোক ছিল?

ছিল বই কি। তাই তো ভগবান শুধু তাকেই একটা নৌকো বানিয়ে তার ভেতর একজোড়া করে পশুপাখি ভরে নিতে বললেন। নোয়া সেইসব আর তার নিজের ছেলেমেয়ে বউদের নিয়ে ঢুকে পড়ল নৌকোর ভেতর। পরে যখন পৃথিবীর সব জল সরে গেল তখন সেই পৃথিবীতে জন্ম নিল আবার নতুন সব মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা।

কোনোদিন মেঘের ফাঁকে রামধনু দেখা গেলে রোশনী চার্চের ভেতর থেকে ফাদারকে টেনে আনত বাইরে। উৎসাহে মেঘের দিকে আঙুল তুলে বলত, দেখ দেখ, ভগবানের সেই রঙিন ধনুক দেখা যাচ্ছে।

ফাদার বাইবেলের গল্প শোনাতে গিয়ে একদিন বলেছিলেন, ওটা হল ভগবানের ধনুক। নোয়াকে প্রভু বলেছিলেন, স্বর্গ আর পৃথিবীকে ছুঁয়ে থাকে এই ধনুক। এতে বুঝতে পারবে আমার সংগে পৃথিবীর সকল প্রাণীর কত গভীর যোগ।

আরও যখন বড় হল রোশনী তখন আরও সুন্দর হল সে। ফাদারকে সে তখন ভারী কোনো কাজ করতে দিত না। ফাদার বুড়ো হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই। বাদাম সংগ্রহ করা থেকে বাজারে বিক্রি করে আসা পর্যন্ত সব কাজই একার হাতে করত। মশকে জল ভরে এনে চৌবাচ্চা ভরে রাখত সে।

ফাদার একদিন বলেছিলেন, এই মূলগাঁওএর ওপর দিয়ে যখন ঝরণার জল বয়ে যেত তখন তার দুটো কূলই সবুজ শ্যামল ঘাসে ভরে থাকত। বর্ষার পর শরৎকাল এলেই পাল পাল ভেড়া নিয়ে চরাতে আসত মেষপালকরা। এখন ঝরণার জল শুকিয়ে গেছে তাই এদিকে আর কেউ আসে না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে সেদিন ফাদার আলফানসোর গলাটা দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছিল।

কিশোরী রোশনী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিল, আবার কোনোদিন তারা হয়ত এসে পড়বে ফাদার।

তা কি হয় রে বোকা মেয়ে। ঝরণায় জল না বইলে তারা তেণ্টার জলই যে পাবে না।

ফাদার আলফানসো নিজেও ছিলেন এক মেষপালকের ছেলে। কিশোর বয়সে নদীর ধারে, পাহাড়ের কোলে মেষ চরিয়ে বেড়াতেন। একদিন চার্চের পাশ দিয়ে ভেড়া নিয়ে

যাবার সময় ভেতরে পাদ্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন,– ভগবানই মেষপালক। আমরা সবুজ তৃণক্ষেত্রে ঘুরে ফিরছি। তিনি আমাদের পানীয় জলের দিকে নিয়ে যাবেন।

কথাগুলি অবাক হয়ে শুনেছিলেন আলফানসো। সেই থেকে লেখাপড়া শিখে যুক্ত হয়ে গেলেন চার্চের সঙ্গে। কিন্তু কোনোদিন ভুলতে পারলেন না তাঁর মেষপালক জীবনের কথা। অবশেষে মিশনের কাজ নিয়ে এলেন তিনি ভারতবর্ষে। ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে এখন বৃদ্ধ আলফানসো এই ভাঙা পরিত্যক্ত চার্চেই তাঁর শেষ দিনগুলির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন।

সন্ধ্যার আগে যখন সূর্যাস্তের আয়োজন হয় তখন চার্চের বাইরে একটি পাথরের বেদীর ওপর বসে ফাদার সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। রোশনীও তাঁর পাশে এসে বসে।

পশ্চিমের আকাশ মেতে ওঠে রঙের খেলায়। শ্যাওলাধরা পুরাতন গীর্জার চূড়ায় বাঁধা ঘণ্টার ফাঁকে অন্য এক জগতের ছবি চোখে এসে পড়ে। কখনও বা মেঘভাঙা সূর্যাস্তের রশ্মি চার্চের দীর্ঘ সিঁড়িগুলো স্পর্শ করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তখন মনে হয় আলোর দেবতা বুঝি নেমে এলেন গীর্জায়। নিচের উপত্যকা থেকে কুয়াশার চাদরে গা ঢেকে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে গীর্জা লক্ষ্য করে। মাথার ওপরে অশথ পাতায় হাওয়া লেগে শব্দ ওঠে। কত পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যায়।

রোশনী হাত নেড়ে পাখিদের চার্চের গাছে বসার জন্য ডাকতে থাকে।

ফাদার আলফানসো বলেন, যেখানে তেষ্টা মেটানোর জল নেই সেখানে ওরা কেন আসবে রোশনী।

ফাদারের গলার স্বরে একটা চাপা দুঃখ উপচে ওঠে।

রোশনী সান্ত্বনার সুরে বলে, দেখো ফাদার, ওরা একদিন ঠিকই আমাদের চার্চের বাগানে বাসা বাঁধতে নেমে আসবে।

ফাদার আলফানসো মৃদু হাসি হেসে রোশনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি চান না এই কিশোরী মেয়েটির উৎসাহে ভরা স্বপ্ন ভেঙে যাক।

দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের হাওয়ায় চার্চের বাগানে কাজুবাদামের ফলন বেশ ভালই হয়। রোশনীর দেখাশোনা আর তদারকির ফলে সারা বছরের খাবারের

রোশনী হাত নেড়ে পাখিদের চার্চের গাছে বসার জন্য ডাকতে থাকে

যোগাড় হয়ে যায় ঐ বাদাম বিক্রির পয়সা থেকে। শীতকালে এবার কিছু গমের চাষও হয়েছে। রোশনীর তাই উৎসাহের শেষ নেই। সে অবসর সময়ে ফাদারের কাছে লেখাপড়া শেখে। ফাদার তার কাছে প্রায়ই বলেন তাঁর দেশভ্রমণের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার গল্প। বড় বড়

চোখ মেলে অবাক হয়ে রোশনী তাই শোনে।

ফাদার এখন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন, তাই তাঁর ইচ্ছা থাকলেও লোকালয়ে কিংবা বাজারে যাওয়া আসা করতে পারেন না। শেষে এমন একদিন এল যখন চার্চের বড় ঘণ্টার শেকল ধরে টানারও শক্তি আর রইল না। রোজ তিনি নিজের হাতে ঐ কাজটি করতেন। যখন সন্ধ্যার বাতাস কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজত তখন ফাদার ভাবতেন এ শব্দ যেখানে যাবে ঈশ্বরের করুণা সেখানেই ছড়িয়ে পড়বে।

রোশনী ফাদারের ইচ্ছার কথা জানত। তাই সে বাইরের শেকলের সংগে একটা মোটা দড়ি বেঁধে ফাদারের শোবার খাটের বাজুতে বেঁধে দিল। রোশনী ঐ দড়ি ধরে টান দিত আর ফাদার তাঁর বিছানার ওপর বসে রোশনীর সংগে ঐ দড়িতে হাত লাগাতেন। ঠিক যেমন করে রোশনী তার ছেলেবেলায় ফাদারের সংগে হাত লাগিয়ে রাখত ঘণ্টার শেকলে।

একদিন রোশনী বাজার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এল চার্চে। সন্ধ্যার বাতি জ্বেলে প্রার্থনা শেষ করে এসে বসল ফাদারের বিছানার ধারটিতে।

আজ যে বড় তাড়াতাড়ি বাজারের কাজ গুছিয়ে ফিরে এলে রোশনী?

সেই কথাটাই তো তোমাকে বলব বলে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আজ একটি লোক আমার বাদামের পসরার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার বাদামগুলো দেখল। তারপর দাম জিজ্ঞেস করতে আমি দাম বললাম। লোকটি তখন বলল, এত সস্তায় তুমি দাও কি করে! এর তো অনেক দাম হওয়া উচিত।

এই বলে বেশি দাম দিয়ে পসরার সব কটা বাদাম একসংগে কিনে নিল। আরও বলল, পরের দিন বাজারে এসে আর কাউকে বাদাম দিও না, আমার জন্যে সব কটা রেখে দিও।

ফাদার আলফানসো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আর কিছু বলেছে লোকটি?

হ্যাঁ ফাদার, আমি কোথায় থাকি তা জানতে চেয়েছিল।

আর কিছু বলেছিল?

হ্যাঁ ফাদার, জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের চার্চের বাগানে কতগুলো গাছ, বছরে কত ফল ফলে। তোমার শরীর কেমন তাও জানতে চেয়েছিল।

চার্চ দেখতে আসবে বলে বলেনি?

বলেছে ফাদার, পরের দিন আমার সংগে সে বাগান দেখতে আসবে। আরও বলেছে, তাকে বাগানাটা ইজারা দিলে আমাদের আর কিছু ভাবতে হবে না। বছরে এক সংগে অনেকগুলো টাকা আমাদের হাতে দিয়ে দেবে।

ফাদার আলফানসো রোশনীর পিঠে হাত রেখে বললেন, ঘন ঘন বাজারে বেচাকেনা করতে যেতে খুব কষ্ট হয় রোশনী?

না ফাদার, আমার একটুও কষ্ট হয় না।

বাদাম তোলার কাজ করতে আর গমের ক্ষেতে কাজ করতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়? তুমি শুধু আমার মুখ চেয়ে বল না।

না ফাদার, একেবারেই না। কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাই।

ফাদার বললেন, মানুষের আসল কষ্টটা কোথায় জান? খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি পাওয়ার ইচ্ছে থেকেই। একবার বেশি কিছু পেলে আরও বেশি পাবার ইচ্ছে বেড়ে যাবে। তখন মনে হবে গোটা পৃথিবীর ধনরত্ন পেলে ভাল হয়। তুমি তোমার প্রয়োজনের জন্য পরিশ্রম করবে। নিজে যতটুকু খেটে-খুটে উপার্জন করবে, সেইটুকু তোমার ধন, তোমার পাওনা। ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখতে পার, তার বেশি নয়।

রোশনী বলল, আমি তোমার কথামতই কাজ করব ফাদার।

শোন, বাদামের জন্য যেটুকু বেশি দাম লোকটি তোমাকে দিয়েছে, তা তাকে পরের বাজারেই ফিরিয়ে দেবে। বিনয়ের সংগে বলবে, আমার দামের বেশি নিয়ে আমি ভুল করেছি। এ আমি নিতে পারি না। আর বলবে...

কিছুক্ষণ থামলেন আলফানসো।

কি বলব ফাদার?

চার্চের বাগানটা আমার নয়, ওটা সকলের সম্পত্তি। আমি কাজ করি তাই তার ফলটা ভোগ করি। কোনো কাজ না করে বসে বসে কারু কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না আমি। চার্চে এসে প্রার্থনা করে যেও কিন্তু বাগান ইজারা দেবার মালিক আমরা নই, দিতেও পারব না।

তাই বলব ফাদার। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

ও লোকটি সৎ ব্যবসাদার নয় রোশনী, মন্দ লোক। তোমাকে বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে সবকিছু হাতিয়ে নিতে চায়।

রোশনী আবার বলল, আমি লোকটির মতলব সত্যি ধরতে পারিনি ফাদার।

আলফানসো বাইবেলের একটি উপদেশ দিয়ে বললেন, যারা সত্যিকারের মেষপালক তারা ভেড়ার খোঁয়াড়ের আসল দরজা দিয়ে ভেড়া নিয়ে ঢোকে। কিন্তু যারা চোর তারা সোজা দরজা দিয়ে ঢোকে না। বেড়া টপকে, দেয়াল ডিঙিয়ে আসার চেষ্টা করে। ঐ লোকটি সত্যিকারের মেষপালক নয়।

রোশনী সেদিন থেকে শিখল মানুষের ভেতর ভাল আর মন্দকে চিনতে। সে আরও শিখল, কাজের ভেতরেই আনন্দ, অলসের মতো বসে থেকে কিছু পাবার ভেতর সত্যিকারের সুখ নেই।

কিছুকাল পরের কথা। রোশনী বাজার থেকে ফিরছিল সওদা করে। মন পড়েছিল তার চার্চে। অসুস্থ বৃদ্ধ ফাদারকে একা ফেলে বেশিক্ষণ কোথাও সে থাকতে পারত না আজকাল। বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে সাঁঝের অন্ধকার। হঠাৎ রোশনী শুনতে পেল চার্চের ঘণ্টার শব্দ। একবার বেজেই কিন্তু ঘণ্টাটা সেই যে থেমে গেল আর বাজল না। রোশনী ছুটতে লাগল। অসুস্থ ফাদার একা কি করে টানলেন ঘণ্টার দড়ি! তাহলে কি কোনো বিপদ হল, না প্রার্থনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে ভেবে ফাদার কষ্ট করেও বাজিয়ে দিলেন ঘণ্টা!

চার্চের এলাকায় ঢোকার মুখেই চড়বড়িয়ে নামল এক পশলা বৃষ্টি। রোশনী ভিজতে ভিজতেই ঢুকে গেল চার্চের ভেতর। বেদীর চারদিকে চারটে মোমের বাতি জ্বলছিল। বাইরের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল শিখাগুলো। রোশনীই আজকাল বাতি জ্বালে। ফাদার বিছানায় শুয়ে বসেই প্রার্থনা সারেন। কিন্তু আজ ফাদার নিজে উঠে বাতি জ্বেলেছেন। কত কষ্ট হয়েছে তাঁর। রোশনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে ছুটে গেল ফাদারের বিছানার কাছে।

চার্চের ডান দিকের দেয়ালে প্রভু যীশুর একটি ছবি। যীশু বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন একটি মেষশাবক। ছবিটি

একটি মেষপালক চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছে

বড় প্রিয় ছিল ফাদার আলফানসোর। রোগশয্যায় শুয়ে ফাদার প্রায়ই চেয়ে থাকতেন ছবিখানার দিকে। রোশনী দেখল, সেই ছবিটির দিকে চেয়েই ফাদার শুয়ে আছেন।

রোশনীর গলায় অভিমান উপচে উঠল, কেন তুমি একা একা উঠে বাতি জ্বালাতে গিয়েছ ফাদার? কেন আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলে না তুমি? ঐ বড় ঘণ্টাখানা টেনে বাজাতে কত কষ্টই না তোমার হয়েছে।

কিন্তু রোশনীর কথার উত্তর দেবার জন্য সেখানে তখন কেউ ছিল না। ফাদারের প্রাণহীন দেহটাই শুধু পড়েছিল বিছানায়।

সে বছর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এমন বর্ষা নামল যে সূর্যের মুখ দেখা গেল না সপ্তাহ ভোর। সারা দেশটা যেন মহাপ্লাবনে ডুবে গেল। নোয়ার নৌকার মতো চার্চটা জেগে রইল তার চূড়াখানা উঁচু করে। একসময় বর্ষা থামলে আকাশ পৃথিবী ছুঁয়ে একটা রামধনু জেগে উঠল। কি আশ্চর্য! মূলগাঁওএর যে ঝরণাটায় এতকাল জলের স্রোত বন্ধ হয়ে ছিল, সেটাতে জলের ধারা নেমে এল তীব্রবেগে।

বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ এসেছে। ধবধবে সাদা দুচার কুচি মেঘ নীল আকাশে ছড়ানো। কাঁচা সোনারমতো রোদ লুটিয়ে পড়ে আছে গাছের ডালপাতায়, পৃথিবীর ধুলো মাটিতে। ঝরণার ধারে ধারে জেগে উঠেছে সবুজ শ্যামল ঘাস।

রোশনী দেখল, ঝরণার তীর বরাবর ওপরের দিকে কে যেন উঠে আসছে। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটি মেষপালক চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছে, তার পেছনে একপাল মেষ। তারা চার্চের সামনে সবুজ তৃণভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। সেই মুহূর্তে রোশনীর মনে হল, ঐ কিশোর মেষচারকটি আর কেউ নয়, ফাদার আলফানসো।

ছবি—সুব্রত চৌধুরী

ছাপাখানার সুবর্ণ সুযোগ

স্থাপিত : ১৯০৭ সব থেকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী টাইপ ফোন : ৩৫-৪২৯৫

অসমীয়া, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা, মারাঠি, নাগা

প্রভৃতি টাইপ বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়

বরদা 18 pt.	বরদা 16 pt.	বরদা 12 pt.	God 12 pt.	God 14 pt.	অমল 16 pt.	অমল 18 pt.	অমল 12 pt.	NÜN 12 pt
অনন্তী	আরতী	পাইকা	চেস্ট বোল্ড কন্	পিন কন্ত	হিন্দী	হিন্দী	হিন্দী	নাগা
বরদা N. S. P.	বরদা 14 pt.	বরদা Great Ant.	GOD 10 pt.	God 12 pt.	অমল 16 pt.	অমল 18 pt.	অমল 12 pt.	nün 12 pt.
নিউ স্মল	চিত্রা	গ্রেট এন্টিক	কার্টন	যোজনী	মারাঠি	মারাঠি	মারাঠি	নাগা

বিশদ বিবরণীর জন্য যোগাযোগ করুন

বরদা টাইপ ফাউণ্ড্রী

48 pt. Baroda 48 pt. Baroda 48 pt. Baroda

২২।৫এ, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তি

সংকর্ষণ রায়

আমার প্রথম ভ্রমণ নদীনীরে। বাবার সঙ্গে পদ্মানদী পাড়ি দিয়েছিলাম চট্টগ্রামের উদ্দেশে। চট্টগ্রামের পাহাড়ে পাহাড়ে তখন খনিজ তেলের খোঁজ নিচ্ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ভ্রমণ সমুদ্রপথে। চট্টগ্রাম, লুসাই, নাগা ও পাতকই পাহাড়ে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার পর বাবা তখন বর্মায় গিয়ে পৌঁছেছেন। উত্তর বর্মার খনিজ তেলের ক্ষেত্র তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরাও চলেছি সেখানে। রেঙ্গুন হয়ে যেতে হবে, কাজেই কলকাতা থেকে রেঙ্গুনগামী জাহাজে করে যাত্রা করেছি।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস। খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগে পৌঁছে যাই কলকাতার উট্রাম ঘাটে। সেখানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ এস. এস. এরন্ডা (স্টিমশিপ এরন্ডা) উট্রাম ঘাটের জেটি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল এবং ঘন ঘন ভেঁপু বাজিয়ে যাত্রীদের তাড়া লাগাচ্ছিল।

সারাজীবন আমার পথে পথে কেটেছে। প্রথমে ভ্রাম্যমাণ বাবার সঙ্গে। আমার মতো পেশায় তিনিও ছিলেন ভূবিজ্ঞানী। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার সূত্রে তিনি দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে মা তাঁর সঙ্গ নিতেন, কাজেই তাঁর ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমায় আমরাও অংশ নিতাম। পরে বড় হয়ে আমি যখন তাঁর মতো ভূবৈজ্ঞানিক হলাম, তখন থেকে পথই হয়ে ওঠে আমার ঘর। কোথাও সীমাবদ্ধ হয়ে না থেকে চলতেই থাকি। এখনও চলছি। ঝরণার মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, যাযাবর পাখির মতো, চলছি শুধু চলছি।

জাহাজ ছাড়ে সূর্যোদয়ের পরেই। দিনের প্রথম সূচনা তখন সোনার রঙে উঁচু উঁচু অট্টালিকার মাথায় চিহ্নিত হয়েছে। ডেকের রেলিং ঘেঁষে আমি আমার গৃহশিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মা ততক্ষণে ভাইবোনদের নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কেবিনে গিয়ে ঢুকেছেন।

জাহাজের গতি সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করি আমি। হুগলি নদীর দুধারে সারিবাঁধা জেটি ও গুদামের ভিড়—শহরের সমস্ত কুশ্রীতা যেন নদীর টুঁটি টিপে ধরে। কিন্তু জাহাজের ভেসে চলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়. দুপাশে সবুজ গাছপালা আত্মপ্রকাশ করে। নদীর জলের রঙ গেরুয়া। মনে হচ্ছে নদী যেন

সন্ন্যাসিনী, সবুজ ঐশ্বর্যের আঙিনার সামনে দিয়ে উদাসিনীর মতো বয়ে যাচ্ছে।

আমার এই গম্ভীর মুখে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখা জনৈক ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমার গাম্ভীর্য ও মুগ্ধতা তাঁর চোখে এঁচোড়ে পাকামি ছাড়া আর কিছু নয়। মাস্টারমশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,ঐ টুকু ছেলে, তার হাবভাব বুড়োদেরও বাড়া। ওর বয়স কত জানেন কি?

জানব না কেন—মাস্টারমশাই জবাব দিলেন, আমারই তো ছাত্র। ওর বয়স সাত কি আট হবে।

মাত্র সাত কি আট ! ভদ্রলোকের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, এইটুকু বয়সেই এতটা পাকা হয়ে উঠেছে ! ওহে ছোকরা, নাম কি তোমার ?

সংকর্ষণ রায়। আমি জবাব দিলাম।

কি অদ্ভুত নাম! যেমন হাব-ভাব, তেমন নাম। সংকর্ষণ না বলে সাঁইত্রিশ সন বললে হয় না ! ভদ্রলোক ঠাট্টার সুরে বললেন।

এমন সময় এগিয়ে এলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। লালচে গেরুয়া রঙের কাপড় দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ মোড়া, মাথা ও মুখ নিখুঁতভাবে কামানো। আমার কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, খুব ভাবুক ছেলে তো তুমি।

গঙ্গার স্রোত দেখে আমার মনে যে ভাবই আসুক না কেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বাংলা বলতে শুনে তাতে ছেদ পড়ল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখে বুঝতে পারি যে তিনি ব্রহ্মদেশীয়, অর্থাৎ একজন বর্মী ফুঙ্গী। বর্মী ফুঙ্গীর মুখে বাংলা কথা খুবই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ফুঙ্গী বললেন,তুমি এমন ভাবে তাকিয়ে আছ যে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার চেয়ে আমিই বেশি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছি।

হ্যাঁ—আমি বললাম, আপনি বাংলায় কথা বলছেন, তাই অবাক হচ্ছি।

শুধু বাংলা নয়, ভারতের অনেক ভাষাতেই আমি কথা বলতে পারি। বর্মাদেশের ফুঙ্গী হলেও আমি নিজেকে বুদ্ধদেবের দেশের মানুষ বলে মনে করি। গত ত্রিশ বছর ধরে আমি বুদ্ধ-গয়াতে আছি। সেখানে থাকতে থাকতে সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছি, নিজেকে আর বর্মী বলে মনে করি না।

কিন্তু আপনি তো বর্মাদেশে যাচ্ছেন !

না। এই জাহাজ বর্মাদেশে গেলেও আমি যাচ্ছি না।

তার মানে? আমি হতবুদ্ধির মতো ফুঙ্গীর মুখের পানে তাকালাম।

তার মানে সম্ভব হলে পরে তোমাকে বুঝিয়ে দেব—ফুঙ্গী মৃদু হেসে বললেন, এখন আমার কথা থাক, তোমার নিজের কথা বল। বল নদীর মধ্যে এমন কি আছে যা তোমাকে মুগ্ধ করেছে।

কি আছে জানি না, মানে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে দেখতে খুব ভাল লাগছে, যত দেখছি তত ভাল লাগছে।

নদীর মধ্যে কি আছে তা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। নদীর মধ্যে আছে একটানা গতি, শুধু এগিয়ে চলা, নদীর স্রোতের মধ্যে আর যাই থাক, পুনরাবৃত্তি নেই। আমি নিজে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কিন্তু আমার সন্ন্যাস-জীবনের মূলমন্ত্র পেয়েছি আমি বেদের চরৈবেতি মন্ত্রের মধ্যে। নদীর কলধ্বনির মধ্যে এই মন্ত্রই যেন সর্বদা উচ্চারিত হচ্ছে। অর্থাৎ নদীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে এই মন্ত্রকে আমি সর্বদাই দেখতে ও শুনতে পাই। বুঝতে পারছ তো আমার কথা?

না, পুরোপুরি বুঝতে পারছি না ! কিন্তু বুঝতে না পারলেও, আপনার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে।

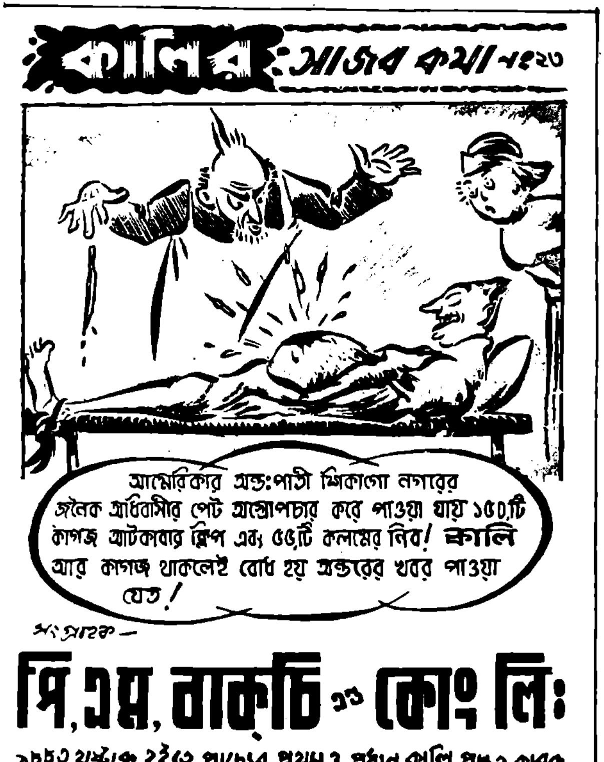

তা হলেই হলো–বৌদ্ধ সন্ন্যাসী খুশি হয়ে বলেন, বুঝতে পারার চেয়ে শুনতে ভাল লাগাটা অনেক বেশি জরুরী। আমারও ভাল লাগছে তোমাকে। তোমার বয়স আট, আমি আটষট্টি কিন্তু আমি তোমাকে আমার বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। তোমার ভাইবোনদের সংগেও আমি ভাব করতে চাই। চল তোমাদের কেবিনে।

আমাদের কেবিনে এসে মা ও ভাইবোনদের সংগে আলাপ করলেন সন্ন্যাসী। মাকে বললেন, আমি ফুংগী, আমার কোনো নাম নেই, মানে কেউ আমাকে নাম ধরে ডাকে না। তবে শান্তিনিকেতন থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ-গয়ায় এসে আমার সংগে আলাপ করে আমাকে আনন্দরূপ নামে ডাকতে শুরু করেছিলেন। এখনও দেখা হলে ঐ নামেই তিনি ডাকেন। আপনারা ইচ্ছে করলে ঐ নামে সম্বোধন করতে পারেন আমাকে। তুমিও আমাকে এই নামেই ডেকো ভাই–বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে থাকেন আনন্দরূপ।

মা বললেন, আমার এই ছেলের সংগে আপনার ভাব হয়েছে বুঝি ?

হ্যাঁ–আনন্দরূপ জবাব দিলেন, ওর সংগে আমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। ষাট বছরের ব্যবধানটাকে আমরা আমাদের ভালবাসা দিয়ে পূরণ করেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, ওকে মাঝে মাঝে আমার ফার্স্ট ক্লাস কেবিন ও ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে নিয়ে যাব।

অনুমতি দেওয়ার কি আছে ! ওর অশেষ সৌভাগ্য যে ও আপনার সংগ পাবে। আপনার যখন খুশি, ওকে নিয়ে যাবেন আপনার ওখানে।

মায়ের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে, এখন চল আমার সংগে–আমার হাত ধরে বললেন আনন্দরূপ।

আনন্দরূপের সংগে এলাম, অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস কেবিনগুলোর লাগোয়া ডেকে। এখানে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা ডেকচেয়ারে বসে নদীর শোভা দেখছে । জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, নদী তত প্রশস্ত হচ্ছে। নদী চওড়া হতে হতে দুপাশের ডাঙাকে অনেকদূর সরিয়ে দিয়েছে। দুদিকের সবুজ পাড় দূরত্বের দরুণ নীল দেখাচ্ছে।

আমরা দুজনে ডেকের ওপরে এসে দাঁড়াতেই ডেক-চেয়ার থেকে উঠে আসে একজন বর্মী তরুণী ও একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে-পুলিশ।

মেয়ে-পুলিশ বললে, খুবই দুঃখিত মিস্টার ফুংগী, সর্বত্র খুঁজেছি, কোনো জায়গাই বাদ দিই নি, কিন্তু খুঁজে পাই নি, খুঁজে পাব বলেও মনে হচ্ছে না। মূর্তিটি এই জাহাজে নেই বলেই মনে হচ্ছে।

সংগে সংগে গম্ভীর হয়ে ওঠে আনন্দরূপের মুখ। বর্মী তরুণীটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই মা-টোর কেবিন ভাল করে সার্চ করা দরকার। হয়তো তার কেবিনের মধ্যে কোথাও লুকোনো আছে মূর্তিটা।

মেয়ে-পুলিশ বললে, মা-টোর কেবিন ভাল করেই সার্চ করেছি। তার সুটকেস, ব্যাগ, বিছানা সব কিছুর মধ্যেই তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কেবিনের আসবাবপত্রের মধ্যেও সন্ধান নিয়েছি। কিন্তু বুদ্ধমূর্তিটির কোনো হদিস মেলে নি।

মা-টোর বডি সার্চ করুন মিস্ ডেভিস্।

বডি-সার্চ করেছি মিস্টার ফুংগী, একাধিকবার করেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি...

আমি হতবুদ্ধির মতো আনন্দরূপের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললাম, ব্যাপার কি আনন্দরূপ ? সব খুলে বলুন আমাকে।

বলছি। বলার আগে একটা অনুরোধ, আমার নাম থেকে রূপ ছেঁটে দাও–আমাকে আনন্দ বলে ডেকো।

বেশ তো, তাই হবে। এখন মূর্তির ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও আমাকে।

বুঝিয়ে দেন আনন্দরূপ। বুদ্ধ-গয়ার বুদ্ধমন্দিরে একটি ছোট জেড (Jade) পাথরের বুদ্ধমূর্তি ছিল। রেংগুনের শোয়ে-ডাগন প্যাগোডার প্রধান ফুংগী (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) মনে করেন যে এই মূর্তিটি শোয়ে-ডাগন প্যাগোডা থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরে রাখা হয়েছিল। শোয়ে-ডাগন প্যাগোডার অন্যতম সেবিকা মা-টোকে নিযুক্ত করেছেন তিনি মূর্তিটিকে বুদ্ধ-গয়ার মন্দির থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য। মা-টো বুদ্ধ-গয়াতে গিয়ে মূর্তিটিকে চুরি করে। চুরি করেই সে আনন্দরূপের সংগে দেখা করে বলে যে জেড-পাথরের বুদ্ধমূর্তিটিকে সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে রেংগুন, আনন্দরূপ যদি পারেন মূর্তিটিকে তার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করুন। আনন্দরূপ যদি তা পারেন, মাটো মনে করবে যে ভগবান বুদ্ধের অভিপ্রায় নয় যে মূর্তিটিকে বুদ্ধ-গয়া থেকে নিয়ে গিয়ে রেংগুনের শোয়ে-ডাগন প্যাগোডায় স্থাপন করা হয়। আর যদি মূর্তিটিকে আনন্দরূপ পুনরুদ্ধার করতে না পারেন, তা হলে ধরে নিতে হবে যে ভগবান বুদ্ধ মূর্তিটিকে শোয়ে-ডাগন প্যাগোডাতেই আবার প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান।

বুদ্ধমূর্তিটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় মা-টোর সংগ নিয়েছেন আনন্দরূপ। কলকাতায় তার সংগে একই হোটেলে থেকেছেন। তার জিনিসপত্র নিজের হাতে

ঘেঁটেছেন, হোটেলে যে ঘরে সে থাকত, সেই ঘরের মধ্যেও খোঁজাখুঁজি করেছেন, শেষ পর্যন্ত এই জাহাজে তার পাশের কেবিনে ঠাঁই নিয়েছেন। মূর্তি তার কাছেই আছে, অথচ তার নাগাল পাচ্ছেন না আনন্দরূপ।

আমি বললাম, ঐ মেয়ে-পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে, তার মানে আপনি পুলিশেও খবর দিয়েছেন?

দিয়েছি বইকি—আনন্দরূপ বললেন, এই জাহাজে ওঠার আগেই জল-পুলিশের সাহায্য চেয়েছি। জল-পুলিশের সুপারিন্টেডেন্ট এই মেয়ে-পুলিশটিকে নির্দেশ দিয়েছেন বুদ্ধমূর্তিটিকে খুঁজে বের করার জন্য। মেয়ে-পুলিশটি যে ব্যর্থ হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ব্যাপারটা খুবই অবাক হওয়ার মতো, তাই না? মা-টো বুদ্ধমূর্তিটাকে তার সংগে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমরা কেউই খুঁজে পাচ্ছি না...

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন আনন্দরূপ। তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে যায় মা-টো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেই।

চুপ করলেন কেন! মা-টো মুখ টিপে হেসে বললে, বলে যান যা বলতে চান।

কি আর বলতে চাইব—ম্লান হেসে বললেন আনন্দরূপ, যাই বলি না কেন, বুদ্ধমূর্তিটি খুঁজে বের করতে তা কি আর সাহায্য করবে!

ঠিক বলেছেন, বেশি কথা না বলে কাজ করাই উচিত আপনাদের। একটা কাজ করুন, এই ছেলেটাকে কাজে লাগান। প্রথমে ওকে আমার কেবিনে পাঠান...

তোমার কেবিনে ঢুকে ঐ মেয়ে-পুলিশটি তো তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কেবিনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি তো পণ্ডশ্রম। তোমার জিনিসপত্র বা বডি-সার্চ করেও কোনো লাভ হবে না। কাজেই খুঁজতে হলে কেবিনের বাইরে খুঁজতে হবে। খিল খিল করে হেসে উঠে মা-টো বললে, আপনি মনে করেন কেবিনের বাইরে কোথাও মূর্তিটিকে লুকিয়ে

ঠিক বলেছেন, বেশি কথা না বলে কাজ করাই উচিত আপনাদের

রেখেছি আমি! কেবিনের বাইরে এমন কোনো জায়গা আছে কি যেখানে আমি মূর্তিটিকে লুকিয়ে রাখতে পারি!

নিশ্চয়ই আছে। আনন্দরূপ গম্ভীর মুখে বললেন, নইলে লুকিয়ে রেখেছ কি করে! এত বড় জাহাজের কোথাও একেবারে গুম করে দিয়েছ! আমার কি মনে হয় জান, আমার মনে হয় বুদ্ধ-গয়ার মন্দির থেকে মূর্তিটিকে চুরি করেই কারুর মারফত তুমি সোজা এই জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছ।

আনন্দরূপের মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে মা-টো বললে, আপনি বলতে চান যে এ কাজে আমার শাগরেদ আছে?

নিশ্চয়ই আছে। এই জাহাজেই আছে। হয়তো নিকটেই আছে। তাকে ধরে ফেলতে পারলে হয়তো মূর্তিও উদ্ধার করতে পারব...

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বুঝলে খোকা, মা-টোর শাগরেদটিকে খুঁজে বের করতে হবে। ভাল করে নজর রাখ।

ভাল করে নজর রাখতে গিয়ে যাত্রীদের দেখি। এই ফার্স্ট ক্লাস ডেকে ডেকচেয়ার পেতে বসে যারা নদীর শোভা নিরীক্ষণ করছে তাদের অধিকাংশই ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তা ছাড়া আছে ভারতীয়, জাপানী ও আমেরিকান। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নদীর রূপ উপভোগ করছে তারা। নদী দুকূল হারিয়ে সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হতে চলেছে।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ে। তীরের অস্পষ্ট আভাস দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। নদী সমুদ্রের মধ্যে উধাও হয়েছে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় জলের শুভ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস। জলের রঙ নীল হয় নি এখনো। সমুদ্রের রূপ দেখা দিলেও মাটির রং ঘোচে নি। এই হলো সমুদ্রের মোহনা।

জাহাজ এখানে থেমে যায়। নদীপথের পাইলট এখানে নামবেন।

জাহাজ ঘেঁষে দাঁড়ায় একটি ছোট স্টিমার। মই বেয়ে ছোট স্টিমারে নেমে যান পাইলট। পাইলট নামতেই সেই স্টিমার সরে গিয়ে জাহাজের উল্টোদিকে চলতে চলতে নদীপথে প্রবেশ করে।

পাইলটকে যারা এগিয়ে দিতে আসে তাদের মধ্যে আছে একজন চাটগেঁয়ে খালাসী। পাইলটের স্টিমার সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার পরও সে দাঁড়িয়ে থাকে।

জাহাজ চলতে শুরু করে সমুদ্রের অভিমুখে। সমুদ্রে ঢুকতেই আঁধার ঘনায়। আকাশে তারা ফোটার সময় এটা।

সেই খালাসীটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট ক্লাস ডেকের রেলিং ঘেঁষে। হঠাৎ দুহাত তুলে নমস্কার করতে শুরু করে সে।

কাকে নমস্কার করছ এখন? আমি প্রশ্ন করি, তোমাদের পাইলট সাহেবের জাহাজ তো অনেকক্ষণ নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আমার প্রশ্ন শুনে একটু যেন চমকে ওঠে খালাসী। পরমুহূর্তে অবশ্য নিজেকে সামলে নেয় সে, মৃদু হেসে বলে, পাইলটেরও তিনি পাইলট, তাঁকেই নমস্কার করছিলাম। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি.....

চট্টগ্রামী টানে বাংলা কথা বলছিল লোকটি। মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে জাহাজের খালাসী ও মাল্লাদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের লোক। আরও শুনেছিলাম যে ধর্মে তারা মুসলমান। কাজেই এই লোকটি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে একটু আশ্চর্য হই। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলি, তুমি বৌদ্ধ?

হ্যাঁ দাদাভাই। খালাসী জবাব দিল, আমাদের চাটিগাঁতে অনেক বৌদ্ধ আছে, আমি তাদেরই একজন। আমি ছাড়া এই জাহাজের খালাসীরা সকলেই মুসলমান।

কালির আজব কথা নং ২৪

প্রাচীন মিশরের প্রসিদ্ধ রাজা টুটানখামেনের একটি খাতা ১৯০৪ সালে কায়রো সহরের কাছে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে প্যাপাইরাসের তৈরী খাতাটি আজকালকার মতই রিং দিয়ে বাঁধানো। আর সেটি কুচকুচে কালো কালি দিয়ে দুর্বোধ্য মিশরীয় 'সর্টহ্যাণ্ডে' লেখা।— আধুনিক সভ্যতাই যে চরম তা নয়!
সংগ্রাহক—
পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং লিঃ
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাচ্যের প্রথম ও প্রধান কালি প্রস্তুতকারক

আনন্দরূপ বললেন, বাক্সের গায়ে রং মাখিয়ে দিয়েছে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তুমি নমস্কার করছ, বুদ্ধ বুঝি সমুদ্রে আছেন?

হ্যাঁ দাদাভাই। সর্বত্র আছেন তিনি, কাজেই সমুদ্রেও আছেন। সমুদ্রে থেকে তিনি সমুদ্রকে শাসন করুন, তাই আমি চাই।

খালাসীর মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আনন্দরূপ বললেন, তুমি এখানে কি করছ? তোমার কি এখন অফ্ ডিউটি?

অফ্ ডিউটি হবে কেন, ডিউটিতেই আছি। খালাসী জবাব দিল, এখানে থেকেই ডিউটি করছি।

এখানে থেকে কি ডিউটি করছ?

সমুদ্রের দিকে নজর রাখছি। কাপ্তেনের হুকুম। সমুদ্রে ঝড় হতে পারে.....

ঝড় হতে পারে! আনন্দরূপ অবাক হয়ে খালাসীর মুখের দিকে তাকালেন, কি করে বুঝলে?

কি করে বুঝলাম তা বোঝাতে পারব না। সমুদ্রের কাছাকাছি থাকতে থাকতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি...

ডাইনিং হলে ঘন্টা বাজে। নৈশভোজের সময় হয়েছে, তারই সংকেত। মা-টোর আমন্ত্রণে আনন্দরূপ ও আমি তার সংগে একই টেবিলে খেতে বসি। সকলে খাবার ঘরে চলে যাওয়ার পরও সেই খালাসী ফার্স্ট ক্লাস ডেকের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

আশ্চর্য ব্যাপার! আনন্দরূপ বললেন, লোকটা একটানা শুধু সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে আছে। বলছে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ঝড়ের আভাস পাচ্ছে।

আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে লোকটা সমুদ্রের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের দেখা পেয়েছে। ও আমাকে বলছিল, বুদ্ধ সমুদ্রের জলেও...

সর্বত্রই আছেন তিনি—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মা-টো বললে, লোকটা ভগবান বুদ্ধের একজন সত্যিকারের ভক্ত।

তারপর সে খাবার-ঘরের হেড্ খানসামাদের ডেকে বললে, ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে যে খালাসীটা ডিউটি দিচ্ছে, তাকে আমি কিছু খাবার পাঠাতে চাই।

কিন্তু ও তো ওদের লংগরখানায় গিয়েই খাবে। হেড্ খানসামা আপত্তির সুরে বললে, এখানকার খাবার তো

ওর খাওয়ার কথা নয়।

আমি যদি ওকে খাওয়াতে চাই, তাতে কি কোনো আপত্তি আছে তোমাদের? মা-টো ঝাঁজালো স্বরে বললে।

না-না, তাতে আর আপত্তি কিসের! মুখ ব্যাজার করে হেড্ খানসামা বললে, আপনার পয়সায় যদি খায়...

মা-টোর পয়সায় সে রাত্রে ঐ খালাসী ছাড়া আনন্দরূপ এবং আমিও খেয়েছিলাম। খাওয়ার শেষে মা-টো বললে, যারা সত্যিকারের ভক্ত, তাদের খাইয়ে আনন্দ পাই আমি।

মৃদু হেসে আনন্দরূপ বললেন, আমাদের এই ছোট বন্ধুটিকেও তুমি ভক্ত বলে মনে কর নাকি?

নিশ্চয়ই—মা-টো জবাব দিল, যীশুখ্রীষ্ট শিশুদের সংগ খুব পছন্দ করতেন, কারণ শিশুরাই নাকি খাঁটি ভক্ত!

আমি বললাম, ঐ খালাসী বলছিল সমুদ্রের মধ্যেও বুদ্ধদেব আছেন। আমি আজ রাতে ওর সংগে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকব, ঐরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পাব...

না না, কক্ষণো না। মা-টো তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, ডেকের রেলিং ঘেঁষে ওরকম দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই মা-টো একরকম জোর করে আমাকে পাঠিয়ে দেয় আমাদের কেবিনে।

কিন্তু কেবিনের বার্থে শুয়ে থেকে যতই ঘুমোবার চেষ্টা করি না কেন, ঘুম আসতে চায় না। মন পড়ে থাকে ফার্স্ট ক্লাস ডেকের সেই রেলিং-এর ধারে, যেখানে খালাসীটা সমুদ্রের দিকে নজর রাখছে।

সমুদ্র আমার নজরের সামনে না থাকলেও জাহাজের ওঠানামা দুলুনির মধ্যে সমুদ্রের ছোঁয়া পাই। কেবিন ও সমুদ্রের মাঝখানে অনেক লোহা, ইস্পাত ও কাচের আড়াল, কিন্তু আমার সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে থাকে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি। শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের ফেঁপে ফুলে ওঠাকে অনুভব করি। বাইরে বাতাসের বেগ বেড়ে গিয়েছে এবং সংগে সংগে জলে ও বাতাসে যেন কবির লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, অন্যদিকে জল ছলছল শব্দে উত্তর দিচ্ছে। জল ও বাতাসের এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের আসর যেন আমাকে প্রবল আকর্ষণ করতে থাকে, কেবিনের মধ্যে আর আমি থাকতে না পেরে বেরিয়ে আসি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ফার্স্ট ক্লাস ডেকের দিকেই যেতে থাকি। ওখানে সমুদ্রের মধ্যে কি একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছিল, হয়তো ঐ রহস্যের টানেই জাহাজের ঐ খালাসী রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে নজর রাখছে।

ঐ খালাসীর পাশে মা-টোও দাঁড়িয়ে আছে। রেলিং থেকে তারা একটু তফাতে সরে এসেছে, কারণ সমুদ্রের ঢেউ উঁচু হয়ে রেলিংয়ের ওপরে আছড়ে পড়ছে। ঢেউ থেকে তফাতে সরে এলেও ঢেউয়ের দিকেই নজর রাখছে তারা। একদৃষ্টে ঢেউয়ের মধ্যে কি যেন দেখছে।

তারা দুজনে মিলে যা দেখছে আমি তাই দেখার চেষ্টা করি। রাতের আঁধারে সমুদ্রের ঢেউগুলো কালো কালো পাহাড়ের মতো জাহাজকে ঘিরে ফেলেছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় অজস্র তারা যেন ঝিকমিকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ সমুদ্রকে আলোর মালা দিয়ে সাজিয়েছে। এই আলোর উৎস হচ্ছে ফস্ফরাস্। সমুদ্রের জল থেকে আলো বিকীর্ণ করছে স্বয়ংপ্রভ ফস্ফরাস। রাতের সমুদ্রের মধ্যে এই আলোকে ভয়ংকর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

সমুদ্রময় এই আলোর মধ্যে আর একটা আলো দেখতে পাই। মা-টো ও ঐ খালাসীটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে রেলিংয়ের সামনে ঢেউয়ের সংগে ওঠানামা করছে উজ্জ্বলতর আর একটা আলো। এই আলো আকারে একটা বল-এর মতো। একটা আলোর বল যেন ঢেউয়ের তালে তালে উঠছে ও নামছে।

কিসের আলো ওটা? ফস্ফরাসের আলোর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। মা-টো এবং খালাসীটি যেমন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে, তাতে বোঝা যায় যে ঐ আলোর মধ্যে রহস্যজনক কিছু আছে।

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। আমার ইচ্ছা আলোটাকে কাছ থেকে দেখি। আমার পায়ের শব্দ শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। আমাকে দেখে যে তারা খুশি হয় নি তা তাদের মুখের ভাবেই বুঝতে পারি। দুজনেরই চোখ ঐ আলোর মতোই জ্বলজ্বল করছে। একটা চাপা আক্রোশ দুজনের চোখে আগুন হয়ে জ্বলছে।

রাগে আগুন হওয়ার কথা বড়োদের মুখে প্রায়ই শুনেছি। ওদের দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রাগের আগুনকে যেন দুজনের চোখের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখি। খালাসীটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কি একটা ইশারা করে মা-টো। সংগে সংগে তার চোখ দুটি আরও ঝলসে ওঠে এবং সে ছুটে আসে আমার দিকে।

কিন্তু সে আমার কাছে পৌঁছবার আগেই তার ও আমার মাঝখানে এসে দাঁড়ান আনন্দরূপ। এতক্ষণ তাঁকে দেখতে পাই নি আমি, মা-টো ও খালাসীটি তাঁকে

দেখে যেরকম আঁৎকে ওঠে তাতে মনে হচ্ছে তারাও তাঁকে দেখতে পায় নি। হয়তো এই ফার্স্ট ক্লাস ডেকের মধ্যেই এতক্ষণ কোথাও আত্মগোপন করেছিলেন তিনি।

খালাসীটির দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরে আনন্দরূপ বললেন, এই ছোট ছেলেটির ওপরে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে কেন? কি করেছে ও? তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, তুমিই বল, তুমি এমন কি করেছ যার জন্য এই লোকটা ক্ষেপে উঠেছে তোমার ওপরে?

আমি আলো দেখেছি—জবাব দিলাম। অদ্ভুত একটা আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করছে...

সমুদ্রের জলে আলো! সমুদ্রের জলে ফস্‌ফরাস্ থাকে, ফস্‌ফরাস্ স্বয়ংপ্রভ, অর্থাৎ অন্ধকারে ফস্‌ফরাস্ আলো বিকীরণ করে...

সে তো সমুদ্রময় ছড়িয়ে আছে। না আনন্দ, এ আলাদা রকম আলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করছে, এস নিজের চোখে দেখবে...

আমি আনন্দরূপের হাত ধরে তাঁকে জাহাজের রেলিংয়ের ধারে নিয়ে যাই।

সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করা আলোটির দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর খালাসীটির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে আনন্দরূপ উত্তেজিত স্বরে বললেন, এখনই টেনে তোল জাহাজের ওপরে...

কি টেনে তুলব? থতমত খেয়ে খালাসীটি বললে।

ঐ আলোটা।

আলো তুলব! সমুদ্রের জলে জ্বলজ্বল করছে ফস্‌ফরাস্। তাকে তোলা কি সম্ভব?

ফস্‌ফরাস্ তুলতে বলেছে কে তোমাকে! ফস্‌ফরাস্ ছাড়াও আলো আছে। ঐ দেখ...

মা-টোর দিকে তাকিয়ে খালাসীটি কাতর স্বরে বললে, কি করব এখন দিদিভাই?

কি আর করবে! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে মা-টো, উনি যা বলছেন তাই কর। তোমারই জিৎ হলো আনন্দ...

আমার জিৎ না, ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা! মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললেন আনন্দরূপ।

তা তুমি যা বল তাই বল...

রেলিংয়ের পাশে ছিল লোহার নাটাই, ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যাপস্টান। তার সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো আছে নোঙরের শেকল। শেকলের স্তূপের মধ্য থেকে একটি ইস্পাতের তার বের করে নিয়ে তাকে টানতে থাকে খালাসীটি। ঢেউয়ের তালে তালে ওঠানামা করা আলোর গোলকটি সমুদ্রের জল থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে আসে। জল থেকে উঠে আসতেই আলোটা একটা বাক্সের রূপ নেয়। ধাতুর বাক্স। আনন্দরূপ বাক্সটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দেখ বাক্সের গায়ে এমন রং লাগিয়ে দিয়েছে যা স্বয়ংপ্রভ, মানে আলো বিকীরণ করে। মা-টো, এই রংটা বাক্সে যদি না লাগাতে, আমাদের এই ছোট্ট বন্ধু ঐ সন্দেহজনক আলো দেখতে পেত না...

বাক্সটির দিকে আমি নজর রাখতে চেয়েছিলাম। মা-টো মুখ কাঁচুমাচু করে বললে।

তুমি ছাড়া আর কারুর নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বোধহয় তোমার মনে হয় নি, তাই না?

না।

বুদ্ধ-গয়ার মন্দির থেকে সোজা এই জাহাজে বোধ হয় এই খালাসীই মূর্তিটা নিয়ে এসেছিল?

হ্যাঁ। ভগবান বুদ্ধের সে পরম ভক্ত।

সমুদ্র থেকে তুলে আনা বাক্সটি গ্রহণ করলেন আনন্দরূপ। ডেকের কাঠের মেঝের ওপরে আসন-পিঁড়ি হয়ে বাক্সের ডালা খুলে ফেললেন। জ্বলজ্বল করে ওঠে জেড্ পাথরের ছোট বুদ্ধমূর্তি।

হাঁটু গেড়ে বসে বুদ্ধমূর্তির উদ্দেশে নমস্কার জানায় মা-টো ও খালাসীটি। আনন্দরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...

ছবি: তরুণ চক্রবর্তী

উর্দিটা দেখিয়ে এস

(আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "এ ওয়ে ইউ উইল নেভার বী" অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

[লেখক-পরিচিতি : আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের জন্ম হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, শিকাগোর এক শহরতলীতে। সাংবাদিক-রূপে জীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৯১৮-তে ইতালি চলে যান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক বৃত্তি নিয়ে। এখানে তাঁর কাজ ছিল এ্যাম্বুল্যান্স চালানো। ১৯২২ থেকে সব কাজ ছেড়ে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস", "ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স্" প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৪-তে তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে।]

এই মাঠ! লড়াইটা এইদিক দিয়েই গিয়েছে বটে। বন্ধুরা মাঝে মাঝেই চোট খেয়েছে, তার চিহ্ন খুব পষ্টো। চোট খেয়েছে মেসিনগানের। রাস্তার প্রত্যেকটা নাবাল অংশ থেকে। এখানে ওখানে ছড়ানো প্রত্যেকটা খামারবাড়ী থেকে। চোট খেতে খেতে শহরে যখন পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি কেউ। এরা নদীর ধার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে নির্ঝঞ্ঝাটে।

বাইসিকেলে আসছে নিকোলাস এ্যাডামস। মাঝে মাঝে তা থেকে নেমে ঠেলতেও হচ্ছে গাড়ীটাকে। কারণ রাস্তায় আর রাস্তা নেই অনেক জায়গায়। ভেঙ্গে চুরে গোল্লায় গিয়েছে একদম। যা-ই হোক, গাড়ী চেপেই হোক আর গাড়ী ঠেলেই হোক, রাস্তা বেয়েই আসছে নিকোলাস। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে মৃতদেহ। দেহগুলো পড়ে আছে যে-ভঙ্গিতে, তাই থেকেই একটা আন্দাজ তার এসে গেল যে লড়াইটুকু হয়েছিল কী ভাবে।

কোথাও কূল্যে একটা লাশ, কোথাও আবার লাশের গাদা। মাঠের লম্বা ঘাসের ভিতরে। যত্রতত্র রাস্তার উপরে। তাদের পকেটগুলো ওলটানো। মাছির ভন্‌ভনানি তাদের ঘিরে। আর চারপাশে ছড়ানো নানান্ ইস্তাহার। প্রার্থনা পুস্তক। বহুজনের দলবদ্ধ ফটো। একটা মেসিনগান ঘিরে গোলন্দাজেরা দন্তবিকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাসিখুশী ডগমগ, যেন যুদ্ধে তারা যাচ্ছে না, যাচ্ছে ফুটবলের ম্যাচ খেলতে। বেশী দিনের ফটো নয়, হয়ত আগের হপ্তাতেই তোলা হয়েছিল। আর এ-হপ্তায়? ঐ যে তারা ঘাসের ভিতর পড়ে আছে। অষ্টাবক্র হয়ে। ফুলে ঢোল হয়ে।

ইস্তাহার, হরেক রকম। চাষী মেহনতীদের লোভানি দিয়ে পল্টনে টানবার জন্য। লুঠপাটের লোভানি, পাপের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শতেক রকম সুযোগের লোভানি।

চিঠি! চিঠি! চিঠি! প্রত্যেকটা লাশের পাশে দুই চারখানা করে চিঠি। মায়ের চিঠি, বৌয়ের চিঠি, বন্ধুর চিঠি, খামের ভিতর চিঠির সঙ্গে কারও-বা প্রিয়জনের ছোট্ট ফটো—

ছত্রাকার পড়ে আছে প্রত্যেকটা লাশের পাশে।

শহর রক্ষার চেষ্টা একেবারেই যে করেনি অস্ট্রিয়ানেরা, তা নয়। তবে করেছিল খুব দেরিতে, যখন ইতালীয়রা সড়কের নাবালে পৌঁছে গিয়েছে, তখন। দীর্ঘ পথে মাত্র তিনটি দেহ চোখে পড়ল নিকোলাসের, যাদের পরনে অস্ট্রিয়ার উর্দি। দৌড়ে পালাচ্ছিল তারা শহরের দিকে। সে-সময় আর পেলো না তারা।

শহরে? বাড়ীঘর গোলার ঘায়ে ভাঙ্গাচোরা, পথঘাট ইটকাঠ পলেস্তারা ধুলো বালিতে আকীর্ণ। দেয়ালে দেয়ালে ফুটো। সে-সব ফুটোর মুখে হলদে-পানা রং। সর্ষে-গ্যাসের রং ওটা। গোলার টুকরো, ফাটা শ্র্যাপনেল থেকে ঠিকরে বেরুনো বুলেট! মিশে আছে আবর্জনার সঙ্গে। মানুষ? শহর শূন্য।

ফর্নাসি থেকে বেরুনোর পরে জ্যান্ত মানুষ একটাও চোখে পড়েনি নিক এ্যাডামস-এর। তবে হ্যাঁ, মানুষ না দেখলেও বন্দুকের নল দেখেছে অনেক। রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে ঐ যে একটানা তুঁতে-ঝাড়গুলো, ওদেরই ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে। চোখে পড়বার কথা নয়, তবু পড়েছে। কারণ রোদে-পোড়া ইস্পাতের উপর থেকে একটা তাপতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে শূন্যপানে। কানা যে নয়, তার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবেই।

নিক এ্যাডামস শহরের এ-প্রান্ত দিয়ে ঢুকল, ও-প্রান্ত দিয়ে বেরুলো। জনপ্রাণী নেই কোথাও, শহরটা একান্তই পরিত্যক্ত। নদীতীর বরাবর একটা নাবাল রাজপথ, তার নীচেই নদীজলের উদার বিস্তার। তার উপরেও মানুষের কোন চিহ্ন নেই, একটা ডিঙ্গিও ভাসছে না কোথাও।

আগে থেকেই শোনা ছিল এ্যাডামস-এর, সেনাবাহিনীর ছাউনি পড়েছে নদীর তীরে বাঁ-হাতী একটা খোলা মাঠে। ছাউনি? সারি সারি গর্ত শুধু। প্রতি গর্তে কয়েকজন করে মানুষ। নিক দূর থেকেই লক্ষ্য করছে, মেসিনগানগুলো কোথায় কোথায় বসানো হয়েছে। সাংকেতিক রকেটগুলোই বা তাকে তাকে গুছিয়ে রাখা হয়েছে কোথায়।

মানুষগুলো ঘুমুচ্ছে। একটা হাঁকও দিচ্ছে না কেউ, "কে যায়" বলে। এ্যাডামস চলেছে ত চলেইছে। কাদায়-কাদা নদীতীরের একটা বাঁক ঘুরতে, তবেই তখন মুখোমুখি তার দেখা হয়ে গেল এক তরুণ দাড়িওয়ালার সঙ্গে, হাতের বিল্লায় যার পরিচয় জানা যাচ্ছে, সে জনৈক সেকেন্ড লেফটেনান্ট পদের সৈনিক। ছোকরা টকাস্ করে পিস্তল বাগিয়ে ধরল নিককে লক্ষ্য করে—"কে তুমি?"

নিক পরিচয় দিল।

"কী করে জানব, তুমি সত্য বলছ?"

নিক তাকে পরিচয়পত্র দেখালো, তাতে তৃতীয় বাহিনীর সীলমোহর। নিজের ফটোগ্রাফ দেখালো, সীল তাতেও। লেফটেনান্ট সেগুলি দখল করল—"আমি নিচ্ছি এসব।"

"নিশ্চয়ই না"—বলল নিক—"ওসব আমায় দিয়ে দাও, আর ঐ পিস্তলটা পকেটে পুরে ফ্যালো।"

"এসব দলিল যে জাল নয়, তার প্রমাণ কী?"

"বোকার মত কথা বলছ তুমি। শোনো, ক্যাপ্টেন পার্ভাসিনি বলে কাউকে চেনো তুমি? খুব লম্বাপানা? খুব ছোট গোঁফ? বাড়ীঘরের নক্সা করতেন আগে? ইংরেজী বলতে পারেন?"

"তুমি চেনো নাকি তাঁকে?"—জেরা করে লেফটেনান্ট।

"এই, মোটামুটি—"

"কোন্ কোম্পানীর ক্যাপ্টেন?"

"দ্বিতীয়—"

"ছিলেন। এখন কিন্তু গোটা বাহিনীটারই অধিনায়ক তিনি।"

"সুখবর। তাহলে এইবার তুমি তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার আমাকে।"—তারা সুস্থ আছে শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে এ্যাডামস।

এই লেফটেনান্ট ছোকরা! লাল্‌চে বৃত্তে দু-চোখ ঘেরা তার, সে-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। যেন তার চারপাশে মিনিটে মিনিটে গোলা ফাটছে অবিশ্রান্ত। অথচ গোটা শহরটা পেরিয়ে আসার সময় একবার মাত্র একটা শ্র্যাপনেল ফাটার আওয়াজ শুনেছে এ্যাডামস, তারপর থেকে সব-কিছু নিস্তব্ধ। ছোকরাকে যেন শূলে বসিয়ে রেখেছে কেউ। অমন ভয়কাতুরের হাতে ঐ পিস্তল, নিকের পক্ষে চিন্তারই কারণ একটা। "পিস্তলটা পকেটে পুরে ফ্যালো বাপু! দুশমন ত নদীর ওপারে!"

"কী করে পুরব? যদিই প্রমাণ পেয়ে যাই যে তুমি গুপ্তচর, এক্ষুণি ত গুলি করতে হবে তোমাকে!"

"চ-লো বাবা, ঝটপট পার্ভাসিনির কাছে চলো"—বলল এ্যাডামস। এই ভীতু ছোকরার পিস্তলের পাল্লা থেকে দূরে যাওয়াই সব-চেয়ে বেশী দরকার এখন। শৃঙ্গিনাং শতহস্তেন।

পার্ভাসিনি আসলে ক্যাপ্টেন মাত্র, একটা কোম্পানীর

অধিনায়ক। অমন কোম্পানী অন্ততঃ দশ-বিশটা থাকে একটা বৃহৎ বাহিনীতে, যার নাম হল গিয়ে ব্যাটালিয়ন। সেই ব্যাটালিয়নের নায়কত্বে যিনি থাকেন, তাঁর পদবী হওয়া উচিত কর্নেল, নিদেন পক্ষে কর্নেলের অধস্তন পদাধিকারী কোন মেজর।

এখন এই যে ব্যাটালিয়নটা, এটা লড়াইয়ে লড়াইয়ে ক্ষয় হতে হতে এমন একটা লঘিষ্ঠ সংখ্যায় পৌছেচে যে এর খবরদারির জন্য কর্নেল ত দূরের কথা, একটা আস্ত মেজরও মোতায়েন করতে নারাজ উপরওয়ালা। তাই, ক্যাপ্টেনদের মধ্যে যিনি বেশী পুরোনো, তাঁকেই করে দিয়েছেন অস্থায়ী অধিনায়ক, সাময়িক ভাবে 'মেজর' পদবীতে ভূষিত করে। সেই লোকই হচ্ছেন পার্ভাসিনি। নিক এ্যাডামস-এর আলাপী এবং মুরুব্বি।

এ্যাডামস দেখল, মেজর পদে অস্থায়ী প্রমোশনের কল্যাণে মানুষটা আগের চেয়েও রোগাটে হয়ে গিয়েছে। চেহারার ভিতর দিয়ে ইংরেজসুলভ বৈশিষ্ট্য আরও যেন বেশী রকম প্রকট হয়েছে ইদানীং। গর্তের মধ্যে টেবিল পেতে অফিস বানিয়েছেন অস্থায়ী মেজর, সেই টেবিলের এধার থেকে এ্যাডামস স্যালিউট দিল ওধারে অধিষ্ঠিত পার্ভাসিনিকে।

"আরে, আরে"—বললেন পার্ভাসিনি—"তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না! ঐ উর্দিটা অঙ্গে চড়িয়েছ কিসের গরজে?"

"চড়িয়ে দিলে ওরা—তা লড়াইটা লড়লে কেমন?"

"হামলাটা যা চালিয়েছিলাম, দেখবার মতন হে! সত্যি বলছি। ভারী স্টাইলমাফিক হয়েছিল। এই যে! এক আঁচড়ে বুঝিয়ে দিই এসো—"

দেয়ালে ম্যাপ ঝুলছে। তারই উপরে আঙুল ঘষে ঘষে নিক এ্যাডামসকে বোঝাতে শুরু করে দিলেন পার্ভাসিনি। কী ভাবে তিনি লড়েছিলেন, নিজের মুখে বর্ণনা দেবার সুযোগ এ-যাবৎ তিনি পাননি। যারা সঙ্গে ছিল তখন, তারা ত চোখেই দেখেছে! নিক এ্যাডামসই প্রথম ব্যক্তি এই ছাউনিতে, যে তা দেখেনি। প্রকৃত ঘটনার পরিমার্জিত (না, না, অতিরঞ্জিত নয়) বর্ণনা কাউকে দিয়ে যদি নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করাতে হয়, তবে এই সেই লোক।

নীরবে সমস্ত কাহিনীটা পার্ভাসিনির মুখ থেকে শোনার পরে নিক বলল—"আহা, আমি ত ফর্নাসি থেকেই আসছি। কী ভাবে কী হয়েছিল, নিজেই ত দেখতে দেখতে

ছোকরা টকাস্ করে পিস্তল বাগিয়ে ধরল

এলাম। তারিফ করেছি মেজর, এন্তার তারিফ করেছি।"

"সত্যিই, লড়াইয়ের মত লড়াই লড়েছি আমরা। তা তুমি কি পল্টনে ঢুকলে না কি?"

"না, না, আমার উপর ভার পড়েছে, উর্দি পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াব সব ছাউনিতে। যাতে উর্দিটা দেখে সাহসে বুক বাঁধতে পারে তোমার সেপাইরা।"

"সে আবার কী রকম? উর্দি দেখে সাহস?"

"আহা, মার্কিন উর্দি একটা যার চোখে পড়বে, সে ত সংগে সংগে ধরে নেবে যে ঐ রকম উর্দি-পরা এক মিলিয়ন মার্কিন এল বলে, জার্মানির মাথায় মুগুর মারবার জন্য।"

"কিন্তু তোমার ওটা যে মার্কিন উর্দি, তা জানছে কে?"

"সেটা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমার—"

"ওঃ বাবা, তাই ব-লো! জানিয়ে দেওয়া! তার মানে। তুমি ছাউনিতে ঘুরঘুর করবে এখানে ওখানে সবখানে, সংগে থাকবে আমার কোন কর্পোরাল। তুমি যে সেই প্রত্যাশিত এক মিলিয়ন আমেরিকানেরই প্রথম আমেরিকান সৈনিকটি, এই কথাটি জোর গলায় ঘোষণা করাই হবে সেই কর্পোরালের কাজ।"

যথোচিত গাম্ভীর্যের সংগেই পার্ভাসিনি কথা কইছিল এতক্ষণ, কিন্তু আর সে পারল না, ফিক্ করে হেসে ফেললো হঠাৎ, হাসতে হাসতেই বলল—"তা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখলে সৈন্যেরা সাহস পাবে বই কি, নির্ঘাৎ পাবে। অসীম উৎসাহ পাবে জার্মানি-অস্ট্রিয়াকে গোবেড়েন দেওয়ার ব্যাপারে।"

"থামো ত বাবা অস্থায়ী মেজর! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না আর। এই উর্দি, এই দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ, এমনিতেই এই উর্দি বুকে পিঠে চেপে বসে দম আটকে দিচ্ছে আমার, টিটকিরির আর সময় পেলে না তুমি!"

পার্ভাসিনি লোক বেশ ভদ্র, কোমল কণ্ঠে বলল—"খানিকটা বিশ্রাম কর। ইচ্ছা করলে ঐ মাচায় শুয়ে এক ঘুম ঘুমিয়েও নিতে পার। এখন এই রোদে ত কোন কাজ হবে না!"

"তাড়াই বা কিসের এত?"

"ঐ যে অস্বস্তিটার কথা বলছিলে—"

"না, না, ও একটা কথার কথা। আমি চমৎকার আছি—

"সত্যি?"

"নিশ্চয়। সেই যে—শুনেছিলে ত? মাথায় একটা রোগ ছিল? সেই অনেক বছর আগে? সেটার দরুন এখনও কষ্ট পাই মাঝে মাঝে। কারণ কী, কে জানে, কিন্তু ঘরে আলো না জ্বললে আমার কোনমতেই ঘুম হবে না।"

"আমার খুব মনে আছে। আমিই ত তখন বলেছিলাম, কপাল ফুটো করে, ভিতরে ঘা-টা কিছু যদি থাকে ত তা মেরামত করিয়ে নাও। আমি অবশ্যি ডাক্তার নই, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে ঐ কথাই আমার মনে হয়েছিল। তখন ত শুনলে না আমার কথা!"

"অন্য অনেকে যে বলল—ঘা থাকলেও তা বসিয়ে দেওয়া যায় ওষুধ খেয়ে! গিয়েছেও নিশ্চয়। কিন্তু এই দোষটুকু রয়ে গিয়েছে। আলো যেখানে নেই, সেখানে পারি না ঘুমুতে। তার চেয়ে, যে-কাজ করতে এসেছি—অর্থাৎ উর্দিটা দেখিয়ে আসি দুই চার জনকে।"

"কক্ষণো না। এই রোদ্দুরে তুমি কক্ষণো বাইরে যেও না। ঘুম যদি না-হয়, না-ই বা হল। শুয়ে ত থাকতে পার। ওঠো গিয়ে ঐ মাচায়। মাথার ঘা না থাকলেও মানুষ পাগল হয়ে যায় এই গরমে।"

"তাহলে তাই। শুয়েই থাকছি—"

নিক এ্যাডামস উঠল মাচায়, পড়ল শুয়ে। ঘুম যে হবে না, তা সে নিশ্চিত জানে। কিন্তু না হোক ঘুম, একটু স্বস্তি ত পাওয়ার কথা, পরিখার এই ঠান্ডা গর্তের ভিতর! থেকে থেকে গোলা ফাটছে। বেশী দূরে নয় নিশ্চয়ই। নদীর ওপারে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে জার্মানেরা। নদী পেরুবে পার্ভাসিনি। সে-ঘাঁটি থেকে তাড়াবে তাদের, এমন সৈন্যবল তার কই? হাতিয়ারের প্রশ্ন পরে। সৈন্য নেই, গোড়াতেই গলদ যে!

মাথায় কত জল্পনাই উঁকি দিচ্ছে নিক এ্যাডমস-এর। সেই আদ্যিকালের ফোড়াটা, যার চিকিৎসার জন্য নিকের কপাল ফুটো করার পরামর্শ দিয়েছিল পার্ভাসিনি, সেটা আজ আবার বড় বেশী বেগ দিচ্ছে। ফর্নাসি থেকে এই রোদে সাইকেল ঠেলে এতদূর আসা, গাদা গাদা মড়ার ফুলে-ওঠা আঁকানো-বাঁকানো বীভৎস চেহারা দেখতে দেখতে, এ কি আর বরদাস্ত হয় সহজে? বিলুপ্ত বিস্মৃত ব্যাধি আজ বুঝি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নিকের মাথায়।

১৮৯৯-তেও এমনিধারা গর্তের ভিতর আশ্রয় নিতে হয়েছিল নিককে। তখন পার্ভাসিনি ছিল তার ক্যাপ্টেন। ও তখন ছিল পল্টনেরই একজন। গর্তটা সেবার এত বড় ছিল না। একটা আনকোরা নতুন রংরুট কামানের অবিশ্রান্ত আওয়াজ আর সইতে পারল না, ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগল। পার্ভাসিনি এই নিককেই হুকুম দিল—"ওটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে টহল দেওয়াও। তাতেও যদি মূর্ছা বন্ধ না হয়, এক ঘুষিতে নাক ভেংগে দাও ওর। তাহলে তখন নাকের কথাই ভাবতে হবে ওকে, গোলাবৃষ্টির কথা ভুলে যাবে।"

কী বলছ? ওরা শত্রুপক্ষে ভিড়ে যাবে? ঐ নাক-ভাংগা ছোকরাটা আর তার পেয়ারের দোস্তগুলো? "সার্জেন্ট, ওদের পিছনে হাটো"—হুকুম দিয়েছিল পার্ভাসিনি। পার্ভাসিনি তখন অস্থায়ী মেজর নয়, সাদাসিধে ক্যাপ্টেন একটা। আর সার্জেন্ট? সে-সার্জেন্ট ত ছিল এই নিক এ্যাডামসই সেদিন। তাকে রংরূটদের পিছনে হাঁটতে পরামর্শ দিয়েছিল পার্ভাসিনি। "আগে যদি হাটো, দুই পা হাঁটার পরেই যদি পিছু ফিরে তাকাও একবার, দেখবে কেউ আসছে না পিছনে। ঠিক আছে! আগে হাঁটব না, পিছনেই থাকব বরাবর। সব ঠিক হ্যায়।" একটা চটকা এসেছিল নাকি ঘুমের? এসেই ছিল যদি, গেল কেন তা? ওহ! গেল এই কারণে যে গর্তটা পুরোপুরি অন্ধকার না হলেও আলো এতে কম, আর নিক এ্যাডামস কোনমতেই ঘুমোতে পারে না, ঘরে আলো না-থাকলে।

হ্যাঁ, হয়ত এসে থাকতে পারে একটা চটকা, তা সে গিয়েছে ভেংগে। কপালটা দপ্‌দপ্ করছে। দুটো কানপিঠও। নাঃ, সেই আদ্যিকালে যদি সত্যিই দুটো ফুটো করা যেতো কপালের দু'পাশে, আর ওষুধ ঢোকানো যেতো সেই ফুটোর ভিতরে পিচকারি চালিয়ে, আজ এমন সময়ে অসময়ে ভোগান্তি হত না মাথার যন্ত্রণায়। পার্ভাসিনি লোকটা রোগাটে হলে কী হয়, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। ফুটো করার পক্ষেই মত ছিল ওর। সাহস পায়নি নিক নিজেই। ঐ ত তফাৎ! ঐ তফাতের জন্যই পার্ভাসিনি হয়ে গেল মেজর (অস্থায়ী মেজরের পক্ষে স্থায়ী হওয়া এমন কি শক্ত?), আর নিক এ্যাডামস খারিজ হয়ে গেল পল্টন থেকে নিরানব্বুইয়ের লড়াই মিটে যেতেই। আজ আবার তাকে ঢুকতে দিয়েছে বটে, কিন্তু লড়াই করার জন্য নয়, ঐ মাথার অসুখই কাল হয়েছে তার। কত্তারা তাকে ছাউনিতে ছাউনিতে ঘোরাতে চাইছেন, মার্কিন উর্দি জাহির করার প্রয়োজনে। এক ধরনের জোচ্চুরি? না, না। জোচ্চুরি কথাটা শোনায় খারাপ। All is fair, in love and war. কোন-কিছুই নিন্দের নয়, ব্যাপার যেখানে রণ বা প্রণয়। একশো এক রকম রণকৌশলের মধ্যে উর্দি দেখানোকেও রণকৌশলই বলা যেতে পারে এক রকম।

নিক এ্যাডামস উঠে বসল, দুই পা নামিয়ে ঝুলিয়ে দিল নীচে। আড়ষ্ট লাগছে পা দুটো। বেশীক্ষণ ছড়িয়ে রাখলে হামেশাই ওরা আড়ষ্ট মেরে যায় ঐ রকম। পা ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হোক আবার, ইতিমধ্যে এই লোকগুলোকে উর্দি দেখিয়ে দেবে নিক। নিজে থেকেই, আগু বাড়িয়েই এরা

নিককে বোঝাতে শুরু করে দিলেন পার্ভাসিনি

এসেছে যখন, যাবে কোথায় উর্দি না-দেখে?

হ্যাঁ, গর্ত-ভর্তি মানুষ। বিল্লা থেকে পরিচয় মিলছে, একটা জ্যান্ত এ্যাডজুটান্টও আছে এ-দলে। মেজরের ব্যক্তিগত সহকারী। বলা যায় কী? মেজর পার্ভাসিনি হয়ত নিজেই ওকে পাঠিয়েছে নিক এ্যাডামস-এর কেরদানি পরখ করার জন্য। কী ভাবে ও উর্দি দেখায়, কী রকম সুরে বক্তিমে দেয় সৈনিকদের কাছে, সেই সব যাচাই করা আর কি!

হুঁ-ব্বাবা! মাথায় যতই গোলমাল থাকুক, কাজে কেউ গাফিলতি ধরতে পারবে না নিকের। এ্যাডজুটান্ট আছে, সিগন্যালারও গোটা কয়েক, রানারও অন্ততঃ দুটো, এ-মওকা ছাড়া নয় কোনমতেই।

"ভাই সব, তোমাদের কিছু কিছু উপহার গছিয়ে দিয়ে, তারপর যদি কাজ শুরু করতে পারতাম, তা হলেই কাজটা এগুতো ভাল। কথা ছিল, ফোরান্সিতে ওরা আমায় ঝোলা-ভর্তি চকোলেট আর চুরুট দেবে তোমাদের মাঝে

বিতরণের জন্য। সময়কালে তা তারা দেয়নি। তবু দেখছোই ত, উর্দি আমার দেহেই আছে।"

শোবার সময় শিরস্ত্রাণটা খুলে রাখতে হয়েছিল। এখন তা আবার চাপিয়ে নিল মাথায়। রোদ্দুরে যাতে লোহার টুপি অসহ্য গরম হয়ে উঠতে না পারে, তারই জন্য কয়েক ভাঁজ ভিজে কাপড় দিয়ে মোড়া।

"মেজর এক্ষুণি আসছেন" এ্যাডজুটাণ্টটা বলল।

"তা, আসুন। তোমরা ততক্ষণ আমার কথাবার্তাগুলো শুনতে পার মেহেরবানি করে। এই যে দেখছ আমার পরনে উর্দিটা, দোষ ত্রুটি এতে নেই, তা নয়। খাঁটি মার্কিন উর্দি এটা হয়নি। এদেশে তৈরী হয় না সে-জিনিস। তবু আদল আছে, বেশ খানিকটাই আছে আদল। কথাটা এই, এটাকে মার্কিন উর্দি বলে বিশ্বাস করে নাও যদি একবার, তারপরে এ-কথাও অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারবে যে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন সেনা এ-রণাঙ্গনে দু-চার দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমরা।"

"মার্কিন সেনা? এখানে?"–এ্যাডজুটাণ্টটা মুখফোঁড়–"এই কথাই কি আপনি বলছেন আমাদের যে অস্ট্রিয়ার এই পাহাড়ে জঙ্গলেও পদার্পণ হবে মার্কিন সেনার?"

"হবে না? বাপের কুপুত্তুর যদি না-হয় মার্কিনেরা, পদার্পণ তাদের হবেই হবে। হতে যাচ্ছে দুই চার দিনের মধ্যেই। জাহাজগুলো আটলাণ্টিকের মাঝামাঝি এতক্ষণ।"

"মার্কিন সেনায় ভর্তি সব জাহাজ, সত্যি?"–এ্যাডজুটাণ্ট লোকটার সন্দেহ যেন ঘুচতেই চায় না।

"সত্যি নয় আবার? ইয়া ইয়া জাঁদরেল চেহারার মার্কিন। এই ত আমায় দেখছ? নিতান্ত ছোট খাটোটি নই। যারা আসছে, তারা আবার আড়ে-দীঘে আমারও ডবল জনে জনে। তাদের স্বাস্থ্য যেমন অটুট, মনও তেমনি নিষ্পাপ। রাত্রে ঘুমোয় তারা, শুঁড়িখানায় হল্লা না করে। ভগবান দেখছেন তাদের। কখনো চোট খায়নি যুদ্ধে। গোলার মুখে উড়ে যায়নি। মাথা ছাতু হয়ে যায়নি। বললে না পেত্যয় যাবে, তাদের মধ্যে অনেকের ক্যান্সার রোগটা পর্যন্ত হয়নি কোনদিন। আশ্চর্য সব মানুষ। দু'দিন সবুর কর, চোখেই দেখতে প্যাবে সব।"

এ্যাডজুটাণ্ট টিপ্পনি কাটল–"তুমি ইতালির লোক না?

"না, না, আমেরিকান। উর্দিটা দেখছ না? করেছিল স্প্যাগনোলিনি, অবশ্য ঠিক-ঠিক ওৎরায়নি।"

"আমেরিকার কোন্ দিকে বাড়ী? উত্তরে না দক্ষিণে?

"উত্তরে"–নিক অস্বস্তি বোধ করছে। এ্যাডজুটাণ্ট ব্যাটা এর পর আবার কী জানতে চাইবে, কে জানে।

"মার্কিন, কিন্তু ইতালির জবানে কথা ত কইছ চমৎকার।

"কেন কইব না? আমি যদি ইতালীয় বলি, তোমার তাতে আপত্তি কী? সেটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা, বলতে চাও না কি?"

"ইতালির মেডাল তোমার বুকে–"

"মেডাল নয়, শুধু ফিতে। পকেটে কাগজপত্রও আছে মেডালের। ওসব এসে গিয়েছে, একটু যা দেরি হচ্ছে, তা আসল জিনিসটা আসতে। অবশ্য তা না এলেও চলে। মিলানের যে-কোন দোকানে গেলে যে-কোন মেডাল যত খুশী সংখ্যায় কিনতে পার তুমি। দরকার হতে পারে তোমারও। যুদ্ধে কিছুদিন টিকে থাক যদি, মেডাল না-পেয়ে তুমি যাবে কোথায়?"

"আমি আনাড়ি নই"–বুক চিতিয়ে জবাব দিল এ্যাডজুটাণ্ট –"ইরিত্রিয়ায় লড়েছি, ট্রিপলিতে লড়েছি–"

"ব-ল কী? আমার ত তাহলে হাতে হাতে স্বর্গলাভ।

এ্যাডজুটাণ্ট বিরক্ত– "এখানে তোমার কর্মটা কী?"

"এই মার্কিন উর্দির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। গলায় একটু আঁটো এটা, তাহলেও মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন পরছে ত অম্লানবদনে! মিলিয়ন মিলিয়ন! পঙ্গপালের ঝাঁকেও অত পঙ্গপাল থাকে না।

ভাল কথা, ফড়িংও যে একজাতীয় পঙ্গপাল, তা তোমরা জান না নিশ্চয়ই ? ফড়িং হে, ফড়িং ! যে-প্রাণীকে আমরা ফড়িং বলি মার্কিন দেশে, সেই ফড়িং। আসলে ওটাও একরকম পঙ্গপাল। তবে সত্যিকার ফড়িংয়েরা হল আকারে ছোট, বর্ণে সবুজ, কমজোরী দুব্‌লাও বটে। তোমরা যেন আবার ঝিল্লীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না ফড়িংকে। ঝিল্লীরা সাত বচ্ছর বাঁচে। ক্রমাগত একটা বিটকেল আওয়াজ করে, যা ঠিক এক্ষুণি আমি বার করতে পারছি না গলা দিয়ে। কানে যেন ক্রমাগত বাজছে সেই আওয়াজ, কিন্তু গলা দিয়ে বার করা—উঁহু—যদি কিছু মনে না করেন, এ-ভাষণ আমি এইখানেই শেষ করতে চাই—"

"আপনি আহত হয়েছিলেন বোধ হয় ?"—জিজ্ঞাসা করল এ্যাডজুটান্ট—"মাথায় ? মাথার ভিতর তালগোল পাকিয়ে যায় সময় সময় ?" একটা রানারকে বলল এ্যাডজুটান্ট,"মেজরকে বল,মার্কিন ড্রার্দি অসুস্থ বোধ করছেন—"

নিক এ্যাডামস এ্যাডজুটান্টের কথায় কান দিচ্ছে না—সর্বসাধারণের দিকে দরাজ ভাবে হাত নেড়ে জিজ্ঞাসা করছে—"আমার যা বলার ছিল, তা বলেছি। কেউ যদি তা-না বুঝে থাকেন, বলুন। প্রশ্ন করে করে জেনে নিন। এই বেলা জেনে নিন। আমি চলে গেলে কে আর বুঝিয়ে দেবে আপনাদের ? কী বলছেন ? সবাই সব বুঝেছেন ? বহুৎ আচ্ছা। তা হলে শেষ করবার আগে আমি আপনাদের সেই সারগর্ভ মহামূল্য উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কার উক্তি, জানেন ? স্যর হেনরি উইলসনের। কী উক্তি, জানেন ? 'হয় তোমরা অন্যদের শাসন কর, নয় ত তৈরী থাক, অন্যেরাই তোমাদের শাসন করবে।' স্মরণ রাখবেন এই উক্তি, আর বিশ্বাস রাখবেন এই মার্কিন ড্রার্দির উপরে।"

হঠাৎ নিকের কানে গেল পার্ভাসিনির কথা—"তোমার সাইকেল কোথায় রেখে এসেছিলে ?"

"শহরের ও-প্রান্তে। পারব খুঁজে নিতে। নদীর ধারে। নীচু-পানা হলদে একটা বাড়ী। জনপ্রাণী নেই তাতে। সেইখানেই রেখেছিলাম সাইকেল।"

"তোমায় এক্ষুণি অবশ্য রওনা হতে বলছি না। এখনও বেজায় রোদ্দুর। তোমার কাজ কিন্তু চমৎকার হয়েছে একটা রানার সঙ্গে দেব তোমার ? মাথাটা ঠিক নেই ত ?"

"না, না, রানার কী হবে ? আমি ঠিক খুঁজে নেব। আর এক্ষুণি বেরোনোই দরকার আমার। ফর্নাসি ত ফিরতেই হবে ! মরবার ফুরসুৎ নেই। কত-কত ছাউনিতেই যে দেখাতে হবে 'ড্রার্দি' !"

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

গরিলার অভিযান

সুরজিৎ ঘোষ

তিন্নি ও তিতলি
আর ছোট ঝিল্লী
তিন বোন সারাক্ষণ
হিল্লী ও দিল্লী
ঘুরে আসে গল্পে
খুশি নয় অল্পে
হাঙর কুমীর চাই
নয় পোষা বিল্লী।

এ'রকম হতে হতে
একদিন বিকেলে
যখন সে তিনজন
গল্পের দখলে
মশগুল হয়ে আছে
হঠাৎ দেখল কাছে
ইয়া বড় ভুঁড়িয়ালা
গরিলা, কে ঢোকালে ?

ওরে মামা, ওরে বাবা
আসছে বাগিয়ে থাবা
ভয়ে কেউ প্যাঁপোঁ করে
কেউ বা নিরেট বোবা—
কাছে এসে ভালোবেসে
গরিলা বলল হেসে,
মুখোশেই এত ভয়
আসলে কী হবে বাবা ?

ছবিঃ দিলীপ দাশ

ভূতুড়ে বাড়িতে রাত

অজেয় রায়

দুপুর একটা নাগাদ খেয়ে উঠে বারান্দায় ইজিচেয়ারে টানহয়ে দৈনিক খবরের কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছিল দীপক। এমন সময় ভবানী প্রেসের পিওন হারু এল একটা চিরকুট নিয়ে। কুঞ্জবিহারীবাবু লিখেছেন—

—অবিলম্বে একবার প্রেসে এস। দরকার আছে।

দীপক উঠে পড়ল। কি হলো আবার? কুঞ্জবাবু নতুন কোনও খবরের সন্ধান পেয়েছেন বুঝি? দীপককে তাই পাঠাতে চান। সে হারুকে বলল, 'কুঞ্জবাবুকে বল আমি যাচ্ছি এখুনি।'

বোলপুর শহরে ভবানী প্রেসের মালিক কুঞ্জবিহারী মাইতি 'বঙ্গবার্তা' নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন। দীপক বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার। বছর পঁচিশ বয়স। এটা দীপকের শখের কাজ। এর জন্য মাইনে-টাইনে কিছু জোটে না। বঙ্গবার্তা চালানোও কুঞ্জবাবুর শখ। কাগজ চালিয়ে লাভ-টাভ মোটেই থাকে না। কুঞ্জবাবুর মাথায় সদাই বুদ্ধি খেলে, কি ভাবে বঙ্গবার্তার প্রচার বাড়াবেন? কি করে কাগজখানাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবেন?

দীপক হন্তদন্ত হয়ে ভবানী প্রেসে হাজির হলো।

একটা লম্বা ঘরে ঘটাং ঘটাং করে ছাপাখানার মেশিন চলছে। তারই এক কোণে পার্টিশান-ঘেরা কুঞ্জবাবুর ছোট্ট অফিস। দরজার মাথায় সাইন-বোর্ড—সম্পাদক : বঙ্গবার্তা।

অফিস ঘরে ঢুকেই দীপক চমকে গেল। সম্পাদক কুঞ্জবাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসে এক সাহেব। কুঞ্জবাবু তৎক্ষণাৎ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সাহেবের সঙ্গে দীপকের আলাপ করিয়ে দিলেন—'দীপক রায়। রিপোর্টার। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার জলি ট্রট। আমেরিকান।'

সাহেব তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে দীপকের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বলল—'হ্যাল্লো রয়।'

ট্রটের বয়স ঠিক বোঝা গেল না। মনে হলো ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। বেজায় ঢেঙা এবং রোগা। ঝালরের মতো কাঁধ অবধি চুল। গালে চিবুকে পাতলা দাড়ি। সরু ঝোলা গোঁফ। চুল দাড়ির রং রূপোলী। লম্বাটে নাক। গোল গোল ধূসর চোখে খুশি খুশি ভাব। তার পরনে ডোরাকাটা শার্ট ও নীল রঙের মোটা কাপড়ের তাপ্পিমারা ট্রাউজার্স। পায়ে কেডস্ জুতো।

সাহেব একগাল হেসে কুঞ্জবাবুকে ইংরেজিতে বলল, 'প্লিজ ওকে বুঝিয়ে দাও।'

কুঞ্জবাবু বললেন, 'হুঁ, বস বস। ওরে হারু তিন কাপ চা নিয়ে আয়। বুঝলে দীপক, এই সাহেব ইন্ডিয়া ঘুরতে

এসেছে। ও শুনেছে, আমি একটা নামকরা উইক্‌লি পেপারের এডিটর। তাই আমাকে ধরেছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল দীপক।

'মানে ওর একটা প্রোপোজাল আছে। সাহেবদের দেশে বোধহয় ধারণা যে কাগজের লোকেরা ইচ্ছে করলে কিনা করতে পারে! দেখ তুমি যদি কিছু করতে পার ওর জন্যে।'

'আমি! আমি কি করব?' দীপক থই পায় না।

'মানে সাহেবের ইচ্ছে ও ভূত দেখবে স্বচক্ষে। ইন্ডিয়াতে ও অনেক কিছু ইনটারেসটিং জিনিস দেখেছে। এখন এই ইচ্ছেটা মিটলে ওর একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হয়। টুট চায় কোনও ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবে। মিশর দেশে ও নাকি একটা পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। ভূতও নাকি দেখেছে। এখন ইন্ডিয়াতেও এমনি একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে চাইছে। দাও না একটা ব্যবস্থা করে। তোমার তো অনেক চেনাশোনা। খোঁজ কর, এমন কোনও বাড়ি আছে কোথায়? আর পারলে তুমিও জুটে যাও ওর সংগে।'

'আমি! ভূতুড়ে বাড়িতে?' দীপক আঁতকে ওঠে।

'আরে অত নার্ভাস হচ্ছো কেন? সাহেব থাকতে পারলে তুমি পারবে না? তারপর লিখে ফেলবে অভিজ্ঞতা। দারুণ একখানা স্টোরি হবে বংগবার্তায়। খরচ-খরচার জন্যে ভেব না। সে সব সাহেব দেবে। সাহেব কিন্তু বাংলা বোঝে না। যা হোক ইংরিজিতে কথাবার্তা চালিয়ে নিও।'

'পোড়ো বাড়িতে রাত কাটালেই কি আর ভূতের দেখা পাব?' দীপক আমতা আমতা করে।

'ঠিক বলেছ। সে আমি বলে দেব সাহেবকে। তবে চেষ্টা কর সিরিয়াসলি। যদি লেগে যায়।'

কুঞ্জবাবুর সংগে দীপকের যতক্ষণ কথা হচ্ছিল ততক্ষণ টুট দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে খুব মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। কি বুঝছিল কে জানে? কুঞ্জবাবু টুটকে বললেন, 'আমি রয়কে বলে দিলাম। ও হন্টেড হাউসের খোঁজ করবে। তুমি তো ট্যুরিস্ট লজে আছ আরও তিন দিন। খবর পেলেই তোমায় জানাবে।'

টুট কৃতার্থ হয়ে দীপককে বলল, 'ভেরি ওয়েল। ভেরি ওয়েল। প্লিজ ট্রাই।'

সেদিনই দীপক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কয়েকটা পোড়ো বাড়ির সন্ধানও মিলল। তাদের মধ্যে একটাকে মনে হলো পছন্দসই। বোলপুর থেকে বেশি দূরে হলে অসুবিধা। আবার খুব জংগুলে বাড়ি হলে চলবে না। ভূতের হাতে না হোক শেষে সাপ-খোপের হাতে প্রাণটা না যায়। পরদিন সে ইলেমবাজারের কাছে পোড়ো বাড়িটা সরেজমিনে দেখতে গেল।

'ও চৌধুরী কুঠি?' নামটা শুনেই গাঁয়ের লোক দেখিয়ে দিল।

গ্রাম থেকে আধমাইল দূরে বাড়িটা। প্রকান্ড বাড়ি। ছোটখাটো প্রাসাদ বলা যায়। বাড়ি ঘিরে মস্ত কম্পাউন্ড নিয়ে উঁচু পাঁচিল। এখন অবশ্য সে প্রাচীরের অনেক অংশই ভাঙা। ইঁটের টুকরো ছড়িয়ে আছে মাটিতে। গেটহীন ফটকের কারুকার্য করা খাড়া দুই স্তম্ভ। বাড়ির দেয়ালের বহু জায়গায় পলস্তারা খসা। বাড়ির চারধারে বুনো ঝোপঝাড়। এছাড়া প্রকান্ড প্রকান্ড কয়েকটা গাছ—জাম, তেঁতুল, শিরিষ, আম ইত্যাদি। আম গাছে গুটি ধরেছে প্রচুর। বাড়ির সামনের দিকে কয়েকটা বিদেশী পাম্ গাছ লম্বা হয়ে উঠেছে এবং রয়েছে কিছু পাতাবাহার গাছও। বোঝা যায় এক সময় শৌখিন বাগান ছিল সদরে ঢোকার রাস্তার দুপাশে। বাড়ির পিছন দিকে এক মজা দীঘি—তাতে চওড়া বাঁধানো ঘাটের কংকাল। দীঘির পাড়ে পাড়ে তাল গাছের সারি। প্রাচীরের গায়ে গায়ে ভাঙা-চোরা একতলা লম্বা লম্বা কয়েকটা ঘর। এগুলো বোধহয় কাছারিবাড়ি জাতীয় কিছু ছিল একসময়। বাড়ির চারপাশে এক পাক ঘুরে দেখে দীপক খোলা সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। দো-মহলা বাড়ি। এটা সদর মহল।

দালান-ঘেরা চৌকো উঠোন। চওড়া চওড়া বারান্দা। মোটা মোটা থাম। ঘরের পর ঘর। কোনও ঘরের কপাট নেই। কোনও ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। কোনওটার বা হাট করে খোলা। জনমানবশূন্য পুরী। খাঁ-খাঁ করছে। শুধু অজস্র পায়রা আর শালিকের কলরব। নোংরা মেঝে ছাদে মাকড়সার জাল। ভ্যাপসা গন্ধ নাকে লাগে। দীপক সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। সেখানেও একই দৃশ্য। দেয়ালে দেয়ালে ফাটল। বট অশথ ডালপালা মেলেছে নানা ফোকর থেকে। দ্বিতীয় মহলটার চেহারা আরও জীর্ণ। ওদিকটায় যেতে সাহস হলো না দীপকের। সে নেমে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। পোড়ো বাড়ি সন্দেহ নেই—ভূতুড়ে হওয়াই স্বাভাবিক। যা হোক এরপর সে কাছের গ্রামটায় ঢুকল বাড়িটা সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে।

দীপক জানতে পারল যে চৌধুরী কুঠি প্রায় দুশো বছরের পুরনো। এই অঞ্চলের জমিদার ছিল চৌধুরীরা। একসময় রবরবা অবস্থা ছিল তাদের এবং বেজায় দাপট।

ক্রমে ক্রমে চৌধুরী বংশ গ্রাম ছাড়ে। বাড়িতে লোক কমে যায়। তাদের জমিদারীও গেল চলে। তবে বছর পনেরো আগে অবধি ওই বাড়িতে দুর্গাপূজো হয়েছে ফি বছর। একজন কর্মচারী ছিল বাড়িটা দেখাশোনা করতে। কৃষ্ণ চৌধুরী আসতেন পূজো উপলক্ষে কলকাতা থেকে কয়েকজন আত্মীয়স্বজন নিয়ে। পুজোয় ধুমধাম অবশ্য আর হতো না তেমন। কৃষ্ণ চৌধুরী মারা যাওয়ার পর ওই বাড়িতে চৌধুরীদের কেউ আর পা দেয়নি। বাড়িটা কেউ দেখাশোনাও আর করে না।

ও বাড়িতে ভূত আছে কি নেই? এ প্রশ্নে দু-রকম মত জানা গেল। একদল বলল, 'আলবৎ ভূত আছে। রাত্তিরে নানান বিদঘুটে আওয়াজ শোনা গেছে কুঠি থেকে।'

আর একদল জানাল, 'না না, ভূত-ফুত বাজে কথা। তেমন কিছু কেউ দেখেনি কখনো।' তবে রাতে ও বাড়িতে কাটায়নি কেউ। বাড়িটা ভূতুড়ে কিনা যাচাই করার মতো সাহস বা উৎসাহ হয়নি কারও।

দীপকের মনে ধাঁধা লাগে। সে আবার গেল চৌধুরী কুঠিতে। বাড়ি দেখতে দেখতে ভাবল—সাহেবকে নিয়ে রাত কাটাতে এ বাড়িটায় ঠিক হবে। ভিতরের উঠোনে অল্প আগাছা থাকলেও বাড়িটা মোটামুটি চলনসই। এখানেই আসব সাহেবকে নিয়ে। তারপর ভূত-ফুতের দেখা পাওয়া বা না পাওয়া সাহেবের বরাত। সে তো জানিয়েই রেখেছে কুঞ্জবাবুকে, ভূত দেখাতে পারব বলে কথা দিতে পারছি না। সত্যি বলতে কি, তার নিজের মনেও ভূত-প্রেতের দর্শন পেতে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। এই বিশাল নির্জন বাড়িতে রাত কাটানোর একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলেই যথেষ্ট। তাই নিয়েই জমিয়ে লেখা যাবে।

চৌধুরী কুঠির বাইরে ইতিউতি ঘুরতে ঘুরতে দীপক হঠাৎ দেখল কে একজন আসছে তার দিকে। লোকটির চেহারা ছোটখাটো। শ্যামবর্ণ। ফতুয়া ও ধুতি পরা। খালি পা। প্রৌঢ়। মাথার অর্ধেক জুড়ে টাক। বাকি চুল কাঁচাপাকা। ঝুনো নারকেলের মতন মুখখানা। ছোট ছোট চোখ। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু। ভদ্রলোক হাসি মুখে নমস্কার করলেন দীপককে। তারপর বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? এই বাড়িতে ভূত আছে কিনা তাই নিয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন? আমি শুনেছি সব।'

দীপক মাথা চুলকে বলল, 'মানে একজন সাহেব—'

'কে সাহেব? কি ব্যাপার?'

'মানে একজন সাহেব এসেছে ইণ্ডিয়া বেড়াতে। ও এখানে কোনও ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাতে চায়। মানে যদি কিছু অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। মিশর দেশে সাহেব নাকি এমনি এক এক্সপিরিয়েন্স করে এসেছে। তাই ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছি।'

'আপনি কে?'

'রিপোর্টার। বঙ্গবার্তা কাগজের।' বলতে বলতে দীপক পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে এগিয়ে দিল।

ভদ্রলোক দীপকের কার্ড হাতে নিলেন না। সেখান থেকেই এক নজরে কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'তা সাহেব ভূত দেখতে চায় কেন?'

দীপক বলল, 'কৌতূহল আর কি! তাছাড়া হয়তো দেশে ফিরে বই লিখবে। তখন এই ধরনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা থাকলে বই কাটবে বেশি।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'হুম্। তা কি রকম অলৌকিক অভিজ্ঞতা চায় সাহেব?'

'তা কিছু বলেনি।'

'বেশ, ব্যবস্থা হতে পারে,' বললেন লোকটি।

'মানে!' দীপক অবাক, 'কি ভাবে?'

'সে আমি ব্যবস্থা করব। তবে কিছু খরচা করতে হবে

সাহেবকে। পারবে?' ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে চতুর হাসি, চোখ পিটপিট করছে।

দীপক ঝট্ করে বুঝে ফেলল ইঙ্গিতটা। অর্থাৎ উনি কোনও সাজানো ব্যাপার দেখাতে চান সাহেবকে। সাহেব দেখে ভাববে অপার্থিব দৃশ্য। ভূতুড়ে কান্ড। আচ্ছা লোক তো! বুদ্ধি বটে! দীপক জিজ্ঞেস করল, 'আজ্ঞে আপনার পরিচয়?'

'আমি ব্রজগোপাল রায়। এই পাশের গাঁয়েই নিবাস। আমার বাপ ঠাকুদ্দা চৌধুরীদের সেরেস্তায় কাজ করেছেন। চৌধুরী বংশের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা।' বেশ গম্ভীর চালে বললেন ভদ্রলোক।

'সাহেব বিশ্বাস করবে তো?' দীপক খুঁতখুঁত করে।

'আলবৎ করবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি।' জোরের সঙ্গে বললেন ব্রজগোপাল রায়।

'কি রকম খরচা লাগবে?' দীপক জানতে চাইল।

উত্তর হল, 'অন্তত শ চারেক।'

দীপকের মনে দ্বিধা। সাহেবকে ঠকাবে? কিঞ্চিৎ মজাও লাগছে। হোক নকল। ধরা না পড়লে ক্ষতি কি? যেমন উদ্ভট শখ!

দীপক ব্রজবাবুকে বলল, 'যদি সাহেব রাজী হয়, আপনাকে জানাব কি ভাবে?'

ব্রজ রায় বললেন, 'জানাবার দরকার নেই। রাজী হলে পরশু সাহেবকে নিয়ে চলে আসবেন এখানে। সন্ধ্যের দিকে আসবেন। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে কিন্তু আসবেন না। ভিন্ন পথে, ওই মাঠের দিক থেকে কুঠিতে ঢুকবেন লুকিয়ে। ওই ধারটা ফাঁকা। গাঁয়ের লোক যেন কিছু টের না পায়। তাহলে সব এসে জুটবে মজা দেখতে। আমাদের প্ল্যান ভেস্তে যাবে। টাকা যা বললাম, সেদিন সঙ্গে আনবেন ঠিক, নগদে। রাতে যে কোনও একটা খোলা ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করবেন দু'জনে। বাইরে বারান্দায় থাকবেন না। তারপর শব্দ-টব্দ পেলে সাহেবকে নিয়ে দেখতে বেরুবেন। তখন দেখতে পাবেন কোনও একটা ঘরে অতীতের কোনও অলৌকিক দৃশ্য। সে ঘরে ঢুকবেন না যেন। বাইরে থেকে দেখবেন। কোনও ভয় নেই। কথা দিচ্ছি ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ থাকবে।' ব্রজবাবুর আবার সেই মিটিমিটি হাসি।

দীপক একটু ইতস্তত করে বলল, 'বুঝলেন, খুব ভয়ংকর কোনও সীন না দেখানোই ভাল। সাহেব যদি ভয় পেয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়?

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আশ্বাস দিলেন ব্রজ রায়।

ব্রজবাবু বিদায় নিলেন। উত্তেজিত শঙ্কিত দীপকও

কি ব্যাপার বলুন তো?

ফিরল বোলপুরে।

বঙ্গবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারীকে ব্রজরায়ের প্ল্যানটা জানাল না দীপক। জলি ট্রটের সঙ্গে আলাদা দেখা করে বলল যে চারশো টাকা খরচ লাগবে। চৌধুরী কুঠিতে রাত কাটানোর ভাড়া। ওই বাড়ির বংশধররা চেয়েছে।

ট্রট এক কথায় রাজী। বের করে দিল টাকাটা। পরশু দিন চৌধুরী কুঠিতে যাওয়ার প্রোগ্রামও ঠিক হয়ে গেল।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে দীপকরা চৌধুরী কুঠিতে ঢুকল। ইলেমবাজার অবধি এসেছিল বাসে। তারপর পুরনো মন্দির দেখবার ছল করে হাঁটতে হাঁটতে গা-ঢাকা দিয়ে দু'জনে কুঠিতে ঢুকেছে।

দু'জনে সদর মহলের একতলা দোতলা ঘুরে ঘুরে দেখল। ট্রটের ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয় মহলটাও দেখে। দীপক

রাজী হল না। চৌধুরী কুঠি দেখে টুট মুগ্ধ। বারবার বলতে লাগল–'এ খাঁটি ভূতুড়ে বাড়ি। আমি টের পাচ্ছি। এ রিয়েল হন্টেড হাউস।'

রাত হয়ে আসছে। একতলায় একটা দরজা-খোলা ঘর বেছে নিল তারা। বসল একটা ভাঙা তক্তপোশে। একটা মোমবাতি জ্বালানো হল। এরপর প্রতীক্ষার পালা।

নিঝুম রাত। নিস্তব্ধ পুরী। না, একেবারে কোনও শব্দ নেই বলা যায় না। বিচিত্র কীট-পতঙ্গের ডাক; বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি, আরও কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ কানে আসে। একটা চামচিকে সাঁ সাঁ করে ঘুরপাক খেয়ে গেল মাথার ওপর। দীপকের রীতিমত গা ছমছম করে। টুট আড়ষ্ট–চোখ বড় বড়। সর্বদা মনে হচ্ছে এইবার অলৌকিক কিছু ঘটল বুঝি। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি। ঘরের ক্ষীণ আলোকশিখায় বাইরের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

সময় এগিয়ে চলে। ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে দু'বার গরম কফি খেল দু'জনে। টুট একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছে।

রাত বারোটা বাজল। হঠাৎ দীপকের কানে ধরা পড়ে একটা আওয়াজ–খুব মৃদু। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। দীপক কান খাড়া করে শোনে। টুটের দিকে তাকিয়ে বুঝল শব্দটা সেও শুনেছে। মিনিট পাঁচ-সাত চুপ করে শুনে দীপক উঠল। এগিয়ে গেল দরজার বাইরে। টুট অনুসরণ করল তাকে।

কিছুদূরে একতলার একটা ঘরের জানলা দিয়ে এক ফালি আলো নজরে পড়ল দীপকের। ও ঘরে আলো কেন? দীপক পা টিপে টিপে চলল ওই জানলার কাছে। আওয়াজটা আসছে ওইখান থেকেই।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। খড়খড়ি লাগানো জানলার কপাটও বন্ধ। কিন্তু একটা খড়খড়ির কাঠ ভাঙা। সেই ফাঁকে চোখ লাগালো দীপক।

প্রকাণ্ড হল ঘর। ঝলমল করছে। লম্বা লম্বা শৌখিন বাতিদানে জ্বলছে বড় বড় কয়েকটা মোমবাতি। ঘরে অনেকগুলি মানুষ। ঘরের মাঝখানে নাচছে রঙিন ঘাগরা ও চেলি পরা একটি অল্পবয়সী সুন্দরী। তারই পায়ের নূপুরে নিক্কণ উঠছে–ঝুম্ ঝুম্। মেঝেয় শতরঞ্জিতে বসে মিঠে সুরে গাইছে একটি মাঝবয়সী রমণী। পাশে বসে বাজাচ্ছে তবলচি ও সারেঙ্গীবাদক। নর্তকীর সামনে দীপকদের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া এক পুরুষ।–বিপুল দেহ। পরনে কোঁচানো ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি। হাতে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে বাহবা দিচ্ছে। লোকটিকে দেখে মনে হয় জমিদার গোছের কেউ হবে। ঘরের কোণে দূরে দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, সম্ভবত পরিচারিকা এবং একজন ভৃত্যশ্রেণীর লোক।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি বড় বড় ছবি–চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো, হাতে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এছাড়া দেয়ালে ঝুলছে একটা মস্ত আয়না ও কয়েকটা চকচকে তরোয়াল, বর্শা, ঢাল। ঘরে কিছু পুরনো আমলের চেয়ার। ধূপের সুগন্ধ ভেসে আসে।

ঘুরে ঘুরে দ্রুত পায়ে নেচে চলছে মেয়েটি। তার পোশাকের কাঁচের চুমকিতে ও গায়ের গয়নায় আলো পড়ে ঠিকরোচ্ছে।

টুট রুদ্ধশ্বাস, তাজ্জব। কারণ ঘণ্টাকয়েক আগে এই জলসাঘরেই সে উঁকি মেরে দেখে গিয়েছিল একদম ফাঁকা।

দীপক চমৎকৃত। বাঃ, ব্রজ রায়ের এলেম আছে! এরমধ্যেই কি দারুণ একটা দৃশ্য তৈরি করে ফেলেছেন! জমিদার বাড়ির উপযুক্ত বটে। ওই যে নাচছে ও কি সত্যিকার মেয়ে? না যাত্রা পার্টির মেয়ে-সাজা ছেলে? তবে নাচছে খাসা।

দু'জনে নিথর হয়ে দেখে।

বোধহয় মিনিট পনেরো এই ভাবে কেটেছে। হঠাৎ দীপক দেখল ঘরে উল্টো দিকের খোলা জানলায় একটা মুখ। তার রং কালো। পাকানো মোটা গোঁফ। বাবরি চুল। লোকটি ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তারপরই সে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। গায়ে ফতুয়া, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। লোকটির পিছন পিছন আরও তিনজন লোক জানলা পথে লাফিয়ে ঢুকল ঘরে। তাদের চেহারাও অনেকটা প্রথম জনের মতন। হাতে তাদের লাঠি ও তরবারি।

চমকে উঠে থেমে গেল নাচ, গান, বাজনা। ধড়মড় করে উঠে বসল আধশোয়া পুরুষটি। প্রথম আগন্তুকের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল–'কে? কে? একি মহিম তুমি! কি মতলব?'

প্রথম আগন্তুক গম্ভীর ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'প্রতাপ চৌধুরী ইষ্টনাম স্মরণ কর। আজ তোমার শেষ দিন।' বলতে বলতে মহিম ঝট্ করে টেনে বের করল কোমরে গোঁজা একটা পিস্তল। তাক করে ধরল প্রতাপ চৌধুরীর দিকে।

অসহায় প্রতাপ চৌধুরী আর্তস্বরে বলে উঠল, 'কি চাও তুমি? বল, কত টাকা? প্রাণে মের না, দোহাই।'

'টাকা?' মহিমের কণ্ঠে শাণিত বিদ্রূপ, 'তোমার অত্যাচারে আমি ভিটে-মাটি খুইয়ে ডাকাত হয়েছি। আমার ছোট ভাইকে তুমি খুন করেছ। টাকা দিয়ে তা পূরণ করতে চাও? না না, তোমাকে প্রাণ দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অনেকদিন তক্কে তক্কে থেকে আজ তোমায় বাগে পেয়েছি প্রতাপ চৌধুরী। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।'

সহসা প্রতাপ চৌধুরী চিৎকার করে উঠল, 'এই কে আছিস?' সংগে সংগে উঠে পালাতে গেল মরিয়া হয়ে।

দুম্ দুম্। দু দু-বার গর্জে উঠল মহিমের পিস্তল।

'আঃ।' কাতর আর্তনাদের সংগে বুক চেপে ঢলে পড়ল মাটিতে প্রতাপ চৌধুরী।

মহিমের তিন সংগী এতক্ষণ অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছিল ঘরের অন্য কয়েকজনকে। যাতে তারা সরে পড়তে না পারে। তারা এবার বিদ্যুৎবেগে ঘা মেরে ফেলে দিল জ্বলন্ত মোবাতিগুলো। দপ্ দপ্ করে নিবে গেল তাদের শিখা। ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে অমনি শুরু হলো তুমুল কান্ড।–ধুপ্‌ধাপ্, দুমদাম। ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। ছোটাছুটির শব্দ। সংগে সংগে ঘরের বাইরে নানা দিক থেকে হাঁকডাক শোনা গেল–'খবরদার! খবরদার!' কারা দৌড়ে আসতে লাগল এই দিকে।

'হাঃ হাঃ হাঃ'–বিকট অট্টহাসি ধ্বনিত হল ঘরের ভিতরে।

হঠাৎ তীব্র আলোকরশ্মি পড়ল ঘরে। জানলার ফাঁক দিয়ে জলসাঘরে টর্চ ফেলেছে টুট। এক ঝলক দেখা গেল–ছুটন্ত ঘাগরা, উল্টে পড়া চেয়ার। কুঁকড়ে শোয়া প্রতাপ চৌধুরী। ঝকঝকে তরবারি। কয়েকজন কৃষ্ণকায় পুরুষ...

ঠাস্ করে কিছু একটা লাগল টুটের টর্চে। হাত থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল টর্চ। দীপক টুটের জামা ধরে টান মেরে ফিসফিস করল–'চলে এস শিগগিরি। নইলে বিপদ হবে।'

ঘাবড়ে গিয়ে টুট কোনওরকমে টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে দীপকের সংগে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকল তাদের আগেকার আস্তানায়। ঘরে মোমবাতিটা তখনো জ্বলছিল। দু'জনে কাঠ হয়ে বসে থাকে। বাইরে হল্লা শোনা যাচ্ছে–'খবরদার। খবরদার। খুন খুন। ডাকু ডাকু–'

টুট ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলল, 'মাই গড। মার্ভেলাস। হন্টেড হাউস। সুপারন্যাচারাল। ভূতুড়ে ব্যাপার। তাই না?'

নীরবে মাথা নেড়ে দীপক জানাল–'হাঁ। সে ভাবছিল–ওঃ সাহেব দিয়েছিল প্রায় ভণ্ডুল করে। অমন আচমকা টর্চ মারবে কে জানতো? ভাগ্যিস সন্দেহজনক কিছু দেখে টেখে নি। ব্রজবাবু ওর হাত থেকে টর্চটা ছিটকে ফেলে দিয়ে খুব ম্যানেজ করেছে। তবে হ্যাঁ, মার্ডার-সীন যা করেছেন ব্রজবাবু, টেরিফিক। দীপক অবধি শিউরে উঠেছিল। হকচকিয়ে গিয়েছিল।

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে বাইরের গোলমাল ক্রমে শান্ত হয়ে এল। আবার সব নিঝুম।

ব্রজগোপাল রায় তো গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল!

ভোরের আলো ফুটতেই ঘর ছেড়ে বেরুল দু'জনে। তেমনি জনহীন অট্টালিকা। টুট বলল, 'দাঁড়াও, সেই ঘরটা একবার দেখে আসি।'

দীপকও খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকাল জলসাঘরের ভিতরে। সেখানে তখন গতরাতের আসবাবপত্র, ছবি, আয়না বা অন্য কিছু নেই। ধুলোজমা আধো অন্ধকার শূন্য ঘর। নিপুণ ভাবে গতরাতের ঘটনার সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। টুটের মুখ দিয়ে শুধু বেরুল–'স্ট্রেঞ্জ!'

সদর দরজার বাইরে আসতেই কিছু দূরে ব্রজ রায়কে দেখতে পেল দীপক। টুটকে অপেক্ষা করতে বলে দীপক এগিয়ে গেল ব্রজবাবুর কাছে।

'কেমন দেখলে সাহেব? শখ মিটেছে?' মুচকি হেসে বললেন ব্রজবাবু।

'দারুণ। সাহেব একেবারে মাত হয়ে গেছে। ভেবেছে সব সত্যি, আপনার বাহাদুরি আছে মশাই। নাটক-ফাটক করান নাকি?' দীপক উচ্ছ্বসিত।

ব্রজবাবু একটু হাসলেন।

'আপনার টাকাটা'—চারশো টাকা এগিয়ে দিল দীপক।

ব্রজবাবু বললেন, 'আমি নেব না। নন্দকে দেবেন। নন্দগোপাল রায়। এই পথে ওই গাঁয়ে ঢুকতে প্রথম বাড়ি। সামনে মস্ত তেঁতুল গাছ। নন্দকে বলবেন, আপনার কাছে এই টাকাটা আমার পাওনা ছিল। ওকে দিতে বলেছি আমি। তবে কি জন্যে পাওনা সেটা কিন্তু ফাঁস করবেন না। আচ্ছা চলি। নমস্কার।'

হনহন করে হেঁটে ব্রজবাবু অদৃশ্য হলেন গাছপালার আড়ালে।

গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে টুটকে পথের ধারে বসে কফি খেতে বলে দীপক একাই গেল। নজরে পড়ল একটা প্রকান্ড তেঁতুল গাছ। পিছনে একটি ছোট্ট মাটির বাড়ি। বাড়ির সামনে খাটিয়ায় বসেছিল এক যুবক, হাতে দাঁতন কাঠি। দীপক জিজ্ঞেস করল তাকে, 'নন্দগোপাল রায় আছেন?'

'আজ্ঞে আমি।' সাতসকালে এক শহুরে বাবুকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল যুবক।

সারা রাত জেগে কাহিল, তাই ভণিতা না করে দীপক সোজাসুজি বলল, 'এই টাকাটা নিন। ব্রজবাবু মানে ব্রজগোপাল রায়মশাই আপনাকে দিতে বলেছেন। আমার কাছে এটা ওঁর পাওনা ছিল।'

লুব্ধভাবে হাত বাড়িয়েই নন্দগোপাল থমকে গিয়ে বলল, 'কি বললেন? ব্রজগোপাল রায় বলেছেন! কবে?'

'আজই ভোরে!' জানাল দীপক।

'এ্যাঁ! কোথায়?'

'চৌধুরী কুঠিতে। ওঁর সংগে আজই আমার ওখানে দেখা হয়েছে।'

'সেকি! ব্রজগোপাল রায় তো গত হয়েছেন পাঁচ বছর হলো!'

'এ্যাঁ! ঠিক বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমার বাবা।' জবাব দিল নন্দগোপাল।

স্তম্ভিত ভাবে তাকিয়ে থেকে দীপক বলল, 'আচ্ছা প্রতাপ চৌধুরী কে?'

'চৌধুরী বংশের এক জমিদার। অনেক কাল আগের লোক। আমার ঠাকুদ্দার বাবার সময়কার।'

'কেমন লোক ছিলেন?'

'শুনেছি ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। এক রাতে চৌধুরী বাড়ির জলসাঘরে খুন হন।'

চকিতে দীপকের মাথায় খেলে—তবে তো কাল রাত্তিরে যা দেখলাম, সাজানো নকল নয়। সত্যি অলৌকিক।

সে খানিকক্ষণ থ হয়ে থেকে নোটগুলি নন্দগোপালের হাতে গুঁজে দিল—'এই নিন', বলেই সে ফিরে চলল।

ছবি : সুশান্ত বিশ্বাস

খেলছে লালু খেলছে ভুলু
দীপু পাপু আর ভুতো,
সবার গায়ে নতুন পোষাক
পায়ে কিন্তু খাদিমের জুতো

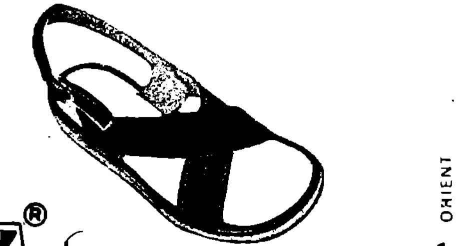

KHADIMS' BUTEX
উৎসবে অপরিহার্য
খাদিমের জুতো

কে, এম, খাদিম অ্যাণ্ড কোং
১৫০বি, লোয়ার চিৎপুর রোড (২৯এ, রবীন্দ্র সরণী)
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, ফোন : ২৬-৭৬৬৪

ফাংশান-পাগল গনুদা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নাকটা মুখের তুলনায় অনেক লম্বা। থুতনিটা নেই বললেই হয়। চোয়ালটা যেন ঠোঁটের তলা থেকেই গলার দিকে চলে গেছে। লম্বা নাকটাকে শুঁড়ের মতন মনে হয়। সেইজন্যেই বোধহয় বাড়ির লোক নাম রেখেছে গণেশ। সামনের দাঁতগুলো বড় বড়, চোখ কিন্তু ছোট ছোট নয়। সুন্দর চোখ, কাব্যের ভাষায় যাকে বলে পটল-চেরা। সেই চোখের চাউনিটাও বড় মিষ্টি। সর্বদা যেন একটা হাসিমাখা স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়ছে। এই স্বপ্নটাই যেন ঝরে পড়ছে। ওঁর পানের ছোপ লাগা বড় বড় ফাঁক ফাঁক দাঁতগুলোর ওপরও। পুরো নাম গণেশ গাঙ্গুলী। সবাই ডাকে গনুদা বলে। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরাও ডাকে গনুদা, তাদের বাবা-মারাও বলে গনুদা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। প্রৌঢ় হলেও পাড়ার কিশোর, তরুণ আর যুবকরা ওর বন্ধু। এই বন্ধুত্বের একমাত্র হেতু ফাংশান। গনুদা ছোটবেলা থেকে ফাংশান-পাগল। তখন এতো ঘন ঘন যেখানে সেখানে ফাংশান হতো না। একবার কোনো এক আর্টিস্ট হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর পরিবারকে সাহায্য করবার জন্যে নিউ এম্পায়ারে একটা ফাংশান হলো। গাইতে এসেছিলেন তখনকার দিনের তিন দিকপাল গায়ক—অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক আর শচীনদেব বর্মন। গনুদা এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হলে ঢুকে এঁদের গান শুনে মুগ্ধ।

এ যে একেবারে রেকর্ডের মতন গাইছে রে! গনুদা তাঁর বন্ধুকে ফিসফিস করে বলেন।

বন্ধুও মাতব্বরের মতন জবাব দেয়—আরে এঁরাই তো রেকর্ডে গান।

আমি ভাবতাম-রেকর্ডে কোনো কায়দা আছে। —

চুপ কর এখন, শুনতে দাও।

পঙ্কজ মল্লিক তখন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গান ধরেছেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। গান তো নয় যেন একটা কান্না! গনুদা অবাক হয়ে বলেন, এ যে রেকর্ডের চেয়ে ভাল গাইলেন। গনুদার মনের আকাশ, শরৎকালের মেঘের মতো সেই হাসিমাখা স্বপ্নে ছেয়ে গেল।

কলেজের অ্যানুয়েল ফাংশানে সব মাঝারি নামকরা গায়ক-গায়িকারা এসে সামান্য ২০।২৫ টাকা নিয়ে গান গেয়ে যেতেন। গনুদা সেবার সোশ্যাল সেক্রেটারি। তিনি

ঘোষণা করলেন, তোমরা বেশি করে টাকা তোল, আমি কৃষ্ণচন্দ্র, পংকজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মনকে আমাদের ফাংশানে নিয়ে আসব।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে, জেনারেল সেক্রেটারি বিনয় রায় সবিস্ময়ে বলেন।

দেখ না—বলে গনুদা সোজা চলে গেলেন ঐ তিন শিল্পীর বাড়ি। প্রথমেই ধাক্কা খেতে হলো কৃষ্ণচন্দ্র দের বাড়িতে গিয়ে, তিনি বোম্বে চলে গেছেন। পংকজ মল্লিক, শচীন দেব এই নাক লম্বা কিশোরটির উৎসাহ দেখে বিস্মিত হন। পংকজ মল্লিক মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি খুব নস্যি নাও? গনুদা সলজ্জে মাথা হেঁট করে স্বীকার করেন, একটু একটু।

বেশি নিও না—পংকজবাবু ঠাট্টা করে বলেন, তাহলে তোমার নাককে আর সামলাতে পারবে না। তোমাদের ফাংশান কবে?

মাথা চুলকে গনুদা বলেন, আগামী শনিবার। আপনাকে কত প্রণামী দিতে হবে?

প্রণামী! পংকজবাবু গম্ভীর ভাবে গনুদাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি?

গণেশ গাংগুলী।

গাংগুলী। তার মানে তুমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পৈতে হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা বামুনের ছেলে, আমি তো মল্লিক, বেনে, আমাকে তুমি প্রণামী দেবে, তাহলে যে আমার পাপ হবে।

গনুদার মনে হলো পংকজবাবু বোধ হয় গাইবেন না। এইভাবে কথার মারপ্যাঁচ করে এড়িয়ে যাচ্ছেন। গনুদা কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। তিনি জানতেন পংকজবাবু রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। গনুদার এক বন্ধু শান্তিনিকেতনে পড়ত। তার কাছে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটা চমৎকার কথা বলেছেন। সেইটে মনে পড়ে গেল। গনুদা সসংকোচে আবার বলেন, একটা কথা বলব পংকজদা?

বল।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন ভারতবর্ষে মাত্র তিনটি ব্রাহ্মণ আছেন। সি এফ এন্ড্রুজ, শ্রী অরবিন্দ আর মহাত্মা গান্ধী। আর সব বেনে। সেই কথা শুনে ক্ষিতিমোহনবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনিও বেনে? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমিও লেখা বেচে পয়সা নেই।

কথাটা শুনে পংকজ মল্লিক চমকে উঠলেন। ভালোও লাগল। গনুদাকে বললেন, ঠিক আছে, যাব তোমাদের কলেজের ফাংশানে।

গনুদা কিন্তু আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে আসেন, কিন্তু দাদা প্রণামীটা—

পংকজবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, সে পরে ভাবা যাবে। আমি যাব তোমাদের ফাংশানে। তারিখটা বলে যাও। পরে আমার কাছ থেকে সময়টা জেনে যেও কখন যাব—বলে বাড়ির ভেতর থেকে ডায়েরি আনিয়ে dateটা লিখে রাখলেন। সত্যি গনুদাদের সেবারের কলেজের অ্যানুয়েল ফাংশানে পংকজ মল্লিক এসেছিলেন এবং একঘণ্টা গান গেয়েছিলেন। গানের শেষে গনুদা একটা খামে করে একশোটা টাকা পংকজবাবুর হাতে দিলেন। পংকজবাবু একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন—এটা কী?

গনুদা এবার নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, আপনার দক্ষিণা সামান্য, একশো টাকা।

পংকজ মল্লিক হাসিমুখে গনুদার পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বললেন, খুব টাকার গরম হয়েছে, না? নাও—ঐ একশো টাকার খামটা গনুদার হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। এই টাকাটা তোমাদের পুয়োর বয়েজ ফান্ডে জমা দিয়ে দিও। বলে সবাইকে স্তম্ভিত করে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। সকলের কানে তখন পংকজবাবুর একটু আগে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানটার মানে যেন নতুন করে বুঝে ফেলল সবাই—"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে, মন মোর নহে রাজি।"

রাতারাতি সমস্ত কলেজে নাকু গাংগুলী (গনুদাকে কলেজের ছেলেরা নাকু গাংগুলী বলে ডাকত) হিরো হয়ে গেল। গনুদাকেও তারপর থেকেই ফাংশানে পেয়ে বসল। যেখানে ফাংশান সেখানেই গনুদা, যেখানে গনুদা সেখানেই ফাংশান।

গনুদা বি. এ. পাশ করে একটা অফিসে মোটামুটি একটা কাজ পেয়ে গেলেন। সেই অফিসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বোম্বে থেকে মান্না দে, ঢাকা থেকে ফিরোজা বেগমকে এনে রবীন্দ্র সদনে একটা জমজমাট ফাংশান করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

পাড়ায় পুজোর পর ছেলেরা গনুদাকে ধরল, গনুদা পুজোর প্যান্ডেলে একটা ফাংশান করব। গনুদা গম্ভীর ভাবে পান চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বাজেট কত?

ছেলেরা বলে, ম্যাক্সিমাম তিন হাজার।

হবে, গনুদা একটু ভেবে উত্তর দেন। তবে, একজন

Growing range of Gen-Set for the growing need of industry

Kirloskar

DIESEL GENERATING SET

A CLASS BY ITSELF

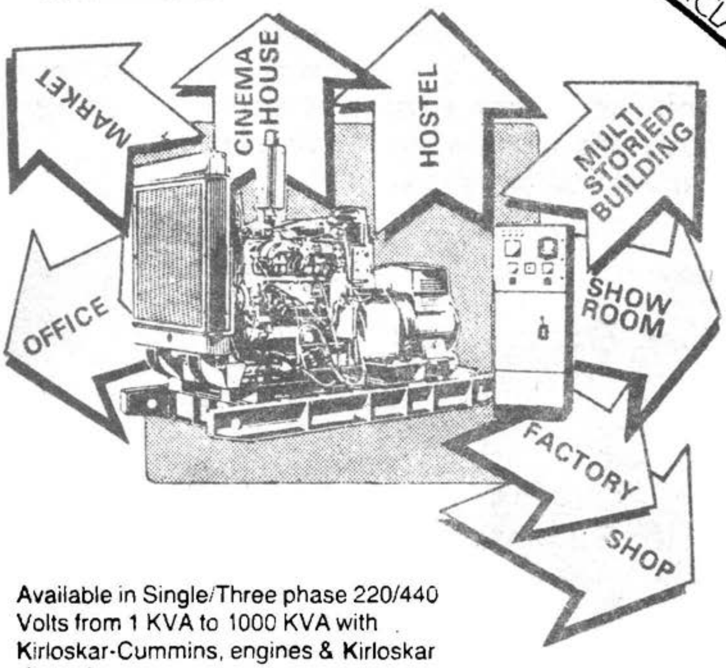

Available in Single/Three phase 220/440 Volts from 1 KVA to 1000 KVA with Kirloskar-Cummins, engines & Kirloskar alternators

Contact Authorised OEM & Distributor

VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES (P) LTD.

19 Ganesh Chandra Avenue Calcutta-700013
Phones: 27-6813
27-6817
Telex: 021-4394(VINY)
Gram: VINEETELEC

Authorised Selling House of Kirloskar Products

নামকরা আর্টিস্ট পাবে, বাদ বাকি বি ক্লাস।

ছেলেরা আবদার করে, প্লিজ গনুদা, হেমন্ত আর হৈমন্তীকে অন্ততঃ আনো।

আরে হেমন্তদা আজকাল প্যান্ডেলে গান না, হৈমন্তীকে চেষ্টা করতে পারি।

গনুদার চেষ্টায় সত্যিই পাড়ার ছেলেদের পুজো প্যান্ডেলে ফাংশানটা মোটামুটি ভালই হলো। সতীনাথ মুখার্জী, উৎপলা সেন, হৈমন্তী শুক্লা, অমৃত অরোরা ও আরও অনেকে। গনুদা এঁদের হাতে পায়ে ধরে, কমেই রাজি করিয়েই এনেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ছেলেরা তিন হাজার দেবে বলেছিল কিন্তু কার্যকালে গনুদার হাতে বাইশশ টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, এতেই ম্যানেজ কর।

কি করে ম্যানেজ করব?

গনুদা হতভম্ব হয়ে যান। ভাগ্যিস সেদিন মাইনে পেয়েছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে চুপি চুপি নিজের স্ত্রী আর কন্যাকে না জানিয়ে যেন নিজের টাকা নিজেই চুরি করছেন, এই ভাবে বাকি আটশ টাকা এনে কোনো রকমে ম্যানেজ করলেন।

গনুদার বয়স হয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে, অথচ গনুদার ফাংশানের প্রতি আকর্ষণ যেন দিন দিন বেড়ে গেছে। গনুদার স্ত্রী খুবই বিরক্ত এই জন্যে। কিন্তু গনুদার ফাংশানের নেশা কিছুতেই কাটাতে পারলেন না। পাড়ায় কোথাও না কোথাও ফাংশান হলে, তারা গনুদার কাছে ছুটে যাবে। কারণ প্রত্যেকটি আর্টিস্ট। হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, উৎপলা, সতীনাথ, তরুণ ব্যানার্জী, দ্বিজেন, হৈমন্তী, অরুন্ধতী, রবি ঘোষ, ভোলা, প্রদীপ, গৌরী, জগন্নাথ, সবাই গনুদাকে ভালবাসে। বিশ্বাস করে। সুতরাং গনুদা হলে ফাংশান হবেই। টাকা কম পড়লে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আজকাল গনুদা ফাংশানে, নিজের থেকেই হাজার খানেক টাকা পকেটে নিয়ে আসেন। যদি শর্ট পড়ে। এবং পড়েই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই টাকা ফেরত পান না।

গনুদা পান চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বাজেট কত?

গনুদার মেয়ে, গনুদাই আদর করে নাম রেখেছেন সন্তোষী। কারণ গণেশের মানসকন্যার নাম সন্তোষী। মেয়ের ডাকনাম সোন্তী। সোন্তীর বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। পাত্র-পক্ষ খুবই ভালো, কোনো চাহিদা নেই, তবু গনুদা তো একটি মাত্র মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে ভালো করে খাওয়াবেন ঠিক করেছেন। তাতেও অন্তত তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে। গনুদা বাড়ির লোককে সান্ত্বনা দিলেন—কোনো চিন্তা কোর না—হয়ে যাবে। হয়ে যাবে তো বললেন—ব্যাংকে কোনো রকমে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তিরিশ হাজার টাকাই আছে।

গনুদার সাংগোপাংগরা গনুদাকে পরামর্শ দিল—গনুদা তুমি তো ফাংশান মাস্টার। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে বোম্বের বড় বড় আর্টিস্টদের নিয়ে একটা ফাংশান লাগাও সোন্তীর বিয়ের সব টাকা উঠে আসবে।

ঠিক বলেছিস। গনুদা যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বোম্বে ছুটলেন। আর্টিস্টদের কায়দায় আনতে গনুদা সিদ্ধহস্ত। ছোটবেলা থেকে এই করছেন। তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন। পাঁচ লাখ টাকা খরচ। একটা দু লাখ টাকার ফাইনেনসার পেলেন, তাতেই প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ আর্টিস্টদের অ্যাডভান্স, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম বুক করা। টিকিট ছাপিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। তারপর হু হু করে টিকিট বিক্রি হবে।

স্ত্রী জানতে পারলেন। বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

গনুদা নির্বিকার ভাবেই পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন?

দুমাস পর তোমার মেয়ের বিয়ে। আর তুমি ফাংশান নিয়ে মেতেছ—স্ত্রী রেগেই জবাব দেন।

আর ঐ জন্যেই তো ফাংশান, গনুদা বড় বড় দাঁতে হাসি ছড়িয়ে উত্তর দেন, দেখবে ফাংশানে কি টাকা পাই। সোন্তীর বিয়েতে আলি হোসেনকে দিয়ে সানাই বাজাব।

সানাই না শিঙে ফুঁকবে, স্ত্রী গজগজ করতে করতে চলে যান।

ফাংশানের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু টিকিট আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না। সবাই আশ্বাস দিল। ক্রিকেটের টেস্ট খেলা হচ্ছে। সবাই-এর মনটা এখন ঐ দিকে পড়ে আছে। বোম্বের যিনি নামকরা গায়ক তাঁর প্রায় সব টাকাটাই পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর ফাংশানের দিন বাকি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হবে! আর্টিস্টের সেক্রেটারি ট্রাংক কলে জানাল, যেন ঐ টাকাটা ফাংশানের আগে গ্র্যান্ড হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফাংশানের দিন। সকালবেলাই দেখা গেল আরও অন্ততঃ তিরিশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হলে, তবেই কোনোরকমে খরচ উঠবে। এদিকে বোম্বের নামকরা শিল্পী গ্র্যান্ডে উঠেই, তাঁর বাকি পঁচিশ হাজার টাকার তাগাদা দিচ্ছেন। গনুদারা আশা করছেন কারেন্টে সেল উঠে যাবে। কিন্তু বোম্বের আর্টিস্ট বললেন—বেলা তিনটের সময় বাকি টাকাটা না দিলে উনি ইভনিং ফ্লাইটে বোম্বে ফিরে যাবেন। তারপর যদি টাকা পাঠান তখন দেখা যাবে। গনুদা দিশেহারা। ছুটলেন গ্র্যান্ডে। ভাগ্যিস সেখানে কলকাতার একজন নামকরা গায়ক বোম্বের এই গায়কটির সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। কলকাতার গায়কটি গনুদার খুব সুপরিচিত। আবার কলকাতার গায়কটিকে বোম্বের গায়কটি খুবই শ্রদ্ধা করেন।

গনুদা হন্তদন্ত হয়ে বম্বের আর্টিস্টকে হাতে পায়ে ধরে বলেন—কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। যদি আপনার টাকাটা ওখান থেকে না ওঠে, আমি কথা দিচ্ছি—কাল দুপুরে আপনার টাকা আমি নিজে এসে দিয়ে যাব।

হাউ ক্যান আই রিলাই ইউ? —বোম্বের আর্টিস্টটি হাসি হাসি মুখে ব্যংগ করে বললেন। কলকাতার নামকরা শ্রদ্ধেয় শিল্পীটি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—ইয়েস, ইউ ক্যান রিলাই হিম।

ঠিক হ্যায়, আপনি যেমন বুলছেন, লেকিন আপকো জামিন হতে হোবে। বোম্বের আর্টিস্ট কলকাতার আর্টিস্টকে সাবধান করে দেন। কলকাতার শিল্পীটি হা-হা হেসে বলে ওঠেন—ঠিক আছে, তবে তার দরকার হবে না।

ইনডোর স্টেডিয়ামে বোম্বের আর্টিস্টটি নেচে-কুঁদে তাঁর হিন্দী ফিল্মের অনেক হিট গান গেয়ে ঐ পাঁচ লাখ টাকা পুরো তুলতে পারলেন না। পঁচিশ হাজার টাকা কম হয়ে গেল। এখন গনুদার বোম্বের আর্টিস্টের কাছে মুখ রক্ষা কি করে হয়? গনুদাকে যে ভদ্রলোক গোড়ায় দু লাখ দিয়েছিলেন, তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি মুখের ওপর বলে দেন, অসম্ভব। এখনও গ্র্যান্ডের বিল পেমেন্ট হয় নি। কি করা যায়।

গনুদা কি আর করেন। তার পরদিন ব্যাংকে গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে মেয়ের বিয়ের জন্যে যে ত্রিশ হাজার টাকা রাখা ছিল, তার থেকে পঁচিশ হাজার তুলে, গ্র্যান্ডে গিয়ে বোম্বের আর্টিস্টকে দিয়ে এলেন। বোম্বের আর্টিস্ট ছোট্ট একটা থ্যাংকস্ দিয়ে টা-টা বলে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটলেন।

এদিকে গনুদার মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে।

মানুষ। গনুদা তাকে গিয়ে ফিসফিস করে বলেন,—শ পাঁচেক টাকা দিতে পারিস।

কেন? নরেন আমতা আমতা করে বলে। গনুদাও ঢোঁক গিলে বলেন—যদিও ছেলেগুলো আমাকে না জানিয়ে ফাংশান করছে, কিন্তু যদি কিছু টাকা শর্ট পড়ে যায়।

নরেন মৃদু হেসে পাঁচশ টাকা গনুদার হাতে দেন।

যদি না লাগে তাহলে দিয়ে যাব। না হলে, মাইনে পেলেই দিয়ে দেব। কাউকে বলিসনি—ফাংশান-পাগল গনুদা চুপি চুপি লোড শেডিং-এর অন্ধকার গলির মধ্যে মিলিয়ে যান।

রবীন্দ্র সদনে গিয়ে গনুদা স্তম্ভিত—হাউসফুল। অথচ শুনেছিলেন—সবচেয়ে কম দামী টিকিটের দাম ১০, সবচেয়ে বেশির দাম—১০০। তাছাড়া পাঁচশ থেকে হাজার টাকার কার্ডও আছে। এত বিক্রি! ফাংশানের মাস্টার গনুদা জীবনে দেখেননি। যখন স্টেজের পেছনে আধ অন্ধকারে ঢুকেছেন গনুদা, ফাংশানটা সবে আরম্ভ হচ্ছে। ড্রপ উঠল। কলকাতার সেই নামকরা গায়ক, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আজকের এই ফাংশানটা আমরা সব শিল্পীরা করেছি। কেন করেছি জানেন? কলকাতার অনেক অনুষ্ঠানের নেপথ্যে যে মানুষটি আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, সেই গণেশ গাঙ্গুলীর সম্মানে। আপনারা শুনে অবাক হবেন উনি নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে দিনের পর দিন আপনাদের আনন্দ দিয়েছেন। শেষ আনন্দ দিয়েছেন—এই তো সেদিন বোম্বের নামকরা আর্টিস্টদের নিয়ে নেতাজী স্টেডিয়ামে ফাংশান হলো। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণেশবাবু নিজের মেয়ের বিয়ের জন্যে যে টাকা রেখেছিলেন—তার থেকে পঁচিশ হাজার বার করে, আমাদের মান রক্ষা করেছেন। তুলে দিয়েছেন বোম্বাইয়ের আর্টিস্টের হাতে।

কিন্তু আমাদের তো কর্তব্য আছে, তাই আমরা ঠিক করেছি, আজকের এই ফাংশানে যে তিরিশ হাজার টাকা উঠেছে, তার সমস্তটাই আমরা গণেশবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্যে খরচ করে নিজেদের ধন্য করব।

ঘন ঘন হাততালি পড়ল।

ছিঃ ছিঃ, একি করছেন—উইংসের ওধার থেকে গনুদা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। দুজন গায়ক গায়িকা তাঁর হাত ধরে বলেন—ঠিক করছি। আপনার দেনা শোধ করছি।

গনুদা আর কিছু বলতে পারেন না। তাঁর পটলচেরা চোখে আবার সেই স্বপ্নের শরতের মেঘ ভেসে আসে। নীরব হাসির সঙ্গে সেই মেঘ থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টিও নেমে আসে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মাইকে সেই রবীন্দ্র সংগীতটাই গাইছেন—"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে, মন মোর নহে রাজি।"

এরপরে গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। গনুদার মেয়ে সন্তোষীর খুব ঘটা করে বিয়ে হলো! গনুদার গল্প শুনে আলি হোসেন সত্যিই এক পয়সা না নিয়ে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সানাই বাজিয়ে গেলেন। ফিরলেন পোলাও মাংস মিষ্টি খেয়ে। যাবার সময় একটা লাল ভেলভেটের ছোট্ট বটুয়ায় চকচকে ১০১ টাকার কয়েন ভরে গনুদার মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, জিতা রহ বেটি, সবকো সুখী কর। গনুদা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গনুদাকে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই সিদ্ধিদাতা গণেশ।

ছবি : দিলীপ দাস

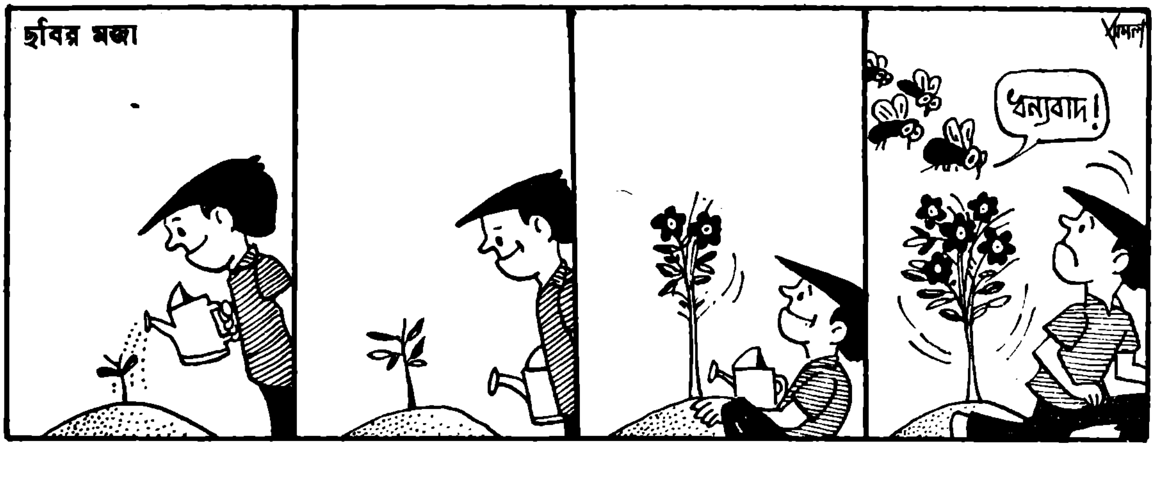

ফ্রি কিক

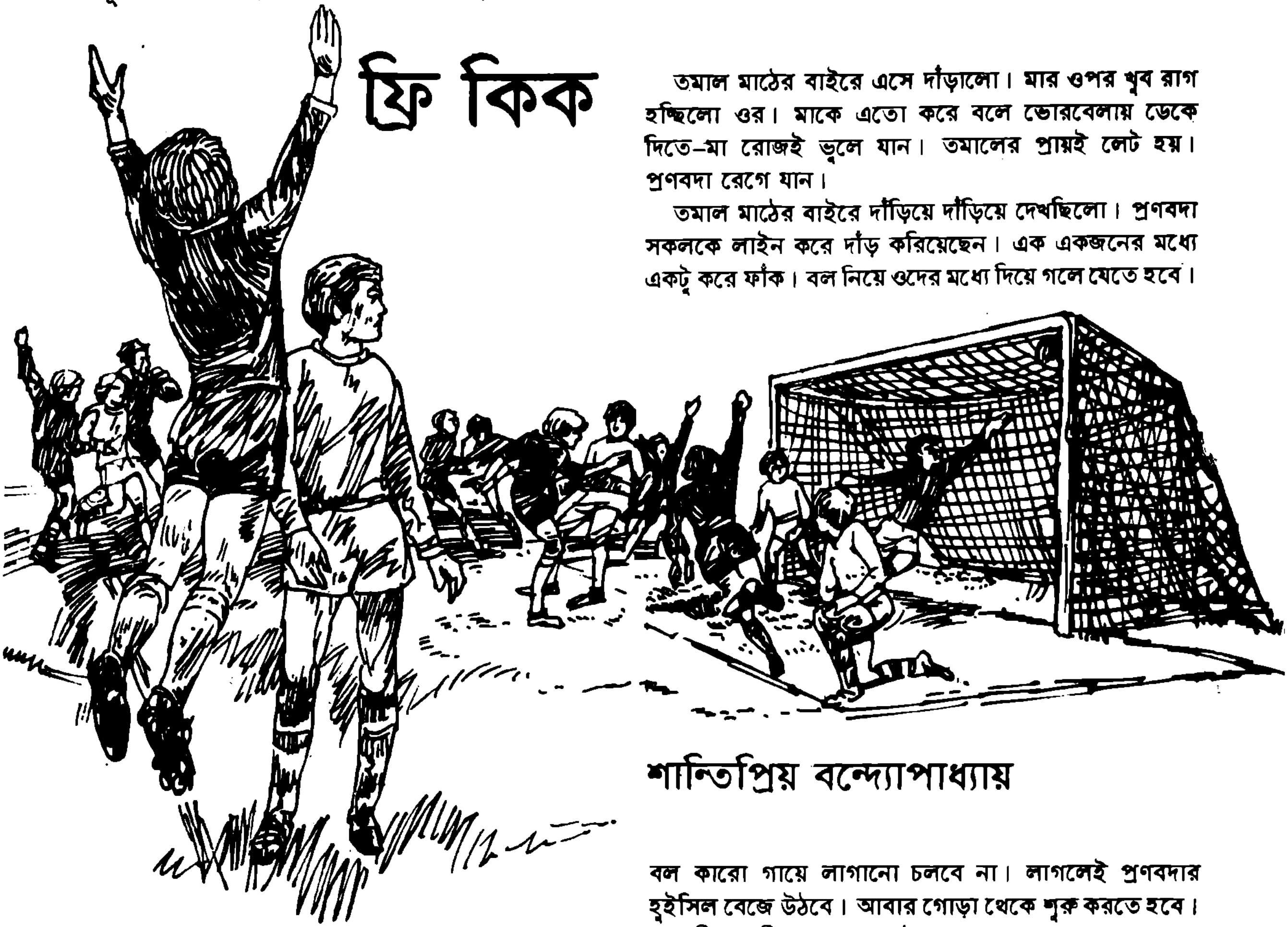

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

মুখের ওপর রোদ্দুর এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেলো তমালের।

ইস এতো বেলা হয়ে গেছে। মা ডেকে দেন নি! কি হবে? এতো দেরি–প্রণবদা রেগে যাবেন।

চোখে-মুখে কোনরকমে একটু জল দিয়ে তমাল ছুটলো। কলোনীর গলি ছেড়ে বড় রাস্তা, খানিকটা এগিয়ে একটা গলি; এঁকে বেঁকে সোজা লেক টাউনে। জয়ার সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই পুকুর, তারপর খেলার মাঠ। আগে পুরোটাই পুকুর ছিলো। এখন অর্ধেকটা ভরাট করে খেলার মাঠ।

যা ভেবেছে ঠিক তাই! প্রণবদা প্র্যাকটিশ করাচ্ছেন। ও ছাড়া ওদের গ্রুপের সকলেই এসে গেছে। তমাল পা পা করে এগোচ্ছিলো।

ওর দিকে চোখ পড়তেই প্রণবদা কড়া গলায় বলে উঠলেন, এতো দেরি! যা বাইরে গিয়ে বসে থাক।

তমাল মাঠের বাইরে এসে দাঁড়ালো। মার ওপর খুব রাগ হচ্ছিলো ওর। মাকে এতো করে বলে ভোরবেলায় ডেকে দিতে–মা রোজই ভুলে যান। তমালের প্রায়ই লেট হয়। প্রণবদা রেগে যান।

তমাল মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। প্রণবদা সকলকে লাইন করে দাঁড় করিয়েছেন। এক একজনের মধ্যে একটু করে ফাঁক। বল নিয়ে ওদের মধ্যে দিয়ে গলে যেতে হবে। বল কারো গায়ে লাগানো চলবে না। লাগলেই প্রণবদার হুইসিল বেজে উঠবে। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

রবীন, সমীর, কুনাল–কেউ পারছে না। বারবার প্রণবদার বাঁশি বাজছে। তমাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। ওর ইচ্ছে করছিলো প্র্যাকটিশ করতে। কিন্তু আজ আর তা হবে না। প্রণবদা বড্ড কড়া।

বিকেলে আবার খেলা আছে। এই ম্যাচটায় জিততে পারলে ওদের স্কুল চ্যাম্পিয়ন হবার পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে। প্রণবদা বলেছেন, এই খেলায় জিততেই হবে। তমালকে আজ ভালো খেলতেই হবে। নতুন হেড মাস্টারমশাই বলেছেন, ওদের স্কুল যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাহলে প্রত্যেককে একটা করে বুট কিনে দেবেন।

কিন্তু দেরি করে প্র্যাকটিশে আসায় প্রণবদা রেগে গেছেন। প্রণবদা ওদের স্কুলের খেলার স্যার। রোজ সকালবেলায় লেক টাউনের মাঠে খেলা শেখান। বিকেলে আসেন সমরেশদা। সমরেশ চৌধুরীকে সকলে পিন্টুদা বলে ডাকে। তমাল অবশ্য পিন্টুদার কাছে খেলা শিখতে যেতে পারে না। যে দিন খেলা থাকে না স্কুল থেকে ফিরে ও মাঠে যায়। পিন্টুদার কোচিং দেখে। দেখে দেখে ও ব্যাকভলিটা অনেকটা শিখে ফেলেছে। স্কুলের ম্যাচে ব্যাকভলি করে একদিন গোল করেছিলো।

প্রণবদা অবাক। খেলার শেষে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কার কাছে ব্যাকভলি করা শিখেছে। তমাল বলেছিলো, কারো কাছে শেখে নি। পিণ্টুদার শেখানো দেখে দেখে খানিকটা শিখেছে। প্রণবদা একটু যেন অবাক হয়েই ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছু বলেন নি।

প্রণবদার বাঁশির শব্দে চমকে উঠলো তমাল। প্র্যাকটিশ শেষ। এবার নির্ঘাৎ ও বকুনি খাবে। প্রণবদা ফিরে আসছেন। লম্বা দোহারা চেহারা। হাফ প্যান্টের মধ্যে গেঞ্জি গোঁজা। পায়ে কেডস। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা বাঁশিটা ঝুলছে। বেশ ঘেমে গেছেন।

তমালের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, কিসের জন্যে তোর দেরি হয় আসতে? ফুটবল খেলার শখ, এদিকে ভোর বেলায় ঘুম ভাঙবে না। বল কেন দেরি করে এলি?

তমাল ঢোক গিললো।

প্রণবদা ওর দিকেই চেয়ে ছিলেন। দুচোখে রাগ।

আজ স্কুলের ইমপর্টেন্ট খেলা। ভেবেছিলাম তোকে কতকগুলো ব্যাপার দেখিয়ে দেবো। হলো না। খেলা না থাকলে তোকে আজ পঞ্চাশ পাক ছোটাতাম। একটা কথা মনে রাখিস, আজ যদি গোল দিতে পারিস তাহলে কিছু বলবো না। না পারলে কিন্তু...

কথাটা শেষ করলেন না প্রণবদা। গটগট করে ক্লাব ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো তমাল। একটু ঘাবড়িয়ে গেছে। বুঝেছে, আজ বিকেলে স্কুলের খেলায় গোল দিতে না পারলে ওর কপালে দুঃখ আছে।

মার ওপর রাগ করতে করতে তমাল বাড়ির পথ ধরলো।

।। দুই ।।

তমালরা রেডি হচ্ছিলো ফ্রিকিকের জন্যে। প্রণবদা প্ল্যান করে দিয়েছেন, ওদের ক্যাপটেন সুনীল কিক করবে। কিক করবে না আসলে বলটা ঠেলে দেবে সন্তোষকে। সন্তোষ উঁচু করে বলটা পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফেলবে। তমাল ছুটে গিয়ে বলটা গোলে মারবে।

তমাল পজিসান নিচ্ছে। বারাসাত স্কুলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ওয়াল তৈরি করে। প্ল্যানমাফিক সব ঠিকঠাক হলে ঐ ওয়ালের ওপর দিয়েই বল আসবে তমালের পায়ে। তারপর...তমালের মনে পড়লো প্রণবদার কথা। ওকে আজ গোল করতেই হবে।

এখন যা অবস্থা তাতে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। বারাসাত স্কুল এক গোলে এগিয়ে আছে। খেলছেও ভালো। তমালদের কেমন যেন একটা খাপছাড়া ভাব। প্রথম অর্ধেই ওরা গোল করেছে। এখন দ্বিতীয় অর্ধের পনেরো মিনিট। গোল শোধের লক্ষণই নেই। এই ফ্রি কিকের সুযোগটা যদি কাজে লাগানো যায়।

তমাল মাঠের বাইরে তাকালো। উত্তেজনায় প্রণবদা উঠে দাঁড়িয়েছেন। গোলটা শোধ করার একটা চান্স এসেছে। রেফারির বাঁশি বেজে উঠতেই তমাল তৈরি।

তারপরই রাগে, বিরক্তিতে আর হতাশায় মাথা ঝাঁকালো তমাল। ফ্রিকিকটা মাঠে মারা গেলো। সুনীল বলটা ঠিকই ঠেলে দিয়েছিলো। সন্তোষ চিপ করতে গিয়ে সট করে বসলো। বলটা ওদের 'ওয়ালে' লেগে ফিরে আসতেই পেয়ে গিয়েছিলো তরুণ। কিন্তু ওদের একজন খেলোয়াড় ছুটে এসে তরুণের পা থেকে বলটা কেড়ে নিলো।

সুনীল ঠায় দাঁড়িয়েছিলো। হতাশ হয়ে পড়েছে ও। নিজের মনে বলছে, আর পারবো না, আমরা হেরেই যাচ্ছি।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথাটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালো তমাল। বললো, তুই ক্যাপটেন, কোথায় আমাদের ভালো খেলার জন্যে ইনসপায়ার করবি তা না নিজেই ঐ সব

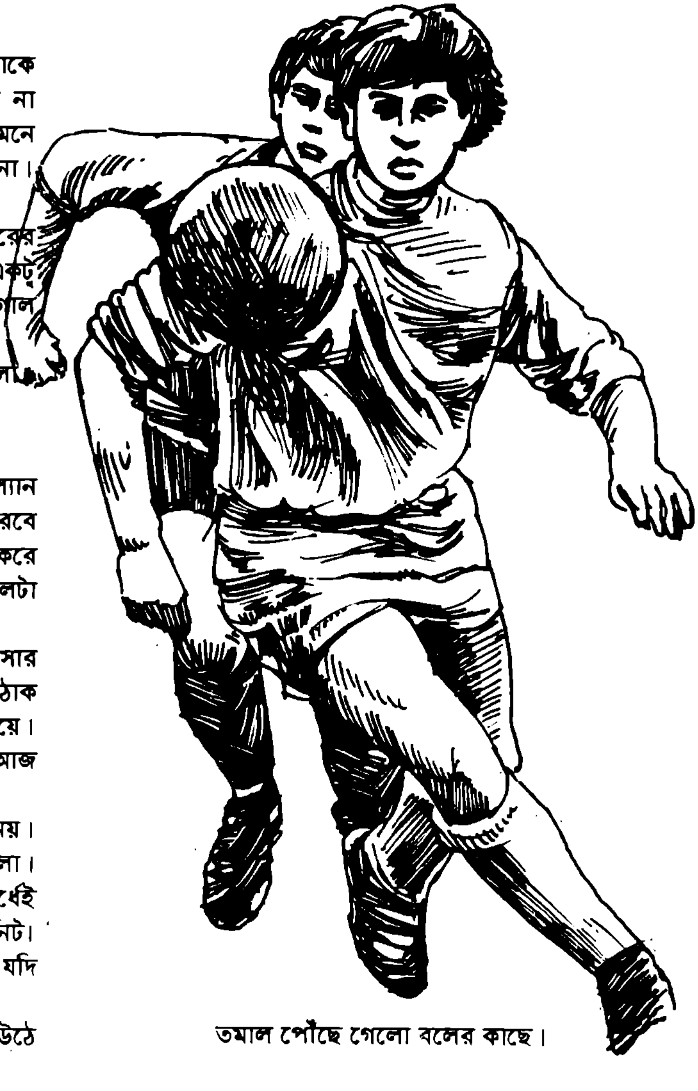

তমাল পৌঁছে গেলো বলের কাছে।

কথা ভাবছিস! এখনোও তো খানিকটা সময় আছে। চল সবাই মিলে শেষ চেষ্টা করি।

পারবি?

চল না চেষ্টা করে দেখি!

কথা বলতে বলতেই বল ওদের দিকে উড়ে এলো। ওদের স্টপার হেড দিতে লাফিয়েছিলো। বলটা তার মাথার পেছনে লেগে তমালের কাছে আসতেই ও বলটা ধরে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ছুটতে ছুটতেই ওর থাইয়ের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠলো। অসহ্য নয়। ও পারবে।

ওদের একজন খেলোয়াড় ছুটে আসছিলো ওকে চার্জ করতে। ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তমাল ওর হিলের ওপর ভর রেখে চকিতে ঘুরে গেলো। ব্যথাটা সরসর করে নিচের দিকে নেমে আসতেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি শব্দ–উঃ....

ততোক্ষণে ও বলটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়েই ছুটলো পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে। ব্যথার কথা তমাল যেন ভুলে গেছে। ও তখন প্রতিপক্ষ দলের ডিফেনডারদের মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি। তমাল পৌঁছে গেলো গোলের কাছে। চারপাশে তাকালো। সন্তোষটা কই। ওঃ অতো দূরে। ওকে বল দেওয়া মানে তো নষ্ট করা। কিন্তু ওকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই।

না, যা করার ওকেই করতে হবে। বল নিয়ে ও গোলের দিকে এগিয়ে গেলো। আর একজনকে কাটিয়ে ও গোলে সট নিতে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই পেছন থেকে ল্যাং মেরে ওকে ফেলে দিলো প্রতিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়।

রেফারির বাঁশি বেজে উঠেছে। পেনাল্টি। মাঠের বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। ভীষণ হৈচৈ হচ্ছে। প্রণবদার গলা শোনা যাচ্ছে। কি যেন বলতে চাইছেন। সন্তোষ আর সুনীল ছুটে এসে তমালকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ব্যথাটা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে।

তুই ঠিক আছিস তো?

সুনীল জিজ্ঞেস করলো। তমাল হাসলো। বললো, তুই যা পেনলটা কর। এখনও খেলার খানিকক্ষণ বাকি আছে। আমরা আর একটা গোল করবো। সুনীল একবার ওর দিকে তাকিয়ে চলে গেলো। বল বসানো হয়ে গেছে।

পেনাল্টি থেকে গোলটা শোধ করে দিলো সুনীল।

তমালের পায়ে বড্ড ব্যথা করছে। হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ছুটতে গেলে মনে হচ্ছে, ওর পা-টা বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। তমাল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। প্রতিপক্ষ স্কুলের খেলোয়াড়রা ধরেই নিয়েছে, ও আর কিছু করতে পারবে না। খেলা শেষ হয়ে এসেছে বলেই বোধহয় ওকে বসানো হলো না। তাই ওর দিকে তেমন নজর দেবার দরকার নেই ভেবে ওরা গোল করার জন্যে প্রায় সকলেই উঠে গেছে।

ঠিক সেই সময় সমীর মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে এগিয়ে এলো। বলটা কোণাকুণি ভাবে তমালকে ঠেলে দিতেই, তমাল এ পা ও পা করে ক'পা এগিয়ে গিয়েই ঠেলে দিলো সমীরকে। সমীর তমালকে বাড়িয়ে দিতেই ও ছুটে গিয়ে বলটা ধরে নিলো। অন্য স্কুলের ছেলেরা ছুটে আসছে। একজন ডিফেন্ডার একটু ইতস্তত ভাবে তমালের সামনে ছুটে এসেছে। তার ধারণা পায়ের ব্যথার জন্যে তমাল তক্ষুণি বলটা ছেড়ে দেবে। তাই তাকে খুব একটা চিন্তিত মনে হলো না।

তমাল বলটা তার পাশ দিয়ে ঠেলে দিয়েই ছুটে গিয়ে ধরে নিয়ে এগিয়ে চললো। সমীর ফলো করছে। তমাল দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ওর পেছনে ছুটে আসছে তিনজন। সামনে একজন। পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি এসে তমাল দেখলো সমীর বক্সের মধ্যে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে।

তমাল বলটা বাঁ পায়ে গোলে মারার ভঙ্গি করেই চকিতে দু পা এগিয়ে এসে ডান পা দিয়ে সমীরের কাছে বাড়িয়ে দিলো। সমীর প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ওর সট গোলের পাশ ঘেঁষে জালে জড়িয়ে গেলো।

গো-ও-ল............

সুনীল ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো সমীরকে। তারপর ছুটে গেলো তমালের কাছে।

সেন্টার হবার পরই খেলা শেষের বাঁশি বাজালেন রেফারি।

তমালদের স্কুল জিতেছে। দুটো গোলই হয়েছে তমালের জন্যে। সক্কলে ছুটে এসেছে ওর কাছে। প্রণবদা আনন্দে নাচছেন। আর দুটো খেলায় জিততে পারলেই ওরা বিধানচন্দ্র ট্রফি জিতে দিল্লিতে সুব্রত মুখার্জি কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে।

সুনীল যাচ্ছিলো তমালের পাশে পাশে। তমালের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

কী রে খুব কষ্ট হচ্ছে?

না, না, ঠিক আছে।

তোর লাগে নি তো?

না, আমি তো ঠিকই আছি।

সুনীল একটু চুপ করে থেকে বললো, আমি তোদের চ্যাম্পিয়ন করে দিয়ে যেতে চাই। আর দুটো খেলায় জেত্ তাহলেই হবে। আমিও খুশি মনে চলে যাবো!

চমকে তাকালো তমাল।

চলে যাবি মানে? কোথায় যাবি?

তুই শুনিস নি? বাবা ট্রানসফার হয়ে গেছেন। আমরা তো এখান থেকে চলে যাবো। আমি চলে গেলে তোদেরই কেউ ক্যাপটেন হবি।

কে ক্যাপটেন হবে? তমালের মনে হলো, ওরই তো ক্যাপটেন হওয়া উচিত। ও দাবি আর কেউ করতে পারে না....আজকের খেলায় যে তমালদের স্কুল জিতেছে তাও তো ওরই জন্যে। তাহলে সুনীলের জায়গায়....

কি রে হাঁটতে পারছিস না? খুব লেগেছে?

লাগা জায়গা তো ?

সুনীল হাত বাড়িয়ে দিলো। বললো, তুই আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চল। আজ তোর জন্যেই তো আমরা জিতলাম।

প্রণবদা এগিয়ে এসেছিলেন।

খুব লেগেছে ?

না, না....

তমাল ভাবলো ওর লাগার কথা বললে যদি ও ক্যাপটেন হতে না পারে। তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সুনীল চলে যাচ্ছে। এবার তাহলে আমিই তো ক্যাপটেন হবো ?

তুই কেন–আমি হবো !

ওপাশ থেকে ফোঁস করে উঠলো তরুণ বললো, আমি তোদের মধ্যে সব থেকে সিনিয়ার–আমারই ক্যাপটেন হওয়া উচিত।

তরুণের চেয়েও বেশিদিন খেলছে সুধীর। ব্যাকে খেলে। ভালোই খেলে। ও বললো, তাহলে তো আমারই হওয়া উচিত।

না, না–আমি হবো। সন্তোষ চিৎকার করে উঠলো।

ক্যাপটেন হওয়া নিয়ে ওদের হৈচৈ দেখে প্রণবদা একটু বিরক্ত হয়েই সরে গেলেন। তমাল টানটান হয়ে শুয়েছিলো। পা-টা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। সুনীল ওর পাশে বসে বুট খুলছিলো। বললো, আমি তো এখনও কিছুদিন আছি। তোরা ঝগড়া আরম্ভ করলি কেন ?

কেন নয়–তোর পর তো আমারই স্কুলের ক্যাপটেন হওয়া উচিত।

তরুণের কথা শেষ হলো না, সুধীর বলে উঠলো, আহা আমরা যেন ভেসে এসেছি ?

প্রণবদা এগিয়ে এসেছিলেন। ওদের কথা কানে যেতেই রেগে গেলেন। বললেন, চুপ কর সব। সুনীল এখনও যায় নি–এরই মধ্যে ক্যাপটেন হবার জন্যে তোরা ঝগড়া শুরু করেছিস। আমি তোদের রেসের ব্যবস্থা করবো। যে জিতবে–সেই ক্যাপটেন হবে।

॥ তিন ॥

শনিবার ছুটির পর দুশ মিটার দৌড়। যে জিতবে সেই স্কুল টিমের ক্যাপটেন হবে। তমালের মন খারাপ। ওর পায়ের ব্যথা কমে নি। হাঁটতে গেলে টান ধরছে। ওদের স্কুলের জগাদা ম্যাসেজ জানে। জগাদা যদি একটু ম্যাসেজ করে দেয়।

তমাল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো। আগের দিন খেলার সময় তমালের লেগেছিলো জগাদার সে কথা জানা। তমালের জন্যেই যে ওদের স্কুল জিতেছে সে কথাও তার জানা। কালই খেলার মাঠে ঠিক করে রেখেছিলো আজ তমালের পায়ে ম্যাসেজ করে দেবে।

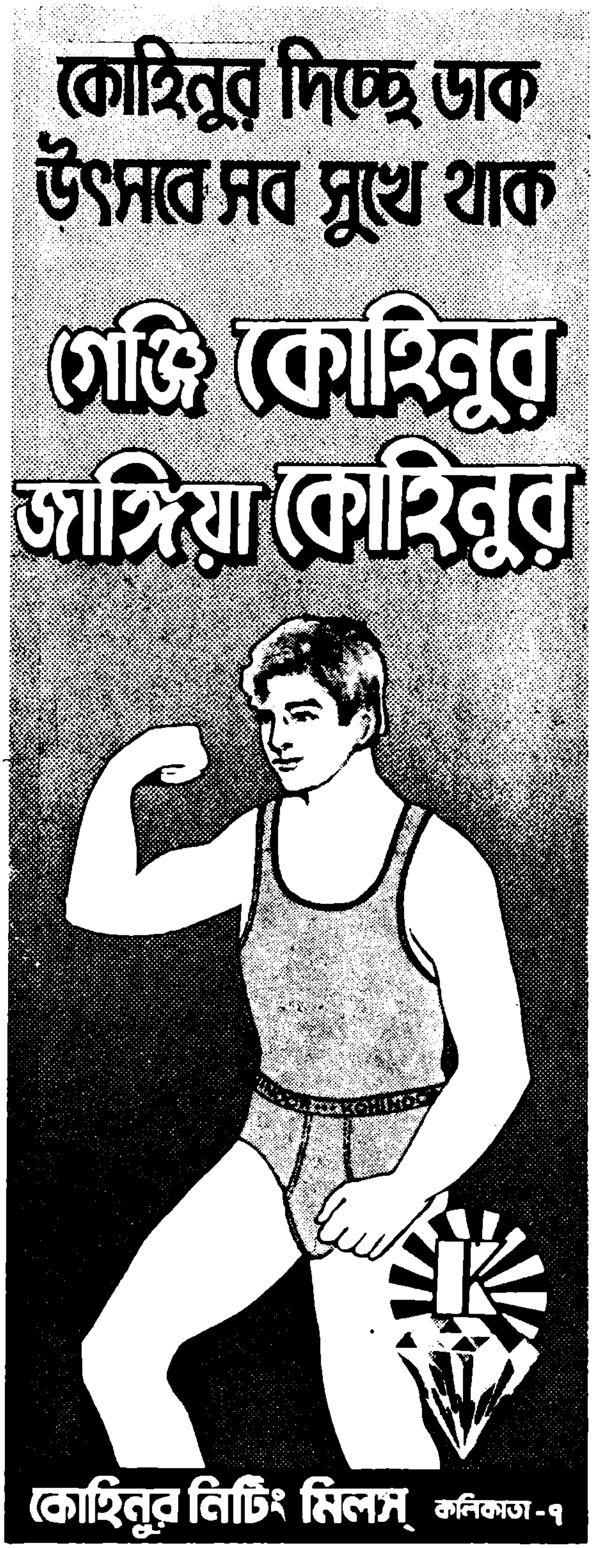

জগাদা টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে অফিস ঘরের দিকে যাচ্ছিলো। বড়বাবু ডাকছেন। তখনই চোখ পড়লো তমালের দিকে। এগিয়ে গেলো।

কোথায় লেগেছে রে?

এই যে...

থাইটা দেখিয়ে দিলো তমাল। জগাদা আঙুল দিয়ে চাপ দিলো। উঃ...তমাল ককিয়ে উঠলো। জগাদা বললো, টিফিনের সময় আমার ঘরে আসবি। ম্যাসেজ করে দেবো। দু দিনে না কমলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

কমবে না?

কমতেও পারে, নাও কমতে পারে।

জগাদা, তাহলে কি হবে?

কী?

শনিবারে আমি ছুটবো কি করে?

তমাল আর্তনাদ করে উঠলো। জগাদা মাথা নাড়লো। তোর আগেই লেগেছিলো—বলিস নি কেন?

ভেবেছিলাম কমে যাবে।

জগা...এই জগা...

অফিস ঘর থেকে বড়বাবুর গলা ভেসে এলো। জগাদা ছুটলো।

টিফিনে আসিস কিন্তু—মিনিট পনেরো ম্যাসেজ করে দিতে পারবো।

সুনীল পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। ওকে দেখে দাঁড়ালো।

কি রে ব্যথা কমে নি?

না! তমাল মাথা নাড়লো।

জগাদা কি বলছিলো।

টিফিনে ম্যাসেজ করে দেবে।

ওরা ক্লাসের দিকে এগোচ্ছিলো।

ম্যাসেজে না কমলে তোকে কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হবে। মেডিকেল কলেজে না হয় আই. এফ. এ-র মেডিকেল ইউনিটে গিয়ে ডাঃ সুনীল ঠাকুরকে দেখাতে হবে। প্রণবদাকে বলতে হবে।

তমাল একটু ঘাবড়িয়ে গেলো। ডাক্তার দেখানোর নামে ওর বড় ভয়। হয়তো ইনজেকশান দেবে! কিন্তু ওর মনের মধ্যে তার চেয়েও বড় একটা আশংকা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে।

সুনীল, আমার আর স্কুলের ক্যাপটেন হওয়া হলো না।

কেন?

পায়ের এই ব্যথা নিয়ে শনিবারে আমি কি দৌড়তে পারবো?

চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো সুনীল। ও ভালো ভাবেই জানে, শনিবারে তমালের পক্ষে ঠিক মতো ছোটা মুশকিল। বললো, ঘাবড়াস নে। জগাদার ম্যাসেজে কমেও যেতে পারে।

তমালের মুখ করুণ। মাথা নাড়লো ও।

কমবে কি আর...

ঘন্টা হাতে নিয়ে জগাদা এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। ঢং ঢং ঢং করে বেল বাজালো। ওয়ার্নিং। একটু পরেই প্রেয়ার শুরু হবে। ওদের দেখে বললো, ক্লাসে গিয়ে বই খাতা রেখে মাঠে যা এক্ষুণি প্রেয়ার শুরু হবে। তমাল জোরে হাঁটিস না। আস্তে আস্তে যা।

টিফিনের ঘন্টা পড়তেই তমাল জগাদার ঘরে। জগাদা ভাত খাচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তমালকে খাটে বসিয়ে দিলো। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো তমাল।

খানিকটা পাউডার হাতে নিয়ে জগাদা তমালের থাইয়ে হাত দিলো। বললো, এই সব ব্যথা-ট্যথা ইগনোর করতে নেই বুঝেছিস। যন্ত্রণা বা ব্যথা হচ্ছে ওয়ার্নিং। মানে কোথাও একটা তো গন্ডগোল হয়েছে।

কথা বলতে বলতে হাত চালাচ্ছে জগাদা। তমালের খুব লাগছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে আছে। ওকে যে শনিবারের মধ্যে ফিট হতেই হবে।

জগাদা বললো, টেবিল ল্যাম্পটা দেখেছিস?

হ্যাঁ! কি হবে ওটা দিয়ে।

ম্যাসেজের পর সেঁক দিবি। দেখবি ব্যথা কতো কমে যাবে। এই সব চোটে হিট ট্রিটমেন্ট খুব কাজে দেয়।

টেবিল ল্যাম্পটার তলায় পা রেখে অনেকক্ষণ সেঁক নিলো তমাল। পাটা বেশ হাল্কা লাগছে। ব্যথাও কমে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ও একটু ছুটে নিলো। না, লাগছে না। কিন্তু জগাদা চেঁচিয়ে উঠলেন, ছোটাছুটি করিস নে। ক্লাসে যা। ছুটির পর সোজা বাড়ি যাবি। রেস্ট নে। কাল দেখবি ব্যথা নেই।

তমালের বাবা-মা অবাক। শুক্রবার রাত্তিরে তমাল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। তমাল কখনো এতো তাড়াতাড়ি শোয় না। তমাল শনিবারের দৌড়ের আগে পুরো বিশ্রাম চাইছিলো। ওকে স্কুল টিমের ক্যাপটেন হতেই হবে। খেলার কথা ধরলে, ওরই তো হওয়া উচিত। প্রণবদা কেন যে ওকে ক্যাপটেন না করে দৌড়ের ব্যবস্থা করলেন কে জানে! ও যদি ফার্স্ট হতে না পারে? ভাবতে পারে না তমাল। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায় তমালের। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ও উঠে গিয়ে মুখ বাড়ায়। বাঃ রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হয়েছে তো! খুশি হয় তমাল। মাঠ কাদা কাদা হলে কেউ জোরে ছুটতে পারবে না। ওর জেতার চান্সই তখন বেড়ে যাবে। ও তো জানে, তেমন জোরে ও ছুটতে পারে না। সুভাষ-টুভাষ ওর থেকে জোরে ছোটে। স্কুল স্পোর্টসে ও থার্ড-ফোর্থের বেশি হতে পারে না।

তমালের খেলার ব্যাপারে মা'র খুব উৎসাহ। কিন্তু দৌড়ের ব্যাপারে মাকেও সে কিছু বলে নি। ভেবেছিলো, যদি স্কুলের ক্যাপটেন হতে পারে তাহলে বলবে। আগে বললে মা নিশ্চয়ই বোনদের বলবেন। তারপর ক্যাপটেন হতে না

পারলে ওরা নির্ঘাৎ ওর পেছনে লাগবে।

অন্যদিন এই সময় ছুটতে বেরিয়ে পড়ে। ভি. আই. পি রোড ধরে মাইল খানেক ছুটে আসে। আজ আর যাবে না। রেসটা আছে তো! মা জিজ্ঞেস করলে বলবে, বৃষ্টি হচ্ছে বলে বেরুবে না।

সকাল বেলায় বাড়ি থেকে বেরুলো না। বই নিয়ে বসে রইলো। পড়তে পারলো না। জগাদা বলেছিলো রিল্যাক্স করতে। বলেছিলো, তোদের ঐ দৌড়ের কথা একদম ভাববি না। ধ্যাৎ! তাই কখনো হয়। ওর স্বপ্ন, স্কুল টিমের ক্যাপটেন হওয়া। ভেবেছিলো, সুনীলের পর ওই ক্যাপটেন হবে। তা তো হচ্ছে না। প্রণবদার অদ্ভুত খেয়াল। অবশ্য প্রণবদাই বা কি করবে? সুভাষ, তরুণ ওরা সক্কলেও ক্যাপটেন হতে চাইছে। ক্যাপটেন হিসেবে ওদের থেকে কি তমাল খারাপ

তরুণ, সুধীর, সন্তোষ আগেই এসে গিয়েছিলো। ওরা ওয়ার্ম-আপ করছে। তমাল এসে দাঁড়ালো। সারাদিন আর বৃষ্টি হয় নি। কড়া রোদ না উঠলেও মাঠ দিব্যি শুকিয়ে গেছে। তমাল ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। ভিজে মাঠের সুবিধে ও আর পাবে না। তমাল ভাবছিলো, ওদের মতো খানিকটা ছুটোছুটি করবে কিনা!

প্রণবদা এসেই পিঁ পিঁ করে বাঁশি বাজালেন। ওদের দলের দু'জন খেলোয়াড় লাল সুতো নিয়ে শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ালো। দু'জন মাস্টারমশাই জাজ হলেন। ওরা ছ'জনে এসে পর পর দাঁড়িয়ে গেলো। তমাল, তরুণ, সন্তোষ আর সুধীর। ওদের পাশে আরও দু'জন।

সুনীল হাত নাড়ছিলো। তমাল একবার তাকালো। উত্তেজনায় ওর বুকের মধ্যেটা কি রকম যেন করছে। খেলার

প্রণবদার হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো।

হবে? তমালের মতো খেলতে পারে ওরা কেউ? ও পারে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে? তাহলে? কেন এই দৌড় প্রতিযোগিতা?

ভালো লাগে না তমালের। তবে পায়ের ব্যথাটা নেই—এই যা রক্ষে। জগাদা একটা দারুণ কাজ করেছে, সেঁক নেওয়ায় যে অতো উপকার হবে তা ভাবতেও পারে নি তমাল।

কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেলো তমাল বুঝতেই পারলো না। স্কুলেও বেশ হৈচৈ হচ্ছে। তার মানে ছুটির পর সারা স্কুল ভেঙে পড়বে মাঠে। সুনীলরা কাল চলে যাবে। ও এসে তমালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেছে। বলেছে, আমার পর তোরই ক্যাপটেন হওয়া উচিত। পায়ের ব্যথাটা কমেছে?

মাথা নাড়লো তমাল। বললো, জগাদা ম্যাসেজ করে দিয়েছে। সেঁক দিয়ে দিয়েছে টেবিল ল্যাম্প জালিয়ে। ব্যথা আর নেই।

হাসলো সুনীল। শনিবার তাড়াতাড়ি ছুটি। ছুটির পরই রেস। ঠিক সময়ে এসে যাবে বলে সুনীল চলে গেলো।

সময় কখনো ওর এইরকম হয় না।

প্রণবদা পিস্তল হাতে ওদের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, সক্কলে শুনে রাখ—বিচারকদের রায়ই ফাইনাল। কেউ কোনো তর্ক করতে পারবে না। আমি পিস্তল ছুঁড়লেই তোরা ছুটতে শুরু করবি।

প্রণবদা সরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। ওরা ছোটার জন্যে প্রস্তুত।

গেট সেট...

স্টেডি...

তারপরই প্রণবদার হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো।

তরুণ যেন ছিটকে বেরিয়ে গেলো। তারপর সুধীর। তমাল তারপর। সব শেষে ছুটছে সন্তোষ। অন্যরা আরও পিছনে।

তমালের মনে হলো, ওর যেন নিজেকে খুব হাল্কা লাগছে। দ্রুত বাতাস কেটে ছুটে চলেছে ও। গোড়াতেই ও খুব জোর ছুটতে চাইছে না। শেষটায় ও দারুণ জোরে ছুটবে। তখন মেরে দেবে সকলকে। তমাল ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো।

সুধীরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।

পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত তরুণ সবার আগে। সুধীর প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ওকে। তমাল সুধীরের প্রায় গায়ে গায়ে ছুটছে। সন্তোষ বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। মাঠের বাইরে থেকে ছেলেরা চিৎকার করছে।

একশ মিটার পার হয়ে গেছে। তমাল ধীরে ধীরে স্পীড বাড়াচ্ছে। সুধীরকে টপকে গেলো ও। তরুণ সামনেই। আর একটু জোরে ছুটতে পারলেই ও তরুণকে ধরে ফেলবে। তমাল আরও জোরে ছুটতে গেলো। ঠিক তখনই ওর থাইয়ের পুরানো ব্যথাটা হঠাৎই চাগিয়ে উঠলো। পা-টা যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো জোরে ছুটতে পারছে না। সুধীর ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপরই তমালের পা সামান্য পিছলে যেতেই ও পড়ে গেলো। তখনই সন্তোষ ওর পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ও দেখলো তরুণ শেষ সীমায়। দু হাত তুলে সে লাফিয়ে উঠেছে। তমাল মাথাটা নামিয়ে নিলো। ওর চোখে জল। ওর সব আশা, সব স্বপ্ন শেষ। হাতের ওপর মাথা রেখে ও কাঁদছিলো।

হঠাৎ দেখলো, জগাদা এসে দু হাত দিয়ে ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ধারে কাছে কেউ নেই। সকলে ওধারে তরুণকে নিয়ে হৈচৈ করছে।

তমালের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা। জগাদা ওকে ততোক্ষণে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়েছে।

।। চার ।।

জগাদা হাসছিলো।

তমালের পায় ম্যাসেজ করে দিতে দিতে বললো, তুই কাঁদছিস কেন? ভাবছিস আর খেলবি না। খেলা ছেড়ে দিবি তাই তো?

তমাল ভিজে চোখে তাকায় জগাদার দিকে। জগাদা কি করে ওর মনের কথা জানলো? ভীষণ অবাক হয় তমাল। জগাদা ওদের স্কুলের দপ্তরীর কাজ করে। ঘণ্টা বাজায়। ফাই-ফরমাস খাটে। তবে খেলার সময় মাঠে ঠিক হাজির হবেই। তমাল লক্ষ্য করেছে, প্রণবদাও জগাদার কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। আর তমালরা তো ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

তমালকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে জগাদা হেসে উঠলো। বললো, এই হার তুই মেনে নিবি কেন? তোকে আরও ভালো খেলতে হবে। স্কুলের ক্যাপটেন হতে পারিস নি তো কি হয়েছে। তুই মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপটেন হবি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখন থেকে চেষ্টা শুরু কর। আমার একটা কথা মনে রাখবি—যেখানে যতো বাধা আসবে, যতো প্রতিরোধ আসবে— সেখানে ততো রুখে দাঁড়াবি। কোনোদিন হার মানবি নে।

জগাদা ম্যাসেজ করতে করতে কথা বলছিলো। তমাল চুপচাপ শুয়ে আছে। একটু আগেও মাঠ থেকে চিৎকার ভেসে আসছিলো। তরুণের নাম ধরে চিৎকার করছিলো ছেলেরা। এখন সব চুপচাপ। জগাদা টেবিল ল্যাম্পটা টেনে নিলো। তমাল চুপ করে শুয়েছিলো। ওর চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে হয় হয়। স্কুলের এক কোণে জগাদার ঘরটায় তখন অন্ধকার নামছে। বাইরের আমলকি গাছের ডালে বাসায়-ফেরা পাখির ডাক। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে আসছে চাঁপা ফুলের গন্ধ।

তমালের জীবন থেকে কী যেন একটা হারিয়ে গেছে। গলার কাছে জমাট বেঁধে থাকা দুঃখটা বুঝি বুকের নিচে নেমে গেছে। এখন আর ঠিক ততোটা কষ্ট হচ্ছে না। ও বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হলো।

জগাদা বললো, এখন আর ক'দিন খেলবি না। প্র্যাকটিশ করবি না। ছুটোছুটিও না। পা-টাকে একটু রেস্ট দে। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল আবার আসবি ম্যাসেজ করে দেবো। পরপর ক'দিন করলে চট করে কমে যাবে।

তমাল ক'দিন প্র্যাকটিশে আসছে না। সকালে লেক টাউনের মাঠেও না, স্কুলেও না। সেদিন স্কুল যেতেই প্রণবদা চেপে ধরলেন, তুই প্র্যাকটিশে আসছিস না কেন?

জগাদা বারণ করেছে। পায়ের ব্যথাটা একেবারে ঠিক হলে তবেই খেলতে বলেছে।

প্রণবদার মুখে চাপা হাসি। উনি ভালোভাবেই জানেন যে ওকে ক্যাপটেন করা হয় নি বলে তমাল দুঃখ পেয়েছে, রেগে আছে। কিন্তু তিনি কি করবেন! ক'জন মিলে ক্যাপটেন হওয়ার জন্যে যে রকম হৈচৈ লাগিয়েছিলো। বাধ্য হয়েই তাঁকে দুশ মিটার দৌড়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। ওদিকে বাংলাদেশের স্কুল ফুটবল দল এসেছে। উত্তর শহরতলীর স্কুলগুলির খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা দল গড়া হচ্ছে। প্রণবদাই সব ব্যবস্থা করছেন। প্রণবদা ঐ ম্যাচে তমালকে খেলাতে চান। বললেন, তোকে বাংলাদেশ স্কুল দলের সঙ্গে খেলতে হবে। ভালো খেলতে পারলে চোখে পড়ে যাবি। আজ বিকেলে তুই মাঠে আসিস। আজ ফাইনাল সিলেকশান।

বিকেলে খেলার মাঠে খুব ভিড়। বিভিন্ন স্কুল থেকে খেলোয়াড়রা এসেছে। সুব্রত কাপ চ্যাম্পিয়ন মধ্যমগ্রাম স্কুলের প্রায় সকলেই হাজির। অনেককেই তমাল চেনে। ইন্টার স্কুল ম্যাচে খেলেছে।

অন্য স্কুলের গেম টিচাররাও এসেছেন। প্রণবদা কথা বলছেন ওঁদের সঙ্গে।

তমাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। কেউ কেউ বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। কেউ গোলে মারছে। তমালের ঠিক সেই রকম উৎসাহ নেই। ওর আর আগের মতো খেলতে ইচ্ছে করে না। ওদের স্কুলের নতুন ক্যাপটেন তরুণ এসে ওকে ডাকলো।

এদিকে আয় তমাল। খানিকটা ওয়ার্মআপ কর।

তমাল মাথা নাড়লো। ও জানে না টিম সিলেকশনটা কি ভাবে হবে। খেলা হলে মুশকিল। জগাদা আরও দু একদিন ওকে খেলতে বারণ করেছে। রোজ ম্যাসেজ করে দেয়। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে হিট ট্রিটমেণ্ট করে। ওর পায়ে আর ব্যথা নেই। হাল্কা হয়ে গেছে। ও এখন ফ্রিলি পা নাড়তে পারে।

তরুণ বল নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে এসেছিলো। তমাল বললো, না রে, পায়ের ব্যথাটা সবে কমেছে। জগাদা আর দু একদিন বিশ্রাম নিতে বলেছে।

কে? জগাদা? ধুত। জগাদার কথায় তুই নাচিস নাকি? ও কী জানে রে? প্রণবদাকে জিজ্ঞেস কর!

তমালের খুব রাগ হয়ে গেলো। জগাদার নামে এই রকম কথা বলা ওর মোটেই ভালো লাগে না। ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো। জগাদা স্কুলে দপ্তরীর কাজ করে ঠিকই, কিন্তু ফুটবল খেলার অনেক কিছুই জানে। নিজে একসময় তো খেলেছে। ম্যাসেজের হাত যে ওর কতো ভালো তমাল তা ভালো করেই জানে!

প্রণবদাদের আলোচনা শেষ। সেদিন আর খেলা টেলা হবে না। সব স্কুলের স্যাররা মোটামুটি ভাবে ১৬ জন খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছেন। প্রত্যেক স্কুলেরই এক দুজন করে আছে। শুধু মধ্যমগ্রাম স্কুলের কিছু বেশি। ওরা সুব্রত কাপ চ্যাম্পিয়ন তো, তাই। আর ওদের স্কুল থেকে চান্স পেয়েছে শুধু তমাল। তরুণ, সুধীর কেউই না।

মনোনীত ষোল জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করলেন মধ্যমগ্রাম স্কুলের স্যার। যারা মাঠে ছিলো তাদের বেশির ভাগই বাদ।

তরুণ ওদের স্কুলের নতুন ক্যাপটেন হয়েছে। ক্যাপটেন হবার পর প্রথম খেলায় ওদের স্কুল হেরেছে। পায়ের ব্যথার জন্যে তমাল খেলতে পারে নি। প্রণবদা প্রথমে একটু রাগ করেছিলেন। জগাদা বলার পর ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকেছে। তরুণের কিন্তু দৃঢ় ধারণা, ক্যাপটেন হতে পারে নি বলে তমাল খেলে নি।

ষোল জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করার পর তরুণের মুখ চুন হয়ে গেলো। ওর ধারণা ছিল, চান্স ও পাবেই। হাজার হলেও ও তো স্কুলের ক্যাপটেন! কিন্তু তা হলো না। ওর মনে হলো, প্রণবদাই বোধহয় জোর করে তমালকে খেলাচ্ছে।

সবাই যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো প্রণবদা তখন বললেন, নির্বাচিত খেলোয়াড়রা কাল থেকে তিন চার দিন একসঙ্গে প্র্যাকটিশ করবে, খেলবে। তাহলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আর টিম স্পিরিট খানিকটা গ্রো করবে। ওদের প্র্যাকটিশ করাবেন ক্ষুদিরাম স্কুলের স্যার রমেনবাবু।

নামটা শুনেই চমকে উঠলো তমাল। ওঁর নাম তো সকলেই জানে। ক'বছর আগেও উনি খুব নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন।

ফেবারিটে যদি থাকে সঞ্চয়
পুজোর আনন্দ দ্বিগুন নিশ্চয়

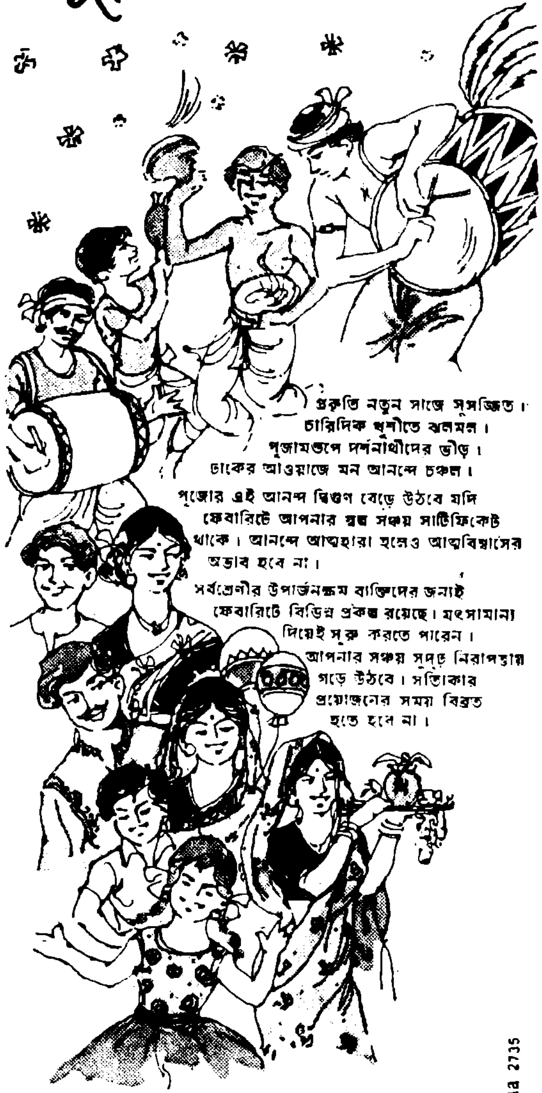

ফেবারিট
স্মল ইনভেস্টমেণ্ট লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—৮৩ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন—২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১, ২১-৩৫৮৮

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব শ্রী এন. দে.

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দু ক্লাবেই খেলেছেন। তমাল খবরের কাগজ আর খেলার পত্রিকাগুলো থেকে ছবি কেটে একটা বড় খাতায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে। মলাটের ওপর বড় বড় করে লেখা—স্পোর্টস অ্যালবাম। সেই অ্যালবামে রমেনবাবু স্যারের একটা ছবি আছে।

প্রণবদার কথা শেষ হতেই রমেনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, কাল সক্কলে বিকেলে এখানে চলে আসবে। আমাদের হাতে একদম সময় নেই। এর মধ্যে যেটুকু সম্ভব তৈরি হয়ে নিতে হবে।

খেলার দিন মাঠে খুব ভিড়। কাগজের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররাও এসেছেন। তমাল খেলছে। ওদের স্কুলের সকলেই এসেছেন। তমাল জানে, ওর ভালো খেলা দরকার। একে তো ওদের স্কুল থেকে ও একা চান্স পেয়েছে। তার ওপর এই প্রথম ও একটা বিদেশী দলের বিরুদ্ধে খেলছে। এই ম্যাচে ভালো খেলতে পারলে, গোল করতে পারলে ও চট করে সকলের নজরে পড়ে যাবে।

ক'দিন এক সংগে প্র্যাকটিশ করায় খেলোয়াড়দের মধ্যে কিছুটা চেনা-জানা হয়েছে। তবে তমাল জানে, এই খেলায় কেউ কাউকে হয়তো তেমন সাহায্য করবে না। নিজের খেলা দেখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে সকলে।

জগাদা ওকে বার বার বলেছে, চান্স পেলে তুই নিজেই গোল করার চেষ্টা করবি। সব সময় চেষ্টা করবি ভালো খেলে নজর কাড়ার। এই ম্যাচে ভালো খেললে তুই জুনিয়ার বেংগল টিমেও এসে যেতে পারিস।

জগাদাও মাঠে এসেছে। স্কুলের ছেলেদের সংগে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তমালের শুধু একটাই ভয়, পায়ের ব্যথাটা আবার না চাগিয়ে ওঠে। জগাদা অবশ্য বলেছে উঠবে না। ম্যাসেজ আর সেঁকে যথেষ্ট উপকার হয়েছে। তার ওপর কদিন রেস্ট পাওয়ায় আর কোনো চিন্তা নেই।

বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মাঠে নেমে পড়ছে। কেউ বল সট করছে, কেউ ছুটোছুটি করছে। তমালরাও নেমে পড়লো। অনেকগুলো বল। ওরা ওয়ার্ম আপ করছে। তমাল বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে জগাদা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে থামলো।

পায়ে লাগছে মনে হলেই কিন্তু আর খেলবি না। তার আগেই দু একটা গোল করার চেষ্টা করবি।

তমাল মাথা নাড়লো।

রেফারির বাঁশি বেজে উঠলো। দুদলের খেলোয়াড়রা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী এসেছেন, তিনি হ্যান্ডশেক করলেন সকলের সংগে। ফুলের তোড়া বিনিময় হলো দুই বাংলার খেলোয়াড়দের মধ্যে।

তারপর শুরু হলো খেলা। আগে থেকেই ওরা ঠিক করে রেখেছিলো। তমাল মধ্যমগ্রাম স্কুলের শিশিরের সংগে জায়গা বদল করে চলে গেলো ডান দিকে। বল তখন ওদের গোলের কাছাকাছি। তমাল নেমে এসেছে অনেকটা। তখনই বারাসত সরকারী স্কুলের ব্রতীশ বল নিয়ে ওভারল্যাপ করে এগিয়ে এলো। তমাল ফাঁকায়। ওকে বল দিলে ওদের মুভমেণ্টটা দারুণ হবে। ব্রতীশ কিন্তু তা করলো না। বল নিয়ে সে এগিয়ে চললো দুলকি চালে। বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় এসে চার্জ করলো। বলটা ছিটকে যেতেই আর এক জন বাংলাদেশী বল নিয়ে তীরের বেগে ওদের রক্ষণভাগের মধ্যে ঢুকে পাস দিতে গেলো। বল চলে এলো নীরেনের পায়ে। নীরেন উঁচু করে তুলে দিলো মাঝমাঠের দিকে। তমাল ছুটে এলো। আশে পাশে কেউ নেই। ও এগিয়ে এসে বলটা ঠেলে দিলো শিশিরকে। শিশির একজনকে কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলটা স্কোয়ার করে তমালকেই দিলো।

তমালকে বাধা দিতে বাংলাদেশ স্কুলের যে ছেলেটা এসেছিলো তাকে শরীর দুলিয়ে, বোকা বানিয়ে তমাল বেরিয়ে এলো। ও ছুটছে। শিশির ফাঁকায়। ওকে বলটা দিয়েই তমাল ছুটে মধ্যে ঢুকে পড়লো, শিশির ততোক্ষণে বলটা বাড়িয়ে দিয়েছে, তমাল ছুটে গিয়ে বলটা ধরে নিয়েই সট করলো। বলটা পোস্টের গা ঘেঁষে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

দর্শকদের হতাশার ধ্বনি ভেসে এলো তমালের কানে। একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলো তমাল।

আবার ওদের আক্রমণ, ব্রতীশ বল নিয়ে এগিয়ে আসছে। তমাল ওর সংগে তাল দিয়ে ছুটছে। তমালের সামনেটা একদম ফাঁকা। বল পেলে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। না, ব্রতীশ এবারও বল দিলো না। ড্রিবল করতে গিয়ে বলটা হারালো। বাংলাদেশের একজন ডিফেন্ডার বলটা ধরে তরতর করে এগিয়ে গেলো। সেণ্টার করলো তমালদের গোলের মুখে। ওদের স্টপার লাফিয়ে উঠলো হেড দিতে। পারলো না। বলটা ধরার জন্যে গোলকিপার রমেন এগিয়ে এলো। সেই ফাঁকে বাংলাদেশের স্ট্রাইকার জাহির বলটা গোলে ঠেলে দিলো।

বাংলাদেশ দল এগিয়ে গেলো এক গোলে।

তমালের ভীষণ রাগ হচ্ছে। ব্রতীশরা বড্ড সেলফিস। কিছুতেই বল দেবে না। এতোক্ষণে তো ওদেরই এগিয়ে যাবার কথা। গোলটা শোধ করার জন্যে তমালরা উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। দেখতে দেখতে প্রথম অর্ধের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

এমন সময় তমালরা একটা ফ্রি কিক পেলো। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা ওয়াল করে দাঁড়িয়েছে। সুখেন ওয়ালের ওপর দিয়ে বলটা চিপ করলো। ওদের একজন স্টপার হেড দিয়ে বলটা ফিরিয়ে দিয়েছে। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে জটলা। সেই জটলার মধ্যে বলটা মটিতে পড়ার আগেই তমাল ব্যাকভলি করলো। বলটা কেউ কিছু বোঝার আগেই বাঁ দিকের পোস্ট ঘেঁষে সোজা জালে।

গো-ও-ল......

সমস্ত মাঠ জুড়ে চিৎকার। তমাল দারুণ গোল করেছে। খেলোয়াড়রা এসে ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মাঠের বাইরে প্রণবদার মুখে হাসি। জগাদা আনন্দে লাফাচ্ছে।

সেণ্টার হতে না হতেই হাফ টাইমের বাঁশি বেজে উঠলো। খেলার ফলাফল তখন ১–১।

দারুণ গোল করেছিস।

প্রণবদা ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। তমাল বসে পড়েছিলো। জগাদা এসে পায়ের লাগা জায়গাটা ম্যাসেজ করে দিচ্ছিলো। বললো, লাগছে না তো?

মাথা নাড়লো তমাল।

আরও গোল করার চেষ্টা কর।

তমাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো।

কারণ আছে। তোর কথা একজনকে বলেছিলাম। সে তাদের ক্লাবের ক'জনকে নিয়ে এসেছে।

ক্লাব...?

তমাল একটু অবাক হয়েই জগাদার দিকে তাকায়। জগাদার মুখে হাসি। বললো,–এখন কিছু বলবো না। তুই শুধু ভালো খেলার চেষ্টা কর। ওরা তোকে বড্ড ছোট, বড্ড ছোট বলছিলো। কিন্তু গোলটা দেখে চুপ করে গেছে। সংগে ওদের কোচও এসেছে তো! তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তোর খেলা দেখছে আর মাথা নাড়ছে।

দ্বিতীয় অর্ধে খেলা আরও জমে উঠলো। কিন্তু কেউ আর কোনো গোল করতে পারলো না। তমাল দারুণ খেলেছে। ওর একটা সট পোস্টে লেগে ফিরে আসতেই ব্রতীশ ওর আগে গিয়ে বলটা বাইরে মেরে বসলো। তা না হলে ওরাই হয়তো জিতে যেতো।

খেলার শেষে বাংলাদেশের ম্যানেজার এসে ওর গলায় একটা মেডেল পরিয়ে দিলেন। বললেন, আমার মতে তুমিই 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'।

মাঠের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। মাঠের পাশে একটা পুকুর আছে। তমালরা ঠিক করে রেখেছিলো, খেলার শেষে ওখানে চান করবে। ওরা ওখানে চান করবে শুনে বাংলাদেশের ছেলেরাও ঠিক করে ফেলেছে যে তারাও ঐ পুকুরেই নামবে।

পায়ের বুট খুলে তমাল ওর স্কুলের বন্ধুদের সংগে গল্প করছিলো। তখনই জগাদার সংগে তিন চার জন ভদ্রলোক এসে হাজির। একজনের মুখটা তমালের খুব চেনা চেনা।

জগাদা এসেই বললো, এই দ্যাখ কে এসেছে!

তমাল একটু অবাক হয়েই তাকালো।

চিনতে পারছিস নে?

আরে তোদের রুণুদা। মনে নেই? ইস্টবেংগল, মোহনবাগান, বেংগল, ইণ্ডিয়া–কোথায় খেলে নি।

তমাল লাফিয়ে উঠলো। রুণুদা মানে.....। ওর খাতায় তো ওঁর ছবি আছে। একসময় কী নামকরা খেলোয়াড়ই না ছিলেন। প্রত্যেক বছর ট্রান্সফারের সময় ওঁকে নিয়ে টানাটানি চলতো।

জগাদা ম্যাসেজ করতে করতে কথা বলছিলো।

খেলা ছেড়ে কোচ হয়েছেন। ওঁর নাম তো সব্বলে জানে।

জগাদা বলছে, এই দেখো রুণু–এই তো মাল। ওর খেলা তো তুমি দেখলে। এবার দেখো ওকে তৈরি করে নিতে পারো কিনা!

রুণুদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, বেশ খেলেছো। কোথায় থাকো তুমি?

পাতিপুকুরে।

ওখান থেকে তুমি রোজ সকালে ময়দানে আসতে পারবে?

তমাল মাথা নাড়ে। পারবে।

তুমি বড্ড ছোট। একটু টাফ হতে হবে। ব্যায়াম করতে হবে রোজ। জগাদা, প্রথম দিন তুমি ওকে নিয়ে এসো না!

জগাদা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ নিয়ে যাবো। কিন্তু এখন তো স্কুল খোলা। তোমাদের ওখান থেকে ফিরে স্কুলে যেতে পারবে তো?

কেন পারবে না? সাড়ে সাতটার মধ্যে প্র্যাকটিশ শেষ হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরতে বড় জোর এক ঘণ্টা। তারপর রেডি হয়ে স্কুলে যাবে।

কিন্তু পড়বে কখন?

জগাদার ইতস্তত ভাব দেখে তমাল বলে উঠলো, আমি রাত জেগে পড়ে নেবো। তুমি কিছু ভেবো না।

ঠিক আছে। তা'হলে ঐ কথাই রইলো। জগাদা কাল ভোর-বেলায় ওকে নিয়ে আসছো তুমি। তোমার তো পুরোনো ক্লাব। আমি সঞ্জীবকে বলে রাখবো।

সকলে পুকুরে নেমে পড়েছে। তমালকে ডাকছে। আনন্দে তমাল তখন যেন হাওয়ায় ভাসছে। সে ময়দানে খেলবে! কোন ক্লাব, কোন ডিভিসান কিছু জানে না। কিন্তু ময়দানে প্র্যাকটিশ করবে, একটা ক্লাবে খেলবে এই আনন্দেই ও আত্মহারা। ছুটে গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়লো।

পুকুরে তখন বাংলাদেশের ছেলেদের সংগে সাঁতারের কমপিটিশান হচ্ছে। তমাল মেতে উঠলো তাই নিয়ে।

।।পাঁচ।।

গড়ের মাঠ

বিচিত্র জায়গা। তমালের কোনো ধারণাই নেই। গড়ের মাঠের ঘাস চিনতেই নাকি বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু মানুষগুলো চিনতে....

তমালকে দেখে প্রথম দিন তো আঁতকে উঠেছিলেন সকলে। এ খেলবে? এই এত্তোটুকু ছেলে? এর যে এখনও গাল টিপলে দুধ বেরুবে।

জগাদা চুপ করেছিলো। একদিন জগাদাও ঐ ক্লাবে খেলেছিলো। কিন্তু এখন সব কিছুই বদলে গেছে। ছেলেগুলো কেমন যেন উদ্ধত। ওদের দেখে সঞ্জীবদা, সঞ্জীব রায়চৌধুরী এগিয়ে এলেন। কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে পড়ান। তবে ছোটদের খেলা শেখানো ওঁর নেশা। শুধু ফুটবল নয়। অ্যাথলেটিকস থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই শেখান। গৌতম সরকারকে নাকি উনি প্রথম দিকে খেলা শিখিয়েছিলেন।

বললেন, জগাদা বোস। তোমার পুরোনো ক্লাব। কিন্তু এখন আর চিনতেই পারবে না। পুরোনোদের মধ্যে মামাকে

দুরন্ত গতিতে ও ছুটে চললো

পাবে। মামা এখনই এসে যাবে। তারপর তমালের দিকে ফিরে বললেন, তুই মাঠে নেমে পড়। বুট এনেছিস তো? পরে নে। তারপর একটা বল নিয়ে মাঠটা ক'বার চক্কর দে।

তমাল বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে চারদিক দেখছিলো। ওর মনের মধ্যে তখন আনন্দ, ভয় আর ভাবনা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ও ভাবতেই পারছে না যে গড়ের মাঠে ফার্স্ট ডিভিসানের খেলোয়াড়দের সংগে প্র্যাকটিশ করছে।

সঞ্জীবদা তখন ভলি মারার কায়দা শেখাচ্ছেন। কর্ণার থেকে একজন উঁচু করে বল গোলের মুখে ফেলছে। সেই বল মাটিতে পড়ার আগে বা পড়ার মুহূর্তে গোলে মারছে আর একজন। তমাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। সঞ্জীব ইশারা করলেন, তমাল ছুটে এসে মারলো।

ঠিক হলো না। অন্যরা মুখ টিপে হাসলো। সঞ্জীবদা এসে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, এ কিছু না—দুচার দিন চেষ্টা করলেই পারবি।

ঘন্টা খানেক প্র্যাকটিশ হলো। সঞ্জীবদা বললেন, কাল আসিস না। কাল খেলা আছে। ইচ্ছে করলে দুপুরে টেণ্টে আসতে পারিস। মাঠে যাবি।

প্রণবদা ভীষণ রেগে গেছেন। তমাল গড়ের মাঠে যাচ্ছে। তাই সকাল বেলায় লেকটাউনে প্রণবদার কাছে যেতে পারছে না। তমালের গড়ের মাঠে যাওয়াটা যেন ঠিক মেনে নিতে পারছেন না প্রণবদা। একটু রাগ, একটু বিরক্ত। কথায় কথায় বলেন, পিঁপড়ের পাখনা গজিয়েছে। এইবার মরবে। আরে বাবা ফার্স্ট ডিভিসান ক্লাব। তোর চেয়ে কতো বড় বড় ছেলে। দেবে একদিন লেংগি মেরে। ব্যস্, সারাজীবনের মতো খেলা শেষ।

তমাল বুঝতে পারে প্রণবদা চান না যে ও গড়ের মাঠে যায়। জগাদা অবশ্য বলেছে, তুই কারো কথা শুনবি না। সঞ্জীববাবু যা বলবে তাই করবি।

বাড়িতেও হৈ চৈ। ছোট্ট বোন মুন্নি আনন্দে লাফাচ্ছে। দাদা তুই মোহনবাগানের সংগে খেলবি? ইস্টবেংগলের সংগে খেলবি? আমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

মনে মনে হাসে তমাল। খেলা—সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। ও শুধু প্র্যাকটিশের সুযোগ পেয়েছে, অন্য খেলোয়াড়রা ওকে পাত্তাই দেয় না। বিশেষ কেউ কথাও বলে না। ফরোয়ার্ডে যারা খেলে তারা ওকে একটু সন্দেহের চোখে দেখে। বলা যায় না কোনদিন হুট করে ও ওদের জায়গা দখল করে বসবে। তাই ওকে ল্যাং মারার চেষ্টা করে।

সঞ্জীবদা আর মামা তমালের নাম আই. এফ. এ অফিসে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছে। তার মানে ও যে কোনদিন খেলতে পারে।

একটার পর একটা খেলা হয়ে যায় তমাল আর চান্সই পায় না। খেলার দিন মাঠে যায়। ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকে।

সঞ্জীবদা বলেন, ব্যস্ত হোস না। দেখ্, দেখে দেখে শেখ। খানিকটা অভিজ্ঞতা না হলে কি আর ফার্স্ট ডিভিসানে খেলা যায়। সময় হলেই খেলাবো।

রোজই আশায় আশায় মাঠে যায় তমাল। ওকে দেখে অন্য খেলোয়াড়রা হাসে। বড্ড কষ্ট হয় তমালের। ভাবে আর মাঠে যাবে না সে। কান্না পেয়ে যায়। ওর মনের ভাব কিভাবে জানি বুঝতে পেরেছিলো জগাদা। সেদিন স্কুলে দেখা হতেই বলে বসলো, কী রে মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

কই না তো?

আমায় লুকোতে পারবি না।

তমাল চুপ করে থাকে। ও কি করে বলবে যে চান্স পাচ্ছে না বলে ওকে দেখে ক্লাবের ছেলেরা হাসে। স্কুলে তরুণ, সুধীররা টিটকিরি দেয়। জগাদা বলে উঠলো, যে যা বলে বলুক তুই গায়ে মাখবি না। ওদের কথায় তোর গায়ে তো ফোস্কা পড়ছে না? তাহ'লে? খেলা থাকলেই মাঠে যাবি। প্র্যাকটিশে যাবি। কোনো অসুবিধে হলে মামাকে কিংবা সঞ্জীবদাকে বলবি। একটা কথা জেনে রাখ তোর ওপর কিন্তু ওঁদের অনেক আশা। ওঁরা দু'জনেই বিশ্বাস করেন, তুই খুব বড় খেলোয়াড় হবি। ওঁরা যা করছেন তোর ভালোর জন্যই করছেন। তোকে ড্রেস পরিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসিয়ে রাখারও একটা কারণ আছে।

জগাদা একটু চুপ করলো। আবার বললো, তুই বাদশা গোলাম বইটা পড়ছিস তো! আমাকে পড়তে দিয়েছিলি! মনে নেই পেলেকে একসময় রোজ ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকতে হতো। তারপর একদিন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামলেন। আর তারপর ....তাহলে তুই কেন মন খারাপ করছিস?

জগাদার কথা শুনছিলো আর তমালের মনটা উৎসাহ, উদ্দীপনায় ভরে উঠছিলো। মনের মধ্যে জমে থাকা মেঘটা জগাদা কতো সহজে সরিয়ে দিলো।

ক'দিন ধরে ক্লাবে খুব উত্তেজনা। মোহনবাগানের সংগে ওদের খেলা আসছে। বছরে ঐ মোহনবাগান, ইস্টবেংগল আর মহামেডানের সংগে খেলাগুলিতেই তো শুধু ওদের সকলের চোখে পড়ার সুযোগ। সেদিন ভালো খেলতে পারলে কাগজে নাম উঠবে। কাগজে কাগজে প্রশংসা বেরুলে চট করে নাম হয়ে যায়, তাই ওরা ঐ খেলাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্য খেলায় তো মাঠে লোকই থাকে না। ফাঁকা মাঠে খেলা হয়। তাই বড় খেলা এলেই ক্লাবে যেন উৎসব লেগে যায়।

তমালের অবশ্য কিছু এসে যায় না। ও ছোট ম্যাচেই চান্স্ পায় নি তো বড় খেলায়। তমাল নিজের মতোই প্র্যাকটিশ করে। সঞ্জীবদা ওকে দিয়ে ব্যাকভলি করাচ্ছেন কিছুদিন ধরে। ও তো আগে থেকেই ব্যাপারটা রপ্ত করে ফেলেছিলো। এখন আরও ভালো পারে। এতে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে। স্কুলের খেলায় অনেকগুলো গোল করেছে ঐ ভাবে। কিন্তু বাংলাদেশ দলের বিরুদ্ধে তমাল বেংগল স্কুল টিমে চান্স পায় নি। তমাল চান্স না পাওয়ায় সকলেই একটু অবাক হয়েছিলেন। সকলেই ভেবেছিলেন, সেদিন ঐ রকম সুন্দর একটা গোল করার পর তমাল নিশ্চয়ই দলে আসবে। তমাল অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি। আসলে মোহনবাগানের সংগে ওদের ক্লাবের খেলা আসছে তো। ও সাইড লাইনের ধারে বসে খেলা দেখবে এই আনন্দেই ও বিভোর। কতো কাছ থেকে ও সুব্রত ভট্টাচার্যকে, বিদেশ বসুকে, মিহির বসুকে, বাবু মানিকে, প্রশান্ত ব্যানার্জীকে দেখবে।

সেদিন সকালে বাড়িতে এক কান্ড। মুন্নি ছুটতে ছুটতে এলো। বললো, দাদা, আমাদের টিকিট দিবি? আমি আর বাবা মোহনবাগানের সংগে তোদের খেলা দেখতে যাবো।

সে কি রে? টিকিট পাবি কোথায়?

কেন তুই দিবি?

আমি?

হ্যাঁ! বাবাও তোকে বলবেন। দাদা তুই মোহনবাগানের সংগে খেলবি?

ধ্যাৎ! এমনি খেলাতেই আমায় নামাচ্ছে না। কিন্তু তোদের টিকিট কোথায় পাবো? তোদের মাঠে যেতে হবে না।

না, না আমি যাবোই। বাবা বলেছেন নিয়ে যাবেন।

মুন্নি ছুটে বাবার ঘরে চলে গেলো। একটু পরে এসে বললো, বাবা ডাকছেন।

আমায়?

তমাল অবাক হয়ে মুন্নির দিকে তাকালো।

চল, চল....

তমাল উঠলো। বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

মুন্নি মাঠে যাবে বলে কান্নাকাটি করছে। তুই দুটো টিকিট যোগাড় করতে পারবি? মুন্নিকে নিয়ে লাইন দিয়ে তো মাঠে ঢোকা যাবে না। দেখ না একবার চেয়ে।

তমালের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ও চান্স পায় না। ক্লাবে ওকে কেউ পাত্তা দেয় না। ও কি করে মোহনবাগানের সংগে খেলার দুটো টিকিট যোগাড় করবে? কার কাছে চাইবে? মামার কাছে, কাল থেকেই দেখছে মামার কাছে বড্ড ভিড়, সকলে ঘিরে রেখেছে। টিকিট চাইছে। মামার কাছে গিয়ে ও টিকিট চাইবে কি করে?

পরশু খেলা। কাল সকালে প্র্যাকটিশ। তখন ভিড় কম থাকে। মামাকে একবার বলে দেখবে। জানে না পাবে কিনা। তমালের খুব খারাপ লাগছে। বাবা চাইলেন—সামান্য দুটো টিকিট তাও কি ও দিতে পারবে না?

সেদিন প্র্যাকটিশে সকলের খুব উৎসাহ। কাল মোহনবাগানের সংগে খেলা। একটু খেলতে পারলেই চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই খেলোয়াড়দের মধ্যেও একটু

আমার দাদা গোল করেছে, আমার দাদা গোল করেছে

টেনসান। কে চান্স পাবে আর কে পাবে না তাই নিয়ে ভাবনা, চিন্তা। সকলে তাই খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিশ করছে। সঞ্জীবদা আজও তমালকে দিয়ে ব্যাকভলি প্র্যাকটিশ করালেন।

প্র্যাকটিশের শেষে চান টান করে সকলে যখন খাচ্ছে তখন আবার সঞ্জীবদা এলেন। কাল তোরা আড়াইটের মধ্যে সকলে এসে যাবি। কি স্ট্র্যাটেজি আমাদের নিতে হবে কাল তোদের বলে দেবো।

খাওয়ার পর সকলে এক এক করে টেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তমাল চুপ করে বসে আছে। টেন্ট ফাঁকা। তমালের মনের মধ্যেটা তখন কি রকম যেন করছে। ও কোন মুখে টিকিটের কথা বলবে? যদি না বলেন–তাহলে? ও তো লজ্জায় মুখই দেখাতে পারবে না।

একটু পরেই সঞ্জীবদা আর মামা ছোট্ট ঘর থেকে বেরুলেন। ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে দুজনেই অবাক। সঞ্জীবদা এগিয়ে এলেন, কি হয়েছে রে! মুখ শুকিয়ে বসে আছিস?

মামাও এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তমাল মুখ ফুটে বলতে পারছে না। সঞ্জীবদা ওর পিঠে হাত রাখলেন, বল না কি হয়েছে?

না, মানে....কালকে খেলা....

তমাল চুপ করে যায়। ওর টিকিটের কথা বলতে ভীষণ লজ্জা করছে।

কাল খেলা তা কি হয়েছে?

না, মানে বাবা আর আমার ছোট বোন....

খেলা দেখতে যাবেন?

হ্যাঁ। মাথা নাড়লো তমাল।

মামা হেসে উঠলেন।

সেইজন্যে এইভাবে বসে আছিস। আমায় একবার বলবি তো? সঞ্জীবদার মুখে হাসি। চকিতে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। মামা বললেন, আয় তোকে টিকিট দিচ্ছি। ক'খানা দরকার?

দুটো।

তমাল ওঁদের পেছনে পেছনে ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে মামা দুটো টিকিট বের করে দিলেন। আনন্দে তমালের চোখে জল এসে গেলো।

সঞ্জীবদা বললেন, তুই কিন্তু কাল আড়াইটের মধ্যে টেন্টে এসে যাবি।

তমাল মাথা নাড়লো।

সঞ্জীবদা আর মামা টেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তমাল বসে রইলো। তার হাতে দুটো কার্ড। বাবা আর মুন্নি খেলা দেখতে যাবে....

।। ছয় ।।

মাঠে দারুণ ভিড়।

মোহনবাগান এবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। একটাও পয়েন্ট হারায় নি এখনো। তাই সমর্থকদের উৎসাহের অন্ত নেই। তমালরা মাঠে আসার অনেক আগেই মাঠ কানায় কানায় ভরে গেছে।

তমালের ভীষণ ভালো লাগছিলো। ও মাঠে নেমে অন্যদের সংগে ছোটাছুটি করছিলো। খেলবে না জানে, কিন্তু মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের সংগে একই মাঠে ওয়ার্মআপ করাও তো বড় কম কথা নয়।

হঠাৎ প্রচন্ড চিৎকার, হৈ চৈ আর হাততালি। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাঠে নামছেন। তমাল চিনতে পারছে। ঐ তো প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সত্যজিৎ ঘোষ, প্রশান্ত ব্যানার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, ঐ তো বাবু মানি, মিহির বসু, বিদেশ বসু। কৃষ্ণগোপাল চৌধুরীকে দেখে খুব হাততালি পড়লো। ইস্টবেংগলের সংগে খেলায় কি দারুণ একটা গোল করেছিলেন। তমাল টি.ভিতে দেখেছিলো। জামশেদের গোলটাও দুর্দান্ত।

তমাল এর আগে মোহনবাগানের খেলা একবারই মাত্র দেখেছে। কিন্তু গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা আর মাঠে নেমে খেলোয়াড়দের কাছাকাছি থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ। ও মাঠে ঢুকেই দেখে নিয়েছে ওদের ক্লাবের এনক্লোজারে বাবা আর মুন্নিকে। মুন্নি দাঁড়িয়েছিলো। ওকে দেখে হাত নাড়ছিলো।

একমুখ হাসি। সত্যি আজ যদি ও খেলতো তাহ'লে বাবা কতো খুশি হতেন। আর মুন্নি। ও তো কিছু বোঝে না। ও ভাবছে, ওর দাদা বুঝি খেলবে।

বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে সুব্রত ভট্টাচার্য তমালের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ও অবাক হয়ে সুব্রতকে দেখছিলো। আর ওকে দেখে সুব্রতর চোখে বিস্ময়। এতোটুকু ছেলে, ও আবার খেলবে নাকি! জিজ্ঞেস করেই বসলেন, তুমি খেলবে নাকি?

সুব্রত ওর সংগে কথা বলছেন। সারা মাঠ তাই দেখছে। বাবা দেখছেন, মুন্নি দেখছে। আনন্দে, গর্বে তমালের মুখ দিয়ে কথা সরে না। কোন রকমে বললো, আমি খেলবো না। একস্ট্রা প্লেয়ার আমি।

সুব্রত মাথা নাড়লেন। তারপর বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। রেফারি আর লাইনসম্যানরা মাঠে এসে গেছেন। বগলা রায় খেলাবেন। প্রদীপ নাগ আর মিলন দত্ত লাইনসম্যান। দু দিকের জাল দেখা হয়ে যেতেই রেফারির বাঁশি বেজে উঠলো। তমালরা বাইরে গিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসলো।

মোহনবাগানের সংগে খেলা। সকলেই জানে ওরা হেরে যাবে। সঞ্জীবদা ডিফেন্সে আটজনকে রেখেছেন। ওরা পাহারা দেবে। মোহনবাগানকে গোল করতে না দেওয়াই ওদের লক্ষ্য। ফরোয়ার্ডে যে তিনজন আছে তারা চেষ্টা করবে মোহনবাগানের রক্ষণভাগে অতর্কিতে হানা দিতে।

মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা গোড়ার দিকে হাল্কা চালেই খেলছিলেন। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে। গোল হচ্ছে না। গ্যালারি অশান্ত। তারা গোল চায়। হঠাৎ প্রশান্ত ব্যানার্জি বল নিয়ে এগিয়ে এলেন। দুজন তাঁকে বাধা দিতে আসছে দেখে বলটা বাবু মানিকে ঠেলে দিয়ে নিজে ছুটে গেলেন। কিন্তু বাবু মানি বলটা ধরার আগেই তমালদের দলের অনিল সেটা মেরে দিলো। কিন্তু বলটা পেলেন কৃষ্ণেন্দু রায়। বল নিয়ে তিনি দ্রুত উঠে এলেন। ডান দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেন, দুলকি চালে দুজনকে কাটিয়ে সেন্টার করলেন। কখন যে সুব্রত ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে ওত পেতে ছিলেন কেউ জানে না। হঠাৎ দেখা গেলো সুব্রত লাফিয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণেন্দুর পা থেকে উঠে আসা বলটা সুব্রতর কপালের ছোঁয়ায় জড়িয়ে গেলো জালে।

গোল...গোল...গোল...!

মোহনবাগান গোল করেছে। সারা মাঠ চিৎকার, হৈ চৈয়ে ভরে গেলো। মোহনবাগান গোল করবে তা তো জানা কথাই। কিন্তু এতো দেরি হলো বলেই তো গ্যালারিতে টেনশান ছিলো। সেন্টার হবার পরই বিরতির বাঁশি বেজে উঠলো।

তমালদের দলের খেলোয়াড়রা সাইড লাইনের কাছাকাছি এসে শুয়ে পড়েছে। মামা ওদের দেখাশোনা করছেন। সঞ্জীবদা কি যেন বলছেন। একটা কথাই শুধু তমালের কানে এলো।

তোরা ডিফেন্সটাকে একেবারে টাইট করে ফেল। কিছুতেই ওদের আর গোল করতে দিবি না।

দ্বিতীয়ার্ধে তমালদের পুরো দলটাই নেমে খেলতে লাগলো। মোহনবাগান বারবার চেষ্টা করেও আর গোল করতে পারছে না। একঘেয়ে খেলা। বল প্রায় সব সময়ই ঘুরছে তমালদের হাফ লাইনের কাছাকাছি। কিন্তু তারপরই আর বেশি দূর এগোতে পারছেন না মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা।

দর্শকরা গোল গোল করে চিৎকার করছেন, কিন্তু কোথায় গোল। প্রশান্ত, সুব্রত, মিহির, বিদেশ, কৃষ্ণেন্দু গোল লক্ষ্য করে সট করেছিলেন দূর থেকে। সে সটগুলো আটকাতে তমালদের গোলরক্ষক শ্যামলকে তেমন বেগ পেতে হয় নি।

ফ্ল্যাগ নেমে গেলো। খেলা শেষ হতে আর মিনিট পাঁচেক বাকি। হঠাৎ সঞ্জীবদা বললেন, তমাল চলে আয়। তুই নাম।

আমি...

তমাল আকাশ থেকে পড়লো।

দেরি করিস নে। সময় নেই। চলে আয়।

তমাল যখন খেলতে নামলো তখন আর চার মিনিট বাকি আছে। ওর ভয় করছে। কাদের সংগে খেলছে ও। ভাবতে না ভাবতেই বল এসে পড়লো তমালের পায়। তমাল বল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। সামনে কেউ নেই। মোহনবাগানের গোলের সামনে শুধু সত্যজিৎ ঘোষ।

তমাল হঠাৎ সব ভুলে গেলো। ওর চোখের সামনে শুধু গোল। দুরন্ত গতিতে ও ছুটে চললো। পেছনে ছুটে আসছেন সুব্রত ভট্টাচার্য আর কৃষ্ণেন্দু রায়। তাড়াতাড়ি আসছেন প্রশান্ত ব্যানার্জি আর মিহির বসু।

তমাল দেখলো সত্যজিৎ এগিয়ে আসছেন। তমাল চকিতে সরে এসে ওঁকে কাটালো তারপর ঢুকে পড়লো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। সামনে শুধু প্রতাপ ঘোষ। আর দেরি করলো না তমাল। ডান পায় সট নিলো।

ও দেখলো প্রতাপ ঘোষ লাফিয়ে উঠেছেন। বলের নাগাল পান নি। কিন্তু গোলে না ঢুকে বলটা বারে লেগে ফিরে আসছে। তমালের দিকেই আসছে। হঠাৎ ওর কি মনে হলো...ও চকিতে পেছনে ঘুরে গিয়ে, ধীরে ধীরে শরীরটাকে পেছনে হেলিয়ে প্রচন্ড জোরে ব্যাকভলি করলো। কেউ কিছু বোঝার আগেই বল মোহনবাগানের জালে।

গো...ও...ল...

রেফারির বাঁশি বেজে উঠলো। মাঠ নিস্তব্ধ। তমাল মাটিতে পড়েছিলো। কি হয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ দেখলো ওদের দলের খেলোয়াড়রা ছুটে এসে ওকে তুলে ধরে জড়িয়ে ধরলো। কেউ কেউ আনন্দে নাচছে। কে একজন তমালের কানে কানে বললো, দারুণ গোল করেছিস...

নিস্তব্ধ মাঠের এককোণে শুধু আনন্দের ঢেউ। সেখানে শ দুই তিন দর্শক দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন। দূর থেকে তমাল দেখলো, মুন্নি দু হাত তুলে নাচছে। ওর পাশে বাবা দাঁড়িয়ে। তমাল জানে মুন্নি কি বলে চেঁচাচ্ছে...

আমার দাদা গোল করেছে, আমার দাদা গোল করেছে...

ঘুমন্ত পুরী

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

রঙ্কুলাল আর কঙ্কাবতী পিঠোপিঠি ভাইবোন। কঙ্কাবতী বছর দুইএর বড়। ছেলেবেলা থেকেই দুজনেরই বিজ্ঞানের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ।

সেই ছোট্টবেলার কথাই বলি। কত আর বয়স হবে তখন রঙ্কুলালের? বড়জোর দশ কি বারো। নেহাৎ খেলার মাঠের অল্পসল্প একটু সময় আর ইস্কুলের জন্য একটু পড়াশোনা,–ব্যস, বাকি সময় সর্বদাই হাতে একটা কাঁচি নিয়ে বসে। সামনে স্তূপীকৃত বিজ্ঞানের পত্রিকা পুরোনো ম্যাগাজিনের স্টল থেকে কেনা,–স্বদেশী বিদেশী সব রকম। প্রথমে গোগ্রাসে গেলার মত করে পড়ছে।তারপর, মনের মতন কোন বিষয় পেলেই, আর কথা নেই, ঘ্যাচাং করে চালাচ্ছে কাঁচি। এর পর ছবি সমেত সেই কাটিংটা নিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে রাখছে ইয়াব্বড় একটা দু কিলো ওজনের খাতায়। বাবা খাতাটার নাম দিয়েছিলেন 'জাব্দা খাতা'। মা বলতেন, "না, ওটার নাম রাখ 'পঞ্চশস্য–মা আবার সংস্কৃতে পন্ডিত, থুড়ি পন্ডিতাইন ফিগ! কিন্তু দাদু বলতেন, 'না, ওটা ওর স্বরচিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া'। যখন খাতা ভর্তি হয়ে যাবে কাটিং-এ, এখন দেখা যাবে আপনা থেকেই একটা

বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি হয়ে গেছে।" অবশ্য ঠিক স্বরচিত না হলেও ওরই সংকলন করা বা সম্পাদিত তো! আঃ, কে না জানে, এসব ক্ষেত্রে যা মুন্সিয়ানা তা সম্পাদকেরই প্রাপ্য।

কঙ্কাবতীর ঠিক ও-রকম অভ্যাস না থাকলেও ওর ছিল বই পড়ার নেশা। ছোট্ট একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিল সে, যার বেশির ভাগই ছিল সহজ বিজ্ঞানের বই দিয়ে ঠাসা,–ইংরেজিতে যাকে বলে 'পপুলার সায়ান্স'। জন্মদিনে, ভাইফোঁটায়, পূজোয় অন্য কোনও উপহার পছন্দ করত না ও, খুশি হত বই পেলে। কি চাই জিজ্ঞেস করলে সব সময়েই এক উত্তর–"বই।–পপুলার সায়ান্সের বই।" এ বিষয়ে ওর গুরু ছিলেন মাস্টারমশাই কুঞ্জবাবু স্যর।

এখন অবশ্য দু'জনেই বড় হয়েছে। দু'জনেই পড়াশোনার পাট শেষ করে কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে, আর বিজ্ঞানের প্রতি সেই দুরন্ত আগ্রহ কারও এক তিল কমে নি। তবে এখন আর শুধু বই পড়া নয়, হাতে-নাতে নানা রকম পরীক্ষা, নানা দুর্গম জায়গায় অভিযান এই সব নিয়েই মেতে উঠেছে ওরা। তা সে বরফ-ঢাকা পাহাড়ই হোক, আর ধূ ধূ-করা মরুভূমিই হোক, কিংবা দূর সমুদ্রের নাম-না-জানা কোন ছোটখাট দ্বীপই হোক। ইতিমধ্যেই ওরা এরকম তিন-চারটে অভিযান সেরেও এসেছে এবং এ নিয়ে বেশ কিছুটা নামও হয়েছে ওদের বিজ্ঞানী-মহলে–বাংগালীর মধ্যে যা বড় একটা দেখা যায় না।

সেবার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের দু'জনেরই ডাক পড়ল–ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কয়েকটা লেক্চার অর্থাৎ বক্তৃতা দিতে হবে। দু' জনকেই। অবশ্য এজন্য ওঁরা যে সম্মান-দক্ষিণা দেবেন তা আমাদের দেশের হিসেবে বেশ মোটা। ওরা তাই প্রস্তাবটা লুফে নিল, কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার নানা জায়গায় এত সব বৈচিত্র্যময় জায়গা আছে যা খুব কম লোকই ঘুরে দেখবার সুযোগ পায়। তাছাড়া শুধু ইচ্ছে আর সুযোগ থাকলেই হয় না, খরচটাও ভাববার বিষয়। ওরা ঠিক করল লেক্চার দেবার পর যে বাড়তি টাকাটা হাতে থাকবে তা নিয়ে ওরা ঐ জায়গাটা চষে বেড়াবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ইনিওতে যাবার সাধ ওদের বহুদিনের। ঐখানেই আছে সেই মৃত্যু-উপত্যকা, ওখানে যার নাম ডেথ্ ভ্যালি। ঐ ডেথ্ ভ্যালিই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরম জায়গা। কতটা গরম? আমাদের দেশে জ্যাকোবাবাদের সবচেয়ে গরম জায়গা বলে একটা দুর্নাম আছে। গ্রীষ্মকালে সেখানে থার্মোমিটারে ৪৬ ডিগ্রী সেলশিয়াস অর্থাৎ ১১৪ ডিগ্রী ফারেন হাইটেরও ওপর তাপমাত্রা উঠে যায়। কলকাতায় যখন ৪০-৪১ ডিগ্রী সেলশিয়াস উঠলেই আমরা ত্রাহি ত্রাহি করি তখন জ্যাকোবাবাদে গেলে কি অবস্থা হবে ভাবা যায় না। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার এই ডেথ্ ভ্যালিতে নাকি তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে সময় সময় ৭৭ ডিগ্রী সেলশিয়াসও ছাড়িয়ে যায়। তার মানে ১৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেও বেশি। ১০০ ডিগ্রী সেলশিয়াস হলেই জল ফুটে বাষ্প হয়ে যায়, কাজেই এই গরমটাও যে কতখানি তা কল্পনা করা কঠিন নয়। ঐ গরমে মানুষের গায়ের জল সব শুকিয়ে যায়, চামড়া যায় পুড়ে। একটা ৭০-৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে ৩০-৪০ কিলোগ্রাম হয়ে গেছে এমনও নাকি ঘটেছে ওখানে।

রংকুলাল বলল, "কুছ পরোয়া নেই। ঐ ডেথ্ ভ্যালিই আমরা দেখতে যাব। তবে হ্যাঁ, দস্তুরমত তৈরি হয়ে যেতে হবে। অ্যাস্বেস্টসের আঁশ দিয়ে বুনে পোশাক বানিয়ে নিতে হবে যাতে গরমে ঝলসে যেতে না হয়। তাছাড়া কালো চশমা, ঠাণ্ডা জলভরা থার্মোফ্লাস্ক, মিনি-জেনারেটর দিয়ে চালানো এয়ারকুলার–এসবও চাই।"

কঙ্কাবতীরও উৎসাহ কিছুমাত্র কম নয়। যদি বিপদের ঝুঁকিই না নেওয়া গেল তবে আর অ্যাডভেঞ্চার হল কোথায়? বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাতে হলে এসব তো মেনে নিতেই হবে। আর তারা তো শুধু অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় যাচ্ছে না, ওখানে গিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও নিশ্চয়ই চালাবে। তার জন্যও সংগে দরকারী যন্ত্রপাতি নিতে হবে। একটা জিপ্ গাড়িরও দরকার হবে।

রংকুলালেরও সেই মত। তাই দু'জনে মিলে তোড়জোড় শুরু করে দিল।

ডেথ্ ভ্যালিতে যে লোকে যায় না এমন নয়, তবে সকলেই প্রায় যায় শীতকালে, দু-চার-দশ জন অবশ্য গরমের দিনেও গেছে, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ভয়ানক। খুবই বিপদে পড়েছে তারা সবাই ফিরতেও পারে নি।

রংকুলাল শুনে বলল, "যেতে হলে ঐ গ্রীষ্মকালেই যেতে হবে, শীতকালে যাবার কোন মানেই হয় না। এই তো সবে গ্রীষ্ম শুরু হয়েছে, যেতে হলে এখনই যাব।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর ডেথ্ ভ্যালি যাওয়া হল না। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায় বক্তৃতা

দিতে গিয়ে ওরা একটা নতুন খবর পেল যার কথা ওদের জানা ছিল না। ডেথ্ ভ্যালি থেকে প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে একটা নতুন জায়গা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জায়গাটা পাহাড়ী তো নয়ই, এমন কি সমতলও নয়। বরঞ্চ একটা বেসিন বলা যেতে পারে ওটাকে। অনেকটা গামলার মত মাঝখানে ঢালু হয়ে অনেকটা নেমে গেছে সমতল থেকে। তা যাক, কিন্তু ঐখানেই সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া গেছে একটা পরিত্যক্ত শহর। পরিত্যক্ত না বলে মৃতের শহর বললে আরও ঠিক বলা হয়। অসংখ্য বাড়িঘর, অট্টালিকা দিয়ে গোটা শহরটা সাজানো, কিন্তু একটি জনপ্রাণীও নেই সেখানে। এ যেন রূপকথার সেই ঘুমন্তপুরী। শুধু মানুষই নয়, একটি গাছগাছালিও খুঁজে পাওয়া যাবে না ওখানে। আর গরম? কোথায় লাগে ডেথ্ ভ্যালি ওর কাছে? ওখানকার আবহাওয়ার উত্তাপ নাকি ৯৫ ডিগ্রী সেলশিয়াস ছাড়িয়ে গেছে এবং তা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। খুব শীগ্গিরই হয়তো ১00 ডিগ্রী সেলশিয়াস্ অর্থাৎ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তার মানে যদি কখনও ওখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে কিংবা ওর কোথাও যদি কোন জল জমা থাকে তবে সে মুহূর্তে বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাবে।

কি করে ঐ জায়গাটার খবর পাওয়া গেল? সেও এক কান্ড। একবার এক ঝাঁক সামরিক এরোপ্লেন,—তা সংখ্যায় গোটা পনেরো হবে,—ঐ জায়গার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝুপ্ ঝুপ্ করে সবগুলি ভেঙে মাটিতে আছড়ে পড়ল। না, কেউ গুলি করে নামায় নি, যুদ্ধ নয়, শান্তির সময় ওটা। তবে কেন পড়ল? একসঙ্গে পনেরোটা প্লেনের এঞ্জিনই কি অচল হয়ে গেল? আশ্চর্য ব্যাপার। বলা বাহুল্য ঐ সব এরোপ্লেনের একটি লোকও বেঁচে ছিল না; অত ওপর থেকে পড়লে কি কেউ বাঁচে? সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই উৎকণ্ঠিত হলেন। তার পর সঠিক ব্যাপারটা জানার জন্য আবার একটা পর্যবেক্ষণ প্লেন পাঠালেন। কথা রইলো, কোনও খবর দেবার থাকলে বা বিপদে পড়লে প্লেন থেকেই যেন সঙ্গে সঙ্গে বেতারে তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু এ প্লেনটিরও হল ঐ একই দশা। উদ্ধারের চেষ্টা করার আগেই সেটাও আবার ভেঙে পড়ল নীচে। শুধু ক্ষণিকের জন্য বেতারে একটা আর্তস্বর শোনা গেল—

হঠাৎ কঙ্কাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "এই রঙ্কু দেখ"

"থার্মোমিটারের ৯৫ ডিগ্রী ছাড়িয়ে যাচ্ছে!–উঃ, কী গরম–মরে গেলাম!–দম বন্ধ হয়ে গেল।" তার পরেই সব চুপ।

এরপর আর সামরিক কর্তৃপক্ষ নতুন করে পর্যবেক্ষক প্লেন পাঠাতে সাহস পেলেন না। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। রহস্যের মীমাংসা আজও হয় নি। বিজ্ঞানীরা বেশ খানিকটা চেষ্টা করেও কিছু হদিস পান নি। জায়গাটার কাছে যেতেও সাহস পান নি। অগত্যা ওটাকে একটা 'অতিপ্রাকৃত রহস্য'–ওঁদের ভাষায় 'সুপারন্যাচারাল মিস্ট্রী' আখ্যা দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা হয় না। তবে হ্যাঁ, জায়গাটার একটা নাম দেওয়া দরকার। ডেথ্ ভ্যালি নামটা তো আগেই অন্য একটা জায়গাকে দেওয়া হয়েছে, তাই ওঁরা এই জায়গাটির নাম দিয়েছেন–'স্লীপিং ল্যান্ড' অর্থাৎ 'ঘুমন্ত পুরী'।

ডেথ্ ভ্যালি যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করল রঙ্কুলাল আর কঙ্কাবতী। ওদের মাথায় এবার খেয়াল চাপল–যদি যেতেই হয় তবে এই ঘুমন্ত পুরীতেই যেতে হবে। উদ্ধার করতে হবে এর রহস্য।

সবাই শুনে বলে, "বল কি! এমন গোঁয়ার্তুমি কেউ করে? এ যে জেনেশুনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া!" কিন্তু রঙ্কুলাল একবার যা জেদ ধরবে তা না করে ছাড়বে না। দিদি কঙ্কাকেও সে জপিয়ে জাপিয়ে নিজের মতে নিয়ে এল। বলল, "আমরা তো খালি হাতপায়ে যাব না, দস্তুরমত আটঘাট বেঁধে তবেই যাব। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই আমাদের এই অভিযানে সাহায্য করবে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সাহায্যও নিশ্চয়ই পাব। তাছাড়া আমেরিকার মহাকাশ গবেষণাগার থেকেও আমরা কিছু কিছু জিনিস ধার চেয়ে নেব। আমরা শুনেছি ঐ বিভাগে বহু ভারতীয় কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক বাঙালীও আছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।"

সকলের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সত্যিই রঙ্কুলাল আর কঙ্কাবতী ঘুমন্ত পুরী অভিযানের জন্য তৈরি হল। পোশাকের মধ্যে রইল–মহাকাশচারীরা যেমনটা ব্যবহার করেন সেই রকম স্পেস্-স্যুট্। তার ওপর অতিরিক্ত মাথা-সমেত সর্বাঙ্গ-মুড়ে-দেওয়া একটা আলখাল্লা গোছের ঘেরা টোপ–হাল্কা অথচ অ্যাস্বেস্টস্ ও আধুনিক উত্তাপ ও অগ্নিনিরোধক জিনিস দিয়ে তৈরি সেটা। মুখের সঙ্গে আঁটা রইল গ্যাস-মুখোশ ও কথাবার্তা বলার জন্য নিরাপদ চোঙা, পিঠে অক্সিজেন-সিলিন্ডার আর একটা ঝোলা–যার মধ্যে রইল ছোট বাক্সে ভরা খুদে একটা ল্যাবরেটরী। দু'ভাইবোনের একই পোশাক। ঠিক হল যতটা যাওয়া সম্ভব ওরা জিপে করেই যাবে। তার-পর সেই তথাকথিত ঘুমন্ত পুরীর কাছে নেমে, সম্ভব হলে, পায়ে হেঁটেই ঘুরে বেড়াবে। কারণ সেই জনমানবহীন নির্জীব পুরীতে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে না পারলে সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হবে না। আর, তা করতে হলে, পায়ে হেঁটে ঘোরাই সুবিধাজনক। তবে কাছাকাছি একটা হেলিকপ্টারও থাকবে এবং সেটিকেও অগ্নিনিরোধক বর্মে সুসজ্জিত করে রাখা হবে যাতে সেই সামরিক এরোপ্লেনগুলির দশা না হয়। মহাকাশচারীরা ইতিপূর্বেই এ ধরনের বর্ম ব্যবহার করেছেন তাঁদের মহাকাশ জাহাজে–যখন মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ঢুকবার সময় প্রচন্ড ঘর্ষণে তাঁদের জাহাজের বাইরের দিক্টা প্রচন্ড রকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওদের আগ্রহ দেখে ও পরিকল্পনা পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়, জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, সামরিক বাহিনী এবং ওখানকার মহাকাশ গবেষণাগার নিজে থেকেই এইসব ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করে দিলেন।

দস্তুরমত তৈরি হয়ে ওরা ঢুকে পড়ল সেই পরিত্যক্ত শহরে।

সারি সারি বাড়ি, মাঝে মাঝে বিরাট অট্টালিকা এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বাড়িগুলোর ছাদ দেখে মনে হয়, স্প্যানিশরা যখন এখানে এসে উপনিবেশ গড়ে তোলে তখনই এগুলো তৈরি হয়েছিল। এ অঞ্চলে তখন কাঠের ছড়াছড়ি, বেশির ভাগ বাড়িই তাই কাঠের তৈরি। বাড়িগুলির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল তার মধ্যে প্রচুর আসবাবপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো–সেগুলোও প্রায় সবই কাঠের। তার গায়ে কতদিন ধরে ধুলো জমে আছে কে জানে! এত বাড়ি, এত আসবাবপত্র, কিন্তু কোথাও লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই!

ওরা আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। মুখে গ্যাস-মুখোশ, তার সঙ্গে কথা বলার চোঙা, পিঠে অক্সিজেন-সিলিন্ডার, কাঁধে ঝোলা। পরনের পোশাকও তাপনিরোধক। থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল–জায়গাটার টেম্পারেচার অর্থাৎ উষ্ণতা বা তাপমাত্রা সত্যি প্রায় ৯৫ ডিগ্রীর কাছাকাছি। কী সাংঘাতিক! পৃথিবীর ওপর কোন জায়গা যে এত গরম হতে পারে তা ভাবাই

যায় না।

হঠাৎ কঙ্কাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "এই রঙ্কু, দেখ!"

রঙ্কুলাল ফিরে তাকাল। এক জায়গায় পাশাপাশি চার পাঁচটা নরকঙ্কাল পড়ে আছে। চামড়া, মাংস শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। ঠিক যেন ম্যমী! কতদিন আগে এই হতভাগ্যদের মৃত্যু হয়েছিল কে জানে!

রঙ্কুলাল বলল, "আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস দিদি? এত বড় শহরটায় এ পর্যন্ত একটা গাছ চোখে পড়ল না! রোদে পুড়ে ঝলসে গেলেও কোন গাছ থাকলেও তার অঙ্গার অংশটুকু তো অন্ততঃ থাকবে। তাও নেই কোথাও। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি?"

"হুঁ", বলে কঙ্কা আর একটু এগিয়ে গেল, বলল, "ঐ দিক্‌টায় চল্‌। ঐ যে উঁচু ঢিবির মত কি একটা রয়েছে দেখছি।"

কাছে গিয়ে দেখল, ওগুলোও কঙ্কাল, তবে মানুষের নয়, কতকগুলো নানা ধরনের চতুষ্পদ জন্তুর। কোন কোনটা বেশ বিরাট আকারের। সবাই ভয় পেয়ে হয়তো আশ্রয়ের আশায় এই জায়গায় জড় হয়েছিল। কঙ্কা বলল, "দেখছিস না, শুকনো পুকুরের মত কি একটা রয়েছে—হয়তো জলের খোঁজেই এসেছিল, তারপর এখানেই মৃত্যুবরণ করেছে।"

তার পর ক্রমাগত সেই একই দৃশ্য। কোথাও নর-কঙ্কাল, কোথাও ইতর প্রাণীর। কিন্তু এত বড় শহরে কোথাও একটাও গাছ নেই। গাছগুলি যেন মন্ত্রবলে উধাও হয়ে গেছে।

সামনে একটা বিরাট ছাউনি দেওয়া জায়গা। বোধহয় কোনও সময় সেটা ছিল গুদাম ঘর। কঙ্কাবতী পায়ে পায়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল, তারপরই চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ্ দেখ্ রঙ্কু, এখানে রাশি রাশি কাঠ পাঁজা করে রাখা হয়েছে, কিন্তু সব ঝলসানো! ওরে বাবা, এ যে অফুরন্ত কাঠ! কিন্তু একটারও চেহারা স্বাভাবিক নয়। কাঠ তো ঠিক? হ্যাঁ, কাঠই, কিন্তু সব ঝলসে কালো হয়ে গেছে।"

রঙ্কুলাল ছুটে এল। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল; তারপর, যেন আপন মনেই বলল, "এখন বুঝেছি গাছগুলি কোথায় গেল। সব ওরা কেটে সাফ করে দিয়েছে। গাছগুলো কেটে, চিরে তাই দিয়ে কাঠের তক্তা বানানো হয়েছে। একটা গাছও আস্ত রাখে নি।"

পরক্ষণেই সে একটু চুপ করে গেল। মনে মনে কি যেন ভাবছে সে। কিসের যেন হিসেব মিলোচ্ছে মনে মনে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "দাঁড়া দিদি, এখানকার বাতাসটা একটু পরীক্ষা করে দেখি। আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

ছোট একটা খুদে ল্যাবরেটরী ওদের পিঠের ঝোলার মধ্যেই ছিল। ল্যাবরেটরী বলতে একটা বড় বাক্স,–তার মধ্যে এটা ওটা কয়েকটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ–এই অ্যাসিড ট্যাসিড জাতীয়। রংকু তার থেকে একটা ছোট্ট স্পিরিট ল্যাম্প বার করে নিয়ে দিয়াশলাই জ্বালাতে গেল, কিন্তু দিয়াশলাই জ্বলল না–জ্বলার কোন লক্ষণও দেখা গেল না। পর পর এগারো-বারোটা কাঠি নষ্ট করে রংকু বলল, "তবে কি এখানকার বাতাসে অক্সিজেন নেই! দেখি?"

হ্যাঁ, ঠিক তাই। পরীক্ষা করে দেখা গেল এক ফোঁটা অক্সিজেন নেই বাতাসে। তবে কি আছে? আছে রাশি রাশি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস।

"হুঁ, কার্বন ডাইঅক্সাইড তো বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী, প্রায় দেড়গুণ। তাই বাতাসের অক্সিজেন নাইট্রোজেনকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করেছে, আর জায়গাটা কতকটা ঢালু গামলার মত হওয়ায় সব গিয়ে সেখানে জমেছে। এখন বুঝতে পারছি, এত লোক–এত জন্তু কেমন করে মারা গেল তার কারণ। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবহাওয়ায় পুরো ডুবে গেলে তো অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়বেই।"

"কিন্তু এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ওপরে কত দূর পর্যন্ত উঠে গেছে দেখতে হবে।"–কংকা বলল, "এবার একটু হেলিকপ্টারটা নিয়ে এসে উঁচু আকাশে ওঠা যাক।"

দু'জনেই হেলিকপ্টার চালাতে ওস্তাদ। হেলিকপ্টারটার কাছে চলে এল ওরা, তারপর দিল চালিয়ে। দেখা গেল হেলিকপ্টারের গতিও বেশ মন্থর, তবু সেটা আকাশের দিকে সোজা উঠতে লাগল। রংকু সমানে বাতাস পরীক্ষা করে চলেছে। না, কোথাও অক্সিজেন নেই,–কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইড–কার্বন ডাইঅক্সাইড আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর কিছু না! প্রায় হাজার খানেক ফুট ওপরে উঠে গিয়েও দেখা গেল ঐ একই অবস্থা।

কংকাবতী বলল, "আর উঠে কি হবে? আমাদের সংগের অক্সিজেন সিলিণ্ডার তো আর অফুরন্ত নয়, চল্, এবার নামা যাক!"

রংকুলাল আবার ধীরে ধীরে হেলিকপ্টার চালিয়ে দিল নীচের দিকে।

ঘণ্টা কয়েক পরের কথা। বিকেলের দিকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা হল-ঘরে একদল ছাত্রছাত্রী আর বিজ্ঞানীদের সামনে বসে ওরা ওদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলছিল আর সবাই তা বিস্ময়ের সংগে শুনছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে, বোধ হয় ছাত্রই হবে, উঠে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা তো শুনলাম, কিন্তু রহস্যটা কি তা তো এখনও বুঝলাম না! আপনারা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?"

অধ্যাপক বিজ্ঞানীরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। রংকুলাল বলল, "রহস্যের সমাধানও কিন্তু আমরা সত্যিই করে ফেলেছি। তবে একটু খুলেই বলি। ঐ শহরটির পত্তন করেছিল স্প্যানিশরা–যখন তারা এদেশে এসে উপবেশন গড়তে শুরু করে। জায়গাটি হয়তো কোন কারণে ওদের বেশ পছন্দ হয়ে থাকবে, তাই ওরা ঘরবাড়ি তৈরি করে ওখানেই একটা বড় বসতি স্থাপন করে। স্প্যানিশ যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কেননা ওদের ঘরবাড়ি ঘুরে আমরা বিস্তর স্প্যানিশ ভাষায় লেখার নমুনা দেখতে পেয়েছি। এ অঞ্চলের কাঠের এক সময়ে খুব নাম ছিল, তাই ওরা বাড়িঘরদোরও যতটা সম্ভব তৈরি করেছিল কাঠ দিয়েই। শুধু বাড়িঘরই নয়, ঘরের আসবাবপত্রও তৈরি করত কাঠ দিয়ে। উনুন, চুল্লী এ সবের জ্বালানী হিসেবেও নিশ্চয়ই ওরা কাঠই ব্যবহার করে গেছে। ফলে যেখানে যত গাছ ছিল সব তারা কাটতে শুরু করে দেয় কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্য। শেষে গাছ কাটতে কাটতে এমন একদিন এল যখন আর একটি গাছও অবশিষ্ট রইল না। গাছ কাটতে হলে সংগে সংগে নতুন গাছও যে সমানে লাগিয়ে যেতে হয় এ খেয়াল বা বুদ্ধি নিশ্চয়ই তাদের হয় নি। ফলে এমন একটা সময় এল যখন এই শুধু মানুষ আর মানুষ, আ হয়তো তাদের কিছু পোষা জন্তু। কিন্তু একটাও গাছ নয়।

"ঐ সব মানুষ আর জন্তুরা বাতাস থেকে ক্রমাগত অক্সিজেন টেনে নিচ্ছিল শ্বাসগ্রহণের তাগিদে–কতদিন ধরে কে জানে! আর সেই সংগে নিঃশ্বাসের সংগে বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড–কার্বন ডাইঅক্সাইড আর কার্বন ডাইঅক্সাইড। আপনারা সবাই জানেন গাছেরা এই কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়েই জল আর সূর্যের আলোর সাহায্যে তৈরি করে তাদের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট আর বাতাসে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন। এ কাজটাকে আমরা বলি ফোটোসিন্থেসিস, আমাদের দেশে কেউ কেউ বলেন সালোক-সংশ্লেষ।

আমরা ফের ঐ অক্সিজেন ব্যবহার করি শ্বাস গ্রহণের কাজে, কার্বোহাইড্রেটটাও ব্যবহার করি খাদ্য হিসেবে, কারণ ও জিনিস আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি না। অথচ জীবন্ত শরীরের তাপ রক্ষার জন্য ঐ খাদ্যটি অপরিহার্য। সমস্ত গাছ অন্তর্ধান করায় এ কাজটি আর চলল না—অর্থাৎ প্রকৃতির ভারসাম্য মানুষই দিল নষ্ট করে। ধীরে ধীরে বাতাসের অক্সিজেন কমতে লাগল আর তার জায়গা দখল করতে লাগল তার চাইতে অনেক ভারী কার্বন ডাইঅক্সাইড। অক্সিজেন যেটুকু ছিল হাল্কা বলে তা ক্রমাগত ওপরে উঠে যেতে লাগল। কতটা জায়গা জুড়ে এ ব্যাপার চলল আর অত উঁচু পর্যন্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড জমাতে হলে কত মানুষ, কত জন্তুর দরকার আর কতটা সময় লাগবার কথা তা হিসেব করে দেখতে হবে। তবে মনে হয় শহরটি নানা অনুকূল অবস্থার জন্য খুবই জনাকীর্ণ ছিল। আমরা প্রায় হাজার খানেক ফুট ওপরে উঠেও পেয়েছি শুধু এই কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেনের ছিটেফোঁটাও পাই নি।"

কঙ্কা রঙ্কুর কথায় সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমিও পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কার্বন ডাইঅক্সাইড উঁচু আকাশে উঠে নিশ্চয়ই একটা আস্তরণ তৈরি করে ফেলেছিল।"

"হ্যাঁ, ঠিক চাদরের মত আস্তরণ।"—বলল রঙ্কুলাল।—"আর সে চাদরের মত আস্তরণটা সবটাই গড়ে উঠেছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়ে।"

সমবেত বিজ্ঞানীরা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার তাঁদের মধ্যে একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "অর্থাৎ আপনি বোধ হয় বলতে চাইছেন যে ঐ কার্বন ডাইঅক্সাইডের আস্তরণ ওপরের আকাশের নীচে এমন একটা প্রাচীরের মত বাধার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে ওর নীচেকার আবহাওয়া বিজ্ঞানের নিয়মেই ক্রমাগত গরম হতে লাগল। ঐ রকম বাধা বা প্রাচীরকেই তো বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় 'বেরিয়ার'। হ্যাঁ, আপনার কথাটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য।"

"হ্যাঁ। আর সেই কারণেই ওখানকার শুধু মাটিতেই নয়, মাটির ওপরকার আকাশেও অনেক দূর পর্যন্ত তাপমাত্রা—টেম্পারেচার ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এক সময়ে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যা কোনও জীবিত মানুষ বা প্রাণীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়,—যেমন সম্ভব নয় ওর মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া।"

প্রবীণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবার বললেন, "বুঝেছি, এই জন্যেই এরোপ্লেনগুলি যখন ওর ওপর দিয়ে যায় তখন চালকেরা দমবন্ধ হয়ে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তা ছাড়া এখন মনে পড়ছে শেষ যে পর্যবেক্ষক প্লেনটি গিয়েছিল তার চালকও আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—উঃ, কী গরম! ৯৫ ডিগ্রী সেলশিয়াস। দম বন্ধ হয়ে গেল—"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" রঙ্কুলাল ও কঙ্কাবতী প্রায় একসঙ্গে উত্তর দিল। তারপর জিজ্ঞাসু ছাত্রটির দিকে চেয়ে রঙ্কুলাল বলল, "তোমার প্রশ্নের জবাব এবার নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ ভাই? রহস্যের সমাধান আমরা ঠিকই করতে পেরেছি, তাই না?"

হলশুদ্ধ লোক নির্বাক বিস্ময়ে শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। এতদিনে ঘুমন্ত পুরীর রহস্যের সমাধান তারা সত্যি খুঁজে পেয়েছে।

ছবি: [illegible]

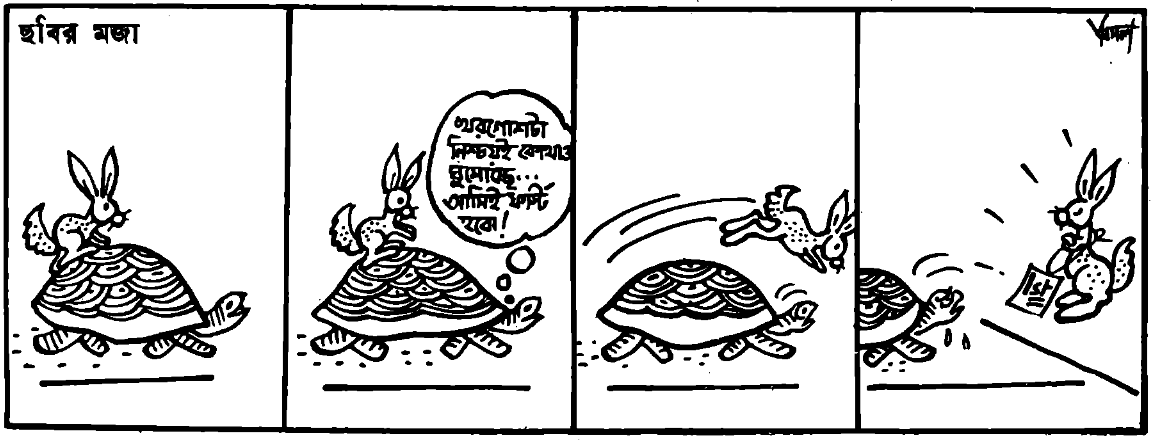

ঘনাদা এলেন !

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হ্যাঁ ঘনাদা একদিন এসেছিলেন !

নিশ্চয়ই একদিন এসেছিলেন আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে।

কিন্তু কবে কখন কেমন করে তিনি প্রথম এলেন সে কথা মনে করতে গিয়ে বেশ মুস্কিলে পড়তে হচ্ছে।

ঘনাদা নামে কোনো এক জনের সঙ্গে এই বাহাত্তর নম্বরে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি বলতে মনে যা আসছে তা স্রেফ একটি ব্যাগ।

হ্যাঁ, মাঝারি সাইজের ক্যাম্বিশের একটি ব্যাগ।

না, মানুষ জন কেউ নয় শুধু একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ— ছেঁড়াখোঁড়া পুরোন না হলেও বেশ একটু জীর্ণ গোছের।

বাহাত্তর নম্বরের প্রথম পত্তনের সময়ে, সব কিছু তখন তো এলোমেলো অগোছালো। সুবিধামত একটা বাড়ি পেয়ে যে ক'জনে মিলে সেখানে একটা শহুরে আস্তানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিল, এখন বাহাত্তর নম্বর বলতে যাদের নামগুলো আপনা থেকেই মনে আসে সেই চারজনই তাদের মধ্যে তখন ছিল প্রধান।

অর্থাৎ বাহাত্তর নম্বর বলতে এখন যেমন তখনও সেই চার মূর্তিমান—শিশির, শিবু, গৌর এবং আমি।

বাড়িটা পুরোন হলেও খুব ভাঙাচোরা নয়। সামান্য একটু আধটু মেরামতের পর চুনকাম করিয়ে আমরা তার কয়েকটা ঘরে তখনই বিছানাপত্র পেতে ঢুকে পড়েছি। এখন যেটা আমাদের আড্ডাঘর সেইটেই তখন কিছু-জমা-করা আসবাবপত্র নিয়ে খালি পড়ে আছে। ঠিক করা আছে যে দুদিন বাদে একটু হাতখালি হলেই আসবাবপত্র গুছিয়ে সেটাকে বসবার ঘর বানানো হবে। সকালে বিকালে ওদিকে যেতে আসতে এরি মধ্যে সেখানে একদিন ঘরের মাঝে জমা করা আসবাবপত্রের মধ্যে একটা গোল টেবিলের ওপর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা চোখে পড়েছে।

একদিন দুদিন বাদেও টেবিলের ওপর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা সমানে বসানো আছে দেখে ব্যাগটা কার তার সন্ধান নিতে হয়েছে।

ব্যাগটার বর্ণনা আগেই করেছি। ওরকম ব্যাগ আমাদের কারুর যে নয় তা বুঝেই সেটার উপস্থিতি একটু অবাক করেছে।

পরস্পরকে জিজ্ঞাসাটিজ্ঞাসা করেও রহস্যটার খুব স্পষ্ট একটা মীমাংসা কিন্তু পাওয়া যায় নি। শিবুই একটু ভেবে ভেবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে—হ্যাঁ, ওই একজন, মানে আমাদের চেনা কেউ নন, মানে বিপদে পড়ে...

বিপদে পড়ে কি ? গৌর শিবুকে তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় জেরা করেছে,—বিপদে পড়ে তিনি এখানে আমাদের সঙ্গে বাসা বাঁধবেন নাকি ?

না, না তা নয় !—শিবু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে জানিয়েছে,—বরাবরের জন্য না, মাত্র কদিনের জন্য বাধ্য

হয়ে এখানে আছেন। খুব কি একটা দরকারী ব্যাপারে কার জন্যে যেন...

হয়েছে! হয়েছে!—শিশির শিবুকে একরকম ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়ে বলেছে, কে, কি, কেন, কিছুই না জেনে কোনো একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছ আমাদের এখানে! এখন তিনি তাঁর এই ব্যাগ নিয়ে...

না, না কোনো অসুবিধে আপনাদের করব না। শিশিরের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বারান্দার দরজা দিয়ে যিনি এবার ঘরে ঢুকেছেন তাঁর চেহারার বর্ণনা দেবার বোধহয় দরকার নেই। হ্যাঁ, সেই শুকনো পাকানো ত্রিশ থেকে ষাট যে কোনো বয়সের ধারালো কুড়ুল মার্কা মাঝারি মাপের চেহারা। গলাটি শুধু চেহারার তুলনায় রীতিমত ভারিক্কি।

ঘরের ভেতর ঢুকে এসে দু'-হাত তুলে সকলকে নীরব নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক বলেছেন, মাত্র দুদিনের ব্যাপার। আপনাদের তেতালায় ন্যাড়া ছাদে একটা ঘর দেখে এলাম—

তেতালায় ন্যাড়া ছাদের ঘর?—আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছি,—সেটা আবার ঘর কোথায়? যত সব ফালতু ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ভরা চোর-কুঠুরি বললেই হয়।

তা হোক—ভদ্রলোক আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন—ওখানে একটা ভাঙা তক্তাপোষ রয়েছে দেখলাম। ঘরটা একটু পরিষ্কার করে আমার ব্যাগটা নিয়ে দুদিন বেশ কাটিয়ে দিতে পারব। ব্যাগটা তাই এখন নিতে এসেছি।

ঘরের টুকিটাকি দু চারটে জিনিস রাখা বড় গোল টেবিলটার ওপর থেকে তাঁর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে যেন আমাদের আশ্বস্ত করবার জন্যেই বলেছেন—ওই জার-বোয়া জবাবের জন্যেই ত অপেক্ষা। তা হয়ত অন্ততঃ কালই পেয়ে যাবো—পাওয়া ত উচিত।

কি বললেন? কিসের জবাব?—আমাদের সকলের প্রশ্নটা গৌরের মুখেই এবার শোনা গেছে।

জবাবটা জার-বোয়া ছাপের। মানে জার-বোয়া ছাপের ইশারার,—ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু বিশদ হয়েছেন—কাগজে ও ছাপ দেখেই আমি ত আর কোনও ভুল করি নি। যেমন কথা ছিল তেমনি যেখানে ও ছাপ দেখেছি সেখানেই তখুনি যেমন জুটেছে তেমনি আস্তানা যোগাড় করে যথাস্থানে ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু জবাবটা আসার অপেক্ষা। জার-বোয়ার ছাপ, কাগজে যে ছাপিয়েছে, গরজটা নিশ্চয়ই তার এমন যে জবাব দিতে এক লহমা সে দেরী করবে না। চাই কি আপনাদের এই বনমালী নস্কর লেনে স্বয়ং সেই বব কেনেথই...

ওই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে, না, না, এসব কি বলছি। মাপ করবেন আপনারা, বলে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বারান্দার দরজার দিকে এগিয়েছেন।

কিন্তু দু পার বেশী বাড়াতে তিনি পারেন নি। আমাদের সকলের হয়ে শিশিরই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছে,—আহা, যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার সেই চার পোয়া ছাপ যে ছেপেছে...

চারপোয়া নয় জার-বোয়া! শিশিরকে বেশ একটু করুণার সংগেই সংশোধন করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছেন,—জার-বোয়া কি তা ত নিশ্চয় জানেন?

না।—অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে নিজেদের মূর্খতা স্বীকার করে বলেছি, জার-বোয়া বল্লম টল্লমের মত কোনো অস্ত্রশস্ত্র না কোনো রকম বাদশাহী পোশাক টোশাক?

না, সে সব কিছু নয়—অনুকম্পা ভরে ভদ্রলোক জানিয়েছেন, জার-বোয়া হল সাহারার মরু অঞ্চলের এক রকম ইঁদুর। ইঁদুরের বদলে...

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলতেই শিশির শিবু দুজনেই এক সংগে উঠে পড়ে তাঁর হাত থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগটা টেনে নিয়ে তাঁকে ধরে একটা খালি চেয়ারে বসাতে বসাতে বলেছে—আহা, আপনি যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার সেই জেরবোয়া ছাপের মক্কেল ত আর দোতালা বাদ দিয়ে আপনার তেতালায় পৌঁছোতে পারবে না। আপনি এখানেই বসুন না। তারপর ওই মরু অঞ্চলের ইঁদুর জার-বোয়া নিয়ে কি যেন বলছিলেন?

ওই জার-বোয়া নিয়ে?—ভদ্রলোক বেশ যেন একটু অনিচ্ছার সংগে একটা চেয়ারে বসে বলেছেন, হ্যাঁ বলছিলাম যে ইঁদুরের বদলে ওকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির ক্ষুদে ক্যাংগারু বললেই যেন ঠিক হয়। ক্যাংগারুদের মত সামনের পা দুটি ক্ষুদে ক্ষুদে আর পেছনের পাগুলো সামনের চেয়ে প্রায় ছ গুণ লম্বা। ইঁদুরগুলো তাই তাদের আকারের তুলনায় ক্যাংগারুদের চেয়ে লম্বা লাফ দিতে পারে।

তা পারে ত পারে!—আমিই প্রথম একটু ঠাট্টায় সুর লাগিয়ে বলেছি—উত্তর আফ্রিকার এক ক্যাংগারু-মার্কা ইঁদুরের এত কি খাতির যে তার ছবি কোথাও ছাপা দেখলেই এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে, আর ওই ক্যাংগারু ইঁদুরের ছবি ছাপাও বা হয়েছে কোথায়?

এখানকার কোনো কাগজে ত দেখিনি।

এখানকার কোনো কাগজে দেখেন নি।—ভদ্রলোকের গলায় এবার যেন অবোধের প্রতি অনুকম্পা—তা দেখবেন কি করে? এখানকার কোনো কাগজে ত নেই, ও ছাপ বেরিয়েছে খাস লন্ডন টাইম্‌সে।

লন্ডন টাইমসে বেরিয়েছে আর আপনি...?

আমার কথাটা আর শেষ করতে হয় নি। ভদ্রলোক নিজেই বাক্যটা সম্পূর্ণ করে বলেছেন—আর আমি এখানকার ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে সেটা দেখে এসেছি। যেখানে যখন যাই আর থাকি ওই লন্ডন টাইম্‌সটার ওপর আগাগোড়া চোখ বোলানো আমার সাত বছরের নিত্য কর্ম।

সাত বছর!—আমাদের সকলের হয়ে গৌর দুচোখ প্রায় কপালে তুলে বলেছে—আপনি সাত বছর ধরে লন্ডন টাইমস্‌-এর ওপর চোখ বুলিয়ে আসছেন?

হ্যাঁ প্রায়—সাত বছরই ত হল।—ভদ্রলোক একটু যেন দুঃখের সংগে জানিয়েছেন।

কিন্তু কেন? সাত বছর ধরে রোজ রোজ নিয়ম করে একটা বিশেষ বিদেশী কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া ত সোজা কথা নয়। তার একটা কারণ ত আছে।—শিশির আমাদের সকলের মনের কথাটাই প্রকাশ করেছে।

তা কারণ আছে বইকি। নিশ্চয় একটা কারণ আছে?—ভদ্রলোক এখনো যেন কথাটা খোলসা করে বলতে চান নি।

কিন্তু আমরা ছাড়বার পাত্র নয়। সোজাসুজি তাঁকে চেপে ধরেছি—তা সেই কারণটা একটু খুলে বলুন না!

খুলে বলব?—ভদ্রলোক এখনো যেন দ্বিধা করে তারপর বলেছেন,—তাহলে যেতে হবে কিন্তু উগান্ডায়!

উগান্ডায়?—আমরা বিমূঢ়। গৌরই প্রথম নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করেছে—উগান্ডা মানে আফ্রিকার উগান্ডায়?

হ্যাঁ, সেখানকার রিজার্ভড ফরেস্ট মানে অভয়ারণ্যে।—ভদ্রলোক যেন বাধ্য হয়ে জানিয়েছেন।

কিন্তু সেখানে এখন যাবো কি করে?—জিজ্ঞাসা করে আর যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হয় নি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমাদের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছেন,—না না, এখন নয়, যাবার কথা বলছিলাম সাত সাড়ে সাত বছর আগেরকার উগান্ডার সংরক্ষিত অরণ্যে। মানে সমস্ত ব্যাপারটা সেখানেই শুরু কি না। শুরু টাইকুন ট্যানার-এর সেই আফ্রিকা-চমকানো শাহানশাহী-সফরী-তে!

কি করেছ চিমসে চামচিকে?

একটু থেমে আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই বোধহয় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নিজের কথার ব্যাখ্যায় বিশদ হয়ে বললেন,—সফরী মানে যে কি তা নিশ্চয় আপনারা জানেন, তবে টাইকুন ট্যানার-এর সফরীর সংগে এখনকার গোনাগুনতি খরচে ভাড়া-করা সফরীর আকাশ-পাতাল তফাৎ।—জংগলে বার শিঙা শিকার আর বাজার থেকে কাটা পাঁঠার মাংস কেনার চেয়ে অনেক বেশী। টাইকুন ট্যানারের সফরী মানে একটা রাজসূয় ব্যাপার। বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যত খুশি যে কোনো প্রাণী শিকার আইন করে তখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু নামের আগে সিংহের ঘাড়ের কেশরের মত টাইকুন

শব্দটা যার জোড়া হয়ে গেছে কোটিপতি ধনকুবেরদেরও যে শাহানশাহ টেক্সাস-এর সেই জীবন্ত ট্যাঁকশাল টাইকুন ট্যানার কি আইনের পরোয়া করে! সফরী-তে গোনাগুনতি শিকার করবার সরকারি পারমিট মানে হুকুমনামা সে ত উগান্ডার বন অরণ্য-দপ্তরের বড়কর্তার কাছ থেকে নিজে নিয়ে নিয়েছে। টাইকুন ট্যানারের নাম জানতে ত কারুর বাকি নেই। যে টাইকুন ট্যানার নিজে সশরীরে অফিসে এসেছে। বন-বিভাগের বড়কর্তা তাকে খাতির করে কোথায় বসাবেন ভেবে পান নি। টাইকুন ট্যানার-এর চেহারাটা তার ঐশ্বর্যের মাপে এমন দশাসই যে একটা প্রমাণ মাপের কোচ-এ তাঁকে আঁটানো যায় না। টাইকুন ট্যানার অবশ্য কোথাও বসার বদলে আগাগোড়া দাঁড়িয়েই বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে তাঁর কথা সেরেছেন। শিকারের পারমিটটা সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি পড়ে দেখেছেন যে অন্যসব সাধারণ জানোয়ারের বেলা তেমন কড়াক্কড়ি না থাকলেও হাতী গণ্ডার সিংহের মত বড় বড় জানোয়ারের বেলা শিকারের অনুমতি দারুণ কড়া। এ হুকুমনামা পড়েও অন্য অনেকের মত বিন্দুমাত্র অনুযোগ আপত্তি না জানিয়ে টাইকুন ট্যানার যেন খুশি মনে বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে করমর্দন করে চলে আসবার সময় শুধু জিজ্ঞাসা করেছে,—শিকার যতই গোনাগুনতি করে রাখা হোক, সফরীর লোকলস্কর লটবহরের বেলা সেরকম কোনো বিধি নিষেধ নেই?

না, তা নেই। —বন-বিভাগের বড়কর্তা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু অতবড় বিরাট বাহিনী আপনি সঙ্গে নিচ্ছেনই বা কেন? ওর ত অনেক ঝামেলা।

ওই ঝামেলা পোহানোতেই আমার সুখ।—বলেছে টাইকুন ট্যানার, —তাছাড়া বিরাট আর কোথায় দেখলেন। শিকারী আমার একজন ওই বব কেনেথ!

হ্যাঁ, ও-ত একাই একশ। হেসে বলেছেন অফিসার। ওর চেয়ে বড় শিকারী এখন সারা আফ্রিকায় আর কেউ আছে বলে ত জানি না।

হ্যাঁ, তাই শুনেছি বলেই ত ওকে নেওয়া, দেখা যাক যত হাঁক ডাক তত এলেম সত্যি আছে কি না! —হেসে বলেছে টাইকুন ট্যানার।

এর ওপর আপনি শিকারের বন্দুকও ত গণ্ডা গণ্ডা নিয়েছেন দেখলাম আমাদের অফিসে পাঠানো আপনার লটবহরের তালিকা থেকে। অত বন্দুক আপনার মিছিমিছি বওয়াই ত সার। কি কাজে লাগবে আপনার? অত বন্দুক?—হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করেছেন বন বিভাগের ওপরওয়ালা অফিসার।

মনে করুন ও শুধু নিজের অহংকারকে একটু তোয়াজ—বলেছে টাইকুন ট্যানার,—ওগুলো যে সঙ্গে আছে তাই দেখার সুখ। আর শুধু, এখন দুনিয়ার সেরা যা শিকারের বন্দুক আছে তা সব ত ওর মধ্যে আছেই, সেই সঙ্গে সেরা একজন বন্দুকের ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়েছি।

বন্দুকের ডাক্তার? রীতিমত অবাকই হয়েছেন বন-বিভাগের বড়কর্তা—সে আবার কি?

কি তা বুঝলেন না!—টাইকুন ট্যানার বলেছে—ডাক্তার মানে হালের বন্দুকের কারিগরির সেরা মিস্ত্রী। ম্যাচলককে যে রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে পারে।

তা ভালো! তা ভালো!—মনে মনে এই দাম্ভিক টাকার কুমীরটার ওপর যতই খাপ্পা হয়ে উঠুন মুখে হাসি টেনে বন-বিভাগের বড়কর্তা বলেছেন, আইনকানুন সব মেনে আপনার এত সাধের সফরী সার্থক হয়ে ফিরে আসুক এই শুভকামনাই জানাই।

ও, আপনাদের আইন-এর কথা বলছেন? কিচ্ছু ভাববেন না, ফিরে আসার পর তার গায়ে আঁচড়ও দেখতে পাবেন না। এ শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ বলে টাইকুন ট্যানার বন-বিভাগের বড়কর্তার এমন করমর্দন করে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যে জখম হাত নিয়ে বনের বড়কর্তাকে ককিয়ে ওঠা চাপতে হয়েছে অনেক কষ্টে।

টাইকুন ট্যানারের যাদের নিয়ে অত হম্বিতম্বি তার সফরীতে গোল বাধল কিন্তু তাদের নিয়েই—সেই কে না কে বন্দুকের ডাক্তার আর আফ্রিকার সেরা শিকারী বব কেনেথ।

টাইকুন ট্যানারের সফরী তখন জানা-অজানা অনেক বন জঙ্গল পার হয়ে এক নতুন জায়গায় আস্তানা গেড়েছে। এ পর্যন্ত শিকার যা হয়েছে তা সাধারণ তিনটে দলের সফরীর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ট্যানারের তাতে মন ভরে নি। এ সফরী থেকে সে এমন কিছু মেরে নিয়ে যেতে চায় দুনিয়ার শিকারী মহলের চোখ যাতে ছানাবড়া হয়ে যাবে।

এই নতুন আস্তানায় সেই ভাগ্যই যেন তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আস্তানা পাতবার পরের দিনই সকালে নিজের বাদশাহী তাঁবু থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলটা একটু ঘুরে আসতে গিয়ে সে এক জায়গায় এসে দাঁড়াবার পরই আতঙ্কে যেমন কেঁপে উঠল তেমনি হয়ে গেল মোহিত।

ভদ্রলোক এই মোক্ষম জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিজের গায়ের কোটটার দুদিকের পকেট দুটো দুবার চাপড়ে মুখটায় কেমন যেন বিরক্তি ফুটিয়ে চুপ করে গেলেন।

কি হল কি তাঁর হঠাৎ, ভেবে যখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি শিশির তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ফেলে তার হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, সিগারেট খুঁজছেন ত এই নিন না।

নেব?—ভদ্রলোক যেভাবে শিশিরের দিকে চেয়ে যে গলায় 'নেব' বললেন, তাতে প্রথমে মনে হল বুঝি শিশিরের তাঁকে সিগারেট দিতে চাওয়াটা অপমান জ্ঞান করে তিনি আসর ছেড়ে চলেই যাবেন উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হল ভদ্রতার খাতিরেই শিশিরের স্পর্ধা সহ্য করে তিনি নরম হয়ে শিশিরের বাড়িয়ে দেওয়া টিনের উঁচিয়ে থাকা সিগারেটটা তুলে নিয়ে নিজের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,—হ্যাঁ, প্যাকেটটা কোথায় যে ফেলে এসেছি কে জানে? হ্যাঁ একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি, কিছু মনে করবেন না। সিগারেট আমি কারুর কাছে দান নিই না। সুতরাং এ সিগারেট আপনার কাছে ধার হিসেবেই নিলাম। মনে রাখবেন আপনার কাছে একটি সিগারেট ধার রইল।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে রাখব। বলে শিশির তখন তাঁর সিগারেটটার জন্য তার লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরেছে।

সে লাইটারের আগুনে সিগারেটটা ধরিয়ে তাতে দুটো রাম-টান দেবার পর প্রায় এক জালা ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বলেছেন, কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, ওই টাইকুন ট্যানারের আতঙ্ক আর উল্লাসের কথা।

ঠিক! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাইকুন ট্যানার তখন খুশিতে ডগমগ।

এইত! টাইকুন ট্যানারের প্রাসাদের সিংদরজার মান বাড়াবার জন্যে এইটিরই ত দরকার ছিল। কম বেশী প্রায় আশী কিলো ওজনের গজদন্ত নিয়ে কিছু দূরে স্বয়ং হাতীদের সম্রাট ঐরাবতই যেন তার সঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বনভ্রমণে বেরিয়েছে।

ট্যানার-এর হাতে বন্দুক ছিল না। আর থাকলেই বা সে করত কি? একবার তার দিকে ফিরে তাকে দেখতে পেলে গজরাজ কি করতে পারেন তাই ভেবে কাঁপতে কাঁপতে ট্যানার-এর গায়ে তখন যেমন ঘাম ছুটছে তেমনি আবার আশায় বুকও দুলছে যদি কোনমতে হাতীর পাল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায় আর যদি তারপর কোনমতে তাঁবুতে ফিরে সে দরকার মত সকলকে ডাক দিয়ে এই হাতীর পালের পিছু নিয়ে কেনেথকে দিয়ে আসল গজরাজকেই শিকার করাতে পারে।

ট্যানারের ভাগ্য তখন ভালো। হাতীর পাল নিয়ে গজরাজ নিজের খেয়ালে অন্য দিকে চলে যেতেই সে নিজের তাঁবুতে এসে সবার আগে বব কেনেথ আর সমস্ত বন্দুক পিস্তলের খোদ খবরদারীর ভার যার ওপর সেই বড় মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালে। ভাগ্যের জোরে আপনা থেকে যা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে তার দেখা গজরাজের সেই দাঁতাল মুণ্ডটা যে তার চাই-ই সঙ্কলকে সে জোর দিয়ে জানিয়েছে।

কিন্তু কই! এত বড় একটা খবরে কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই কেন? তার সামনে দুই মূর্তি যেন জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে।

কি? কি হল কি তোমাদের? টাইকুন ট্যানার এবার গর্জে উঠল,—সব কালা বোবা হয়ে গেছ নাকি?

মানে?—আমতা আমতা করে এবার মুখ খুলল বব কেনেথ—বড় শিকার আর আমরা কি করতে পারি? আমাদের...

আমাদের?—ধমক দিয়ে কেনেথকে থামিয়ে দিয়ে টাইকুন ট্যানার আবার গর্জন করে উঠল, কি হয়েছে আমাদের? হাত ঠুঁটো হয়ে গেছে, না বন্দুকের সব বারুদ ভিজে গেছে? শিকার করতে পারব না কেন?

পারব না।—বন্দুকের বড় মিস্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললে—আমাদের পারমিটে আর বড় শিকারের অনুমতি নেই বলে। হুকুমনামায় যে কটা বড় শিকার আমাদের মারবার অনুমতি দেওয়া ছিল সব কটাই আমরা মেরেছি। দু একটা ছোট শিকারের বন্দুক ছাড়া সব বন্দুক আমি তাই বাক্সবন্দী করে দিয়েছি।

কি করেছ চিমসে চামচিকে? বলে ঘাড় ধরে বন্দুকের মিস্ত্রীকে শূন্যে তুলে টাইকুন ট্যানার বললে, বড় বন্দুক সব বাক্সবন্দী করে দিয়েছ?

হ্যাঁ—ট্যানারের হাতে ঘাড়-টিপে-ধরা অবস্থাতেই বন্দুকের মিস্ত্রী যেন সুখবর দেবার মত গলায় বললে, শুধু বাক্সবন্দীই করি নি। তার আগে বন্দুকগুলোর কলকব্জা খুলেও দিয়েছি।

কলকব্জা খুলে দিয়েছিস! চিড়বিড়িয়ে উঠে টাইকুন ট্যানার বন্দুকের মিস্ত্রীকে আছড়ে মারবার মত করে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, —তোকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে মারব।

একটা ডিগবাজি খেয়ে বন্দুকের চিমসে মিস্ত্রী তখন কিছুদূরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবুঝকে বোঝাবার মত

গলায় সে বললে,—আমায় পুঁতে ফেলতে চান? তা অবশ্য আপনি পারেন। কিন্তু তাহলে আপনার ওই অত সাধের বন্দুকগুলোর মায়া যে ছাড়তে হবে। ওগুলোর কলকব্জা এখন খোলা। সে সব আবার জোড়া লাগাবার বিদ্যে অমন দু পাঁচ হাজার মাইলের মধ্যে সারা উগান্ডায় আর কারুর নেই। আমি মাটির নিচে পোঁতা থাকলে ওসব বন্দুকের পাঁচ জানা মিস্ত্রীর খোঁজে কাকে কোথায় পাঠাবেন? যাকে পাঠাবেন সে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছোবে কি! পৌঁছোলেও কত দিনে সে ওস্তাদ মিস্ত্রী নিয়ে এখানে ফিরবে? আর যতদিনে ফিরবে ততদিন আপনি এখানে টিকে থাকতে পারবেন কি?

বন্দুকের মিস্ত্রী যতক্ষণ তার কথা শোনাচ্ছিল ততক্ষণ টাইকুন ট্যানারের মুখটা ছিল যেন বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়বৃষ্টির ছবি ফোটানো ছায়াছবির পর্দার মত। এই মনে হচ্ছিল রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে হিংস্র হায়নার মত সে ঝাঁপিয়ে পড়বে বন্দুকের মিস্ত্রীর ওপর আবার মিস্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে নিজের অবস্থাটা বুঝে সে দমকা ঝড় হঠাৎ থেমে যাওয়ার মত সামলাবার চেষ্টা করছিল নিজেকে। শেষ পর্যন্ত তার প্যাঁচালো বুদ্ধিরই জয় হয়েছে।

বেয়াড়া গরম মেজাজের জন্যে নিজেই যেন নিজের কান মলে ট্যানার এবার যা বলেছে তার মর্ম হল এই যে বন্দুকের মিস্ত্রীর ওপর রাগারাগি করা তার অন্যায় হয়েছে। মিস্ত্রীর সংগে সে মিটমাটই চায়। মিস্ত্রী যদি তার সব বন্দুকের কলকব্জা ঠিক করে সেগুলো চালু করে দেয় তাহলে সে যা তার পাওনা তার ওপর মোটা বখশিস দিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে যাবে।

বন্দুকের মিস্ত্রী একটু ভেবে নিয়ে প্রস্তাবটায় রাজী হয়েছে। আর ঘন্টাখানেক বাদে বাক্সবন্দী সব বন্দুক খুলে চালু করে দিয়ে তার পাওনা আর বখশিস চেয়েছে।

বন্দুকগুলো সব হাতে পাওয়ার পর নিজমূর্তি ধরেছে ট্যানার। পাওনা আর বখশিস চাও? —সে যেন কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছে, দুই-ই পাবে এখনি।

পাওনাটা সে তখনই মিটিয়ে দিয়েছে, তার নিজের কজন দৈত্যাকার কাফ্রী সেপাই দিয়ে বন্দুকের মিস্ত্রীকে ধরে বেঁধে শিকার-করা জানোয়ারদের ছাড়ানো চামড়া জমা-করা একটা তাঁবুতে বন্দী করে ফেলে রেখে। আর ফেলে চলে যাবার সময় আশা দিয়ে গেছে যে বখশিসটা দিয়ে যাবে দাঁতালো গজরাজকে মেরে তার গজদন্ত নিয়ে এখানকার আস্তানা তুলে চলে যাবার সময়ে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই এই জংগলে ফেলে রেখে দিয়ে।

বন্দুকের মিস্ত্রীকে হাত পা বেঁধে বন্দী করে চলে যাবার পর টাইকুন ট্যানার নিজেই কিন্তু পড়েছে মহা মুস্কিলে। হাতী মারবার চালু বন্দুক ত সে হাতে পেয়েছে, কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়বে কে? বন্দুক উদ্ধারের পর খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে শিকারী বব কেনেথকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজির মধ্যে তার তাঁবুতে তার লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। বব কেনেথ তাতে লিখে গেছে যে হুকুমনামায় যা লেখা আছে তা অগ্রাহ্য করে বাড়তি দাঁতালো হাতী ত নয়ই অন্য কোন কিছু শিকার করে সে সারা আফ্রিকায় অচ্ছ্যুৎ শিকারী হিসেবে দাগী হয়ে নিজের সব রুজি-রোজগার আর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না। সেই জন্যেই টাইকুন ট্যানারের জবরদস্তি এড়াতে নিজের ন্যায্য পাওনাগন্ডা না নিয়েই তাকে পালাতে হচ্ছে।

পালাতেও হচ্ছে, কিন্তু পালিয়ে যাবি কোথায়? — কেনেথের লেখা চিরকুট পড়তে পড়তে রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেছে টাইকুন ট্যানার, —আমার সমস্ত লোকলস্কর লাগিয়ে সারা উগান্ডা চষে তোকে খুঁজে বার করব-ই।

যে কথা সেই কাজ। ট্যানার গজরাজের সন্ধান ছেড়ে কেনেথকে খুঁজতেই তার সফরীর সকলকে লাগিয়েছে তখুনি। এমন বেড়াজালে জংগল ঘিরে তল্লাসী চালিয়েছে যাতে একটা খরগোশও না গলে পালাতে পারে।

কিন্তু এই বেড়াজালে ঘেরা তল্লাসীর ভেতর দিয়েই শিকারী কেনেথ গলে এসেছে। এসেছে রাতের অন্ধকারে টাইকুন ট্যানারেরই সফরীর তাঁবু মহল্লায়। সেখানে নিঃশব্দে বন্দুকের মিস্ত্রীকে বন্দী করা শিকারে মারা জানোয়ারদের চামড়া রাখা তাঁবুতে ঢুকে সে কিন্তু অবাক। হাতে একটা ছোরা নিয়ে সে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে সে তাঁবুতে ঢুকেছিল বড় মিস্ত্রীর বাঁধন কেটে তাকে মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু হাত পার বাঁধন কেটে সে মুক্তি দেবে কি, বড় মিস্ত্রী নিজেই আগে থাকতে বাঁধন টাঁধন খুলে সেখানে বসে আছে। কেনেথ খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে যাবার পর হঠাৎ চমকে উঠে শুনেছিল—কে তাকে ফিসফিস করে বলেছে,—আর না, ছোরাটা খাপে গুঁজে এবার উঠে বোসো।

গলাটা যে বড় মিস্ত্রীরই তা বুঝে একেবারে হতভম্ব হয়ে উঠে বসে কেনেথ দেখেছিল। বন্দুকের মিস্ত্রী হাত-পা খোলা অবস্থায় তার সামনে বসে একটা চামড়ার টুকরোয় কি যেন করছে।

কেনেথকে উঠে বসতে দেখে সে কাজ থামিয়ে মিস্ত্রী

বলেছে,—পালিয়ে গিয়েও তুমি যে ফিরে এলে?

এলাম আপনারই বাঁধন কেটে আপনাকে মুক্ত করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে। কিন্তু আপনি নিজেই ত বাঁধন খুলে বসে আছেন। কি করে খুললেন ওই জংলী কাফ্রী দৈত্যগুলোর অমন শক্ত বাঁধন?

কি করে খুললাম?—বন্দুকের মিস্ত্রী একটু যেন হেসে বলেছে—সময় পেলে তোমায় শিখিয়ে দেব, কিন্তু এখন তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না। এখুনি পালাও আর যাও উত্তর দিকে!

উত্তর দক্ষিণ কোন দিকেই আর আমি যেতে চাই না—বেশ হতাশভাবে এবার বলেছে শিকারী কেনেথ—আমার হাতের এই ছোরাটা আর কোমরবন্ধের এই পিস্তলটা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। এই নিয়ে গন্ডা গন্ডা যাদের কাছে রাইফেল আর বন্দুক আর কমপক্ষে ষাট সত্তর জন জংগল ঠেঙিয়ে খোঁজবার লোক-লস্কর তাদের বিরুদ্ধে আমি কি করব আর কোথায় পালাব? পালাতে হলে আপনি নিজে পালান নি কেন?

আমি?—বন্দুকের মিস্ত্রী একটু যেন অবাক হয়ে বলেছেন—হ্যাঁ আমি পালাই নি বটে, তবে এই কাজটা করতে এমন তন্ময় হয়ে গেছলাম যে সময়টা কত কেটেছে ঠিক খেয়াল করি নি।

এমন অবস্থাতেও সময়ের খেয়াল যার জন্যে করেন নি সেটা কি এমন কাজ? —শিকারী কেনেথ রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

কাজটা কিছু নয়, এই চামড়ার টুকরোর ওপর একটা পেরেক দিয়ে আঁচড় কাটা একটা ছবি! —বলে বড় মিস্ত্রী চামড়ার টুকরোটা কেনেথের হাতেই তুলে দিয়ে বলেছে, এটা তুমিই রাখো। তোমার কাজে লাগবে।

আমি কাছে রাখব এই চামড়ার আঁচড়-কাটা টুকরো? এটা আমার কাজে লাগবে? কি বলছেন কি আপনি! —বন্দুকের মিস্ত্রীর মাথাটা ঠিক আছে কি না সে বিষয়েই সন্দেহ ফুটে উঠেছে এবার কেনেথের কথায়।

যা বলছি আজগুবি শোনাচ্ছে, না? —হেসে জিজ্ঞাসা করেছে বড় মিস্ত্রী—কিন্তু হাতে-হাতে ফল পেলেই বুঝবে আবোল তাবোল কিছু বলি নি। তোমার হাতে যে চামড়ার টুকরোটা দিয়েছি তাতেআঁচড়কাটা কিসের ছবি তা জানো? জানবার কথাও নয়। ওটা আঁচড় কেটে যা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে সেটা একটা জার-বোয়া। আফ্রিকার ঝানু শিকারী হলেও জার-বোয়া কাকে বলে হয়ত জানো না। জার-বোয়া হল একরকম মরুঅঞ্চলের অদ্ভুত ইঁদুর। ইঁদুর না বলে ক্ষুদে ক্যাংগারুও বলা চলে।

তখন বুঝবে আবোল তাবোল কিছু বলিনি

সামনের পা দুটি ছোট ছোট আর পেছনের গুলি ক্যাংগারুর মত লম্বা বলে শরীরের তুলনায় অনেক দূর পর্যন্ত লাফ দিতে পারে। তোমায় এখান থেকে পালিয়ে উত্তর দিকে যেতে বলেছি, এই উত্তরে চাড্ থেকে শুরু করে সাহারার মরুভূমিতে এই ক্ষুদে ক্যাংগারু জার-বোয়াদের পাওয়া যায়। এই জার-বোয়ার ছাপমারা তাবিজ-পরা আফ্রিকায় এক গুপ্ত সমিতি আছে। তারা আফ্রিকাকে ইওরোপের শাদা চামড়ার লোকেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্যে গোপনে বিরাট আয়োজন করে যাচ্ছে। তারা তোমার হাতের ওই জার-বোয়ার আঁচড়-কাটা চামড়ার টুকরোটা দেখলেই তোমায় নিরাপদে সাহারা পেরিয়ে মিশরের কায়রো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। এখন তুমি শুধু উত্তরমুখো গিয়ে উগান্ডাটা পার হয়ে যাও।

কিন্তু পার হব কি করে?—কেনেথ হতাশভাবে বলেছে—বললাম না আমার কাছে শুধু একটা পিস্তল আর একটা ছোরা। পার হবার আগেই ওদের গন্ডাগন্ডা বন্দুকে আমি ত ঝাঁজরা হয়ে যাবো।

কিছু হবে না! —বন্দুকের মিস্ত্রী জোর দিয়ে বলেছে, প্রথমত তুমি আফ্রিকার শিকারী, জংগলে কি করে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে গাছপালার সংগে মিশে গিয়ে চলাফেরা করতে হয় তা তুমি ওদের সাত জন্ম শেখাতে পারো। সুতরাং ওরা এমনিতে তোমার হদিসই পাবে না। আর যদি বা পায় ওদের কোন বন্দুকের গুলি তোমার ডাইনে বাঁয়ে দু গজের মধ্যে পৌঁছোবে না।

দু গজের মধ্যে পৌঁছোবে না?...ঘোর অবিশ্বাসের সংগে বলেছে কেনেথ,—একি ঝাড়ফুঁক মন্ত্র নাকি?

না, মন্ত্র নয় যন্ত্র, যন্ত্রের কেরামতি।—বলেছে বড় মিস্ত্রী—তুমি তাতে বিশ্বাস করে নির্ভয়ে চলে যাও। আর দেরী না করাই ভালো!

কিন্তু আপনি?—যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সত্যিকার উদ্বেগের সংগে জিজ্ঞাসা করেছে কেনেথ—আপনি যাবেন না আমার সংগে!

না,—বলে একটু একটু থেমে বন্দুকের মিস্ত্রী কিছুটা কৌতুকের স্বরেই বলেছে—সত্যি কথা বলতে গেলে আমার এখন পোয়া বারো যাকে বলে তাই। যাকে সে হাত পা বেঁধে কাঁচা চামড়ার গুদামের তাঁবুতে বন্দী করে ফেলে দিয়েছিল সকাল না হতেই টাইকুন ট্যানার তার কাছে ছুটে এল বলে! তারপর আমার আংগুল নাড়ায় টাইকুন ট্যানারকে ওঠ বোস করাতে পারব। সোজা কথা নয় দুনিয়ার সেরা তার গন্ডাগন্ডা সব বন্দুকে নিশানার চার ধারে দু গজের মধ্যে গুলি পৌঁছোচ্ছে না কেন, এ ধাঁধার উত্তরের জন্যে তাকে বাঁদর নাচ করাতে করাতে আমি একদিন তাকে রাজধানী কাম্পালাতে বন-বিভাগের বড়কর্তাদের হাতেই তুলে দেব। সুতরাং আমার জন্যে তোমার ভাবনা করবার কিছু নেই। আর হ্যাঁ, তুমি নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে যে এখানে এমন করে এসেছ, এ ঋণ আমি কোনদিন ভুলব না। কখনো কোথাও যদি দারুণ বিপদে পড় তাহলে, তোমার হাতে যা দিয়েছি, ওই জার-বোয়ার ছাপ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন বিলেতের লন্ডন টাইম্‌সে ছাপাবার ব্যবস্থা কোরো। আমি যেখানেই থাকি সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে তোমায় আমার তখনকার ঠিকানা জানাব-ই। তারপর তুমি আমার ঠিকানায় চিঠি লিখে তোমার বিপদ আর ঠিকানা জানালেই—আমি বেঁচে থাকলে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব-ই, এটা নিশ্চিত জেনো।

ক্যাম্বিশ ব্যাগের ভদ্রলোক দম নেবার জন্যেই একটু থেমে বললেন—ক'দিনের জন্যে আপনাদের এই শহরটা ছুঁয়ে যাবার সময়ই লন্ডন টাইম্‌সের বিজ্ঞাপনটা দেখে হাতের কাছে পেয়ে আপনাদের এই বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানাটাই জানিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি বলে একটা উত্তর না আসা পর্যন্ত আর নড়তে পারছি না। আপনাদের তাই বাধ্য হয়ে একটু কষ্ট দিচ্ছি।

না, না কষ্ট কিসের?—আমরা প্রায় সমস্বরে বলেছি—যতদিন লন্ডন টাইম্‌সের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও চিঠি না পান ততদিন আপনি থাকুন না এখানে,—ওই ওপরের টঙের ঘরটা পছন্দ হলে সেখানেই থাকুন। কিন্তু একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করছি,—টাইকুন ট্যানার আপনাকে বন্দুকের পাকা মিস্ত্রী বলে তার সফরীতে নিয়েছে আবার শিকারী কেনেথকে আপনি যে ভাবে জার-বোয়া ছাপের তাবিজ-পরা আফ্রিকার গুপ্ত বিপ্লবীদের খবর দিয়ে ভরসা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ওই জার-বোয়া ছাপের গুপ্তদলের সংগেও আপনার ভালোরকম যোগাযোগ ছিল। এখন আবার আপনাকে দেখছি এই আমাদের কলকাতা শহরে। আসল পরিচয়টা তাহলে আপনার কি?

হ্যাঁ, কেনেথও ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল আমার চামড়ার জার-বোয়া ছাপ নিয়ে তাঁবু থেকে জংগলের পথে চলে যাবার সময়। তাকে যা বলেছিলাম, তাই আপনাদের বলি,—নিজের পরিচয় কি কেউ আমরা জানি! সেই পরিচয়ই ত সবাই খুঁজছি সারা জীবন।

আমাদের হতভম্ব করে ওইটুকু বলেই টেবিল থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগটা নিয়ে তেতালার ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে চলে গিয়েছিলেন।

ক্যাম্বিশের ব্যাগটা না থাক ভদ্রলোক এখনো আমাদের টঙের ঘরেই আছেন। না থেকে উপায় কি? লন্ডন টাইম্‌সের জার-বোয়া ছাপ-মারা বিজ্ঞাপন-দাতার উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠির জবাব যে এখনো আসে নি।

ছবিঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

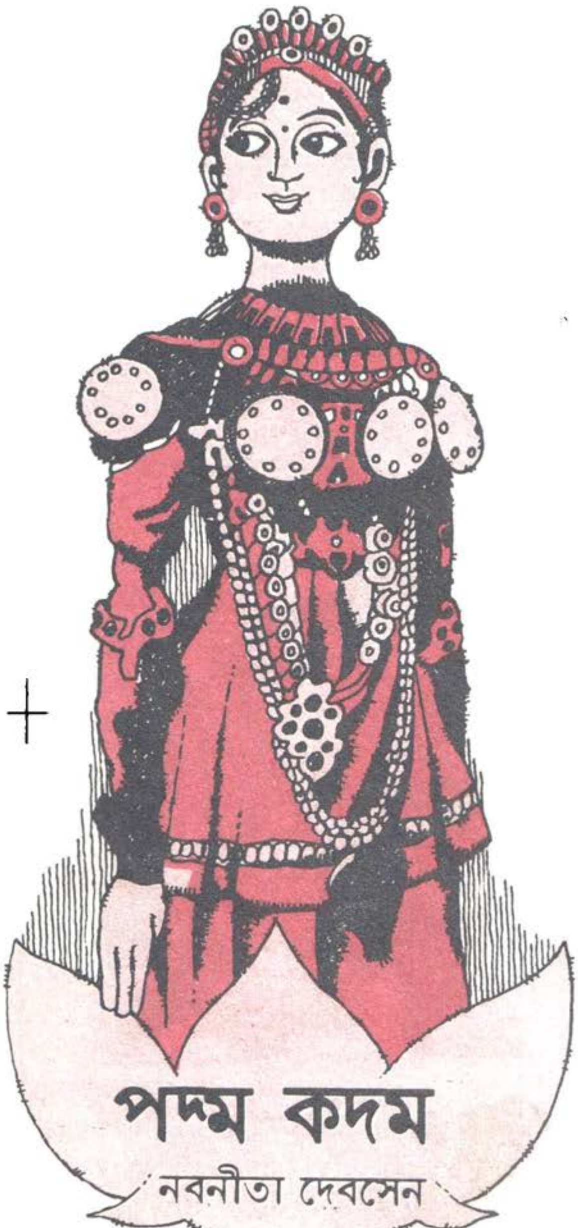

একদিন এক জেলে নদীতে জাল ফেলেছে, মাছের বদলে উঠলো এক পেতলের হাঁড়ি। হাঁড়ির ভেতরে কী আছে? হাঁড়ির ভেতরে কী আছে? দেখবার জন্য জেলেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। কেউ বলে আছে সোনার মোহর, কেউ বলে কিছু নেই, কার হাঁড়ি মাজতে গিয়ে ডুবে গেছে, কাদায় মুখটা বুজে গেছে। কিন্তু যে জেলে হাঁড়িটা পেয়েছে, সে আর হাঁড়িটা খুল্লেই না। সে বললে, আমি আমার মাকে গিয়ে হাঁড়িটা দেব। মা কত খুশি হবেন।

অন্য জেলেরা বললে, হাঁড়িটাই বেচে দে, অনেক টাকা দাম পাবি।

জেলে বললে, না। আমরা গরীব, মাটির হাঁড়িতেই মা ভাত রেঁধেছেন। কাঁসা-পেতল চোখে দেখেননি। মাকে দেব।

জেলে তো বাড়ি গিয়ে মাকে হাঁড়ি দিয়েছে। তার মা হাঁড়ি নিয়ে খুব খুশি। পুকুরঘাটে গেছে কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করে মেজে আনতে। মাজতে গিয়ে দ্যাখে হাঁড়ির মধ্যে পদ্মফুল। জেলের মা জেলেনী পদ্মফুলটি যেই হাতে নিয়েছে, সে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে হয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে। জেলেনীর মেয়ে ছিল না। একটাই ছেলে। সে বললে, কেঁদো না মা, কেঁদো না। চল আমার ঘরে চল। কিছু খেতে দিই। বলে, সে হাঁড়ি আর মেয়ে নিয়ে বাড়ি এল। জেলে তো অবাক—এ কার মেয়ে গো?

জেলেনী বললে—এ তোমার বোন। হাঁড়ির ভেতরে করে তুমি একে ঘরে এনেছো।

তখন সেই কন্যে বললে—মা, আমি এক অপ্সরার মেয়ে। অপ্সরা আর মুনি-ঋষিদের ছেলেমেয়েরা হাঁড়ি কলসীতে জন্মায় কিনা। আমি অপ্সরা মায়ের কাছে নাচগান শিখেছি, আর ঋষি বাবার কাছে মন্ত্রতন্ত্র, শাস্ত্র, কাব্য। এসব জ্ঞান আর গুণ নিয়েই আমার জন্ম হয়েছে।

জেলেনী আর জেলে তো মহাখুশি। তারা লেখাপড়াই জানে না, শাস্ত্র পড়বে কি? তবে জেলেদের গান জেলেদের নাচ তারাও জানে। পদ্মফুলের তৈরি মেয়ে বলে তার নাম হলো পদ্মকুঁড়ি। জেলের ঘরেই সে বড় হতে থাকে।

এদিকে রাজ্যের মন্ত্রীটি ছিল অতি দুষ্টুলোক। সে চাইত রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যটি তার নিজের ছেলেকে দিতে। রাজার ছেলেপুলে ছিল না, কিন্তু এক ভাগ্নে ছিল। রাজা তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। ভাগ্নেটি আপনভোলা, সে বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। গরীব-দুঃখীদের সংগে মিশতো। রাজার তাকেই রাজ্য দিয়ে যেতে ইচ্ছে। রানীও তাকে সন্তানস্নেহ করেন। কিন্তু সেই ছেলে কদমকুমার না গেছে পাঠশালায়, না গেছে অস্ত্র শিখতে, না বসেছে রাজসভায়। সে ঘোড়ায় চড়তে জানে, কিন্তু শিকার করে না। পশুপাখি মারতে তার বুক দুঃখে গলে যায়। যুদ্ধ করার নামে সে আঁতকে ওঠে। সেকি? মানুষ মারবো? আমরা কি রাক্ষস খোক্কস? সে চাষীদের সংগে মিশে লাংগল দিতে শিখেছে, ধান রুইতে শিখেছে, ধান কাটতে

শিখেছে, সে জেলেদের সঙ্গে মিশে মাছ ধরতে শিখেছে, সে কুমোরদের সঙ্গে মিশে হাঁড়ি-সরা এমনকি ঠাকুর-পিতিমে পর্যন্ত গড়তে শিখেছে, সে কামারদের সঙ্গে মিশে ছুরি-বঁটি, লাঙলের ফলা, ঘোড়ার নাল তৈরি করতে শিখেছে। জানে সে অনেক কিছুই। তবু মন্ত্রীমশাই বলেন, কদমকুমারের তো শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই হল না, ওকে সিংহাসনে বসালে

রাজা মৃদুমন্দ হাসেন। আর গোঁফে তা দেন।

রাজ্যপাট উঠে যাবে। আপনি অন্য যুবরাজ স্থির করুন। রাজা মৃদুমন্দ হাসেন। আর গোঁফে তা দেন।

কদমকুমারের সঙ্গে পদ্মকুঁড়ির বেশ ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। কদমকুমার গান গাইলে পদ্মকুঁড়ি নাচে, কদমকুমার বাঁশি বাজালে পদ্মকুঁড়ি গান গায়, কদমকুমার যদি দু'লাইন কবিতা তৈরি করে তাহলে পদ্মকুঁড়ি তৈরি করে দেয় পরের দু'লাইন। পদ্মকুঁড়ির সঙ্গে গল্প করতে করতেই কদমকুমারের নানান শাস্ত্রে জ্ঞান হয়ে গেছে। রানীর পদ্মকুঁড়িকে খুবই পছন্দ, ভাবেন বড় হলে ওকেই কদমকুমারের বউ করবেন। রাজার কিন্তু মোটেই পছন্দ না। ধ্যেৎ! জেলের মেয়ে কবে রাজবাড়ির বউ হয়েছে? তাও স্রোতে-ভেসে-আসা কন্যে? দেখেশুনে জেলেনী-মা তো ভয়েই সারা। রাজারাজড়ার সঙ্গে অত মেলামেশা না করে জেলেপাড়াতেই জামাই খোঁজা উচিত বলে জেলেনী-মা রোজ জেলেকে তাড়া দেয়। পদ্মকুঁড়ি রূপে গুণে শত রাজকন্যের বাড়া। জেলে বলে, মা, আমার বোনের তো রাজার বাড়িতেই বিয়ে হওয়া মানায়। জেলের ঘরে ও-কন্যের মূল্য কে বুঝবে? বলে জাল কাঁধে ফেলে নদীর দিকে পালায়।

পদ্মকুঁড়ি ইতিমধ্যে বড়ো হয়ে উঠলেন। পাতা ভরে ভরে পদ্য লেখেন, গান লেখেন। পদ্মকুঁড়িকে জেলেপাড়াতে মানায় না বটে, কিন্তু সবাই তাঁকে ভালোবাসে। মোটে অহংকার নেই অত রূপগুণের জন্যে।

ওদিকে কদমকুমারও বড়ো হয়ে উঠেছেন। একদিন কদমকুমার লাফাতে লাফাতে এসে বললেন—পদ্মকুঁড়ি, আমি অনেক দূরে পহ্নবী রাজার সভাতে যাচ্ছি। মন্ত্রীমশাই পাঠাচ্ছেন। সেখানে মস্ত উৎসব হচ্ছে, গানবাজনা, কাব্যসভা, আর বিপুল ভোজ। সব দেশের রাজপুত্তুররা যাচ্ছে। তোমার জন্যে কী আনবো, বলো?

পদ্মকুঁড়ি তো অতীত ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেন, তিনি বললেন—কদমকুমার, খুব সাবধানে থেকো। জল ছাড়া কিছু পান কোর না। ফল ছাড়া কিছু ভোজন কোর না। আর মুশকিলে পড়লে মনে মনে পদ্মকুঁড়িকে ডেকো। আমার জন্য কিছু আনতে হবে না, শুধু তোমার বাঁশিটা ফেরত এনো। হারিয়ে ফেলো না।

কদমকুমার তো পহ্নবী রাজার সভায় গেছেন। কতো ভালো ভালো খাবার, মস্ত ভোজ, কিন্তু পদ্মকুঁড়ি বলে দিয়েছে যেন ফল ছাড়া খেও না। কত রকমের শরবৎ,

কিন্তু পদ্মকুঁড়ির বারণ যেন জল ছাড়া পান কোর না। কদমকুমারের মনে মনে রাগ হয়ে যায়, তবুও তিনি বন্ধুর কথাটা শোনেন। কেননা বন্ধু যে ভূত-ভবিষ্যৎ জানে। শুধু কি খাওয়া-দাওয়া? কত দেশ থেকে কত বড় বড় ওস্তাদ এনেছিলেন পদ্মবীরাজ! চমৎকার নাচগান হলো। বিখ্যাত সব নটীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। শেষে শুরু হলো কবিগান । কবিরা সবাই একে একে উঠে পদ্মবীরাজের জয়জয়কার করতে লাগলেন। আহা, এমন রাজা হয় না, হয়নি। কারুর রাজ্যে এত বড় ভোজ হয়নি! এত ভালো ভালো খাদ্য জগতে কেউ খায়নি! এমন স্বর্গীয় পানীয় জগতে কেউ আস্বাদন করেনি! এতজন এত ভালো গায়ক কোনো রাজার সভায় নেই! এমন নাচ কেউ জীবনে দেখেনি! আর এমন ভালো ভালো সভাকবি তো কোনো রাজসভাতেই নেই! জগতে কেউ কখনো এমন গান শোনেনি। এমন নাচ দেখেনি। এমন কবিতা পড়েনি। পদ্মবীরাজ তো মহাখুশি। তিনি দাড়িতে মৃদু হাত বুলোতো বুলোতে সবার মুখের দিকে হেসে হেসে চাইছেন। হঠাৎ দেখেন কদমকুমার চুপটি করে বসে আছেন। পদ্মবীরাজ বললেন–কদমকুমার, যদিও আপনি রাজকুমার, কিন্তু আপনি তো কবিও বটেন, আজ আপনি একটু কবিগান করবেন না?

কদমকুমার আর কী করেন? তিনি সরল সোজা মানুষ। ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। তিনি বললেন–ফলের মতো খাদ্য হয় না, জলের মতো পানীয় হয় না, ঈশ্বরের স্বহস্তে তৈরি এইসব খাদ্য পানীয় আমি গ্রহণ করেছি, পদ্মবীরাজারই অসীম করুণায়। এত মিষ্টি জল এত স্বাদু ফল আমি আর কোথাও খাইনি। অতি অপরূপ নৃত্য দেখেছি, অসামান্য সংগীত শুনেছি, আর কবিদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ও পেয়েছি। আর কোনো রাজার সভাতেই এমনটি আমি দেখিনি। কিন্তু রাজসভার বাইরে আমাদের রাজ্যের এক জেলের ঘরে আমি এর চেয়েও মনোরম নৃত্য দেখেছি, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট সংগীত শুনেছি, এর চেয়ে উত্তম কাব্যও পাঠ করেছি। পদ্মবীরাজার এই মহোৎসব, এই ভোজ, এই নৃত্যগীত ও কাব্যসভা রাজাদের মধ্যে তুলনাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীতে অতুলন বললে ভ্রান্ত বাক্য বলা হবে। যাই হোক, এই অপরূপ সভাতে এসে আমি ধন্য বোধ করছি। জয় মহারাজের!

কিন্তু সত্যি কথা শোনবার মতো মনমেজাজ ছিল না তখন পদ্মবীরাজের। চাটুকারিতায় তাঁর খুব অহংকার হয়েছে। তিনি অনেক সুরাপান করে কিঞ্চিৎ প্রমত্তও

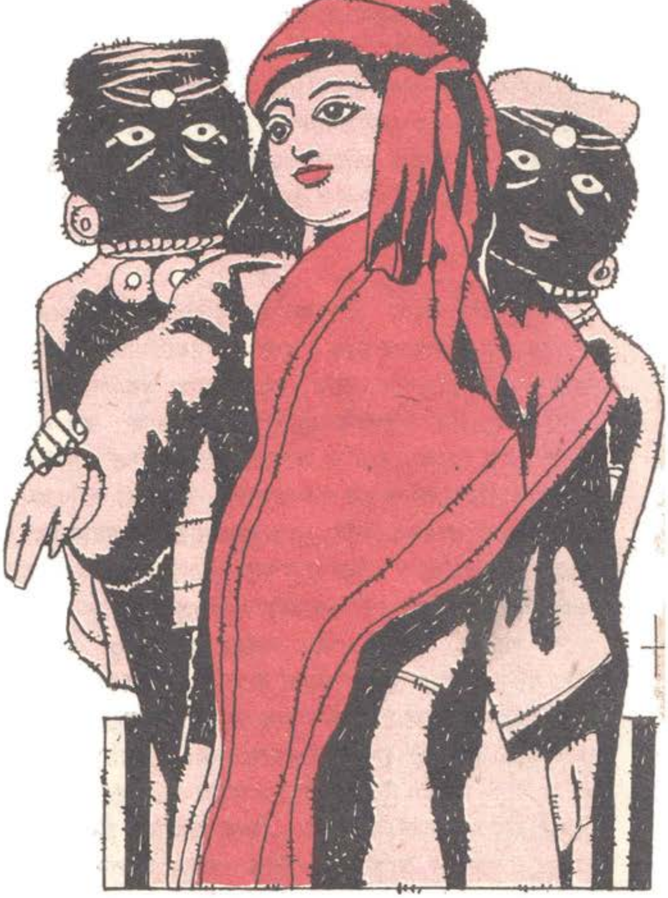

অমনি মোটাসোটা প্রহরীরা এসে

ছিলেন। তিনি কোটালকে বললেন–এত বড়ো স্পর্ধা? বলে কিনা এর চেয়ে ভালো নাচ-গান-কবিতা ওদের রাজ্যে জেলেদের ঘরেও শোনা যায়? এত অপমান? অ্যাঁ? দাও রাজকুমারকে গারদে পুরে। শাস্তি হোক!

ব্যস্ অমনি মোটাসোটা প্রহরীরা এসে কদমকুমারকে মেরে ধরে কয়েদে পুরে দিলে। কদমকুমার বেচারী তো মারপিট জানেন না। তিনি গারদে বসে বসে গান করেন। বাঁশি বাজান। তাঁর বাঁশি শুনে গর্ত থেকে রাজবাড়ির বাস্তু সাপ রাজগোখরো নাগ-নাগিনী বেরিয়ে আসেন রোজ রাত্রে। তাঁর গান শুনে রাজবাড়ির সাদা ময়ূররা পেখম মেলে নাচে, যদিও আকাশে মেঘ নেই। রাজা রেগে গিয়ে বললেন–বারণ করো ওকে গান করতে। কেড়ে নাও ওর বাঁশি। গান তো বহু হলো। বাঁশি যেই কাড়তে গেছে প্রহরী, অমনি বাস্তু-গোখরো বেরিয়ে এসে ফোঁস্ করে

ছোবল তুলেছেন। প্রহরী "বাপরে!" বলে পগারপার। কদমকুমার মনে মনে বললেন—পদ্মকুঁড়ি, তুমি আজ এখানে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না। তাঁর মনের কথাটি বাতাস বয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল জেলেনীর বাড়ির উঠোনে পদ্মকুঁড়ির কানে কানে। পদ্মকুঁড়ি কেঁদে উঠলেন। জেলেকে বললেন, দাদা, আমি রাজার সভায় যাচ্ছি কদমকুমারকে উদ্ধার করতে। তুমিও আমার সংগে চল।

দুষ্টু মন্ত্রিমশাই এদিকে মহাখুশি। তিনি খবর পেয়েছেন কদমকুমার বন্দী হয়েছেন। তিনি রাজামশাইকে বোঝাচ্ছেন, পদ্মবীরাজ খুব শক্তিমান প্রতিবেশী, ওঁর সংগে ঝগড়া না করাই ভাল। ভাগ্নের শাস্তি হয় হোক। অন্যায় করেছে, তাই শাস্তি পাচ্ছে। রাজা-রানীর এদিকে খুব মন খারাপ। তাঁরা না পারছেন পদ্মবীরাজকে ধমক দিতে, না পারছেন এই অপমান সহ্য করতে! আমন্ত্রিত অতিথিকে গারদে পোরা? কে কবে এমন কথা শুনেছে? কী করা যায়? ওঁদের প্রাণে সুখ নেই, মনে শান্তি নেই। এমন সময়ে পদ্মকুঁড়ি এলেন রাজসভায়। রূপে সভা আলো হলো। মন্ত্রীর সর্বশরীর কেঁপে উঠল। অজানা একটা ভয়ে ভেতরটা কুঁকড়ে গেল। পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, আপনার মন আমি ভালো করে দিতে পারি। কদমকুমারকে আমি এনে দিতে পারি পদ্মবীরাজ্যকে শত্রু না করেই। কিন্তু আমার তিনটি শর্ত আছে। সেগুলি আমি এসে বলব। বলুন আপনি রাজী কিনা?

রাজা বললেন—খুব রাজী।

রানী বললেন—এক্ষুণি রাজী।

কন্যে বললেন—তাহলে আমাকে একটা সোনার শাড়ি দিন, রূপোর পালকি দিন, সংগে আপনার বাজনদার দিন, হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর দিন, পদ্মবীরাজার রাজ্যে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিন। আর জাল নিয়ে আমার দাদাও সংগে যাবেন।

রানী বললেন—এক্ষুণি দিচ্ছি।

মন্ত্রী দেখেশুনে চুপ।

সোনার শাড়িই শুধু? হীরেমুক্তোর গয়নাতেও সাজিয়ে দিলেন পদ্মকুঁড়িকে রানীমা। পদ্মবীরাজ্যে রওনা হলেন পদ্মকুঁড়ি। সামনে বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে, হাতি-ঘোড়া লোক-লস্করের মিছিলের মাঝখানে রূপোর পালকি চড়ে পদ্মকুঁড়ি যাচ্ছেন।

দূর থেকেই পদ্মবীরাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। কে এক রাজকন্যে এসেছেন! অপরূপ সুন্দরী!

পদ্মবীরাজকে গিয়ে পদ্মকুঁড়ি কিছু পরিচয় বলবার আগেই রাজার লোকজন এসে মহাসম্মান করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেল রাজসভাতে। তখনও উৎসব জমজমাট। পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, আমি আপনাদের এই অপূর্ব সংগীতসভা, নৃত্যসভা, কাব্যসভার খবর পেয়ে এসেছি। জগতে নাকি তার তুলনা নেই। তা আমিও নৃত্যগীত পটীয়সী, আর কাব্যরসপিপাসুও বটে। আমিও কি যোগ দিতে পারি?

রাজা তো ধন্য। বলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

রাজসভা দ্যুতিময় করে তুলে পদ্মকুঁড়ি তো গান ধরলেন। অপ্সরার সংগে ওস্তাদেরা পারবেন কেন? তাঁরা লজ্জায় এক এক করে সভা ত্যাগ করলেন। রাজা হতবাক্।

তারপর পদ্মকুঁড়ি বললেন— মহারাজ! এবারে নৃত্য হোক?

পদ্মপায়ে সোনার নূপুর আর আলতা পরাই ছিল, রাজ সভার মেঝেটা টাটকা দুধে মুছে নিয়ে, পদ্মকুঁড়ি নাচ শুরু করলেন। নাচ যখন থামলো, রাজসভার মেঝেয় তখন এক অসামান্য দুধে আলতার পদ্মফুলের ছবি ফুটে উঠেছে। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো—রাজা গলার মাণিক্যমালা ছুঁড়ে দিলেন পদ্মকুঁড়ির পদ্মপায়ে। দেশ বিদেশের নটীরা স্তব্ধ!

পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, এবার তবে কবিতা পড়া শুরু হোক?

নাচগানের নমুনা দেখেই কবিরা থ! সভাকবি তো কান্ড দেখে আগেই উঠে গেছেন। অন্যান্য কবিরা কে যে কোথায় কোন থামের আড়ালে, টের পাওয়া গেল না। পদ্মবীরাজ মুগ্ধ মোহিত। পদ্মকুঁড়ি কবিতা পড়তে শুরু করলেন। পৃথিবীর ইতিহাস, মানবসভ্যতার ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, মানুষের বাসনা, ক্রোধ, লোভ মোহ, অহংকার, হিংসের ইতিহাস—কেমনভাবে চাটুকারিতা মানুষের দম্ভে সুড়সুড়ি দিয়ে সত্যের পথ ভুলিয়ে দেয়, কেমনভাবে সেই নকল অহংকার আহত হলে মানুষের ক্রোধ হয়, মোহ হয়, অপরাধ হয়। মানুষ কত তুচ্ছ, কত সামান্য, কত দুর্বল—সেই ইতিহাস।

সভা মন্ত্রমুগ্ধ।

এমন সময় কোথায় যেন বাঁশি বেজে উঠলো। অমনি রাজসিংহাসনের তলা থেকে দুই রাজগোখরো ধবধবে দুধেল বাস্তুসাপ বেরিয়ে এসে হেলেদুলে ফণা তুলে নাচতে শুরু করে দিলেন। পদ্মকুঁড়ি সেই নাচের সংগে

তাল মিলিয়ে দুলতে লাগলেন, যেন তিনিও নাগিনী।

রাজা আর সহ্য করতে পারলেন না—যেন কোনো এক জাদুকরীর মায়ায় পড়ে গেছেন। তিনি ছুটে এসে পদ্মকুঁড়ির পায়ের কাছে বসে পড়ে বললেন—রাজকন্যা, আমাকে আপনার সেবক হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার গুণে বাস্তুসাপও ছুটে এসেছে।

পদ্মকুঁড়ি চমকে উঠে পা সরিয়ে নিলেন। হাতজোড় করে বললেন—ছি ছি! মহারাজ। আমি রাজকন্যা নই। আমি তো সামান্য জেলের মেয়ে। এই যে আমার দাদা!

বলতে বলতেই জাল কাঁধে নিয়ে জেলে এসে দাঁড়ালো পদ্মকুঁড়ির পাশে। পদ্মকুঁড়ি বললেন—আর এইসব ধনসম্পদ আমার বন্ধু কদমকুমারের। এই হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর সোনারুপো সবই তাঁর। আমি দরিদ্র ধীবরকন্যা। আপনি ভুল করবেন না। আমার বন্ধু কদমকুমার কাছেই কোথাও আছেন। তাঁরই আকুল করা বাঁশির টানে আপনার বংশের বাস্তুভিটের সাপ-সাপিনী বেরিয়ে এসেছে। কেননা তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না, তিনি কারুর শত্রু নন। আপনি তাঁকে মুক্ত করে দিন নইলে আপনার রাজলক্ষ্মী আপনাকে পরিত্যাগ করে যাবেন।

মহারাজ আর কী বলবেন?

কদমকুমারকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সহস্রবার করে মার্জনা ভিক্ষা করা হলো। হাতি-ঘোড়া সমেত পদ্মকুঁড়ি কদমকুমারকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরলেন জেলে-দাদার সঙ্গে। পদ্মবীরাজ পদ্মকুঁড়িকে দ্বিগুণ হাতি-ঘোড়া তিন গুণ সোনাদানা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। বললেন, আমার মনুষ্যজন্ম ধন্য যে তোমার দর্শন পেলাম। এত গুণবতী মানুষ আমি আগে দেখিনি।

পদ্মকুঁড়ি কদমকুমারকে নিয়ে ফিরছেন দেখে হিংসের চোটে বুক ফেটেই মন্ত্রীমশাই অক্কা পেলেন। তাঁর ছেলেকে একটি ভালো মুদির দোকান করে দেওয়া হলো। পদ্মকুঁড়ি মন্ত্রী হলেন, কদমকুমার রাজা হলেন, আর রাজারানী মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বানপ্রস্থে গেলেন। জেলেনী-মা আর জেলে-দাদা কিছুতেই প্রাসাদে এলেন না, কিন্তু রোজ তাঁদের জন্যে রাজবাড়ি থেকে রাজভোগ রান্না হয়ে যেতো; সাতজন বাহকের কাঁধে।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

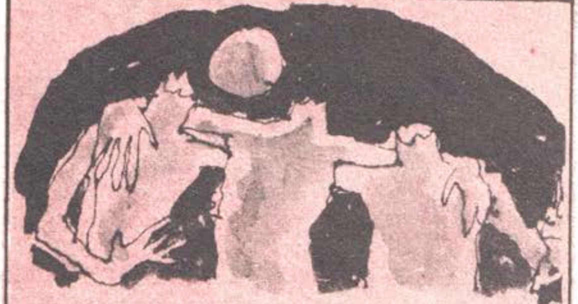

রাত-দুপুরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত-দুপুরে
হল্লা জুড়ে
　　এই রে, বাবা,
কাঁপিয়ে পাড়া
এখন কারা
　　খেলছে দাবা?
বলছে ওরা,
"সামলা ঘোড়া,
　　মন্ত্রীকে মার্!"
ঘুমের দফা
হচ্ছে রফা
　　গোটা পাড়ার।

ভাবছ ওরা
দুষ্টু ছোঁড়া?
　　আরে, না না,
মুর্গিহাটার
কন্দকাটার
　　জ্যান্ত ছানা।
বলো তো ভাই,
তোমরা সবাই
　　সত্যি জানো?
ওই ওরা কি
মানুষ, নাকি
　　দত্যি-দানো?

ছবি: সুবোধ দাশগুপ্ত

পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে

সমরেশ বসু

গোগোল কয়েক দিন জ্বরে বিছানায় শুয়েছিল। জ্বর সেরে যাবার পরেও, ও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ওর স্কুল যাওয়া বন্ধ। গ্রীষ্মের ছুটির পরে, মাত্র দশ দিন আগে স্কুল খুলেছে। চার দিন যেতে না যেতেই জ্বর।

এ সময়টা গোগোলকে সাবধানে থাকতে হয়। খেলাধূলো করতে গিয়ে, গায়ে ঘাম বসে, অল্পেতেই ওর ঠাণ্ডা লেগে যায়। আজকাল ওকে একটি ক্লাবের 'সি' গ্রুপে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের মাঠেও নিয়মিত খেলা হয়। কিন্তু গোগোলের বাবা স্কুলের খেলার শিক্ষার থেকে, একটি নাম করা ক্লাবেই ওকে ভর্তি করে দিয়েছেন। বাবা যে ঠিক কাজই করেছেন, গোগোল তা ক্লাবে খেলা শিখতে গিয়েই বুঝেছে। ক্লাবের নানা খেলার জন্য আছেন আলাদা শিক্ষক। খেলার ব্যাপারে যাঁদের বলা হয় 'কোচ'। গোগোলের অবশ্য ক্রিকেটের দিকেই ঝোঁক বেশী। টেনিসের দিকেও ওর টান কম নেই। আর ফুটবলে আছে একটা উত্তেজনা।

গোগোলকে বয়স অনুযায়ী 'সি' গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছে। সাধারণতঃ ও শনিবার আর রবিবার ক্লাবে যায়। অন্যান্য ছুটির দিনেও যায়। বাকি দিনগুলো ও সুমিত, পারভেজ, জর্জ, এদের সংগেই নীচে খেলা করে। গ্রীষ্মের সময় ক্লাবে যখন খেলা শিখতে যায়, তখন একাধিক জামা বদলানর ব্যবস্হা আছে। আর তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে দেবার লোকও আছে। কিন্তু বাড়িতে—ফ্ল্যাট বাড়ির নীচে যখন খেলতে যায়, তখন জামা বদলান, ঘাম মোছা তো হয়ই না। উপরন্তু গোগোল, জল-তেষ্টা পেলেই, তাড়াতাড়ি লিফ্‌টে উঠে, খাবার ঘরে ঢুকে, রেফ্রিজারেটর থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে গলায় ঢালে। রেফ্রিজারেটরের জল খাওয়া ওর এমনিতেই বারণ। তার ওপর খেলতে খেলতে ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ওর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। জ্বরও হয়েছিল ওর সেই কারণেই। মা বা কাজের লোক বঙ্কিমদার সামনে ও রেফ্রিজারেটর থেকে জল বের করে খায় না। জানে খেতে গেলেই বকুনি খাবে, বাধাও পাবে। তাই ওকে লুকিয়েই ঠাণ্ডা জল খেতে হয়। আসলে ও ঠাণ্ডা জল খেতে ভালবাসে।

জ্বরে ভুগে ওঠার পর, দুর্বল শরীর নিয়ে গোগোল এখনও লেখাপড়া নিয়ে তেমন বসতে পারছে না। ডাক্তার বলেছেন, সাত দিন ওকে বিশ্রাম নিতেই হবে। খেলাধূলোও বারণ। অবশ্য দুর্বল শরীর নিয়ে গোগোলের পক্ষে খেলা সম্ভবও নয়। তবে সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকা অসম্ভব। ওদের পাঁচতলা ফ্ল্যাটে, দুটো ব্যালকনি আছে। বড় ব্যালকনিটা দক্ষিণ দিকে।

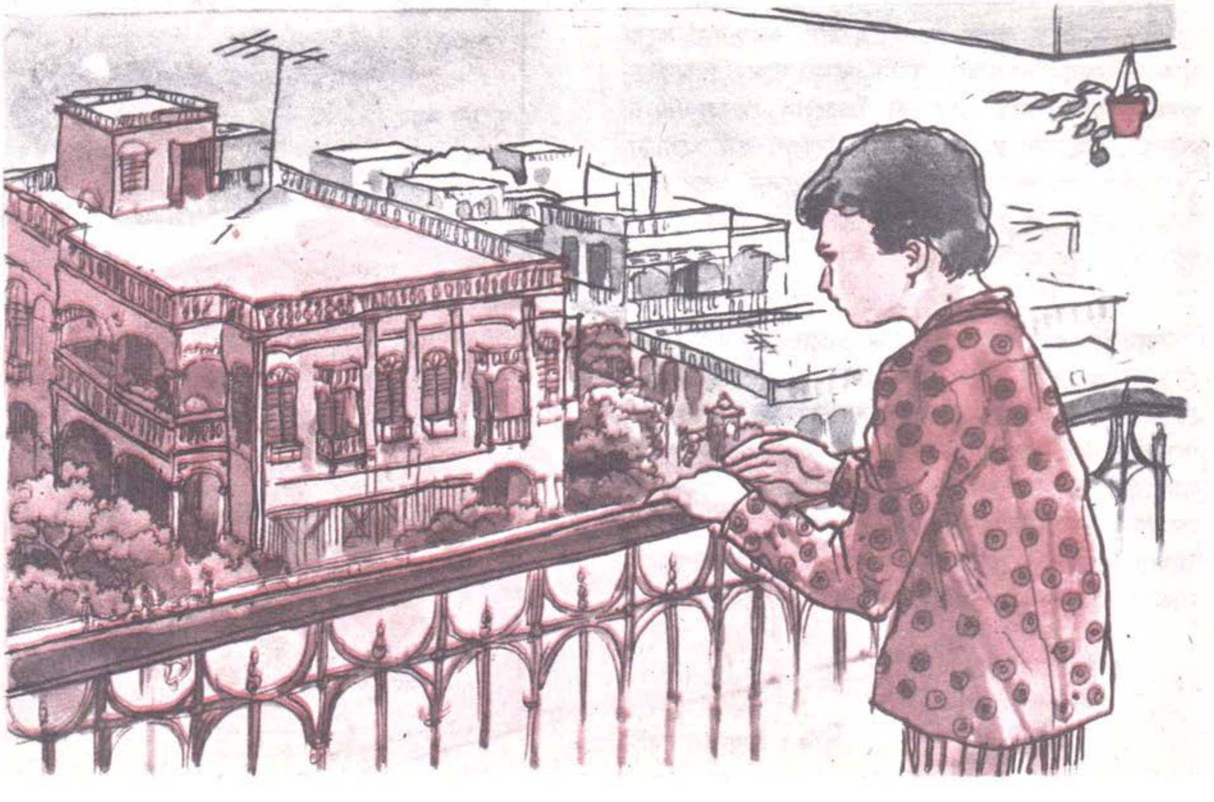

সেখানে বসলে, নীচের খেলাধুলো দেখা যায়। আর পশ্চিম দিকেও একটা ছোট ব্যালকনি আছে। গোগোল সকালের দিকে পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসে বই পড়ে। বই পড়তে যখন ভাল না লাগে, তখন বাইরের বাড়িঘর রাস্তাঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকেলে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে রোদ থাকে। তখন ওখানে বসা যায় না। ও বসতেও চায় না। বিকেলে দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখে।

গোগোলদের দশতলা ফ্ল্যাট বাড়ির পশ্চিমে, কাছে পিঠে কোন উঁচু বাড়ি নেই। বেশির ভাগ বাড়িই দোতলা, তিনতলা। চারতলাও আছে। বাড়িগুলো একটু ছাড়া ছাড়া। আর সব বাড়ির সামনেই ছোট বড় বাগান আছে। বেশির ভাগ বাড়িগুলোকেই কেমন নির্জন লাগে। জানালা দরজা বিশেষ খোলা দেখা যায় না। যে দু-একটা রাস্তা দেখা যায়, তার কোনটাই বিশেষ চওড়া নয়। লোকজনের ভিড়ও নেই। মাঝে মাঝে রকমারি গাড়ি চলতে দেখা যায়। তবে সব বাড়ির ছাদেই ছোট বড় নানা আকারের টেলিভিশনের এ্যান্টেনা আছে। গোগোল অনেকদিনই পশ্চিমের এ অঞ্চলটা দেখেছে। এখন অসুখ করে, চেয়ারে বসে বসে আরও বেশী করে দেখছে। পাড়াটা যে বড়লোকদের, বাড়িগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

গোগোল পাঁচতলা থেকে পশ্চিমের খুব সামনের কয়েকটা বাড়ির, একতলা দোতলার সবই প্রায় দেখতে পায়। সকালের দিকে বাড়িগুলোর লোকজনকে একটু ব্যস্ত মনে হয়। দু চারটি ছোট ছেলে মেয়েকেও দেখা যায়। তাদের নিয়ে মহিলারা গাড়ি চেপে স্কুলে নিয়ে যান। ভদ্রলোকেরাও সব কাজে বেরিয়ে যান। তারপরে মহিলারা কেউ ফেরেন। কেউ ফেরেন না। সবই কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। কেবল বাগানের মালীদের একটু বেলা অবধি কাজ করতে দেখা যায়। কখনো সখনো হয় তো দু একজন কাজের মেয়ে পুরুষকে দেখা যায়, বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে বা ঢুকতে।

দু-দিন বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে, পশ্চিমের নিরিবিলি পাড়াটার দিকে দেখতে দেখতে, উত্তর দিকের একটা বাড়ির দিকে গোগোলের নজরটা কেমন আটকে গেল। দোতলা বাড়িটা, উত্তর দিকের একটেরেতে। অথচ বাড়িটার উত্তর দিকটা মোটে দেখাই যায় না। পুব দিকের সবটাই প্রায় দেখা যায়। পুবে পশ্চিমে লম্বা বাড়িটার, দক্ষিণ দিকের বারান্দা বেশ চওড়া। পুব দিকে দোতলায় দুটো ছোট ছোট ব্যালকনি। কিন্তু ব্যালকনির দরজা দুটো যেমন প্রায় কোন সময়েই খোলা দেখা যায় না, তেমনি চারটি জানালাও খোলা হয় না। দুটো জানালায় এয়ারকুলার মেসিন বসানো আছে। সেগুলো চলে কি না, গোগোল তা বুঝতে পারে না।

বাড়িটা যে বড়লোকের বাড়ি, তা দেখলেই বোঝা যায়। দক্ষিণের লম্বা আর চওড়া বারান্দাটা খুব সুন্দর। মাঝামাঝি সামনের দিকটা অনেকখানি বেশী চওড়া। সেখানে রয়েছে রঙ করা মোটা বেতের বেশ কিছু চেয়ার। মাঝখানের নীচু টেবিলটা যে কাঁচের, গোগোল তাও স্পষ্ট দেখতে পায়। এমন কি, কাঁচের টেবিলের ওপরে কাট গ্লাসের দুটো ঝকঝকে ছাইদানিও চোখে পড়ে। আর রেলিং যে কেবল চকচকে কাঠের, তা নয়। কাঠের রেলিংয়ের মাঝখানে প্রায় এক ফুট চওড়া কাঁচ দিয়ে ঘেরা। ওরকম রেলিং গোগোল আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। তাছাড়া বারান্দার সিলিংয়ে ঝুলছে বেশ কয়েকটা ফ্যান।

বাড়িটার দক্ষিণে বাগান। বাগানে বেশ কিছু বড় বড় গাছ রয়েছে। সেই বড় গাছগুলো থাকায়, বাগানটাকে কেমন ঝোপঝাড়ে ছায়ায় ঢাকা মনে হয়। গোগোল ওই বাগানে কোন মালীকে কাজ করতে দেখতে পায় না। বড় বড় ঘাসে ঢাকা বাগানে কোন ফুল গাছ চোখে পড়ে না। বাগানের পুব দিকে, গোগোলের মুখোমুখি একটা বড় গেট আছে। গেটটা কোন সময়েই খোলে না। দেখলেই বোঝা যায়, বড় লোহার গেটে জং ধরেছে। তার মানে, গেটটা অনেককাল খোলা হয় নি। বাগানেও লোকজন চোখে পড়ে না। তবে উত্তর দিকে একটা বড় গেট আছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সেই গেটটা দেখা যায়। বেশীর ভাগ সময় সেই গেটের একটা পাল্লা খোলা থাকে। হঠাৎ হঠাৎ কোন গাড়ি এলে, আর একটা পাল্লা খুলে যায়। নিশ্চয়ই গেটে দারোয়ান আছে। নইলে কে গেট খুলে দেবে? কিন্তু গোগোল দারোয়ানকে দেখতে পায় না। না পাবার কারণ, গাছের আড়াল। অথচ গেটের ধারে, পাঁচিলের গায়ে শ্বেত পাথরের ওপর কালো রঙের ইংরেজিতে 'দু' নম্বরটা স্পষ্টই পড়া যায়। ওটা যে বাড়িটারই নম্বর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরো একটা ব্যাপার হল, ওই গেটের সামনে পাঁচিল এত উঁচু, ভেতরের চত্বরটা খুব অল্পই দেখা যায়। সেটুকুও দেখা যেত না, যদি না গোগোল পাঁচতলার ওপর থেকে দেখত। চত্বরের যে অংশটা ওর চোখে পড়ে, সেদিকে কয়েকটা গ্যারেজ ঘর আছে।

গোগোল সকালের দিকে জলখাবার আর ওষুধ খেয়ে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসতে যায়। মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। কারণ জ্বরটা ছাড়লেও, বাইরের হাওয়া লেগে আবার শরীর খারাপ করতে পারে। কিন্তু গোগোল সকালবেলা আবার ঘরের মধ্যে বিছানায় গিয়ে শুতে রাজি হয় নি। তা ছাড়া, ডাক্তারবাবুও বলেছেন, 'বৃষ্টি না হলে, বাইরের হাওয়াকে এখন ভয় নেই। তবে গোগোল যেন একটা মোটা ফুল হাতা জামা গায়ে দিয়ে বাইরে বসে। আর পা জোড়া যেন খালি না থাকে।'

ডাক্তারবাবুর কথা শোনার পরে মা ব্যালকনিতে বসতে দিতে রাজি হয়েছেন। বঙ্কিমদা খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার পেতে দিয়েছে রেলিং থেকে একটু দূরে সরিয়ে। গোগোল চেয়ারটা রেলিংয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়। তবে দেওয়াল

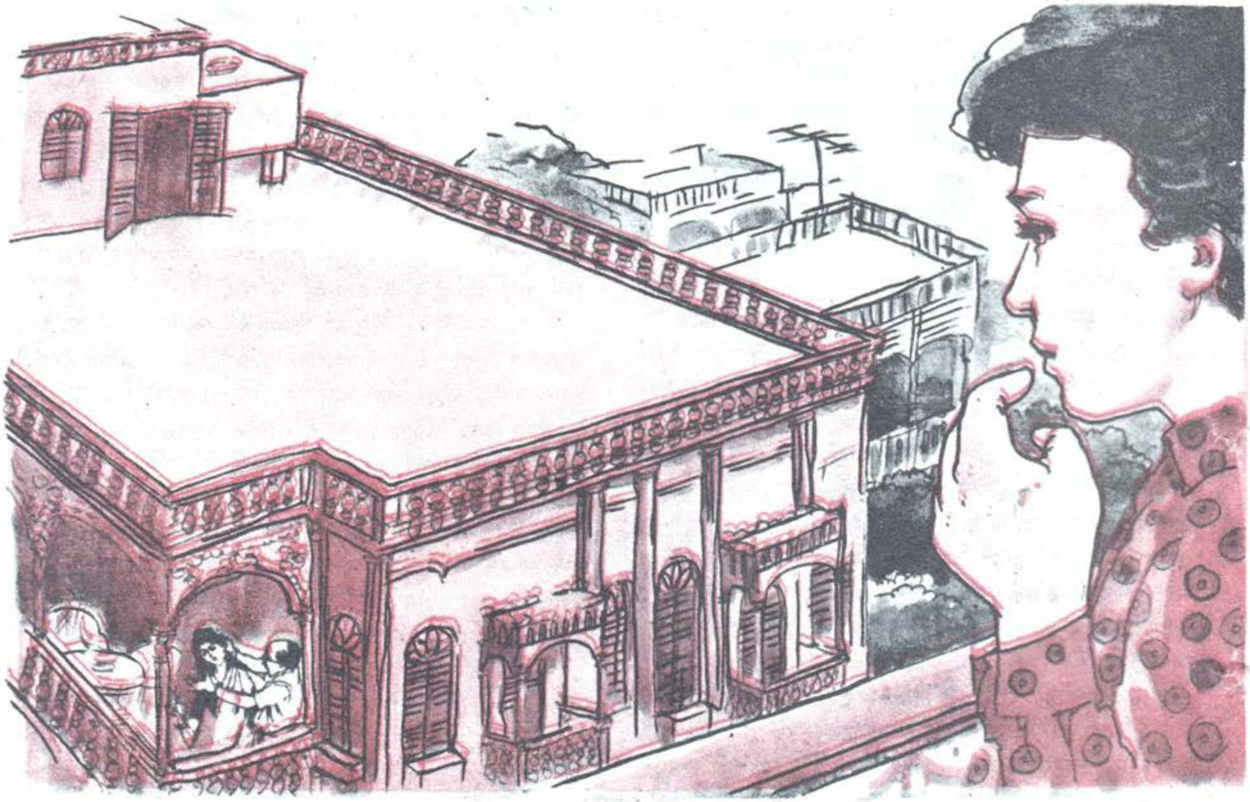

কিন্তু মহিলা কিছুতেই যেতে চাইছেন না।

ঘেঁষে, একটু কোণ নিয়ে বসে। গল্পের বই নিয়ে বসলেও, লোকজন গাড়ি দেখলে, সেদিকেই ওর চোখ চলে যায়। পাঁচ নম্বর বাড়িটা, ছাড়া অন্যান্য বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাবার সময় দেখা যায়। তবে তারা কেউ গোগোলের বয়সী নয়। সবাই ওর থেকে ছোট।

গোগোল মনে মনে অবাক হয়। কাছের বাড়িগুলোতে, একজনও ওর বয়সী ছেলে নেই কেন? তারা কি কেউ কলকাতায় পড়ে না? সব দার্জিলিং বা নৈনিতালে পড়ে? গোগোল জানে, অনেক বাড়ির ছেলে মেয়েরাই, কলকাতার বাইরে থেকে পড়ে।

গোগোলের দু'দিন কেটে গেল, এইরকম বই পড়ে আর বাইরের দিকে তাকিয়ে। বিকেলে তো দক্ষিণের বড় ব্যালকানিতে বসে, নীচে বন্ধুদের খেলা দেখে। বন্ধুরা ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে। গোগোলও হেসে হাত নাড়ে। এরকম দুদিন কেটে যাবার পরে, তৃতীয় দিনের সকালে, পাঁচ নম্বর বাড়ির একটা ঘটনা ওকে কেমন অবাক করে দিল। ও বসে বসে বই পড়ছিল। অন্যান্য বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে, তাদের মায়েরা স্কুলে চলে গেছেন। ভদ্রলোকেরাও অনেকে বেরিয়ে গেছেন। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার পুবের ব্যালকনির একটা দরজা খুলে গেল। আগের দুদিন ও বাড়ির পুবের দিকের ব্যালকনির দরজা খোলা দেখে নি। বিকেলের দিকে খোলে কি না, ও জানে না। সকালের দিকে কোন দিনই খুলতে দেখে নি। এমন কি, দক্ষিণের লম্বা সুন্দর বারান্দায়, একজন মানুষকেও দেখতে পায় নি।

গোগোল দেখল, পাঁচ নম্বর গেরুয়া রঙের বাড়ির, দোতলার পুবের একটা ব্যালকনির দরজা খুলে গেল। একজন মহিলা ভেতর থেকে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই এগিয়ে এলেন না। মহিলা গোগোলের মায়ের থেকে বয়সে বেশ ছোট। ওকে যে-দিদি পড়ান, অনেকটা তাঁর মতই মনে হল। সেই দিদি এখনও ইউনিভারসিটিতে পড়েন।

গোগোলের মনে হল, মহিলা যেন দরজা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখতে তাঁকে বেশ সুন্দর। বেশ একটু দূরে হলেও, গোগোল স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, মহিলা বেশ ফরসা। তাঁর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি সুন্দর। তাঁর মাথার চুল খোলা, তবে তাঁর জামা কাপড় যেন তেমন ঝকঝকে রঙচঙে পরিচ্ছন্ন নয়। তাঁর হাতে-গলায় সামান্য চুড়ি হার আছে। থমকে দাঁড়িয়ে, তিনি বাইরের দিকে তাকালেন।

প্রথমেই যেন তাঁর চোখ পড়ল গোগোলদের উঁচু বাড়িটার দিকে। তাঁর দেখার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, গোগোলদের উঁচু বাড়িটা যেন তিনি এই প্রথম দেখছেন। তবে, গোগোলদের বাড়িটা দেখলেও, তিনি গোগোলকে মোটেই দেখছেন না। তাঁর নজর পাঁচতলা থেকে আরও উঁচুতে।

গোগোলের তখনও কিছুই মনে হয় নি। ও বইয়ের খোলা পাতার দিকে দেখতে গেল। কিন্তু চোখ নামাতে পারল না। মনে হল, মহিলা যেন ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। প্রায় মিনিট খানেক পেছন দিকে দেখে, আবার সামনের দিকে ফিরলেন। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে এসে, ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। মুখ নামিয়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকালেন। গোগোল দুই সারি বাড়ির মাঝখানে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে না। বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তাটার ফালি ফালি টুকরো দেখা যায়। পাড়াটা নিরিবিলি, রাস্তায় লোকজন খুবই কম। মাঝে মাঝে হুস্ হাস্ করে এক একটা গাড়ি বেরিয়ে যায়।

গোগোল ভাবল, ও ভুল দেখেছে। শুধু শুধু মহিলা ভয় পাবেন কেন? ও আবার মুখ নামিয়ে বইয়ের দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য, ও বইয়ের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিতে পারল না। পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যালকনির দিকে না তাকিয়েও মনে হল, সেখানে আরও কে একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। ও চোখ তুলে তাকাল। ঠিক তাই! এক ভদ্রলোক, খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও বেশ ফরসা, আর শক্ত চওড়া চেহারার মানুষ। তাঁর মাথার সামনের দিকে খানিকটা টাক পড়ে, কপালটা বেশী চওড়া দেখাচ্ছে। চোখে তাঁর সোনালী ফ্রেমের চশমা। শাদা ফুল প্যান্টের কোমরে গুঁজে পরেছেন শাদা হাফ শার্ট। বাঁ হাতের মোটা কবজিতে চওড়া স্টিলের ব্যান্ড বাঁধা ঘড়ি চকচক করছে। খুব লম্বা তিনি নন। কিন্তু তাঁর চশমার কাঁচের আড়ালে চোখ দুটো, আর মুখটা কেমন শক্ত দেখাচ্ছে। তিনি মহিলার পেছন দিকেই তাকিয়ে আছেন। আর মহিলা যে ভদ্রলোকের আসাটা মোটেই টের পান নি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

গোগোল দেখল, ভদ্রলোকের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। ভদ্রমহিলা যেন আচমকা ভয়ে, পেছন ফিরে তাকালেন। তারপরে আর একবারও সামনের দিকে না ফিরে, ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। যেই মাত্র তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, অমনি ভদ্রলোক তাঁর গালে একটা থাপ্পড় মারলেন। আর চুলের মুঠি ধরে, ঘরের আরও ভেতরে ঠেলে দিলেন। তারপরে বাইরের কোন দিকে না তাকিয়ে, দরজাটা এত জোরে ঠেলে বন্ধ করলেন, গোগোলের মনে হল, শব্দটা যেন ও শুনতে পেল।

গোগোল এত অবাক হয়ে গেছল, প্রথমে কিছু বুঝেই উঠতে পারল না! ওরকম বয়সের মহিলাকে ও কোন দিন ও ভাবে মার খেতে দেখে নি। ভদ্রলোকের শক্ত চোখ মুখ দেখে, ও একবারও ভাবে নি, উনি মহিলাকে হঠাৎ ওরকম গালে থাপ্পড় মেরে, চুল টেনে ভেতরে ঠেলে দেবেন। ওর মনের হকচকানিটা কেটে যাবার পরে, মনে হল, ও যাঁকে ভদ্রমহিলা ভাবছে, তিনি হয় তো তা নন। আসলে সে বাড়ির ঝি পরিচারিকা গোছের কেউ হবে। আর গ্রাম্যও হতে পারে। এমনও হতে পারে, ব্যালকনির দরজা খোলা তার পক্ষে নিষেধ ছিল। তাই ভদ্রলোক রেগে গিয়ে ওরকম মারলেন।

গোগোলের মনে এরকম চিন্তা এলেও, ও নিজেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর খুব খারাপ লেগেছে। মনটা খারাপ করে দিয়েছে। মহিলা যদি ভদ্রমহিলা নাও হন, এত বড় বয়সের একজন মহিলাকে কোন ভদ্রলোক ওরকম মারেন? গোগোলদের এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ির অনেক কাজের মেয়েকেই অন্যায় করলে বকুনি খেতে দেখেছে। খুব বেশী অন্যায় করলে, বাড়ি থেকে বের করে দিতেও দেখেছে। অবশ্য সব সময় কাজের মানুষরাই যে অন্যায় করে, গোগোল তা মোটেই বিশ্বাস করে না। কিছু কিছু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে ও দেখেছে, তাঁরা কাজের মেয়ে পুরুষদের যেন মানুষ বলেই গণ্য করেন না। কিন্তু এরকম বয়সের একজন মহিলার গায়ে হাত তুলতে ও আজ পর্যন্ত দেখে নি।

গোগোল নিজের মনে মাথা নাড়ল। না, ব্যাপারটা ওর মোটেই ভাল লাগে নি। তা ছাড়া, ওর আরও মনে হল, ভদ্রমহিলার জামা কাপড় হয় তো তেমন ঝকঝকে রঙচঙে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখে বেশ ভদ্রমহিলাই মনে হচ্ছিল। একটু ভয় ভয় ভাব থাকলেও, মানুষকে দেখে কি একটুও চেনা যায় না? তা ছাড়া, ঝি পরিচারিকাদের হাতে গলায় কি সোনার চুড়ি হার থাকে? তাঁর খোলা চুল কেমন ঘাড় অবধি ছাঁটা ছিল, তাতেও তাঁকে অন্যরকমই দেখাচ্ছিল।

গোগোল যখন এরকম ভাবছে, তখনই বঙ্কিমদা এসে বলল, "গোগোল, গরম জল হয়ে গেছে। মা বললেন, তোমাকে এবার গা স্পঞ্জ করে নিতে হবে।"

গোগোল বলল, "যাচ্ছি।"

বঙ্কিমদা চলে যাবার পরে, গোগোল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গল্পের বইটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে, ওকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দেখল, নীচের বাগানে একজন পুরুষ, আর একজন স্ত্রীলোক, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পুরুষ লোকটির গায়ের জামা প্যান্ট, আর স্ত্রীলোকটির জামা কাপড় দেখে মনে হল, দুজনেই বাড়ির কাজের লোক। তাদের দুজনের চোখে মুখেই কেমন একটা ভয় আর উত্তেজনার ভাব। দুজনেই চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে কিছু বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দার দিকে মুখ তুলে দেখছে। তাদের কথাবার্তা গোগোল কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তবে বুঝতে পারছে, গোগোল একটু আগেই দোতলা বাড়িটার পুবের ব্যালকনিতে যে-ঘটনাটা দেখেছে, সেটা নিয়েই তারা কথা বলছে। হয় তো এখনও বাড়ির ভেতরে কিছু ঘটছে। গোগোল দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে না।

গোগোল দেখল, বাগানের পুরুষ আর স্ত্রীলোকটি হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। দুজনে দুদিকে ছিটকে গেল। তারপর স্ত্রীলোকটি বাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল। পুরুষটি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেদিকে দেখতে লাগল।

"কী হল গোগোল?" বঙ্কিমদা আবার এসে তাড়া দিতে লাগল, "তোমার গা স্পঞ্জ করার জল যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

গোগোল তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চল যাচ্ছি।"

বঙ্কিমদার পিছু পিছু গোগোলকে এবার ফিরতেই হল। ঘরে ঢোকবার আগে, ও আর একবার বাগানের দিকে তাকাল। লোকটা তখনও সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল।

গোগোলকে এখন দুপুরে ভাত খেতে দেওয়া হচ্ছে। তবে দুপুরে ঘুমনো একদম বারণ। কারণ এখন ওর যা শরীরের অবস্থা, দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমোলে জ্বর আসতে পারে। তবে বসে থাকার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পারে।

অন্যান্য দিন গোগোল দুপুরে খেয়ে উঠে খানিকক্ষণ পড়ার টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ে। বিশেষ করে খেলার পাতাটা খুঁটিয়ে পড়ে। তারপরে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে। কিন্তু আজ গোগোলের মাথায় খবরের কাগজ বা গল্পের বই মোটেই নেই। পশ্চিম দিকের পাঁচ নম্বর বাড়িটাই ওকে কেবল টানছিল। খেয়ে উঠে ওকে আবার পশ্চিমের ব্যালকনির দিকে যেতে দেখে, মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "খেয়ে উঠে এখন আবার তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

গোগোলের খেয়ালই ছিল না, মা ওকে লক্ষ্য করছেন। ধরা পড়ে গিয়ে বলল, "আমি ওদিককার ব্যালকনিতে গিয়েই বসছি।"

মা বললেন, "সকাল থেকেই তো ওই ব্যালকনিতে বসেছিলে। এখন আবার বসবার কী দরকার? একটু বসে যেমন খবরের কাগজ পড়, তাই পড়গে। তারপর খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে।"

"আজ আমার ঘরে বসতে ভাল লাগছে না।" গোগোল বলল, "তার চেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে আমি ওদিককার ব্যালকনিতে বসে পড়ব।" বলে ও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল খবরের কাগজ আনতে।

মা অবাক চোখে গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। গোগোল খবরের কাগজ হাতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, মায়ের সামনে দিয়েই, অন্য ঘরে ঢুকে গেল। সেই ঘরের ভেতর দিয়েই পশ্চিমের ব্যালকনিতে যেতে হয়। মা একটু ভাবলেন। তারপরে নিজের কাজে চলে গেলেন। তিনি নিশ্চিন্ত, গোগোল ফ্ল্যাটের মধ্যেই আছে।

গোগোল পশ্চিমের ব্যালকনিতে এল। চেয়ারটা রাখাই ছিল। খবরের কাগজে ওর মন ছিল না। চেয়ারে বসবার আগেই, ও পশ্চিমের পাঁচ নম্বর দোতলা বাড়ির দিকে তাকাল। কারোকে কোথাও দেখা গেল না। বাগানে গাছের আড়ালে সেই লোকটাও এখন আর নেই। মিনিট খানেক দেখে, গোগোল চেয়ারে বসল। খবরের কাগজের খেলার পাতাটা খুলল। কিন্তু পড়ল না কিছুই। সেই বাড়িটার দিকেই ওর নজর আটকে রইল।

প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল। গোগোলের ঝিমুনি ধরে গেল। ঘন ঘন হাই উঠতে আরম্ভ করল। কিন্তু ও যা আশা করেছিল, তার কিছুই ঘটল না। ও ভেবেছিল, বাড়িটার মধ্যে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কেন না, ভদ্রমহিলাকে ওভাবে মারতে দেখে, ওর মোটেই ভাল লাগে নি। তারপরে সেই পুরুষ আর স্ত্রীলোকটিকে ওভাবে বাগানে এসে কথা বলতে দেখে, ওর মনে নানা রকম সন্দেহ হয়েছিল। বাগানে তখন দুজনে হঠাৎ চমকে উঠে দুদিকে ছিটকে গেছল কেন? স্ত্রীলোকটিই বা কেন দৌড়ে বাড়ির ভেতর ছুটে গেছল? তাকে কি বাড়ির ভেতর থেকে-কেউ ডেকেছিল?

গোগোল নানারকম ভাবলেও, আসল ঘটনার কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ, একটা সামান্য ব্যাপার ভেবে, ঘটনাটাকে মন থেকে দূর করতেও পারছে না।

গোগোল খবরের কাগজের খেলার পাতায় মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ল বাড়িটার ছাদের দিকে। ছাদটা বেশ বড়। লম্বা বারান্দাটা দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িটা ছোট নয়। ও দেখল, সেই মহিলা ছাদে উঠে এসেছেন। সেই মহিলা মানে, যাঁকে ও সেই টাক মাথা ফরসা ভদ্রলোকের হাতে মার খেতে দেখেছিল। চিলে-কোঠার দরজাটা, ছাদের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, দক্ষিণ দিকে। গোগোল দেখল, মহিলা দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ওবেলা যেমন প্রথমে, ব্যালকনির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেই রকম।

গোগোলের মনটা কেমন একটা দুশ্চিন্তায় ভরে উঠল। মহিলার সেই আগের শাড়িটা এখন নেই। একটা গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছেন এখন। মাথার চুল সেই আগের মতই খোলা। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাদের ডাইনে বাঁয়ে আর সামনের দিকে, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। ছাদের আলসে বেশ উঁচু। আর বাড়িটা সাধারণ বাড়ির মত নয়। দোতলা যেন চারতলার মত উঁচু।

মহিলা ডান দিকে—অর্থাৎ পূব দিকে ফিরে, এক পা এক পা করে এগোতে লাগলেন। ওবেলাও তিনি পূবের ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়েছিলেন। ওদিকটায় যে রাস্তা আছে, গোগোল তা জানে। ওর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভদ্রমহিলা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বেন না তো? তিনি যতই এগিয়ে আসতে লাগলেন, গোগোল তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন কী একটা চিন্তায় ডুবে গেছেন। যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছেন। তিনি কাঁদছেন না। কোনো দুঃখ-কষ্টের ছাপও নেই তাঁর মুখে। তিনি যদি মুখ তুলে গোগোলদের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকান, তা হলে নিশ্চয়

গোগোলকে দেখতে পাবেন। কিন্তু কোন দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই।

ভদ্রমহিলা যতই এগোতে লাগলেন, গোগোলের বুকে ঢিপ ঢিপ শব্দ বাড়তে লাগল। ও কি চেঁচিয়ে উঠবে? কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

গোগোল চমকে উঠল। দেখল, আর একজন ভদ্রমহিলা ছাদে উঠে এলেন। তাঁর বয়স অনেকটা বেশী। তাঁর গায়ে শাদা জামা, আর শাদা শাড়ি। শাড়িটা পরেছেন অবাঙালীদের মত। মারোয়াড়ি বা গুজরাতি মহিলারা যেমন পরেন। তাঁর মাথার চুল শাদা পাকায় মেশানো। শরীরটা একটু মোটাসোটা মত। ছাদে উঠেই তিনি ডান দিকে তাকিয়ে সেই দিকে হন হন করে এগিয়ে এলেন। সেই আগের মহিলা তখন পূব দিকের আলসের অনেকটা কাছে এসে পড়েছেন। বয়স্কা মহিলা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, অল্পবয়সী মহিলার একটা হাত চেপে ধরলেন। তাঁর কোমল মুখে দুঃখের ছায়া। তাঁর ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা গেল, তিনি কিছু বলছেন।

আগের সেই অল্পবয়সী মহিলা মাথা নীচু করে, বয়স্কা মহিলার কথা শুনলেন। তারপরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বয়স্কা মহিলা আরও কিছু বললেন। আগের মহিলা মুখ না তুলেই যেন কিছু বললেন। তাঁর অল্প ঠোঁট নড়া দেখে তাই মনে হল। তারপরেও বয়স্কা মহিলা, মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কথা বলতে লাগলেন।

গোগোল আবার চমকে উঠল! আর বুকটাও ধড়াস্ করে উঠল। দেখল, মাথায় টাক সেই ভদ্রলোক ছাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই ভদ্রলোকই ওবেলা, অল্পবয়সী মহিলাকে ব্যালকনি থেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরেছিলেন। তিনি ছাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ডান দিকে ফিরে দুই মহিলার দিকে দেখলেন। মহিলারা তাঁকে দেখতে পেলেন না। ভদ্রলোক চট্ করে দরজার আড়ালে চলে গেলেন আর মুখটা একটুখানি বের করে, উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন।

বয়স্কা ভদ্রমহিলা তখনও কথা বলছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি যেন, অল্পবয়সী মহিলাকে কিছু বোঝাচ্ছেন। আর সেই মহিলা মাথা নীচু করে কথা শুনে যাচ্ছেন। তাঁরা টেরও পেলেন না, ভদ্রলোক তাঁদের দেখছেন। হয় তো তাঁদের কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

প্রায় সাত আট মিনিট পরে, বয়স্কা মহিলা, অল্পবয়স্কা মহিলার হাত ধরে চিলেকোঠার দরজার দিকে ফিরলেন। আর চোখের নিমেষে ভদ্রলোকের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বয়স্কা মহিলা আগের মহিলার হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গোগোল তারপরেও বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও কিছু ঘটল না। ও খবরের কাগজটা তুলে ধরল। এমন সময় মা এসে বললেন, "আমার খাওয়া হয়ে গেল। তুমি এখনো এখানে বসে কী করছ?"

"এমনি বসে আছি।" গোগোল মাকে সত্যি কথাটা বলতে পারল না।

মা বললেন, "এই শরীর নিয়ে, সেই সকাল থেকে ঠায় বসে আছ। এখন তুমি বেশ দুর্বল। চল, ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়বে।"

গোগোল বলল, "আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

মা তা মানতে চাইলেন না। বললেন, "তোমার কষ্ট না হোক, আমি আর তোমাকে এ ভাবে বসে থাকতে দেব না। চল, ঘরে চল। বিকেলে ওদিকের ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখবে।"

তুমি এখনো এখানে বসে কী করছ?

গোগোল মায়ের কথার অবাধ্য হতে পারল না। ওকে তখনকার মত ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে যেতেই হল। যাবার আগে পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে একবার দেখে নিল। কারোকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটছে, তাই নিয়ে ওর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে ছাদের ঘটনাটা ওর মনে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। দুই মহিলার মধ্যে কী সম্পর্ক? ভদ্রলোকই বা ওরকম চুরি করে তাঁদের দেখছিলেন কেন? এসব মিলিয়ে এক রাশ প্রশ্ন ওর মাথায় যেন খোঁচাতে লাগল। মায়ের সংগে ঘরে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। কিন্তু পড়া হল না। অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ও বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে যেতে পারবে।

মা বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়েছেন। তারপরে শুয়ে পড়েছিলেন। গোগোল ভেবেছিল, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটুখানি সময় অপেক্ষা করে, ও বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। মাও সংগে সংগে পাশ ফিরে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। ভুরু কুঁচকে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এখন তিনটেও বাজে নি। এর মধ্যেই উঠে কোথায় যাচ্ছ?"

গোগোল খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। ও হঠাৎ তৈরী করে মা বাবাকে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তা নইলে হয় তো বলে দিত, ও বাথরুমে যাবে। কিন্তু ও মোটামুটি সত্যি কথাই বলল, "আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

মা বললেন, "আজই দেখছি, তুমি একটু বেশী ছটফট করছ। তার মানে, শরীরটা ভাল আছে। কিন্তু এখনো তোমার সাবধানে থাকার দরকার। আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো। সাড়ে তিনটে নাগাদ তোমার দুধ আর ওষুধ খাবার সময়। সে-সময় উঠে, ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখবে।"

গোগোল আর কী করবে? মায়ের কথার অবাধ্যতা করা চলবে না। বলল, "ঠিক আছে। আমি চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়ছি। আমার আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

মা বললেন, "বেশ, তাই পড়। কিন্তু এখন বাইরে যেও না।"

গোগোল বিছানা থেকে নেমে, ঘরের একপাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসল। টেবিলের ওপরেই ছিল গল্পের বই। যদিও ও গল্পের বই টেনে নিল, আর বইয়ের পাতাও ওল্টাল, পড়তে পারল না একটা লাইনও। ওর চোখের সামনে তখন ভাসছে, পশ্চিমের সেই পাঁচ নম্বর বাড়ি, বাগান, ছাদ, আর সেই দুই মহিলা ও ভদ্রলোকের মুখ। এতক্ষণে হয় তো অনেক কিছু ঘটে গেছে। গোগোল কিছুই জানতে পারছে না।

গোগোলের মনে হঠাৎ কৌতূহল জাগল, পাঁচ নম্বর বাড়িটা কোন্ রাস্তায়? রাস্তাটার নাম কী? রাস্তাটা একেবারে অচেনা নয় ওর কাছে। ওদের এই ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেলে, সামনে পড়বে সার্কুলার রোড। সার্কুলার রোড গেছে পশ্চিম দিকে। সেদিকে খানিকটা গেলেই, বাঁ দিকে বেঁকে গেছে পাঁচ নম্বর বাড়ির রাস্তা। হ্যাঁ, এখন ওর চোখের সামনে রাস্তাটা ভাসছে। জর্জ পারভেজ আর সুমিতের সংগে, একদিন ও এমনিই ওই রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। ওই রাস্তায় উঁচু বাড়ি একটাও নেই। একতলা, দোতলা বাড়িই বেশী। দু একটা তেতলা বাড়ি আছে। সব বাড়ির সামনে বা পেছনে আছে বাগান। রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি। দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকদের পাড়া। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির গেটেই দারোয়ান পাহারা দেয়। আরও একটা ব্যাপার হল, পাড়াটার অধিকাংশ বাসিন্দাই অবাঙালী।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, গোগোলের মনে পড়ে গেল, রাস্তাটার নাম ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিট। রাস্তাটায় ঢোকবার মুখেই, বাঁ দিকের একটা দেওয়ালে, এনামেল প্লেটে স্পষ্ট করেই ও নামটা লেখা আছে। কিন্তু এতটা মনে করেই বা কী লাভ? ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়িতে কারা থাকে, সেটা তো জানার কোন উপায় নেই। তবে মনে হয়, গোগোলদের টেলিফোনের সাতচল্লিশ এক্সচেঞ্জের এলাকার মধ্যেই ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিট পড়বে। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? সাতচল্লিশ, আর সাতচল্লিশের ক্রস বার আটচল্লিশ। সেটা জানলেও, পাঁচ নম্বর বাড়ির টেলিফোনের নাম্বার জানার উপায় কী? টেলিফোন গাইডে সাতচল্লিশ আর আটচল্লিশ এক্সচেঞ্জে হাজার হাজার নাম্বার আছে। গোটা গাইড খুঁজে, ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির মালিকের নাম বের করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

গোগোলের ওই পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যাপারে এতই কৌতূহল যে টেলিফোন নাম্বারটা জানলেই বা ওর কী লাভ হবে, সেটা একবারও ভেবে দেখছে না। ও কি ও বাড়িতে টেলিফোন করবে? কাকে? কেন? আর ও বাড়ির লোকেরা ওর সংগে কথা বলবেই বা কেন?

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, বঙ্কিমদা দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, "গোগোল, তোমার দুধ রেখেছি খাবার টেবিলে।"

গেগোল লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। তা হলে সাড়ে তিনটে বেজেছে! মা জেগেই ছিলেন। বললেন, "বঙ্কিম, আমাকে চা দিও। আমি খাবার টেবিলে যাচ্ছি।"

গোগোলকে বেরিয়ে যেতে দেখে মা বললেন, "দুধ খেয়ে, ওষুধও খেয়ে নিও।"

"আচ্ছা।" বলে গোগোল শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বঙ্কিমদা ওষুধের শিশি, চামচ, কাপ আর জলের গেলাস, পাত্র আগেই খাবার টেবিলে রেখে দিয়েছে। গোগোল খাবার ঘরে এসেই, দুধের গেলাস হাতে তুলে নিল। খুব গরম নয়। তবে এক চুমুকে ঢক ঢক করে খাবার উপায় নেই। যতটা সম্ভব, তাড়াতাড়ি ও দুধটা শেষ করল। তারপর পাঁচ মিনিট দেরি করে ওষুধটা খাবার কথা। কিন্তু গোগোলের আর তর সইছে

না। শিশির ঢাকনা খুলে, দু চামচ ওষুধ কাপে ঢালল। ঢক করে গিলে, গেলাসে জল ঢেলে দু চুমুক খেয়ে নিল। শিশির মুখ বন্ধ করে, আর কোন দিকে না তাকিয়ে আর একটা ঘরের মধ্য দিয়ে সোজা চলে গেল পশ্চিমের ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতে তখন রোদ। কিন্তু ব্যালকনিতে চেয়ার ছিল না। নিশ্চয় বঙ্কিমদা তুলে নিয়ে গেছে। কারণ, এ সময়ে গোগোল এখানে বসে না। বিকেলে ও দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে। তাই বঙ্কিমদা চেয়ারটা তুলে নিয়ে গেছে।

গোগোল ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, চেয়ারটা রাখা আছে খাটের একপাশে। হালকা বেতের চেয়ার। গোগোল ঘরে ঢুকে নিজেই চেয়ারটা তুলে নিয়ে এল। ওর পক্ষে এখন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ও চেয়ারটাকে একটু কোণ ঘেঁষে পেতে বসে, সবে মাত্র পশ্চিমের পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়েছে। অমনি মা সেখানে এসে হাজির। তিনি ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার গোগোল? এখন তুমি এই রোদে এখানে এসে বসেছ কেন?"

গোগোল মাকে দেখেই তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল। ও যে-দিকের কোণ ঘেঁষে চেয়ারটা রেখেছিল, সেখানে পুরোপুরি রোদ নেই। কিছুটা ছায়া আছে। ও বলল, "এই কোণে বসলে রোদ লাগবে না।"

মা একটু ঝেঁজে বললেন, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি তো বিকেলে কোনো দিন এখানে এসে বস না? দক্ষিণের বারান্দায় বসে তুমি বন্ধুদের খেলা দেখ। আজ হঠাৎ এখানে কেন?"

গোগোল বাধ্য হয়েই বলল, "আজ আমার এখানে বসতেই ভাল লাগছে।"

মা ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে গোগোলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে তিনিও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। চোখে পড়ার মত কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কিছু পুরনো একতলা দোতলা বাড়ি আর গাছপালা ছাড়া কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না। আবার তাকালেন গোগোলের দিকে। বললেন, "কী যে তোমার ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারি নে। ঠিক আছে, তোমার যখন ভাল লাগছে, তখন এখানেই বস।"

গোগোল চেয়ারে বসল। মা চলে গেলেন। কিন্তু মা যে একটা কিছু সন্দেহ করেছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। গোগোলই বা কী করবে? ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর

রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল।

বাড়ি ছাড়া ওর মাথায় এখন আর কিছু নেই। একবার যখন মনে নানা সন্দেহ আর প্রশ্ন জেগেছে, যতক্ষণ না তার একটা সুরাহা হচ্ছে, ও এখান থেকে কিছুতেই নড়তে পারছে না। অথচ পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হল, দরজা জানালা বন্ধ বাড়িটা একেবারে নিঝুম। দক্ষিণের বড় বড় গাছপালায় ভরা বাগানেও কেউ নেই।

ডোভস্ নেস্ট স্ট্রিটের গাছতলার ফাঁকে ফাঁকে, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝেই গাড়ি যাতায়াত করছে। কোনো কোনো বাড়ির লনে ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। আয়ারা পারামবুলেটারে শিশুদের নিয়ে ঘুরছে। পাঁচ নম্বর বাড়ির গেটের একটা পিলারই শুধু দেখা যায়। যেখানে পাঁচ নম্বরটা লেখা আছে। সামনের চত্বরের সবটা দেখা যায় না। একেবারে পশ্চিমের শেষে কিছুটা চত্বর আর পাশাপাশি কয়েকটা গ্যারেজ। সব ক'টা গ্যারেজই খালি। দেখে মনে হয়, বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেছে।

গোগোল যখন এই রকম দেখছে আর ভাবছে, তখনই পর পর দুটো, শাদা আর নীল রঙের এ্যামব্যাসাডার গাড়ি ঢুকল। গ্যারেজের সামনে দাঁড়াল। দুটো গাড়ি থেকেই কিছু মহিলা পুরুষ নামলেন। গোগোল যাঁদের দেখেছে, তাঁরা কেউ দলের মধ্যে ছিলেন না। নতুন মহিলা পুরুষের দল সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর দক্ষিণ দিকে ফিরে, চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

বেশ খানিকক্ষণ সময় চলে গেল। কারোকেই কোথাও দেখা গেল না। যাঁরা এলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? গোগোলের মনে হল, পাঁচ নম্বর সীমানার মধ্যে, দুটো তিনটে আলাদা বাড়ি আছে। একটা বাড়ি, আর একটা পরিবার থাকলে কি চারটে গ্যারেজ থাকে?

গোগোল যখন এরকম ভাবছে, তখনই দোতলার দক্ষিণের দরজা দিয়ে, লম্বা সুন্দর বারান্দায় দুজন বেরিয়ে এলেন। দুজনেই অল্পবয়সী মহিলা। একজন সালোয়ার কামিজ পরেছেন। ছিপছিপে ফর্সা আর দেখতে বেশ সুন্দর। তাঁর মাথার কোঁকড়ানো চুল ইন্দিরা গান্ধীর মত ছোট করে কাটা। পায়ে হাই হিলের জুতো। বাঁ হাতে একটি ছোট ব্যাগ। একটু আগে যে গাড়ি দুটো এল, সেই গাড়ি থেকে এ মহিলা নামেন নি।

আর এক মহিলাকে দেখে গোগোল অবাক হয়ে গেল। ইনিই সেই মহিলা, বেলা এগারটা নাগাদ যাঁকে দেখা গেছল দোতলার পুবের ব্যালকনিতে দাঁড়াতে আর ভদ্রলোকের হাতে মার খেতে। ইনিই দুপুরে ছাদে এসেছিলেন, বয়স্কা মহিলা যাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছলেন। কিন্তু তখন মহিলাকে যে-রকম পোশাকে আর চেহারায় দেখা গেছল, এখন একেবারে অন্যরকম। এখন তিনি লাল টকটকে সিলকের শাড়ি পরেছেন। ঘাড় অবধি চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। গোগোল ব্যালকনি থেকে দেখে বুঝতে পারছে, উনি মুখে কিছু মেখেছেন। সরু ভুরু দুটো আর চোখ কালো দেখাচ্ছে। কপালে লাল টিপ। তাঁর পায়েও হাই হিল জুতো। তিনি সালোয়ার কামিজ পরা মহিলার সঙ্গে হাসতে হাসতে বারান্দায় এলেন। তাঁকে এখন খুবই খুশি দেখাচ্ছে। ইনিই যে ওবেলার সেই মহিলা, তা একটুও বোঝা যাচ্ছে না। দুজনকে দেখেই গোগোলের মনে হল, পত্রিকার রঙীন ছবির বিজ্ঞাপনের মত সুন্দর আর ঝকঝকে।

দুজনেই হেসে কথা বলতে বলতে, কাঠের আর কাঁচের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দার মাঝখানে চওড়া চৌকো জায়গায়, যেখানে বসবার জন্য চেয়ার আর নীচু কাচের

টেবিল পাতা আছে, তাঁরা দুজনে সেখান দিয়ে গিয়ে, দক্ষিণে রেলিং ধরে ঝুঁকে হেসে হেসে কথা বলতে লাগলেন।

দু তিন মিনিট পরেই সেই ভদ্রলোকও বারান্দায় এলেন। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। দুজনেরই গায়ে এখন দামী প্যান্ট শার্ট। তাঁরা দুজনেও হেসে কথা বলতে বলতে বারান্দায় এলেন। মহিলারা দুজন তাঁদের দিকে তাকালেন। কী কথা হচ্ছিল, শোনা না গেলেও, সালোয়ার কামিজ পরা মহিলার খিলখিল হাসির শব্দ গোগোল, খুব আস্তে হলেও স্পষ্ট শুনতে পেল। ওবেলার সেই ভদ্রলোক হাতের ভঙ্গি করে সবাইকে বসতে বললেন। আর ওবেলার মহিলা সালোয়ার কামিজ পরা মহিলার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

সকলে বসবার আগেই, পরিষ্কার শাড়ি পরা, ওবেলা দেখা বাগানের সেই কাজের স্ত্রীলোকটি একটি ট্রলি চালিয়ে নিয়ে ঢুকল। ট্রলির ওপরে, বড় পাটাতনে আর নীচের পাটাতনে অনেক কাঁটা ট্রে ছিল। ট্রে-তে সাজানো ছিল নানা রকম খাবারের প্লেট। জলের জাগ, কাঁচের ঝকঝকে গেলাস, চায়ের কাপ ডিস টি-পট। সবই সে বড় কাঁচের টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল। রেখে ট্রলিটা বারান্দার একপাশে রেখে চলে গেল।

ভদ্রলোক আর মহিলারা সবাই বসে কথা বলতে বলতে একটু খাবার খেতে লাগলেন। গোগোল লক্ষ্য করে দেখল, সকালবেলার সেই মহিলা কিছুই খাচ্ছেন না। তবে হাসছেন আর কথা বলছেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে এলেন সেই বয়স্কা মহিলা, যাঁকে দুপুরে ছাদে দেখা গেছল। তিনি আসতে পুরুষ দুজন দাঁড়ালেন। বয়স্কা মহিলা হাত তুলে তাঁদের বসবার ইঙ্গিত করে নিজে বসলেন।

সকালের সেই ভদ্রলোক, সকালের সেই মহিলার পাশেই বসেছিলেন। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে, হেসে এমন ভাবে কথা বলছিলেন, এখন দেখে বোঝাই যায় না, ভদ্রলোক মহিলাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে মেরেছিলেন। গোগোল ওই দুজনকেই বিশেষ ভাবে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল। তখনও বারান্দায় খাওয়া আর গল্পগুজব হাসি চলছে। নতুন কিছুই ঘটছে না। গোগোলেরও ভাল লাগছিল না। ওর ঘরে ঢোকবার সময় হয়ে এল। পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। গোগোল ভাবল, এতক্ষণে ওর বন্ধুদের খেলাও শেষ হয়ে এল। তবু ও দক্ষিণের ব্যালকনিতে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য! পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দার সব মহিলা পুরুষরা উঠে দাঁড়ালেন। কথা বলতে বলতে সবাই ঘরে ঢুকে গেলেন। সেই কাজের স্ত্রীলোকটি এসে, ট্রলি এগিয়ে নিয়ে এল টেবিলের কাছে। সব তুলে নিয়ে সে ট্রলি ঠেলে অন্য একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

গোগোল কী করবে, ভাবছে। ওর ধারণা, ওবেলা ভদ্রলোক অল্পবয়স্কা মহিলাকে মারলেও, এবেলা নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে গেছে। তা নইলে দুজনকে পাশাপাশি বসে ওরকম হেসে কথা বলতে দেখা যেত না। গোগোল ঘরের মধ্যে ঢুকবে বলে, মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওর নজর পড়ল নীচের চত্বরে। দেখা গেল, নতুন যে ভদ্রলোক বারান্দায় এসেছিলেন, তিনি একটি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সেই সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা আর বয়স্কা মহিলা এসে সেই গাড়িতে উঠলেন। ওঠবার আগে তাঁরা ওপরের দিকে তাকালেন। হাত তুলে বিদায় জানালেন। যাঁদের বিদায় জানাচ্ছেন, তাঁদের গোগোল দেখতে পাচ্ছে না। তবে তাঁরা যে ওবেলার সেই ভদ্রলোক আর মহিলা, সে-বিষয়ে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। ওদিকে হয় তো দোতলায় ব্যালকনি আছে। অথবা জানালা আছে। নীচের মহিলারা গাড়িতে উঠতেই, গাড়ি গেটের দিকে এগিয়ে এল।

গোগোল দেখল, সন্ধ্যা নামছে। আর ওর বাইরে থাকার উপায় নেই। নতুন আর কিছু ঘটবে না বলেই ওর মনে হল। কথাটা মনে হওয়া মাত্রই, ওর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। চমকে অবাক হয়ে দেখল, ওবেলার সেই মহিলা, যিনি লাল টকটকে সিলকের শাড়ি পরেছিলেন, তিনি ছুটে বারান্দায় এলেন। তাঁর শাড়ির আঁচল বারান্দার মেঝেতে লুটোচ্ছে। এখন আর তাঁর মুখে সেই হাসি নেই। তিনি যেন ভয়ে আর আতঙ্কে বারান্দায় ছুটে এলেন। এসেই তিনি রেলিংয়ের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু তিনি রেলিংয়ের কাছে পৌঁছুবার আগেই, সকালবেলার সেই একই ভদ্রলোক ছুটে এসে মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গোগোলের মনে হল, ভদ্রলোক যেন একটা সিংহ। আর মহিলা যেন একটা সুন্দর হরিণ। ওর বুকের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগল। ও দেখল, ভদ্রলোক মহিলাকে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু মহিলা কিছুতেই যেতে চাইছেন না। মহিলাকে খানিকটা টেনে নিয়ে এসে, ভদ্রলোক তাঁর মুখের ওপর প্রচন্ড জোরে হাত দিয়ে আঘাত করলেন। মহিলা এত জোরে আর্তনাদ করে উঠলেন, গোগোল তা স্পষ্টই শুনতে পেল। ভদ্রলোক তখন মহিলার শাড়ির আঁচল দিয়েই তাঁর মুখটা জড়িয়ে দিলেন, যাতে চিৎকার করলেও না শোনা যায়। তারপর ও বেলার মতই চুলের মুঠি ধরে পেটে আর কোমরের কাছে, তাঁর শক্ত হাত দিয়ে মারতে মারতে, টেনে নিয়ে চললেন ঘরের দিকে।

গোগোলের প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হল ভদ্রলোক বুঝি মহিলাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবেন। উনি কেন যে মহিলাকে পেটে আর কোমরের দিকে মারছেন, ও তা বুঝতে পারল না। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আচমকা, আর উলটো পালটা ঘটে চলেছে, ঘটনার কিছুই ও বুঝতে পারছে না। যারা একটু আগেও পাশাপাশি বসে হাসছিলেন, তাঁদের

এবার গোগোলই আমাদের সব কথা বলবে

যে এমন সম্পর্ক হতে পারে, এটা বিশ্বাস করাই কঠিন। নেহাৎ বারান্দার আলো জ্বলছিল বলেই, গোগোল সব ঘটনাটা দেখতে পেল। ভদ্রলোক একটা পিশাচের মত মহিলাকে ওই ভাবে মারতে মারতে ঘরে ঢুকে গেলেন। আর বারান্দার আলো টুক করে নিভে গেল।

গোগোলের বুকে ঢিপ ঢিপ শব্দটা তখন যেন ঢাকের মত বাজছে। আর ভয়ে উত্তেজনায় ও নিজেরই আঙুল কামড়ে ধরেছে।

"কী ব্যাপার গোগোল।" দরজার কাছ থেকে বাবার গলা শোনা গেল।

গোগোল চমকে পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, বাবার পেছনে মাও এসে দাঁড়িয়েছে। গোগোলের মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না।

বাবার আর মায়ের, দুজনের মুখই গম্ভীর। আর দুজনেই যে বেশ অবাক হয়েছেন, মুখ দেখে তাও বোঝা যাচ্ছে। বাবা আবার বললেন, "তুমি কি ব্যালকনিতে বসে রাত্রিটাও কাটিয়ে দিতে চাও নাকি? আমি বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম, তুমি এখনো এদিকের ব্যালকনিতে বসে আছ। ওদিকের ব্যালকনিতে নাকি একবারও যাও নি।"

গোগোল কী বলবে ভেবে পেল না। মা বললেন, "তাও সেই সাড়ে তিনটেয় কোন রকমে দুধ আর ওষুধ খেয়ে এসেই বসেছে। তারপর থেকে আর ওঠার নাম নেই। দুপুরে আমি ডেকে নিয়ে না গেলে, ঘরেও যেত না।"

গোগোলের মুখ থেকে তখনও কোন কথা বেরোল না। বাবা মায়ের কথা ওর কানে ঢুকছে। সে কথার জবাব দেওয়া দরকার। অথচ এখনও পাঁচ নম্বর বাড়ির ঘটনা ওর মাথায় ভোঁ ভোঁ করে পাক খাচ্ছে।

বাবা এবার ধমক দিয়ে উঠলেন, "কী হল, কোন জবাব দিচ্ছ না কেন? একেবারে বোবা হয়ে গেলে দেখছি? পশ্চিমের এ ব্যালকনিটা হঠাৎ তোমাকে আজ এরকম পেয়ে বসেছে কেন? তোমার মা আর বঙ্কিমদা এসে দেখে গেছে, তুমি কিছু টের পাও নি। তুমি ওদিকে তাকিয়ে বসেই রয়েছ।"

আশ্চর্য! মা আর বঙ্কিমদার চোখে কিছুই পড়ে নি? কী করেই বা পড়বে? পশ্চিম দিকে তো কেবল ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়িটাই নেই, আরও অনেক বাড়ি আছে। সে সব বাড়ির ভেতরের লন, একতলা, দোতলার খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। কেবল ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটটাই এখান থেকে দেখা যায় না। আর পশ্চিমে, গলি রাস্তাও চোখে পড়ে। সেদিকেও বেশ কিছু বাড়ি। গলিতেও গাড়ি যাতায়াত করতে দেখা যায়। এত সবের মধ্যে, শুধু একটি বাড়ির দিকে হঠাৎ কারোর নজর আটকে যাবার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে সে-বাড়ির পুবের দরজা জানালা যদি সব সময় বন্ধ থাকে। বারান্দায় একটাও লোক না দেখা যায়।

গোগোলকে বাবার ধমক খেয়ে এবার মুখ খুলতেই হল। কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলতে পারল না। বলল, "এদিকটায় অনেক কিছু দেখা যায়। অনেক রকম মানুষ, অনেক ছেলে মেয়ে, অনেক মজার মজার ঘটনা। দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসলে তো শুধু আমাদের বন্ধুদের আর ফ্ল্যাটের লোকদেরই দেখা যায়। আর রাস্তাটা। ওদিকটা পুরনো হয়ে গেছে।"

বাবা পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকালেন। মা হেসে ফেললেন। বললেন, "আমি ওর কথার ছাতা মাথা কিছুই বুঝিনে। ওদিকটা পুরনো হয়ে গেছে, এদিকটা নতুন লাগছে। তাই ও সারাদিন এদিকে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কী বলবে তুমি ওকে?"

বাবা কিন্তু হাসলেন না। তিনি গোগোলের মুখের দিকে

একবার দেখে বললেন, "তা তোমার কি এখনো এই অন্ধকারে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে? না ঘরের ভেতর যাবে?"

গোগোল বুঝল, আসলে বাবা ওকে ঘরের ভেতরে যেতেই বলছেন। ও বাবার মার পাশ দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। সেই ঘরের বাইরে গিয়ে, খাবার আর বসবার ঘর পেরিয়ে, অন্য শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে একেবারে চলে গেল দক্ষিণের ব্যালকনিতে। সেখানে একবার নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল, তখনও তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে সাইকেল চেপে চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে আবার ঘরে ফিরে এল। অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকেই গোগোল দরজা দিয়ে দেখল, বাবা মা পশ্চিমের সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, আর নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছেন।

গোগোল ঘরের আলো জ্বেলে, বাথরুমে ঢুকল। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে, বেরিয়ে এল। চেয়ারে গিয়ে বসে, টেবিলের ওপরে সাজানো, ওর বাংলা পাঠ্যবইটা টেনে নিল। মা যে উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, তা ও দেখতে পেল না। ওর চোখে ভাসছে, সেই পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দার পৈশাচিক ঘটনা। পৈশাচিক ঘটনা ছাড়া, ওটাকে আর কী বলা যায়? টাক মাথা ফরসা স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোককে আর ভদ্রলোক ভাবাই যাচ্ছে না। লোকটাকে পিশাচের মতই ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। একজন মহিলাকে কেউ ওভাবে মারতে পারে? ওর সন্দেহ হচ্ছে, ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে যদি ওভাবে মারতেই থাকে, মহিলা এতক্ষণে বোধহয় মরেই গেছেন।

গোগোলের মাথায় মহিলার মরার চিন্তাটা আসতেই, ও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। খবরটা এখনই পুলিশকে দেওয়া উচিত। পুলিশ এসে পড়লে, হয় তো মহিলা বেঁচে যাবেন। পুলিশকে খবর দিতে হলে, টেলিফোনেই দিতে হবে। ঠিক যেমন খবরের কাগজে লেখে, "কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ থানায় টেলিফোন করবে?

গোগোল একটু চিন্তা করেই, ধরে নিল, ওদের এলাকার থানায় টেলিফোন করে, ডোভেস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির নাম করলেই হবে। টেলিফোন গাইড দেখে, থানার নাম্বারটা বের করতে হবে। কিন্তু তিনটে ঘরের মধ্যে, যেটা বাবার ঘর, টেলিফোনটা আছে সেই ঘরে। বাবা ওই ঘরে বসে পড়াশোনা করেন। বইয়ের আলমারি আছে ও-ঘরে। তা ছাড়া, অনেক সময় অফিসের কাজও করেন। ছোট একটা ডিভান আর তাকিয়া আছে। কোন কোন দিন ওখানেই শুয়ে পড়েন। নইলে অন্য ঘরে যান। গোগোল আজকাল প্রায় একলাই এ ঘরে শোয়। আবার মাও এসে শোন। এখন রোজ মা এ ঘরে ওর কাছে রাত্রে ঘুমোন।

গোগোল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে গেল দরজার কাছে। বাবার স্নান হয়ে গিয়েছে। তিনি পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে খাবার টেবিলে বসেছেন। পাশের চেয়ারে বসে আছেন মা। বাবা এখন সামান্য একটু কিছু খাবার খেয়ে এক কাপ চা খাবেন। তারপরে কী করবেন, ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। হয় তো মায়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতে করতে টি.ভি. দেখবেন। টি.ভি. দেখা ছেড়ে, বাইরেও বেরিয়ে যেতে পারেন। নয় তো ঘরে কাজ নিয়েও বসতে পারেন।

বাবা মা দুজনে টেলিভিশন দেখলে, টেলিফোন করার কোন অসুবিধে হবে না। বাবা বেরিয়ে গেলেও, টেলিফোন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ মা তখন টেলিভিশন দেখবেন। গোগোলও টেলিভিশন দেখে। তবে বেশির ভাগ টি.ভি. প্রোগ্রামই দেখতে ওর ভাল লাগে না। খেলা দেখতে পেলে ছাড়ে না। তা সে যে-কোন খেলাই হোক। স্পাইডারম্যান বা দু একটা ইংরেজি সিরিয়াল খারাপ লাগে না। বাংলা প্রোগ্রাম সব থেকে খারাপ লাগে। একমাত্র কুইজ কনটেস্ট ছাড়া। হিন্দিরও তাই।

গোগোল বুঝতে পারছে না, বাবা কী করবেন। যদি টেলিভিশনটা চালান, তাহলে ও টেলিফোন করতে পারে। বাবা মা ওর টেলিফোনের কথাবার্তা শুনতে পারেন না। কিন্তু বাবা মাকে কথা বলতে দেখে মনে হচ্ছে, এখন টেলিভিশন দেখবেন না। বঙ্কিমদা বাবার চা আর খাবার ট্রেতে করে নিয়ে এল। ওদিকে পাঁচ নম্বর বাড়িতে কী ঘটে যাচ্ছে, কিছুই অনুমানও করা যাচ্ছে না।

গোগোল ফিরে গেল টেবিলের কাছে। কিন্তু বসতে পারল না। একবার ভাবল, বাবা মাকে ঘটনাটা বলে দেওয়াই ভাল। তা হলে বাবাই থানায় টেলিফোন করে পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারেন। ঠিক এ সময়েই ডিংডং শব্দে কলিং বেলটা বেজে উঠল।

গোগোল চেয়ারে বসে, পড়ার বইটা সামনে টেনে নিল। ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হোল। মিনিট খানেক পরেই, বাবার গলা শোনা গেল, "ঘোষ এসে গেছ? চল, আমার ঘরে গিয়ে বসি। ফাইল টাইল গুলো সব ও-ঘরেই আছে।"

ঘোষ মানে, বাবার অফিসের একজন সহকর্মী, নাম দীনেশ ঘোষ। বাবা তাঁকে ঘোষ বলেই ডাকেন। গোগোল তাঁকে ঘোষ কাকা বলে ডাকে। ঘোষ কাকার গলা শোনা গেল, "যেখানে বলবেন, আমি সেখানেই বসতে পারি।"

বাবার গলা শোনা গেল, "ঘরেই চল। সুনীতি এখানে বসে টি.ভি. দেখুক।"

ঘোষ কাকার গলা শোনা গেল, "এই যে বউদি, নমস্কার। ভাল আছেন তো? গোগোলের শরীর খারাপ হয়েছিল। ও

কেমন আছে ?"

গোগোলের আর কোন কথাই কানে যাচ্ছিল না। কারণ ওর সমস্ত প্ল্যানটাই ঘোষ কাকা ভেস্তে দিলেন। তাঁর আসা মানে বাবা এখন কাজের ঘরে গিয়ে বসবেন। মা হয় তো টি.ভি. দেখবেন, আর ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে বঙ্কিমদার সঙ্গে একটু কাজ করে আসবেন। গোগোলেরই বা কতোটুকু সময় আর হাতে আছে ? একটু বাদেই মা ওকে খেতে ডাকবেন। খাবার পনের মিনিট পরে ওষুধ দেবেন। তারপর সাড়ে আটটার মধ্যেই বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবেন।

গোগোল হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে রইল। ঘোষ কাকার সামনে গিয়ে বাবাকে ঘটনাটা ও বলতে পারবে না।

পরের দিন সকালে গোগোলের ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ওর শরীরটা যে এখনও বেশ দুর্বল, তা বোঝা যায়। তা ছাড়া, গতকাল রাত্রে ও অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে নি। খুবই ছটফট করেছে। তারপরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মা কখন এসে শুয়েছিলেন, কিছুই জানতে পারে নি। ও বিছানা ছেড়ে উঠেই আগে বাথরুমে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে, ব্রাশে পেস্ট নিয়ে দাঁত মাজল ঘস্ ঘস্ করে। তারপরে মুখ ধুয়ে সোজা একেবারে খাবার টেবিলে। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

গোগোল জানে, বাবা এখন বাথরুমে দাড়ি কামাচ্ছেন। মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। এসে গোগোলের গালে গলায় একবার হাত দিয়ে দেখলেন। নিজেই বঙ্কিমদাকে ডেকে, ওর খাবার দিতে বললেন। তার আগেই মা একটা ট্যাবলেট এনে, খালি পেটে খেয়ে নিতে বললেন। গোগোল নিজেই ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, "ও কি করছ ? তোমার ফ্রিজের জল খাওয়া একদম বারণ, জান না ? আমি জল দিচ্ছি।"

গোগোলের কি ওসব মাথায় আছে ? এখন ওর মন প্রাণ পড়ে আছে পশ্চিমের ব্যালকনিতে। মা জলের জাগ আর গেলাস নিয়ে এলেন। জাগ থেকে জল ঢেলে দিলেন গেলাসে। গোগোল ট্যাবলেট মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেলল। টেবিলের ওপরে কাছেই ছিল, ইংরেজি আর বাংলা খবরের কাগজ। ও ইংরেজি কাগজটা টেনে নিল। খেলার খবরের পাতায় যাবার আগেই, ওর চোখ আটকে গেল একটি ছোট সংবাদের হেডিংয়ের ওপর "ডেড উওম্যান"। ও ঝুঁকে পড়ে সংবাদটা পড়ল। ঘরের মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে গতকাল সিলিংফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। ঠিকানাটা গ্রে স্ট্রিট দেখে ও নিশ্চিন্ত হল।

বঙ্কিমদা গোগোলের খাবার নিয়ে এল। মুসাম্বি লেবুর রস। কাটা আপেল। মাখন ছাড়া টোস্ট, হাফ বয়েল ডিম আর দুধ। ও খেতে আরম্ভ করল। মা নিয়ে এলেন ওষুধ। ভিটামিন বি-এর ক্যাপসুল ছাড়াও দুটো ট্যাবলেট আর একটি শিশি, চামচ, কাপ।

গোগোলের তাড়াতাড়ি খাওয়া দেখে মা বললেন, "ওরকম গোগ্রাসে খাচ্ছ কেন ? যাবে তো পশ্চিমের ব্যালকনিতে। তার জন্যে এত তাড়া কিসের ? ব্যালকনিটা তো আর পালিয়ে যাবে না।"

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসল। কিন্তু মাকে আসল কথা বলার উপায় নেই। কে জানে, গতকাল রাত্রেই কিছু ঘটে গেছে কি না। ওর খাবার আর ওষুধ খাওয়ার শেষে উঠে দাঁড়াল। এ সময়েই বাবা এলেন খাবার ঘরে। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "পশ্চিম পাড়া আবিষ্কার করতে চললে ?"

গোগোল হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, খাবার ঘর থেকে অন্য ঘরে ঢুকে গেল। পশ্চিমের ব্যালকনির দরজা খোলাই ছিল। এ ঘরের দক্ষিণ দিকে দুটো বড় জানালা আছে। গোগোল ব্যালকনিতে পা দিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক কান্ড ! যে-মহিলা গতকাল সন্ধ্যায় ওই রকম মার খেয়েছেন, এখন তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন পুবের ব্যালকনিতে ? অবশ্য এখন আর তাঁর লাল সিল্কের শাড়ি পরা নেই। সেরকম সাজগোজ নেই। মাথার চুল উসকো খুসকো। ভুরু আঁকেন নি। কাজল দেন নি চোখে। সামান্য একটা নীল পাড় শাদা শাড়ি পরে আছেন। ব্যালকনিতে দু হাত রেখে, মুখ নামিয়ে নীচের দিকে দেখছেন। ব্যালকনির পেছনে দরজা খোলা।

গোগোল গতকাল সকালের দিকেই মহিলাকে দেখেছিল ওই ব্যালকনিতে। তিনি দরজা খুলে, ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একটু পরেই সেই পিশাচের মত লোকটা ওঁকে চুলের মুঠি ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে গালে জোরে জোরে থাপ্পড় মেরেছিল। আজও আবার মহিলা পুবের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছেন ? ভদ্রলোকের মত দেখতে, সেই লোকটা এসে, গতকালের মত আবার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারবে না তো ?

ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। আরও অনেক বাড়ির লন দেখা যাচ্ছে। লোকজনের চলা ফেরা, বাগানে মালীদের কাজ করা, সবই চলছে। গোগোলের সে সব দিকে মোটেই নজর নেই। ওর মনে উত্তেজনা আর ভয়, কখন খোলা দরজা দিয়ে সেই লোকটা এসে মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। মহিলা যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। একবার গোগোলদের বিল্ডিংয়ের দিকেও চোখ তুলে দেখলেন।

আবার কখনও ডাইনে বা বাঁয়ে। তাঁর ফরসা মুখ যেন শুকনো দেখাচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন হেসে হাত নাড়লেন। এ সময়েই দরজায় দেখা গেল কালো মত একটি মেয়েকে। লাল রঙের শাড়ি পরা থাকলেও তার বয়স বেশ কম। সে কিছু বলল। মহিলা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন। তিনিও কিছু বললেন। মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কিছু বলল। মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গোগোল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ও যা ভয় পেয়েছিল, তা ঘটে নি। এবার লক্ষ্য করে দেখল, এক পাশে চেয়ার রয়েছে। নিশ্চয়ই বঙ্কিমদা চেয়ারটা রেখে গেছে। ও বসল। খবরের কাগজ বা গল্পের বই কিছুই নেই। গোগোল তা আনতে গেল না। এখন ওর কিছুই পড়তে ইচ্ছে করছে না। ও এই প্রথম আবিষ্কার করল, ওদের বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে অনেক বাগান, গাছপালায় চারদিক সবুজ, আর নানারকম পাখির জটলা। আর সব কিছুই ও উঁচু থেকে দেখছে।

এক সময়ে বঙ্কিমদা এসে বলল, "গোগোল, মা ডাকছেন, আজ তুমি চান করবে। জল গরম করা হয়ে গেছে।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন ক'টা বেজেছে?"

"সাড়ে এগারটা বেজে গেছে।" বঙ্কিমদা বলল, "আর দেরী করো না। তাড়াতাড়ি চলে এস।"

বঙ্কিমদা চলে গেল। গোগোল পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে দেখল। চুপচাপ, নিঝুম বাড়ি। কেবল কয়েকবার কয়েকটি গাড়ি, বাড়ির ভেতরের চত্বরে যেতে আসতে দেখা গেছে। ওকে চেয়ার ছেড়ে উঠে, ঘরের ভেতর যেতেই হল। তবে ও বেশ স্বস্তি বোধ করছে। গতকাল সন্ধ্যায় লোকটা যে-ভাবে মহিলাকে মারছিল, তারপরেও তাঁকে আজ দোতলার পুবের ব্যালকনিতে দেখা গেছে। ও ভয় পেয়েছিল, হয় তো মরেই যাবেন। তা যান নি। আজ এতখানি বেলা পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটতে দেখা গেল না। অবশ্য ভেতরে কিছু ঘটে থাকলে, গোগোলের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই মনে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই গেল।

বিকেল প্রায় পৌনে চারটের সময় গোগোল দুধ মিষ্টি আর ওষুধ খেয়ে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে এল। আসবার আগে মা আজও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আজও তুমি এ বেলা ওদিককার ব্যালকনিতে যাচ্ছ? বন্ধুদের খেলা দেখবে না?"

গোগোল মাকে বলে এসেছে, "আমার ওদিককার বারান্দায় বসতেই ভাল লাগে।"

মা আর কিছু বললেন নি। গোগোল পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে

গুণের জন্যে আজ সবার প্রিয়

পিবিএম

আর্ণিকা হেয়ার অয়েল

বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথ

মিহিজামের ডাঃ পি. ব্যানার্জীর

আবিষ্কৃত ফর্মূলায় প্রস্তুত

পি. ব্যানার্জী মিহিজাম

১০৯ ডি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

ফোন নং ৪৬-৩০৫২

দেখল। কারোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পুবের দুটি ব্যালকনির দুই দরজা আর দুই জানালাই বন্ধ। দক্ষিণের মস্ত বারান্দাও ফাঁকা। সেই মহিলাকে একবার দেখতে পেলেই, গোগোল নিশ্চিন্ত। মহিলা তো ওর পিসতুতো বা খুড়তুতো দিদিদের থেকে বেশী বড় নন। লোকটার ওইরকম সাংঘাতিক মার দেখেই, ওর মনটা সব সময় একটা দুশ্চিন্তা ছেয়ে থাকে।

প্রায় আধঘন্টা কেটে গেল। গোগোলের চোখ পড়ল পাঁচ নম্বর বাড়ির বাগানে। দেখল, গতকালের দেখা সেই কাজের স্ত্রীলোকটি। তার সংগে সেই প্যান্ট আর সাধারণ একটা জামা পরা লোকটিও। দুজনেই বাগানে গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে কী সব কথা বলছে। স্ত্রীলোকটিই বেশী কথা বলছে, আর হাত দিয়ে দোতলার দিকে দেখাচ্ছে। তাদের দুজনের হাব ভাব দেখলেই মনে হয়, যেন কিছু একটা গোপন রহস্যময় ঘটনা নিয়ে কথা বলছে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুজনেই বাগান থেকে বাড়ির দিকে চলে গেল।

গোগোল অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মাথায় কিছুই এল না। আরও প্রায় আধঘন্টা পরে গোগোলের দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণের বড় বারান্দার দিকে। ওদিকে তাকিয়েই, ও সজাগ হয়ে উঠল। দেখল সেই পিশাচ লোকটা, আর তার সংগে গতকালের সেই সালোয়ার কামিজ পরা, ছোট করে কোঁকড়ানো চুল ছাঁটা মহিলা। তবে আজ মহিলা সালোয়ার কামিজ পরেন নি। ঘন নীল রঙের শাড়ি পরেছেন। দু জনের মধ্যেই কিছু কথা হচ্ছে। এ দুজনের ভাবভংগিও কেমন যেন রহস্যময়। গোগোল দূরে থাকলেও, বুঝতে পারছে, দুজনের মধ্যেই চুপি চুপি কথা হচ্ছে। লোকটি মহিলাকে ঘরে ঢোকবার দরজার দিকে দেখিয়ে কিছু বলল। মহিলা ঘাড় কাত করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বুঝেছেন। লোকটা বাঁ হাত তুলে তার ঘড়ি দেখিয়ে কিছু বলল। মহিলাও তাঁর বাঁ হাত তুলে নিজের ঘড়ি দেখে, যেন কিছু জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে লোকটা কিছু বলল। আবার দরজার দিকে দেখিয়ে, হাত তুলে দরজা ধাক্কা দেবার ভংগি করে দেখাল। মহিলা ঘাড় কাত করে আগের মতই জানিয়ে দিলেন, লোকটার কথা তিনি বুঝেছেন। লোকটি আরও কয়েকটি কথা বলে, বারে বারে আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিয়ে, ঘরের ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

গোগোল কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। মহিলা একলা বারান্দায় রইলেন। আর লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল? কেন? তারপরেই ওর চোখে পড়ল, মহিলা চেয়ারে বসলেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপরে একটা রঙীন পত্রিকা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পড়তে পারলেন না। টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি যেন কেমন ছটফট করছেন। পায়চারি করছেন, আর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন।

গোগোল আবার চমকে দোতলার পুবের ব্যালকনির দিকে তাকাল। দেখল, একটা ব্যালকনির দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কিন্তু কে খুলল, তা দেখা গেল না। যেন বাতাসে খুলে গেল। অথচ বাইরে তেমন বাতাসও নেই। দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। নিশ্চয়ই কেউ এমন ভাবে খুলে দিয়েছে যাতে তাকে দেখা না যায়। গোগোল আরও লক্ষ্য করল, ঘরের ভেতরটা অন্ধকার মত। খোলা দরজার সামনে অল্প একটুখানি মোজাইকের মেঝে দেখা যাচ্ছে। ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দক্ষিণের বারান্দায় মহিলা ঘন ঘন তাঁর হাতের ঘড়ি দেখছেন। গোগোল আর স্থির থাকতে পারল না। ওর মনে হল, নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল। জানে, মা এখন দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে আছেন। বংকিমদা হয় তো রান্নাঘরে। নয় তো বাইরে গেছে। ও বাবার ঘরে ঢুকে, আগেই টেলিফোন গাইডটা টেবিলে রেখে পাতা ওলটাল। তারপর একটা পাতায় নজর করে, দু সেকেন্ড দেখল। সরে গিয়ে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। ডায়াল করার সময় ওর হাত কাঁপছিল। দু তিন সেকেন্ড পরেই টেলিফোনের ওপার থেকে গম্ভীর গলা ভেসে এল, "হ্যালো?"

গোগোলের গলার স্বরও যেন কেঁপে উঠল, বলল, "হ্যালো, এটা কি পার্ক স্ট্রিট থানা?"

জবাব এল, "হ্যাঁ।"

গোগোল বলল, "শুনুন, ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলায় ভয়ংকর কিছু ঘটছে। আপনারা শীগ্গির চলে আসুন। মনে হয় একজন মহিলা খুব বিপদে পড়বেন।"

টেলিফোনের ওপার থেকে সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল, "গলা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার নাম কী?"

"আমার নাম গোগোল।" বলেই গোগোল জিভ কেটে, আবার বলল, "না না আমার নাম গোগোল নয়। আমার নাম...হ্যালো হ্যালো...।"

টেলিফোনের ওপার থেকে তখন লাইন কেটে দিয়েছে। গোগোল রিসিভার নামিয়ে রেখে, ছুটে গেল পশ্চিমের বারান্দায়। অবস্থা তখনও একরকমই। দক্ষিণের বারান্দায় মহিলা ছটফট করে পায়চারি করছেন, আর ঘড়ি দেখছেন। পুবের ব্যালকনির দরজা তেমনি খোলা। ভেতরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রান্নার জগতে অনবদ্য জুটি !

সানরাইজ

গুঁড়ো মশলা ও সরষের তেল

TCP/SUN 933/85

পুরোপুরি খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত সানরাইজ গুঁড়ো মশলা ও সানরাইজ সরষের তেল। বাছাই করা উপাদান থেকে তৈরী। রান্না সত্যিই মুখরোচক — স্বাদে, গন্ধে, রঙে অতুলনীয়।

নিজে খান, সকলকে খাওয়ান
— আপনার বহুদিনের সাথী সানরাইজ

PURE POWDER SPICES

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সময় যেন আর কাটতে চায় না। গোগোল বারবার দেখছে বারান্দার মহিলার দিকে। আর একবার পূবের ব্যালকনির খোলা দরজার দিকে। মনে ওর জিজ্ঞাসা, পুলিশ আসবে তো? হঠাৎ ওরকম লাইন কেটে দিল কেন? ওকে বিশ্বাস করে নি? পুলিশ যদি ওর টেলিফোন পেয়েই বেরিয়ে পড়ে, তা হলে ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটে পৌঁছুতে পাঁচ সাত মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়।

গোগোল হঠাৎ চমকে উঠে দেখল, পূবের ব্যালকনির খোলা দরজার অনেকটা ভেতরে একটা যেন আগুনের ঝলক দেখা গেল। দেখা দিয়েই সেটা মিলিয়ে গেল আরও ভেতরে। ঠিক তখনই বারান্দার মহিলা ওঁর হাতের ঘড়ি দেখে, দরজায় দু হাত দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন। ওঁনার গলার স্বর গোগোল স্পষ্টই শুনতে পেল, "দরোজা খোলো, মম্‌তা! দরোজা খোলো।"

গোগোলের নজর গেল সেই মুহূর্তেই নীচের দিকে। পাঁচ নম্বর বাড়ির নীচের চত্তরে এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশের অয়্যারলেস লাগানো জীপ। এক জন ইউনিফর্ম পরা অফিসারের সংগে আরও কয়েকজন লাফিয়ে নামলেন। সকলেই বাড়ির নীচের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। গোগোল আর তাঁদের দেখতে পেল না।

গোগোল রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে এল। ও যে-ভাবে কাঁপছে, হয়তো নীচেই পড়ে যাবে। বারান্দার মহিলা তখনও দরজায় ধাক্কা দিয়ে মম্‌তা নামে একজনকে ডেকে চলেছেন। বাগানে ছুটে এল সেই স্ত্রীলোকটি। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেই আবার ছুটে চলে গেল ভেতরে।

দক্ষিণের বারান্দার দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন কনেস্টবলকে। মহিলা কী যেন বললেন। কনেস্টবলও কিছু বললেন। শুনেই মহিলা ঘরের ভেতরে ছুটে গেলেন। গোগোল দেখল, বাড়িটার নীচের চত্তরে অনেক মহিলা পুরুষ জড়ো হয়েছেন। তাঁদের সকলের দৃষ্টি দোতলার দিকে। সকলেই উত্তেজিত ভাবে কিছু আলোচনা করছেন।

প্রায় দশ মিনিট পরে, গোগোল দেখল, কাপড় চোপড় দিয়ে সারা গা ঢাকা দিয়ে পুলিশ একজনকে জীপের পেছনে তুলল। মুখটা ভাল করে দেখা গেল না। জীপ বেরিয়ে গেল। আরও পনের মিনিট বাদে, ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে এল ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি। কিন্তু আগুন লাগার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

গোগোলের খেয়াল নেই, কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাঁচ নম্বর বাড়ির চত্বরে লোকজনের ভিড় রয়েছে। ও সেদিকেই তাকিয়ে আছে। আজও বাবার ডাকেই গোগোল সংবিত ফিরে পেল। তবে বাবা ওকে বকলেন না। খালি বললেন, "অনেকক্ষণ তো এদিকটা দেখলে। এবার ঘরে এস।"

সাতদিন কেটে গেছে। গোগোল আবার নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করছে। কিন্তু ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলায় কী ঘটেছে, কিছুই জানতে পারল না। খবরের কাগজেও কোন খবর ও খুঁজে পায় নি। কিন্তু ঠিক আট দিন পরে, সন্ধ্যাবেলা গোগোলদের ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল। গোগোল তখন নীচের থেকে খেলে এসে, পড়তে বসতে যাচ্ছিল। বাবাও একটু আগেই অফিস থেকে ফিরেছেন। গোগোল বাইরের ঘরে মোটা আর গম্ভীর গলা শুনতে পেল, "আপনার ছেলের নাম কি গোগোল?"

বাবার গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"সব বলব।" সেই মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, "আমি পার্ক স্ট্রিট থানার অফিসার ইনচার্জ। আপনাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। গোগোলকে একটু ডেকে দিন।"

গোগোল তখন বাবা মা'র ভয়ে চুপসে গেছে। তবু ও নিজেই ঘর থেকে, বাইরের ঘরে এল। বাবা ওকে দেখিয়ে বললেন, "এই আমার ছেলে গোগোল।"

থানার ও সি এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে গোগোলের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে গোগোলের ডান হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন, "তোমাকে খুঁজে বের করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের কোন বাড়ির ছেলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর তোমার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। প্রথমেই বলি সেদিন টেলিফোন করে, তুমি একজন মহিলার জীবন বাঁচিয়েছ। আর একটু দেরী হলে, তিনি এত বেশী পুড়ে যেতেন, বাঁচানো যেত না। আসলে মহিলা আত্মহত্যা করতে যান নি। তাঁর স্বামী আর বোন, দুজনে ষড়যন্ত্র করে, তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আর ভেবেছিল প্রমাণ করবে, মহিলা আত্মহত্যা করেছেন।"

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ ও.সি. কী ব্যাপার বলুন তো?"

ও.সি. বললেন, "আমার যা বলার বললাম। এবার গোগোলই আমাদের সব কথা বলবে। এস গোগোল, আমরা বসি। আপনারাও বসুন।"

গোগোল তখনও বাবা মায়ের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে। হয় তো তাঁরা রাগ করছেন। কিন্তু বাবা হঠাৎ হেসে বলে উঠলেন, "হুঁ, এইবার বুঝেছি, গোগোল কেন পশ্চিমের ব্যালকনি ছেড়ে নড়তো না।"

মাও গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোল বড় সোফায় ও.সি.র পাশে বসে, ওর পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে দেখার ঘটনা বলতে লাগল। আর বাকীরা সবাই অবাক ও চমৎকৃত হয়ে শুনতে লাগলেন।

ছবি—গৌতম বসু

বড়মামার স্বপ্ন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামাকে কে না জানে? আমার বড়মামা। আমি চিনি। আমার মেজমামা চেনেন। আমার মাসীমা চেনেন। সারা গ্রামের মানুষ আমার বড়মামাকে চেনেন। বড় ডাক্তার। ভীষণ উদার। অসম্ভব খেয়ালী।

রোজ সকালে এই মুখার্জি বাড়ির দোতলার বড় ঘরে চায়ের আসর বসে। মেজমামাকে ডাকতে হয় না। ভোরে ওঠেন। প্রথম পাখির প্রথম ডাক শুনতেই হবে তাঁকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা। এইটাই তাঁর জীবনের প্রতিজ্ঞা, যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস না করে, চাণক্য বলেছিলেন, শিখা বাঁধব না। মেজমামার অনেক রকম প্রতিজ্ঞা। সকালে চা খাবার আগে আধঘন্টা খালি পায়ে ঘাসের ওপর বেড়াবেন। অবশ্যই বেড়াবেন। পৃথিবী উল্টে গেলেও। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর দশ মিনিট হাঁটু মুড়ে বসবেন। একবার পড়ে গিয়ে ডান হাঁটুতে ভীষণ চোট পেয়েছিলেন। পা মোড়ার উপায় নেই। আমাকে রোজ রাতে খাবার পর মেজমামার সামনে পা মুড়ে বজ্রাসনে বসে থাকতে হত আধঘন্টা। সে যে কি সাংঘাতিক কষ্ট!

একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'মেজমামা এই ভাবে বসলে কি হয়?' বলেছিলেন, 'এর নাম বজ্রাসন। খাবার পরেই আধঘন্টা এই ভাবে বসলে সব হজম।'

'তা এতে তো আমার হজম হচ্ছে। আপনার কি হচ্ছে?'

'শুনিস নি? সংস্কৃতে বলে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। গন্ধ শুঁকলে অর্ধেক খাওয়া হয়। তেমনি দর্শন করলেও অর্ধেক উপকার। এই ভাবে বসে চুল আঁচড়ালে, চুল বাড়ে। জীবনে কখনও টাক পড়ে না।'

'আপনার যে টাক পড়ছে মেজমামা?'

'ও তো পুরনো টাক। নতুন করে আর পড়ছে কি?'

এই আমার মেজমামা। শরীরের জন্যে কি না করেন! পালোয়ান রেখে কুস্তি শিখতে গিয়ে এমন ঘাড় মটকে গেল যে, হাসপাতালে পড়ে রইলেন মাসখানেক। বড়মামা বলেন, 'ওর কপালে নাচছে অপঘাতে মৃত্যু।'

মাসীমা সব দেখে শুনে বলেন, 'পৃথিবীতে অনেক রকম পাগল আছে। পাগল ভালো করো মা। আর তো পারা যায় না। সকাল থেকে পাতা বেটে বেটে, আমার জীবন গেল। কুলে খাঁড়া, থানকুনি, গাঁদাল, জবাফুল।'

বড়মামা আগে বেশ ভোরেই উঠতেন। একেবারে শেষ রাতে। ঘড়ি না দেখলে মনে হবে মাঝ রাত। আকাশে প্যাট প্যাট করছে এক আকাশ তারা। উঠে ব্যায়াম বা বেড়ানো কোনও কিছুই করতেন না। বিছানায় চুপ করে বসে থাকতেন আধঘন্টা। তারপর আবার শুয়ে পড়তেন ধপাস করে। এরপর কখন উঠবেন, কারুর ক্ষমতা নেই বলে।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'আপনি কেন ওই রকম করেন?'

বলেছিলেন, 'ভাঙ্গা ঘুম জোড়া লাগাই। উঠে আবার শুয়ে পড়ার মজা জানিস? জানলে আর প্রশ্ন করতিস না।'

এখন বড়মামা আর ওই সব কায়দা করেন না। টানা ভোঁস ভোঁস ঘুম। ডেকে ডেকে ডেকে সবাই বিরক্ত হয়ে যায়। আমি ডাকছি, মাসী ডাকছেন, বড়মামার ছ ছটা বিভিন্ন জাতের কুকুর একসঙ্গে ডাকছে। বড়মামার ঘুম আর ভাঙে না কিছুতেই।

মাসীমা একদিন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড়দা তোমার তো এই রকম কুম্ভকর্ণ মার্কা ঘুম ছিল না। একটু ডাক্তার-বদ্যি দেখাও না!'

'হাসালি পাগলী। আমি নিজেই ডাক্তার। আর কয়েক বছর বাদেই ওয়ার্লড-ফেমাস হয়ে যাব। আমি ডাক্তার দেখাতে যাবো কোন দুঃখে রে!'

একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বড়মামা আমাকে ছাদে নিয়ে গেলেন, 'বোস, প্রাইভেট টক আছে।'

সব প্রাইভেট টক আমার সঙ্গে। যতক্ষণ ডাক্তার ততক্ষণ সাংঘাতিক ডাক্তার। চেম্বার থেকে চলে আসার পর অন্য মানুষ। তখন আমরা দুজনে প্রাণের বন্ধু। মাসী বলেন, আমি নাকি বড়মামার অপ-সেক্রেটারি। যত অপকর্মের প্ল্যান প্রথমে বড়মামার মাথায় খেলে, আর আমার সাহায্যে সেই সব পরিণত হয় কাজে। তা না হলে কার মাথায় এসেছিল গরুকে ছানার জল খাওয়ালে পেট থেকে সোজা ছানা বেরিয়ে আসবে। কার মাথায় এসেছিল গোটাকতক কাক ধরে সাদা রঙ করে দিলে কাকাতুয়া হবে। কার মাথায় এসেছিল বাড়ি থেকে চেম্বার পর্যন্ত দেশলাইয়ের খোলের টেলিফোন চালু করবে!

ছাদের যে দিকটায় তুলসী মঞ্চ, সেইখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালেন। আমি ভাবলুম বর্ষাকাল, হয়তো কোনও বাগানে মাছ ধরতে যাবার পরিকল্পনা হবে। বলবেন, মাসী আর মেজ যেন জানতে না পারে। তার কারণ নাটাগড়ের এক বাগানে মাছ ধরতে গিয়ে, মাছের হাতে আমরা দু'জনেই মারা পড়ছিলুম। সে এক কান্ড। ছিপে এত বড় একটা মাছ পড়ল যে একটানে বড়মামা হড়কে পুকুরে। আমি পা ধরে টানার চেষ্টা করতে গিয়ে আমিও জলে। সেই কথা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গেল। তারপর থেকে মাছধরার কথা উঠলেই সবাই মারতে আসেন।

বড়মামা বসলেন আমার পাশে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দুনিয়াটা একটা রহস্য। ওই যে আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আজকাল আকাশে তারা ছাড়াও অনেক কিছু দেখা যায়। নীল আলো। লাল আলো। পৃথিবীর মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গলে যাচ্ছে, শুক্রে যাচ্ছে। তারার পাশাপাশি মানুষের পাঠানো গ্রহ উপগ্রহ উড়ছে আকাশে।

'হ্যাঁ শোন? তোর সাহায্য চাই।'

'কি বড়মামা?'

'আমি রোজ রাতে আজকাল ভালো ভালো স্বপ্ন দেখি। অসাধারণ সব স্বপ্ন। জানিস তো স্বপ্নে মানুষ অনেক কিছু পায়। লেখক গল্পের প্লট পায়। বিজ্ঞানী ফর্মুলা পায়। রুগী ওষুধ পায়। স্বপ্ন মানুষকে দিতে আসে। আমার কি হচ্ছে জানিস, যেই ঘুম ভাঙছে সব ভুলে যাচ্ছি। সেদিন আমি ক্যানসারের ওষুধ পেয়েও হারালুম।'

'কিছুতেই মনে রাখতে পারছেন না?'

'মনে রাখার কি উপায় আছে! ভোর হতে না হতেই, দাদা চা, মামা চা, মামা চা, দাদা চা, ধড়মড়, ধড়মড়, সব ভুল হয়ে গেল। ঠিক ভুল নয়। গুলিয়ে গেল সব। এই চা। চা-ই বাঙালী জাতির সর্বনাশের কারণ। সাধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী চায়ের নাম শুনলে ক্ষেপে যেতেন। এই তো গবেষকরা বলছেন, বেশি চিনি খেলে ডাকাতি করতে ইচ্ছে করে।'

প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলুম। আমি তো ভীষণ চিনি খাই। চুরি করে মুঠো মুঠো টিন খালি।

'তা আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? আপনার হয়ে স্বপ্ন দেখে!'

'গাধার মতো কথা বলিস নি। আমার স্বপ্ন তুই দেখবি কি করে! তোর স্বপ্ন আমি দেখবো কি করে? যার যার স্বপ্ন তার তার স্বপ্ন।'

'তাহলে আমি কি করবো?'

'রোজ ভোরবেলা তুই আমাকে আগলাবি। চা চা করে কেউ যেন না আমাকে ডিসটার্ব করে। তোর হাতে থাকবে খাতা আর কলম। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করবি। কেমন?'

'তারপর?'

'তারপর আমাকে আস্তে আস্তে জাগাবি। মানুষকে কি ভাবে জাগাতে হয় জানিস্?'

'বড়মামা, বড়মামা বলে চেল্লাবো।'

'তোর মাথা? পায়ের বুড়ো আঙুল ধরবি।'

'কার আমার?'

'আরে গাধা, আমার, আমার!'

'আমারই তো বললুম।'

'তোর আমার আর আমার আমার এক হল রে? জানবি চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না রে!'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আপনার দু'পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল ধরবো। ধরে?'

'ধরে অল্প একটু মোচড়াবি জলের কলের মতো। আমি চোখ চাইবো। সঙ্গে সঙ্গে তুই রেডি হবি। নোট নেবার জন্যে। আমি গড় গড় করে স্বপ্ন বলে যাবো।'

'কি মজা বড়মামা! দারুণ হবে।'

'দারুণ। দারুণ। কাউকে বলবি না। এমন কি মেজকেও না। তোর মাসীকে তো নয়ই।'

প্রথম দিন ভোরবেলা যেমন কথা ছিল ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলুম। তারপর বড়মামার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে আস্তে মোচড় মারলুম দু'বার। পা টেনে নিলেন। ঘুম ভাঙল না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। প্রায় নাক ডাকার মতো। পা আবার সোজা হল। এবার একটু জোরে মোচড় মারতেই মারলেন শট। যেন পেনাল্টি থেকে টাইব্রেকারে গোল দিচ্ছেন। আমি ছিটকে এসে পড়লুম ডিভানে।

ঠেলেঠুলে উঠলুম। এবার আমার নিজস্ব কায়দা। একটা কাগজের টুকরো সরু করে পাকিয়ে একবার এ-নাকে একবার ও-নাকে। ফোঁস ফোঁস করে উপুড় হয়ে শুলেন। হয়ে গেল। বড়মামার নাক আমার হাতছাড়া। কানে কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে, পিঠে গোটা দুই কিল মেরে বসে রইলুম হতাশ হয়ে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না? এবার দেখি নাকও ডাকতে শুরু করেছে। শেষে মাথায় বুদ্ধি এলো। কাতুকুতু দিলে কেমন হয়। যাঁহাতক কাতুকুতু দেওয়া বড়মামা সোজা উঠে বসলেন, চোখ জবাফুলের মতো লাল।

ধমকের সুরে বললেন, 'কি চাই কি তোমার? সাত সকালেই অসভ্যতা করছ?' আমি একটুও ভয় পেলুম না। জানি তো, ঘুম ভাঙার পর মানুষ বেশ কিছুক্ষণ সব ভুলে যায়। একটু পরে সব আবার মনে পড়ে। মেজমামা বলেন, ঘুম হল কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যু।

আমি চিৎকার করে বললুম, 'স্বপ্ন চাই। স্বপ্ন।'

বড়মামা সোজা বিছানা থেকে উঠলেন। দরজা খুললেন। তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে

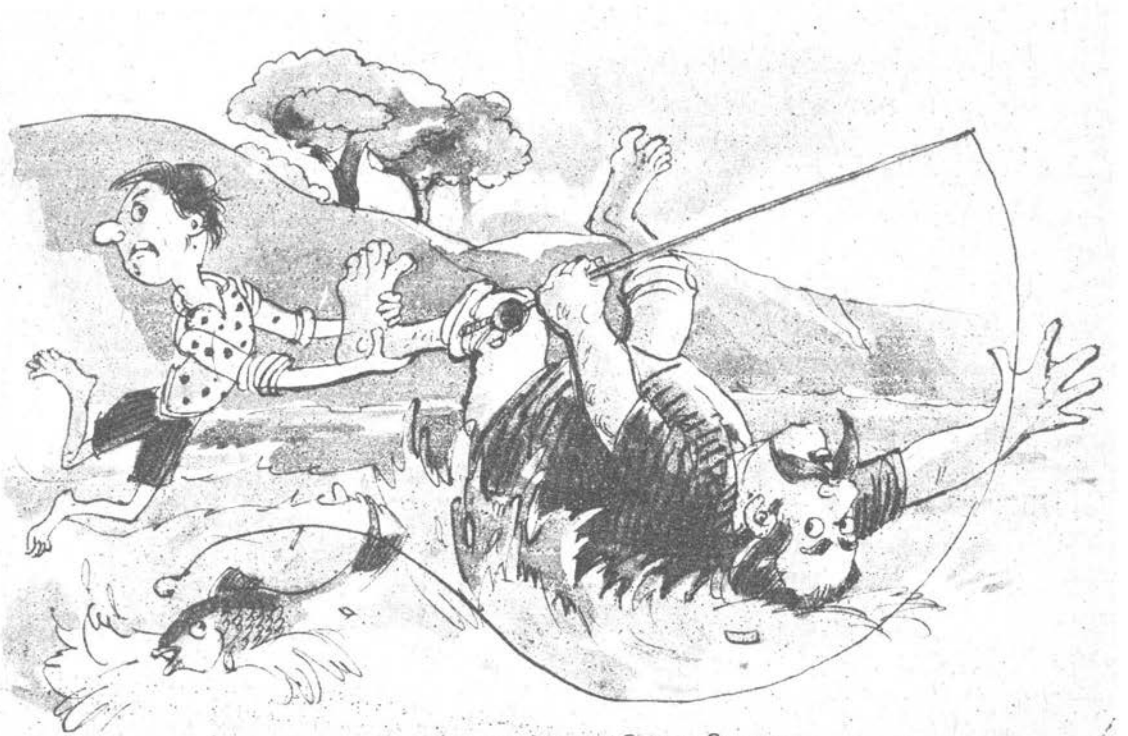

পা ধরে টানার চেষ্টা করতে গিয়ে আমিও জলে

তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন,

দিয়ে, দরজা দিয়ে দিলেন। আমি হাঁ হয়ে গেলুম। নিচে নেমে আসতেই মাসীমা বললেন, 'কি রে ! বড়মামাকে ডাক। চা যে পান্তাভাত হয়ে গেল।'

বললুম, 'পারবো না।'

মাসীমা আমার মুখের দিকে তাকালেন, 'কেন গো অপ-সেক্রেটারি। আজ এমন বেসুরো কেন ?'

বড়মামার ব্যবহারে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। বড়মামা যদিও বারণ করেছিলেন, মাসীকে একেবারেই বলবি না। তবু সব বলে ফেললুম। মাসীমা আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'বড়দার ঘুম তো বিখ্যাত রে ! খাট থেকে টেনে ফেলে দে, মেঝেতে পড়ে ঘুমোবে। সেখান থেকে টানতে টানতে বারান্দায়, সেখানেও ঘুমোবে। জানিস তুই, বড়দা একদিন ছেলেবেলায় পাঁচিলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওই যে আমাদের পেছনের বাগানে বড় সীমানা পাঁচিল, প্রায় ছ-সাত ফুট উঁচু, আম জাম লিচু গাছের ডালপালায় দেখাই যায় না, ওর ওপর উঠে চিৎ হয়ে শুয়ে বড়দা মনের আনন্দে ঘুমোচ্ছে।'

'কেন মাসীমা ?' ওর ওপর কেউ ঘুমোয় ! অত সরু পাঁচিল ! পাশ ফিরলেই তো পড়ে যেতে হবে ?'

'ছেলেবেলায় তো ভীষণ দুষ্টু ছিল। কি একটা করেছিল ! ও হ্যাঁ, মায়ের সেলাইয়ের কল থেকে কাঁচি বের করে আমার চুল কেটে দিয়েছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর মা ধরে পিঠে গুমগুম কিল।'

'তারপর ?'

'কোথায় চলে গেল ? খোঁজ খোঁজ। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কান্নাকাটি। শেষে দেখা গেল, তাও আমরা দেখিনি। পাঁচিলের ও-পাশে বোসেদের পুকুর। পুকুরে স্নান করতে এসে কুসুম দেখলে একটা ঠ্যাং ঝুলছে, আর একটা হাত ঝুলছে। এমন বোকা মেয়ে, ও ভেবেছে পাঁচিলে লোকে কাপড় জামা মেলে দেয় তো, সেই রকম কেউ হয় তো হাত আর পা শুকোতে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ ওর মনে হয়েছে, তা কি করে হয় ! তখন ভেবেছে ভূত। দে ছুট। বাড়ি গিয়ে মাকে বলেছে। সবাই ছুটে আসছে। এমন সময় দাদা পাশ ফিরতে গিয়ে ঝপাং করে জলে।'

সেদিন আটটার সময় বড়মামা উঠলেন। তাও উঠলেন কেন, পুবের জানলা খোলা ছিল? মুখে রোদ পড়েছে। চড়া রোদ। জামগাছের ডালে বসে কাক ডেকেছে খা খা করে।

একটু পরেই খোঁজ পড়ল আমার। ঘুম ঘুম চোখে বললেন, 'কি করলি। ছি ছি। তোকে এত করে বললুম। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেল। বড় স্বপ্নটা ভোর পাঁচটা নাগাদ শেষ হয়েছিল মনে হয়। তোকে আমি কি বলেছিলুম ? ঠিক পাঁচটা পাঁচে আমাকে ঠেলে তুলবি। আর আমি গড়গড় করে বলে যাবো। গুরুজনের

একটা কথাও কি শুনতে নেই রে ! বড় মাছের পেছন পেছন ছোট মাছ ঘোরে। ওই বড় স্বপ্নর পেছন পেছন এসে গেল কুঁচো স্বপ্ন। ঘুম ভাঙল কি স্বপ্ন দেখতে দেখতে জানিস ? ওই মেজ, বাগানে কুস্তি করছে কিংকং-এর সংগে। কিংকং এক লাথি মারল, মেজ ছিটকে গিয়ে পড়ল গোবরের গাদায়। সেখান থেকে বেড়ালের মতো ঘাড় ধরে তুলে একেবারে আখড়ার বাইরে। এই সব স্বপ্ন দেখার জন্যে আমি ঘুমোই ? বল তুই ? কি সময় নষ্ট, তাই না !'

'বড়মামা, স্বপ্নে যাঁকে আপনি মেজমামা ভেবেছেন, সে হল আমি। আমাকেই আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিংকং হয়ে লাথি ঝেড়েছেন। তারপর কিংকং হয়ে ঘাড় ধরে দরজা খুলে ঘরের বাইরে বের করে দিয়েছেন। বড়মামা, আমার ভীষণ দুঃখ হয়েছে। অভিমান হয়েছে। রাগ হয়েছে।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি রে। ছি ছি ! তোর লেগেছে ?'

'হ্যাঁ, লেগেছে বই কি ! অমন আচমকা লাথি খেয়ে ছিটকে পড়লুম ডিভানে। তারপর ঘাড় ধরেছিলেন, কি ভীষণ ব্যথা।'

সোফায় বসে বসে, বড়মামা অনেকক্ষণ ছি ছি করলেন। বললেন, 'কিছু মনে করিস নি। ঘুমোলে আমার জ্ঞান থাকে না রে।'

যাক আমার অনেক লাভ হল। বড়মামা সেদিন খুব খাওয়ালেন। ভালো একটা কলম কিনে দিলেন।

রাতে ঠিক হল, ভোরবেলা বড়মামাকে আর পায়ের দিক থেকে নয়, মাথার দিক থেকে জাগাবার চেষ্টা করব। কিছুই না, নাকটাকে দু আঙুলে চেপে ধরব। কিছুক্ষণ চেপে রাখলেই চোখ খুলবেন তখন আমি ধীরে ধীরে মাথার চুলে, চুল তেমন নেই, টাকে হাত বুলোবো।

ভোর ঠিক পাঁচটা পাঁচ। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে, বড়মামার মাথার সামনে এসে দাঁড়ালুম। ভোঁস ভোঁস ঘুম। মেজমামা ঠিকই বলেছেন, এই ভোঁস ভোঁস ঘুমে স্বপ্ন আসে না। স্বপ্ন রুপলি ইলিশের মতো, হালকা ঘুমে পিঠ ভাসিয়ে খেলে বেড়ায়।

আমার আঙুল বড়মামার নাক টিপে ধরার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। গুরুজনের নাক টিপে ধরার সাহস নেই। কি করা যাবে, গুরুজনের আদেশ যেমন। হাত এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। প্রায় এসে গেছে নাকের নাগালের কাছে। এইবার। এইবার।

হঠাৎ বড়মামা, গোঁ গোঁ করে শব্দ শুরু করলেন। সারা মুখের মাংসপেশী থির থির করে নাচছে। চোখ খুলছেন, চোখ বোজাচ্ছেন। আমার হাত পেছিয়ে আসছে ভয়ে। বড়মামা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছেন।

ঠিক এই অবস্থায় আমাকে কি করতে হবে ? সে-কথা তো আমাকে বড়মামা বলেন নি। আমি অবাক হয়ে দেখছি। বড়মামা শিশুর মতো উঁ উঁ করে কাঁদছেন। এত কাঁদছেন যে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমার নিজেরই কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। স্বপ্নে নিশ্চয়ই কিছু ভেঙে ফেলেছেন। আর মাসীমা মনে হয় খুব ধমকাচ্ছেন।

হঠাৎ বড়মামার ঘুম কেউ যেন এক ধাক্কায় ভাঙিয়ে দিলে। সারা শরীর কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। কান্না বন্ধ। ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। আমি সংগে সংগে খাতা বাগিয়ে ধরে বললুম, 'বলুন বড়মামা। বলুন, কি দেখলেন ?'

বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামলেন। পা দিয়ে দিয়ে চটি জোড়া খুঁজলেন। পেলেন না। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

আমি বললুম, 'বড়মামা স্বপ্ন ?'

শুনেও শুনতে পেলেন না।

দরজা খুলে বারান্দা। সিঁড়ি দিয়ে নিচে।

আমি ছুটে গিয়ে মেজমামা আর মাসীমাকে সব বললুম। মেজমামা বেরিয়ে এলেন। বড়মামা ততক্ষণে বাগানে চলে গেছেন।

বাগানের উত্তর কোণে, শেষ মাথায়, সেকালের ঘর। থাকে না কেউ। প্রায় ভেংগে এসেছে। বহুকাল আগে শুনেছি এ বাড়ির ছোটরা ওখানে খেলা করত। বড়মামা সেইখানে গিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে। মেজমামা পেছন থেকে খুব মিষ্টি গলায় বললেন, 'কি খুঁজছিস ?'

'আরে এখানে একটা বাচ্চা ছেলে বসে কাঁদছিল। বলছিল আমি হারিয়ে গেছি। বহুদিন ধরে সে চেষ্টা করছে ঘরে ফেরার। কোথায় গেল বল তো মেজ ?'

মেজমামা হাসলেন, 'বড়দা, যাকে খুঁজছো তাকে আর পাবে না ?'

'কেন, কেন, এই তো ছিল !'

'যাকে খুঁজছো, সে তোমারই ছেলেবেলা। ছেলেবেলাকে কি আর পাওয়া যায় দাদা ? ওই মাঝে মাঝে স্বপ্নে এসে কাঁদিয়ে দিয়ে যায়।'

ছবিঃ গৌতম বসু

ক্যা কসুর

নটরাজন

মাথা নিচু করে একমনে অংক কষে চলেছে বচ্চন। আজ রাতে অংকের এই প্রশ্নমালাটা তাকে শেষ করতেই হবে, নইলে কাল স্কুলে তার দুর্গতির শেষ থাকবে না। অংকের মাস্টার বড়ই রাগী। হোম-টাস্কের ওপর কড়া নজর তাঁর। একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

গ্রামের মধ্যেই প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বচ্চন। বয়স মাত্র আট। বাড়ন্ত গড়ন, তাই দশ-বারোর মতো দেখায়। ছিপছিপে চেহারা। মাথায় চুলের ঝুঁটি। তার সংগে সাদা রুমাল জড়ানো। গায়ের রং ফর্সা না হলেও মুখখানি সুন্দর কাটা-কাটা। টানা দু'টি স্বপ্নালু চোখ।

বচ্চনদের বাড়িটি মাটির। ছাদও বাঁশের কঞ্চি ও মাটি দিয়ে তৈরি। ভেতরটা চুনকাম করা। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে এমনি ধরনের বাড়িরই রেওয়াজ। যাদের পয়সা আছে তাদের কথা আলাদা। পাকা বাড়ি তাদের। বচ্চনদের পয়সা নেই। পয়সা থাকবেই বা কেমন করে? তার জন্মের আগে বাংলাদেশের যুদ্ধে তার বাবা খড়গ্ সিংয়ের যদি একটা চোখ নষ্ট হয়ে এবং একটা হাত প্রায় অকেজো হয়ে না যেত তাহলে তার বাবা এখনও পল্টনে নোকরি করতো। আর নোকরি মানেই পয়সা। অবশ্য তার বাবা এখনও যে নোকরি করে না তা নয়। দিল্লীর একটা ছোট্ট কোম্পানির ভ্যান ড্রাইভার। তাতে আর ক'টা পয়সা রোজগার হয়? নেহাত মিলিটারি থেকে বিদায় নেয়ার পরে সরকার তার বাবাকে কয়েক বিঘে জমি দিয়েছিল। সেই জমির আয় ও তার বাবার রোজগারে কোনো রকমে দিন চলে তাদের। তবে বচ্চনদের বাড়িটি মাটির হলেও ইলেকট্রিক লাইট আছে। পাঞ্জাবে জল-বিদ্যুতের দৌলতে গ্রামাঞ্চলেও ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক।

বচ্চনের মা অমৃতা কাউরের বড়ই দুশ্চিন্তা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মতো চটপটে নয় বচ্চন। কেমন যেন একটু ভাবুক প্রকৃতির। অমৃতার ধারণা এতটুকু বয়সে এমন ভাবুক হওয়া ভালো নয়। গ্রামের গুরুদ্বারের প্রধান পুরোহিত বাবা সঙ্কর সিংকে একদিন অমৃতা বচ্চন সম্পর্কে নিজের দুর্ভাবনার কথা বলেও ছিল। জবাবে বাবা সঙ্কর সিং বচ্চনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, ভগবান তো সব মানুষকে একরকম করে তৈরি করেন না, মাঈজী। আমি বলছি, গুরুজীর আশীর্বাদে তোমার এই বেটার ভালো হবে। খুশি মনে সেদিন অমৃতা ছেলের হাত ধরে গুরুদ্বার থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

হঠাৎ অংক কষা থামিয়ে বচ্চন সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। এরকম সে মাঝে মাঝেই করে। দেয়ালে টাঙানো তিনখানা ছবি। সবচাইতে বড়খানা নানকজীর। ধবধবে সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথার পাগড়ির সংগে জড়ানো একগাছা মালা। হাতেও তাই। করুণাঘন একজোড়া চোখ দিয়ে যেন তিনি তাকিয়ে আছেন বচ্চনের দিকে। তাঁর মাথার পেছন দিকের সেই স্বর্গীয় জ্যোতি যেন

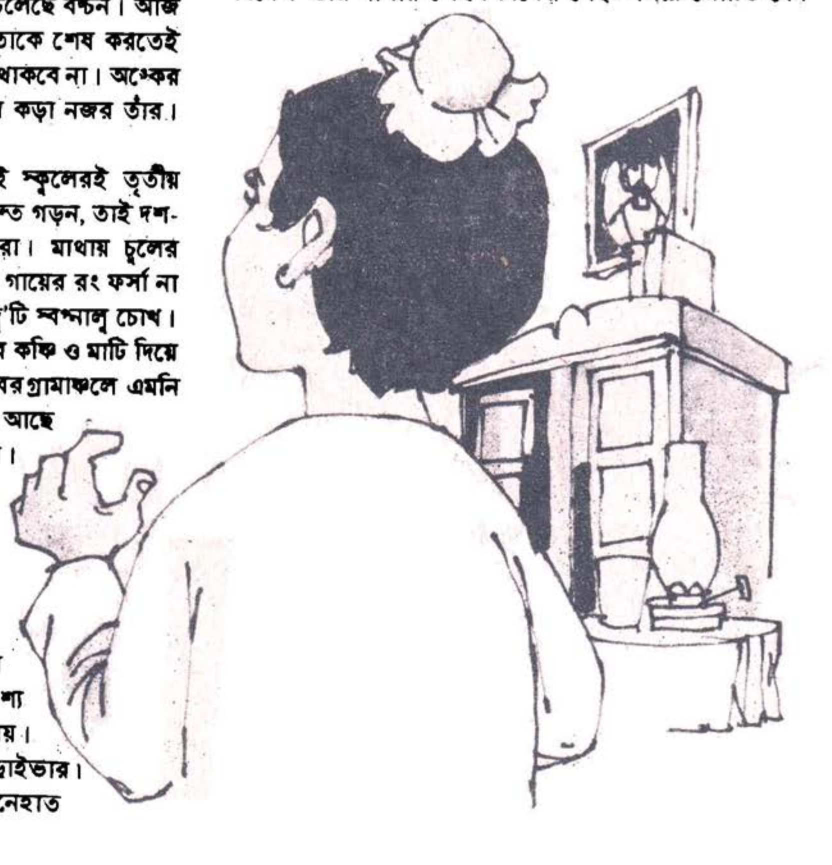

ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে।

নানকজীর ছবির ঠিক নিচেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর ছবি। আশ্চর্য ব্যক্তিত্বময়ী সেই মহীয়সী নারী তাঁর ঘোমটার ফাঁকে কালোর মধ্যে একগুচ্ছ সাদা চুল ও মুখে স্মিত হাসি নিয়ে যেন বচ্চনকেই দেখছেন। দুষ্টু ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় ইন্দিরাজীও যেন ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে আছেন বচ্চনের দিকে।

সবশেষে একেবারে নিচে বচ্চনের বাবা খড়গ্ সিংয়ের ছবি। গায়ে তার পল্টনের পোশাক, মুখে গর্ব ও তৃপ্তির চিহ্ন। হাসি হাসি মুখে সে যেন তাকিয়ে আছে পুত্রের দিকে। পল্টনে যোগ দেবার বছর দুয়েক পরেই খড়গ্ সিং শখ করে এই ছবিখানা তুলিয়েছিল।

আট বছরের ছোট ছেলে বচ্চন মাঝে মাঝেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এই ছবি তিনটির দিকে। নানকজী অনেককাল আগেই চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু ছবির মধ্য দিয়ে তিনি বচ্চনের দিকে তাকিয়ে যেন বলছেন—ধর্মে মতি থাকুক তোমার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী অনেক দূরের মানুষ। তাঁর ধারে কাছে যাওয়া যায় না। তিনিও যেন ছবির মধ্য দিয়ে বচ্চনকে বলছেন—দেশকে ভালোবাসো। সবশেষে তার বাবা খড়গ্ সিং। একেবারে কাছের মানুষ হলেও সে তেমন কাজের নয়। সারা বছরে বচ্চন যে ক'টা দিন তার বাবাকে কাছে পায় তা প্রায় আঙুলে গোনা যায়। তেমন একটা ছুটিছাটা নেই খড়গ্ সিংয়ের। তাই জীবন্ত বাবার চাইতে ঐ ছবির বাবাই বচ্চনের অনেক কাছের। সেই বাবা যেন ছবির মধ্য থেকে ছেলেকে বলেছে—বীর হও—সাহসী হও।

খড়গ্ সিং ছাড়া বাকি দু'জনের মধ্যে নানকজী বহুদূরের মানুষ। তাঁর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁর নাগাল পাওয়া সম্ভব সেই ইন্দিরাজীকে একটিবার চোখের দেখা দেখার সুযোগও এ পর্যন্ত বচ্চনের ঘটেনি। বলে বলে সে হয়রান হয়েছে খড়গ্ সিংকে। বলেছে, তোমার তো খুব মজা, পাপাজী। তুমি দিল্লিতে থাকো। রোজ রোজ দেখতে পাও ইন্দিরাজীকে।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে খড়গ্ সিং বলেছে, পাগলা কোথাকার! দিল্লি থাকি বলে ইন্দিরাজীকে দেখতে পাওয়া এতই সহজ? এত বড় একটা বিরাট দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি। কত কাজ তাঁর। আমাকে দেখা দিতে তাঁর সময় কোথায়?

—কেন, তুমি তাঁর বাড়িতে গেলেই তো তাঁকে দেখতে পারো।

হো-হো করে হেসে উঠে বলতে থাকে খড়গ্ সিং, দূর বোকা, ইন্দিরাজীর বাড়ি আমাকে ঢুকতে দেবে কেন? বাড়ির চারিদিকেই তো পাহারা।

—বারে, বলে উঠে বচ্চন, তুমি তো পল্টনে নোকরি করতে। তোমাকেও ঢুকতে দেবে না?

—নারে না, জবাব দেয় খড়গ্ সিং, সেখানে বাইরের লোকের ঢোকা একেবারেই বারণ।

বাপের কথায় ছোট্ট বচ্চনের সুন্দর মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। সেইদিকে তাকিয়ে খড়গ্ সিং ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আবার বলে, মৎ ঘাবড়াও বেটা। একবার তোকে দিল্লি নিয়ে যাবো। তখন যে করেই পারি ইন্দিরাজীকে দেখাবো।

—সচ্ বলছো, পাপাজী?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

বাপের কথার ওপর অগাধ বিশ্বাস বচ্চনের। তাই খড়গ্ সিংয়ের কথায় মনটা আনন্দে নেচে ওঠে তার। মাকে ডেকে বলে, মা—মাগো, আমি পাপাজীর সঙ্গে দিল্লি যাবো ইন্দিরাজীকে দেখতে।

—বেশ, যখন যাবি তখন যাবি, জবাব দেয় অমৃতা, এখন বাপবেটায় এসে খানা খেয়ে নে।

খড়গ্ সিং মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, আচ্ছা বচ্চন, ইন্দিরাজীকে দেখতে কেন তোর এত ইচ্ছে হয় বল্ তো?

—ওরে ব্বাস্! বলে ওঠে বচ্চন, অত বড় একটা লোককে দেখতে ইচ্ছে হবে না?

—অত বড়? মুখ টিপে হেসে মাথার পাগড়িটা ঠিক করতে করতে খড়গ্ সিং বললে, কে বললে বড়? এইটুকু ছোট্ট এক দুবলা জেনানা ইন্দিরাজী।

—দুবলা? ইন্দিরাজী দুবলা? কভি নেহি, প্রচণ্ড অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে বলতে থাকে বচ্চন, দুবলাই যদি হবে তা'হলে বাংলাদেশের সেই পাকিস্তানী জঙ্গী টিক্কা খানকে কী করে সে শায়েস্তা করেছিল?

—হাঁ বেটা, ঠিক কথাই বলেছিস, বলতে থাকে খড়গ্ সিং, শরীরের তাগদ দিয়ে কী হয়? আসলি তাগদ—আসল শক্তি তো মনের। ইন্দিরাজীর মনের তাগদ আছে বলেই না বাংলাদেশে পাকিস্তানি ফৌজদের বেকায়দায় ফেলেছিল। কথা বলতে বলতে খড়গ্ সিং শ্রদ্ধার চোখে তাকায় ইন্দিরাজীর ছবিটার দিকে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি খড়গ্ সিংয়ের শ্রদ্ধা বাস্তবিকই আন্তরিক। তার মনের জগতে গুরু নানকের পরেই ছিল ইন্দিরার স্থান। তাই সে তার নিজের বাড়ির দেয়ালে নানকের ছবির ঠিক নিচেই ইন্দিরাজীর ছবি টাঙিয়েছিল। খড়গ্ সিংয়ের মনের এই শ্রদ্ধাভক্তি তার পুত্র বচ্চনের মনটাকেও করেছিল সংক্রামিত। বাপের মুখের ইন্দিরা সম্পর্কে নানা ধরনের কথা শুনে শুনে ছোট্ট বচ্চনও ইন্দিরাজীকে বসিয়েছিল নিজের কিশোর মনের সিংহাসনে। তার কাছে ইন্দিরাজী তখন আর কেবল একজন নারী নয়—শৌর্য-বীর্যের এক জীবন্ত প্রতীক। তাই তার এত আগ্রহ একটিবার ইন্দিরাজীকে দেখার জন্যে।

গোটা পাঞ্জাব রাজ্য তখন উত্তাল। একদল উগ্রপন্থীকে শায়েস্তা করতে ইন্দিরাজী সৈন্যবাহিনীকে ঢুকিয়েছেন

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের সমালোচনা। সেই সমালোচনার ঢেউ এসে লেগেছে বচ্চনদের সেই ছোট্ট গাঁয়েও। লোকের মুখে নানারকম কথা। সেসব কথা কানে আসে বচ্চনেরও। আট বছরের বচ্চন তার কিছু বুঝতে পারে, কিছু পারে না। তবে এটুকু বুঝতে পারে তার কল্পলোকের সেই বীরাংগনা ইন্দিরাজী নাকি একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বচ্চন। ইন্দিরাজী যে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারেন এটাই তার ধারণার বাইরে। এ নিয়ে মা অমৃতা কাউরকে প্রশ্ন করে বচ্চন কোনো জবাব পায় না। এসবের ধার ধারে না অমৃতা। জমিজমা ও সংসারের যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা সহ্য করতে হয় তাকে। তাই ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার।

মুশকিল হয়েছে বচ্চনের। বাইরে নানা কথা শোনে, আর মনের মধ্যে জেগে ওঠে হাজারো প্রশ্ন। কেউ নেই সেই প্রশ্নের জবাব দেবার। নানারকম প্রশ্ন, নানারকম আলোচনা। তার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে ছোট্ট বচ্চন। তার প্রশ্নের জবাব দিতে একমাত্র যে পারে সেই তার পাপাজী খড়্‌গ্ সিং তো দিল্লিতে। কবে বাড়ি আসবে কে জানে? তাই পাপাজীর জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে বচ্চন, আর মাঝে মাঝে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে থাকে মা অমৃতা কাউরকে।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির নিয়ে পাঞ্জাবে তখন একটার পর একটা উত্তেজনা। প্রথম উত্তেজনা স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারির অনুপ্রবেশ ও উগ্রপন্থীদের কব্জা করতে গিয়ে স্বর্ণমন্দিরের ক্ষতি নিয়ে। আর দ্বিতীয় উত্তেজনা মন্দির মেরামতের জন্যে 'কর সেবার' বন্দোবস্ত নিয়ে। জীবনে এই প্রথম 'কর সেবা' কথাটা শুনলে বচ্চন। পরিশ্রম করাকেই 'কর সেবা' বলে। বচ্চনদের গ্রাম থেকেও কয়েকজন লোক স্বর্ণ মন্দিরের সেই কর সেবায় যোগ দিতে চলে গেল অমৃতসর। এই নিয়ে সেই ছোট্ট গাঁয়েও উঠলো আলোড়ন। পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম আলোচনা। অবশেষে একদিন দিল্লি থেকে চিঠি এলো খড়্‌গ্ সিংয়ের। তাতে সে জানিয়েছে যে সে নিজেও নাকি অমৃতসর গিয়ে কর সেবায় যোগ দিয়েছিল।

মায়ের মুখে কথাটা শোনার পর থেকে মনটা কেমন যেন একটু হালকা বোধ হতে লাগলো বচ্চনের। এ যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্ণমন্দিরের ক্ষতি করে ইন্দিরাজী যদি কোনো পাপ করেই থাকে তাহলে তার পাপাজী অনেকের সংগে মন্দির মেরামতের কাজে হাত লাগিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। খড়্‌গ্ সিং যে ইন্দিরাজীর জন্যে একটা কানা চোখ ও একখানা প্রায় অবশ হাত নিয়ে কর সেবা করেছে তাতেই বচ্চনের ডাগর চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অমৃতা কিন্তু তার স্বামীর এই আচরণকে একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে করে। কী প্রয়োজন ছিল দিল্লি থেকে অমৃতসর গিয়ে কর সেবা করার? তাতে তাদের কী লাভ? এ জন্যে ইন্দিরাজী কি তার স্বামীকে একটা ভালো চাকরি দেবে? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তো তার স্বামীকে একটা কানা চোখ ও একখানা প্রায় অবশ হাত নিয়ে সেই প্রাইভেট কোম্পানিতে গাড়িই চালাতে হবে। ইন্দিরাজীর হুকুমে বাংলাদেশের যুদ্ধে গিয়ে পংগু হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামী খড়্‌গ্ সিংয়ের ইন্দিরাজীর প্রতি কেন যে এত ভক্তি তা ঠিক বুঝতে পারে না অমৃতা! এদিকে ছেলেটাও হয়েছে ঠিক বাপের মত। ইন্দিরাজী বলতে অজ্ঞান।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে খড়্‌গ্ সিং বাড়ি ফিরতেই বচ্চন তার পাপাজীকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। খেতে-বসতে প্রশ্ন। সব প্রশ্নই অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ও ইন্দিরাজীকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নের যেন শেষ নেই। তার ছোট্ট মনের প্রশ্নের জোয়ার এমন বাঁধভাঙা বন্যার মতো তার পাপাজীর ওপর ভেঙে পড়লো যে তার জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো খড়্‌গ্ সিং। অমৃতা মাঝে মাঝে ধমকে ওঠে ছেলেকে। বলে, মানুষটা এতদিন পরে বাড়ি ফিরলো। কোথায় দুটো সংসারের কথা বলবে, চাষ-বাসের খবর নেবে, তা নয় রাতদিন কেবল ইন্দিরাজী আর স্বর্ণমন্দিরের কথা! শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! স্ত্রীর কথায় খড়্‌গ্ সিং কেবল হাত বাড়িয়ে বচ্চনকে নিজের আরও একটু কাছে টেনে এনে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জবাব দেয়, আমি ছাড়া ওর কৌতূহল আর কে মেটাবে বলো?

বচ্চনের নিজের ধারণা সে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। কাজেই এবার সে অনায়াসেই তার পাপাজীর সংগে দিল্লি গিয়ে ইন্দিরাজীকে দেখে আসতে পারে। পাপাজীর কাছে কথাটা পাড়তেই খড়্‌গ্ সিংয়ের বদলে অমৃতা হাঁ-হাঁ করে ওঠে। বলে, পাগল হয়েছিস নাকি তুই? তোর পাপাজী সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরবে। তুই থাকবি কোথায়?

—কেন, পাপাজী যেখানে থাকবে আমিও সেখানেই থাকবো।

—কে দেখবে তোকে? জিজ্ঞেস করে অমৃতা।

জবাব দেয় বচ্চন, দেখবে আবার কী? আমি এখন বড় হয়েছি না?

ছেলের কথায় বাপ-মা দুজনই মুখ টিপে হাসে। তাদের সেই হাসি দেখে বচ্চন দু'হাতে বাপের মুখখানা নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে এনে ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে, তুমিই বলো না পাপাজী, আমি এখন বড় হয়েছি না?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার ভান করে খড়্‌গ্ সিং জবাব দেয়, আলবৎ—আলবৎ বড় হয়েছ তুমি।

—তাহলে এবার আমি তোমার সংগে দিল্লি যাবই।

ছেলের আবদারে বিব্রত বোধ করে খড়্‌গ্ সিং। দিল্লি হচ্ছে এক আজব শহর। সেখানে খাবার পাওয়া গেলেও থাকার

ACIL/SWCPD-2/85 BEN

জায়গার বড়ই অভাব। একটা ঘিঞ্জি এলাকায় একখানা মাত্র ছোট ঘর নিয়ে তারা চার-পাঁচজন একসংগে থাকে। সামনে এক চিলতে ঢাকা বারান্দা। সেখানেই খানা পাকানোর ব্যবস্থা। তাদের নিজেদের পক্ষেই সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে ওঠা-বসা করা মুশকিল। এই অবস্থায় কেমন করে সে বচ্চনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলবে?

বচ্চন কিন্তু এবার নাছোড়বান্দা। কিছুতেই সে তার পাপাজীকে ছাড়বে না এবার। দিল্লি সে যাবেই। নিজের চোখে তার কল্পলোকের সেই বীরাংগনা ইন্দিরাজীকে সে দেখবেই।

বাপের আশ্বাস ও মায়ের ধমকানিতেও যখন কোনো কাজ হলো না তখন খড়গ্ সিং রাজি হলো ছেলেকে দিল্লি নিয়ে যেতে। ঠিক হলো, একটা সপ্তাহ পরেই সে তার গাঁয়ের একজন লোকের সংগে বচ্চনকে পাঠিয়ে দেবে।

বচ্চনের এই প্রথম দিল্লির মতো একটা বিরাট শহরের অভিজ্ঞতা। বড় বড় বাড়ি, বিরাট বিরাট রাস্তা, হাজার হাজার গাড়ি। এর মধ্যে প্রথম দু একদিন কেমন যেন একটু বিভ্রান্ত বোধ করে বচ্চন। কিন্তু তারপরেই নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে মনটা তার ভরে ওঠে। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় তাদের সেই অখ্যাত গ্রামটিকেই সে এতকাল তার পৃথিবী বলে মনে করতো, দিল্লি এসে সেই ভুল ভাঙলো তার।

দিল্লির এক ঘিঞ্জি এলাকার একখানি ঘরে তার পাপাজীর সংগে থাকে বচ্চন। নামেই কেবল পাপাজীর সংগে থাকা, আসলে পাপাজীর নাগাল পাওয়াই ভার। সকাল আটটায় তার পাপাজী খড়গ্ সিং রুটি তড়কা খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। ফিরতে রাত আটটা ন'টা। ঐ ঘরে তার পাপাজীর সংগে আরও যে ক'জন থাকে তারাও প্রায় একই সময় বেরিয়ে যায় কাজে, কেবল একজন ছাড়া। তার নাম সুভগ সিং। সুভগের বয়স হয়েছে। চুল-দাড়ি সবই প্রায় সাদা। মাথার পাগড়িটা যেমন-তেমন করে বাঁধতেই সে অভ্যস্ত। হাতের লোহার বালাটাও অতিরিক্ত ঢলঢলে। কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে নাইট গার্ডের কাজ করে সুভগ সিং। প্রতিদিন রাত আটটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত তার ডিউটি। ডিউটির পর ফিরে আসে আস্তানায়। এই সুভগ সিংয়ের তত্ত্বাবধানেই সারাটা দিন কাটে বচ্চনের। দু'তিন দিনের মধ্যেই সুভগ সিংয়ের সংগে বেশ ভাব জমে গিয়েছিল তার। বিকেলের দিকে বচ্চন এসে দাঁড়ায় তাদের সেই এক চিলতে বারান্দার জানালার কাছে। এখান থেকে সামনের খোলা জায়গাটুকু নজরে পড়ে। এই জায়গাটুকুর মালিক পাশের দোতলা বাড়ির রামপ্রসাদ শর্মা। দিল্লির চাঁদনি চকে ব্যবসা আছে রামপ্রসাদের। সেই সূত্রে সবাই তাকে লালাজী বলে ডাকে। সেই খোলা জায়গায় লালাজীর কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বিকেলের দিকে খেলা করে। জানালায় দাঁড়িয়ে বচ্চন তাদের খেলা দেখে। তারও ওদের সংগে খেলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অপরিচিতের সংকোচ কাটিয়ে সে পারে না তাদের সংগে মিশতে। সুভগ সিং অবশ্যি বলে, যা না বেটা, ওদের সংগে গিয়ে খেলা কর না। কিন্তু বচ্চন যায় না।

মাঝে মাঝে বচ্চন তার বাবাকে তাড়া দেয়। বলে, আমার এখানে থাকতে আর ভালো লাগে না, পাপাজী। ইন্দিরাজীকে দেখাবে না?

ছেলের মনের কথা টের পেয়ে জবাব দেয় খড়গ্ সিং, জরুর, নিশ্চয়ই দেখাবো। একদিন সাউথ ব্লকে ইন্দিরাজীর অফিসের কাছে গিয়ে তোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। ওখানেই দেখতে পাবি ইন্দিরাজীকে।

–সাউথ ব্লক কি পাপাজী? জিজ্ঞেস করে বচ্চন।

জবাব দেয় খড়গ্ সিং, ওটাই তো ইন্দিরাজীর অফিস। রোজ সকাল সাড়ে ন'টা দশটায় উনি ওখানে আসেন।

–গাড়িতে চেপে আসেন?

হেসে খড়গ্ সিং বলে, গাড়িতে চেপে না তো হেঁটে আসবেন নাকি?

নিজের বোকামিতে নিজেই লজ্জা পায় বচ্চন। তারপর আবার আবদারের সুরে বলে, তাহলে আর দেরি করছো কেন, পাপাজী? কাল সকালেই চলো না।

একটু ম্লান হেসে খড়গ্ সিং আবার বলে, না বেটা, কাল তো আমার ছুটি নেই। একটা ছুটির দিন যাবো।

–কবে, রবিবার?

–না বেটা, বলতে থাকে খড়গ্ সিং, আমার ছুটি তো রবিবার নয়। বুধবার আমার ছুটি। আসছে বুধবার সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তোকে নিয়ে বেরোবো। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দিল্লি শহরটা দেখবি, ইন্দিরাজীকে দেখবি।

বচ্চনের কিন্তু আর তর সয় না। তার ইচ্ছে হয় এখনই সে বেরিয়ে পড়ে ইন্দিরাজীকে দেখতে। সেই সংগে দিল্লি শহরটা দেখা তো ফাউ। মনে মনে সে হিসেব করে বুধবার আসতে আর ক'টা দিন বাকি।

অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত বুধবার। সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ঘুম ভাঙলো বচ্চনের। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে বাপের হাত ধরে ইন্দিরাজীকে দেখতে বেরিয়ে পড়লো বচ্চন। যাবার আগে সুভগ সিংকে আমন্ত্রণ জানাতেও সে ভুললে না। বললে, যাবে নাকি আমাদের সংগে ইন্দিরাজীকে দেখতে, চাচাজী?

মৃদু হেসে সুভগ সিং বললে, না বেটা, অনেক দেখেছি তাঁকে। তুই যা।

বাপ ছেলে এসে দাঁড়ায় সাউথ ব্লকের কাছে। চারদিকে প্রহরী। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর প্রতীক্ষা করতে থাকে।

সাড়ে ন'টা থেকে এগারোটা। পাকা দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও যখন ইন্দিরাজীকে দেখা গেল না তখন কেমন যেন সন্দেহ হয় খড়গ্ সিংয়ের। ইন্দিরাজী দিল্লি আছেন তো? না থাকলেই তো বিপদ। ছেলেটাকে সে কী বলে প্রবোধ দেবে?

অধৈর্য হয়ে উঠেছে বচ্চন। বারে বারে জিজ্ঞেস করছে খড়গ্ সিংকে, ইন্দিরাজী কখন আসবে, পাপাজী? আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? বচ্চনের মত খড়গ্ সিংও ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তাই সে এবার ছেলের হাত ধরে এগিয়ে যায়।

সামনেই প্রহরীদের জটলা। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তারা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। খড়গ্ সিং বচ্চনের হাত ধরে তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই একজন বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কী চাই এখানে?

জবাব দেয় খড়গ্ সিং, ইন্দিরাজী আজ এখানে আসবেন না?

–কেন, কী দরকার? আবার সেই রুক্ষ কণ্ঠস্বর প্রহরীটির।

–না, কোনো দরকার নেই, একটা ঢোক গিলে বলতে থাকে খড়গ্ সিং, আমার এই লেড়কাকে নিয়ে এসেছিলাম ইন্দিরাজীকে দেখাতে। ইন্দিরাজীকে দেখার বড় ইচ্ছে ওর।

সহসা প্রহরীদের আলোচনা থেমে যায়। সকলের দৃষ্টি এসে পড়ে ছোট বচ্চনের ওপর। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না।

অবশেষে একজন দু পা এগিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে খড়গ্ সিংকে বললে, জলদি হঠো হিঁয়াসে। ইন্দিরাজীকো গোলি মার দিয়া।

–ইন্দিরাজীকে গুলি করেছে? স্খলিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে প্রহরীটির মুখের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে খড়গ্ সিং। কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না তার।

সেই মুহূর্তে শূন্যতা ফুটে উঠেছে বচ্চনের চোখেও। সেকি, ইন্দিরাজীকে গুলি করা সম্ভব নাকি? তবে কি ইন্দিরাজীকে দেখতে দেবে না বলে এরা তাদের এভাবে ভাঁওতা দিচ্ছে? কিন্তু এদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে ভাঁওতা বলেও তো মনে হচ্ছে না। তাহলে?

খড়গ্ সিং নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, ইন্দিরাজী বেঁচে আছেন তো?

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রহরীটি জবাব দেয়, জানি না। হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

–কে গুলি করেছে?

–জানি না।

–কখন গুলি করেছে?

–কিছুক্ষণ আগে।

–কোথায়?

এবারও প্রহরীটি কর্কশ কণ্ঠে জবাব দেয়, গুলি করেছে তার নিজের বাড়িতে। যাও–যাও, হঠো। ঘর চলা যাও জলদি। পথে-ঘাটে গোলমাল হতে পারে।

এতক্ষণে খেয়াল হয় খড়গ্ সিংয়ের। সত্যিই তো গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হতে পারে। পথে-ঘাটে গন্ডগোল হতে পারে। সংগে আবার রয়েছে একটা ছোট ছেলে।

আর একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে ছেলের হাত ধরে হন-হন করে বাড়ির পথ ধরে খড়গ্ সিং। বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে

কেন, কী দরকার? আবার সেই রুক্ষ কণ্ঠস্বর প্রহরীটির।

যেতে বচ্চন বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ওরা সচ্ বলেছে, পাপাজী? ইন্দিরাজীকে গুলি করেছে?

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় খড়গ্ সিং জবাব দেয়, হ্যাঁ বেটা, সচ্। ওরা সত্য কথাই বলেছে। ইন্দিরাজীর নামে একথা কি মিথ্যে হতে পারে? কথার শেষে মুখখানা পাথরের মতো করে পথ চলতে থাকে খড়গ্ সিং। তার মনের মধ্যে তখন ঝড়ের তান্ডব। তার জীবনে নানকজীর পরেই যার স্থান সেই ইন্দিরাজীকে গুলি করা হয়েছে! তিনি এখন হাসপাতালে! এ কেমন করে সম্ভব হলো?

বাড়ি ফিরে এসে মনমরা হয়ে রইলো বচ্চন। ফলবতী হলো না তার আশা। দেখতে পেলো না সে ইন্দিরাজীকে।

সারাটা দিন সেভাবেই কাটলো বচ্চনের। সে লক্ষ্য করছিল তার বাবার মুখে কোনো কথা নেই। বৃদ্ধ সুভগ সিংয়ের সংগে মাত্র কয়েকটা কথা সে বলেছিল। তারপরেই ঝিম্ মেরে পড়ে রইলো খাটিয়ার ওপর।

সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির বাসিন্দা আর একজন মাত্র ফিরে এসে জানালে যে ইন্দিরাজীর নাকি মৃত্যু হয়েছে। তাঁরই দুজন শিখ প্রহরী তাঁকে হত্যা করেছে। গোটা দিল্লি শহরে দাংগা-হাংগামা শুরু হয়ে গেছে। সে আরও বললে, বেছে বেছে শিখদের ওপরেই নাকি হামলা চলছে। তাদের বাড়ি-গাড়ি,

দেব সাহিত্য কুটীরের নবতম উপহার

ক্রাইম সিরিজ

রহস্য, রোমাঞ্চ, সন্ত্রাস, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। প্রতি মাসে একটি করে বেরুচ্ছে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম মাত্র সাত টাকা। লিখছেন

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

১৫ই সেপ্টেম্বর বেরিয়েছে

মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর

গুপ্তঘাতক দলের নেতা মৃত্যুদূত, ভারতবর্ষের চরম শত্রু। একটি লোক, যে বিদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে সেই শুধু জানে এই গুপ্তঘাতকের প্রকৃতি। মৃত্যুদূতের সবচেয়ে সাংঘাতিক চক্রান্তে সারা ভারত ওলোট পালোট হয়ে যাবে। এই চক্রান্তের খবর কানে এলো এক ভারতীয় এজেন্টের। মরণপণ সংগ্রামের জন্য তৈরী হল সে...

১৫ই আগস্ট বেরিয়েছে

অদৃশ্য কালোহাত

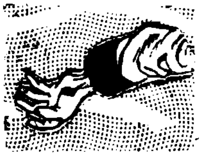

সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের একটি মিনিবাস আমস্টারডাম থেকে বম্বে আসছে। সেই বাসে লন্ডন-প্রবাসী দুই ভারতীয় ছাত্রী। গ্রীস, তুর্কী, আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান হয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে মিনি বাসটি ক্রমশঃ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে কোনো দুঃস্বপ্ন নিয়ে....?

১৫ই জুলাই বেরিয়েছে

জ্বলন্ত আগুন

মিউনিখ থেকে ভিয়েনা আসছে সাসিট এক্সপ্রেস, ভেতরে চার রাষ্ট্রনায়ক। তাঁদের খুন করবে জনৈক দেহরক্ষী। ঘাতক সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন পদ্মনাভন। এর আগেই এক ভারতীয় এজেন্ট খুন হয়ে গেলেন এক নির্জন হ্রদে-তারপর ...আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের এক নৃশংস দৃশ্যপট।

এর আগে বেরিয়েছে

বুলেটের শিস : উজ্জ্বল নীল মৃত্যু : উড়ন্ত বাজ

দেব সাহিত্য কুটীর : ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

দোকান-পাট লুঠ হচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

কথাটা শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে বচ্চনের। কিন্তু ঘরের মধ্যে থমথমে আবহাওয়ায় কথাটা সে কাউকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। অবশেষে থাকতে না পেরে এক সময় সে জিজ্ঞেস করেই বসে খড়্গ্ সিংকে, পাপাজী, ওরা সবাই শিখদের মারছে কেন?

খড়্গ্ সিং কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় সুভগ সিং, যারা ইন্দিরাজীকে খুন করেছে তারা শিখ বলে।

—কিন্তু চাচাজী, যাদের ওরা মারছে তারা তো ইন্দিরাজীকে খুন করেনি।

—হ্যাঁ বেটা, সচ্। লেকিন—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সুভগ সিং। সে বুঝতে পারে না এই ছোট ছেলেটাকে সে কী জবাব দেবে।

বচ্চন আবার তার বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পাপাজী, তুমিই না আমাকে গল্প করেছিলে যে গান্ধীজীকে যে লোকটা মেরেছিল সে ছিল একজন হিন্দু?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে সায় দেয় খড়্গ্ সিং।

—তাহলে কি সেদিনও সবাই মিলে হিন্দুদের মেরেছিল?

আবার একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে সেখানে। ছোট্ট বচ্চনের এই প্রশ্নের জবাব সেই মুহূর্তে কেউই দিতে পারে না।

রাত প্রায় আটটা। বড় খিদে পেয়েছিল বচ্চনের। সেই সকালের পরে সারাদিন আর পেটে কিছু পড়েনি। একসময় সে বাপের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললে, ভুখ লাগা, পাপাজী।

হঠাৎ যেন খেয়াল হয় খড়্গ্ সিংয়ের। একটার পর একটা ঘটনায় এতক্ষণ সে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। তাই খানা পাকানোর কথা এতক্ষণ তার মনেই পড়েনি। ইন্দিরাজীর মৃত্যু—শিখদের ওপর অত্যাচার—তাদের বাড়ির বাকি ক'জনের অদৃষ্টে কী ঘটেছে, তারা কোথায় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েই এতক্ষণ বসে বসে সে চিন্তা করছিল।

খাটিয়া থেকে নেমে আসে খড়্গ্ সিং। ছুটির দিন খানা পাকানোর দায়িত্ব তার নিজের। একটা কানা চোখ ও প্রায়-অবশ একটা হাত নিয়ে কষ্ট হলেও এই একটি দিনের রান্না-বান্নার দায়িত্ব সে নিজের হাতেই রেখেছিল।

বারান্দায় এসে উনুন জ্বালায় খড়্গ্ সিং। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই সে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ কে যেন দরজায় ধাক্কা দেয়। এতক্ষণে বাড়ির বাসিন্দা আর কেউ ফিরে এলো মনে করে দরজা খুলে দেয় সুভগ সিং। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে পাশের বাড়ির লালাজী। ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তোমরা তিনজন কেন, সর্দারজী? বাকিরা কোথায়?

—তারা এখনও ফেরে নি। জবাব দেয় সুভগ সিং।

—হায় ভগবান! হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে রামপ্রসাদ শর্মা,

এখনও যখন ফেরে নি তখন তাদের কপালে কী ঘটেছে কে জানে?

উনুনের পাশ থেকে উঠে এসে খড়্গ্ সিং জিজ্ঞেস করে, আপনি এইমাত্র ফিরলেন নাকি, লালাজী? শহরের অবস্থা কী রকম?

–খুব খারাপ–খুব খারাপ, বলতে থাকে রামপ্রসাদ, ইন্দিরাজী খুন হয়েছেন, ভয়ংকর দুঃখের কথা। ভাবাই যায় না যে এমনটা কখনও ঘটতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবাই পাগল হয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে? পথে-ঘাটে নিরপরাধ শিখদের ওপর হামলা করতে হবে? তাদের খুন করতে হবে? তাদের দোকানপাট লুঠ করতে হবে? না–না, এভাবে চলতে পারে না–কিছুতেই পারে না। সব রসাতলে যাবে।

একটু থেমে লালাজী নিজের মাথার কালো টুপির ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার বললে, শোনা সর্দারজী, গুন্ডাদের জাত নেই। তাদের বিশ্বাসও নেই। আমাদের এদিকে যদিও এখনও হাংগামা ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু ছড়াতে কতক্ষণ? আজ রাতটা তোমরা আর এখানে থেকো না। চলে এসো আমার বাড়িতে। গুন্ডারা আমার বাড়ি চড়াও হতে সাহস পাবে না। দেরি করো না। শীগগির চলে এসো।

–লেকিন এতনা সামান? বলে ওঠে সুভগ সিং, এত জিনিসপত্র নিয়ে কি করে আপনার মোকামে আশ্রয় নেব, লালাজী?

বিরক্তি কণ্ঠে বলে ওঠে রামপ্রসাদ, ছোড় সামান। থাক জিনিসপত্র এখানে পড়ে। জীবনের দাম জিনিসপত্রের চাইতে অনেক বেশি।

–ঠিক আছে–ঠিক আছে, এবার জবাব দেয় খড়্গ্ সিং, আমাদের খানা তৈরি। তাড়াতাড়ি খেয়েই আমরা আসছি।

–হ্যাঁ, তাই এসো। তুরন্ত্ এসো। দেরি করো না।

কথার শেষে রামপ্রসাদ বেরিয়ে যায়। খড়্গ্ সিং দ্রুত হাতে খাবার ভাগ করতে থাকে।

কোনো রকমে খাওয়ার পাট চুকিয়ে খড়্গ্ সিং বললে সুভগ সিংকে, চাচাজী, আপনি ছেলেটাকে নিয়ে লালাজীর ওখানে চলে যান। আমরা দু'জনে আসছি।

–কেন, তোমরা দেরি করবে কেন?

ম্লান হেসে জবাব দেয় খড়্গ্ সিং, যতই কেন না বলি জীবনের দাম বেশি, কিন্তু মালপত্রের দামও তো কম নয়। আপনি বুড়ো মানুষ। আপনি ওকে নিয়ে যান। আমরা যতটা পারি জিনিসপত্র নিয়ে এখনই আসছি।

খড়্গ্ সিংয়ের কথায় বচ্চনের মনটা যেন কেমন করে ওঠে। বাপকে ছেড়ে তার যেতেই ইচ্ছে করছিল না। তাই সে বললে, মালপত্র পড়ে থাক, পাপাজী। তোমরাও চলো আমাদের সংগে।

একটু ম্লান হেসে ছেলেকে আদর করে খড়্গ্ সিং বলে ওঠে, ডরো মত্, বেটা। তোমরা যাও। আমরা এখনই আসছি।

রামপ্রসাদের অনুমান যে মিথ্যে নয় তা' বোঝা গেল একটু পরেই। তার বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল সুভগ সিং ও বচ্চন। আর ওদিকে পাশের বাড়ির একতলার একটি ঘরে খড়্গ্ সিং ও তার সংগী তাড়াতাড়ি দামী জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

হঠাৎ বড় রাস্তার ওপর জেগে ওঠে একদল মানুষের পৈশাচিক চিৎকার। নরমেধ যজ্ঞ করতে বেরিয়েছে তারা। হাতে তাদের ধারালো অস্ত্র, কণ্ঠে নিহত ইন্দিরাজীর জন্যে শোকের উল্লাসধ্বনি।

দুর্ভাগ্য খড়্গ্ সিং ও তার সংগীর। ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে তারা বাইরে বেরোবার জন্যে পা বাড়াতেই সেই পিশাচের দল হৈ হৈ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। তারপর–।

মাত্র পনেরো মিনিট। এই সময়টুকুর মধ্যেই দু'টো নরহত্যা ও লুঠপাট চালিয়ে বীরপুরুষের দলটি সরে পড়ে সেখান থেকে। পথে একটা ফেলে যাওয়া জীপ গাড়িতে আগুন দিতেও ভোলে না তারা। এভাবে মানুষ খুন ও লুঠপাটের মাধ্যমেই তারা তৃপ্তি কামনা করে ইন্দিরাজীর অমর আত্মার।

দুটো বাড়ির মধ্যের সেই ফাঁকা জায়গাটুকু রক্তে ভিজে উঠেছে। তারই মধ্যে পড়ে আছে খড়্গ্ সিং ও তার সংগীর প্রাণহীন দেহ। সেই দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে বৃদ্ধ সুভগ সিং। কাঁদতে কাঁদতে সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রামপ্রসাদকে জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, এ ক্যেয়া হুয়া লালাজী–কেয়া হুয়া?

আশ্চর্য মনের শক্তি আট বছরের ছেলে বচ্চনের। চোখের পাতা দু'টো পর্যন্ত কাঁপে না তার। মুখেও কোনো শব্দ নেই। স্থির চোখে সে কেবল তাকিয়ে থাকে তার পাপাজীর রক্তমাখা দেহটার দিকে।

দিন কয়েক হলো বৃদ্ধ সুভগ সিং ও কিশোর বচ্চন হাজার হাজার নিরপরাধ অসহায় শিখ নর-নারীর মতো একটা শিখ গুরুদ্বারে এসে আশ্রয় নিয়েছে। প্রাণের আশংকা নেই এখানে। চারিদিকে সশস্ত্র মিলিটারির পাহারা। খেতে-পরতে পাচ্ছে তারা। বৃদ্ধ সুভগ সিং খানিকটা সামলে উঠেছে এই কটা দিনে। বলতে গেলে সে-ই এখন বচ্চনের অভিভাবক। বচ্চন কিন্তু আশ্চর্য রকম ধীর-স্থির। কোনো কথা বলে না কারুর সংগে। এমনকি সুভগ সিংয়ের সংগেও নয়। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও কোনো জবাব দেয় না। কেবল ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে। পাপাজী খড়্গ্ সিংয়ের মৃত্যুর দিনটি থেকে বচ্চন যেন বোবা হয়ে গেছে।

ইন্দিরাজীর অন্ত্যেষ্টি। বিরাট শোভাযাত্রা যাবে গুরুদ্বারের পাশের বড় রাস্তা দিয়ে। আবার নতুন করে হাংগামার আশংকায় গুরুদ্বারের প্রধান ফটক বন্ধ। এমনকি দোতলার ছাদে ওঠার সিঁড়ির দরজাও বন্ধ। শোক-দুঃখের মধ্যেও মানুষের কৌতূহল যায় না। তাই স্বামীহারা স্ত্রী পুত্রহারা মাও এসে দাঁড়িয়েছে গুরুদ্বারের জানালার পাশে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যারিবিয়ানের কড়চা ১০·০০
বাদশা গোলাম ৬·০০
আমাদের সেরা খেলোয়াড় ৬·০০
ক্লাবের নাম মোহনবাগান ৮·০০
ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল ৮·০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত
আমাদের মতো খেলো ৫·০০

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন ৮·০০
ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে ৬·০০
ব্যাটের রাজা গাভাসকার ১০·০০
বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি ৭·০০
শীতের দুপুরে দুই প্রতিবেশী ৬·০০
তিন পুরুষ ৮·০০
ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার
আইন কানুন ১২·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
গ্রেটেস্ট টেস্ট ৮·০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

শোভাযাত্রা দেখতে। প্রচণ্ড ভিড় সেখানে।

গুরুদ্বারের প্রশস্ত চত্বরের একপাশে আপন মনে বসে বসে কী যেন ভাবছিল বচ্চন। ইন্দিরাজীর শেষ যাত্রা আজ। এই ইন্দিরাজীকে দেখতেই মাত্র কয়েকটি দিন আগে সে এসেছিল গুরুদাসপুর জেলার এক পাড়াগাঁ থেকে বাপের হাত ধরে। দেখা আর হলো না ইন্দিরাজীকে। তার আগেই তিনি চলে গেলেন। সেই সংগে চলে গেল তার পাপাজীও। ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার মধ্যে চলে গেল সে। উঃ, কী নিদারুণ সেই দৃশ্য! চারিদিকে রক্তের স্রোত। তার মধ্যে পড়ে আছে তার পাপাজী। না, কান্না আসে না বচ্চনের। পাপাজীর মুখখানা মনে পড়লেও কান্না আসে না তার।

শোভাযাত্রা এসে পড়েছে গুরুদ্বারের সামনে। লক্ষ কণ্ঠের শোকার্ত ধ্বনি– ইন্দিরাজী অমর রহে।

কী যেন হলো বচ্চনের। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় দোতলায়। সেখান থেকে ছাদের সিঁড়ির দিকে।

না, ছাদে যাবার উপায় নেই। সিঁড়ির দরজা বন্ধ। দু'পাশের কোল্যাপ্‌সিব্‌ল্ গেটেও ঝুলছে মস্ত তালা।

একটু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে চিন্তা করে বচ্চন। গেটের মাথার দিকে সামান্য একটু ফাঁক। অতটা উপরে উঠতে পারলে সেই ফাঁক গলে ওপাশে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার একটু সময় চিন্তা করে সে। না, ছাদে যেতেই হবে তাকে। দেখতেই হবে ইন্দিরাজীকে। জীবিত ইন্দিরাজীকে যখন দেখতে পারলো না তখন মৃত ইন্দিরাজীকেই সে দেখবে।

অনেক পরিশ্রমের পরে গেটের মাথার দিকে উঠতে সমর্থ হয় বচ্চন। তারপর সেই ফাঁক গলে কোনোমতে ওপাশে গিয়ে এসে দাঁড়ায় ছাদে।

একটা মস্ত অজগরের মত সচল শোভাযাত্রা। রাজধানী দিল্লির সমস্ত মানুষ যেন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে তাদের ইন্দিরাজীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। গুরুদ্বারের ছাদের ওপর আট বছরের ছেলে বচ্চন একা দাঁড়িয়ে। নজর তার নিচের জনস্রোতের দিকে।

অবশেষে একসময় এলেন ইন্দিরাজী। খোলা মিলিটারি গাড়ির মধ্যে ফুলের পাহাড়। তার মধ্যে শুয়ে আছেন তিনি। মাথায় অল্প ঘোমটা। চোখ দুটি বন্ধ।

ছাদের ওপর থেকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ইন্দিরাজীর দিকে তাকিয়ে থাকে বচ্চন। চোখের পলক ফেলতেও সে ভুলে যায়। তার অনেক দিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হলো। ইন্দিরাজীকে দেখতে পেয়েছে সে।

হঠাৎ চোখ দু'টো জ্বালা করে ওঠে বচ্চনের। সংগে সংগে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। বাঁধাভাঙা বন্যার মতো চোখের জলের মধ্যে সে পাগলের মতো বলতে থাকে–বোলো–বোলো ইন্দিরাজী, আমার বাবার কী দোষ? মেরে পাপাজী কা ক্যা কসুর?

ছবি: সরোজ সরকার

আমার বন্ধু গোপাল সেনদের (মিহির সেন) একটি সুন্দর বাড়ি আছে হাজারীবাগ শহরে। সে বাড়িতে প্রথম যাই আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে। তখন আমরাও ছাত্র এবং তোমরা কেউই জন্মাওনি। হয়ত তোমাদের অনেকের মায়েরাও জন্মাননি।

চারদিকে ঘন জঙ্গল আর সীতাগড়া, সিলাওয়ার আর কান্‌হারী পাহাড় ঘেরা হাজারীবাগ শহরটির মতন সুন্দর জায়গা তখন কমই ছিল। আমাদের বয়সও কম থাকাতে মনের সজীবতাও তখন অন্যরকম ছিল। যাইই দেখতাম, যাইই করতাম, তাইই খুশিতে ভরে দিত মন।

হাজারীবাগের কথা এবং বন্দুক-হাতে আমাদের সেই সময়ের হাজারীবাগের চারদিকের জঙ্গলে পাহাড়ে দুরন্তপনার কথা বলতে বসলে একটি আলাদা বইই লিখতে হয়। কত রকম চরিত্রই যে হাজারীবাগে বিভিন্ন বার গিয়ে দেখেছি, সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

গোপালদের বাড়িতে যে কাজের লোকটি ছিল, আজও আছে সে; তার নাম ছিল চমন। ওরকম বুদ্ধিমান কিন্তু বোকা-সেজে-থাকা লোক আমি আর দেখিনি। গোপাল এবং গোপালের মা কল্যাণী মাসীমা এবং ছোট বোন বুড়ি প্রত্যেকেরই দেশি বিদেশী রান্নায় হাত ছিল দারুণ। তাই মিস্টার চমনলাল তাদের সকলের কাছ থেকেই নানারকম রান্না শিখেছিল। কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে মুসুরীর ডালের খিচুড়ি যা রাঁধত চমন, তার তুলনা নেই কোনো।

চমন যখন নিজে কথা বলত, ওর বাঁ চোখটা বুঁজে আসত। যখন অন্যর কথা শুনত, তখন ওর ডান চোখটা বুঁজে আসত। কোনো কথা ওর পছন্দসই না হলে ওর কানদুটো নড়ত এবং সে কথা আদৌ শুনেছে বলে ভুলেও জানান দিত না।

চমনের হাসিটাও ছিল অদ্ভুত। হাসবার সময় ওর মুখটা তিনকোনা হয়ে যেত। ও আমাদের সকলেরই ভালবাসার লোক ছিল বলে ওর কান-নাড়ানো ইচ্ছা-বধিরতা, এবং তিনকোনা হাসি সত্ত্বেও ওকে নাহলে গোপাল এবং তার অগণিত বন্ধুবান্ধবদের কারোই চলত না।

গোপালের নাপিতের নাম ছিল মহাবীর। তার নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনোই মিল ছিলো না। রোগা চিমসে দেখতে, মুখে চাণক্যের মত বুদ্ধির ছাপ। ওর মুখ দেখে মনের ভাব কখনই আঁচ করা যেত না। ধুতি আর হাফ-শার্ট পরে, হাতে কাঠের ছোট্ট বাক্সে ওর শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজামৎ মিস্টার মহাবীর প্রতি

কিত্‌নামে লায়া ?

বুদ্ধদেব গুহ

সকালে বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ এসে হাজির হত। পালা করে সে ভিতরের ঢাকা-বারান্দার রোদে তেল মাখাত আমাদের। আর অজস্র গল্প শোনাত। ওর বাড়ি ছিল সিন্দুর গ্রামে। যে গ্রামে গোপালদের মালী করম্‌-এর বাড়ি ছিল। করম্‌ মানুষটির মুখ দেখে মনে হত পৃথিবীর কারো কাছেই কোনো ব্যাপারে ওর অনুযোগ নেই কোনো। অমন নিঃশর্ত সমর্পণের হাসিমুখ খুবই কম দেখা যায়।

দারুহা, কিচিং ভূতের গল্প, নানারকম পেত্নীর গল্প করত মহাবীর আমাদের। চুল কাটতে গিয়ে কোন্ পান্ডে সাহেবের বাঁ কান কেটে ফেলেছিল ও এবং পরে জংলী আঠা দিয়ে সে কান কী করে সেঁটেও দিয়েছিল এরকম নানা গল্প করত। মহাবীরের মত আজগবী গল্প অমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে করতে খুব কম লোককেই দেখেছি। ও হাসত খুব কম। হাসবার সময়ও ঠোঁটদুটি পুরো ফাঁক হত না। তার জাতের বুদ্ধিমান হিসেবে যে বিশেষ খ্যাতি ছিল, সে তা পুরোপুরিই অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

একবার আমার মায়ের হাঁটুতে আর্থরাইটিস হয়। মা হাঁটতে পর্যন্ত পারতেন না। গোপালদের হাজারীবাগের বাড়িতে মা ও বাবা গিয়েছিলেন কিছুদিন শীতকালে। কলকাতার ডাক্তাররা কেউই ভাল করতে পারলেন না মাকে। মহাবীর শুকনো মহুয়া তাওয়াতে সেঁকে সেই মহুয়া দিয়ে রোজ হাঁটু মালিশ করে দিয়ে পায়ের ব্যথা একেবারেই সারিয়ে দিয়েছিল।

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন প্রায়ই মহাবীরের কথা বলতেন।

আজ কল্যাণী মাসীমাও (গোপালের মা) নেই, আমার মাও নেই। এবং মহাবীরও চলে গেছে।

অনেকদিনই যাইনি হাজারীবাগে। শুনেছি, এখন মহাবীরের ছেলেই হাজামৎ-এর কাজ করে এবং আসে গোপালদের বাড়ি, 'পূর্বাচলে'।

বড়হি রোডের উপর পূর্বাচলের প্রায় উল্টোদিকেই বেরিয়ে গেছে রিফর্মেটরীর রাস্তা। এখন লেকের পাশে এবং পূর্বাচলের উল্টোদিকে বনবিভাগ সিঙ্কোনার প্লানটেশান্ করেছেন। তখন ছিল মোরব্বার ক্ষেত (সিসাল্ হেম্প্), যা দিয়ে দড়ি তৈরী হয়। তাতে ছিল তিতির, খরগোশ আর সাপেদের আড্ডা। বৃষ্টির মধ্যে আমি আর গোপাল বন্দুক-হাতে ভিজে ভিজে ওখানে রাতের খাবারের জন্যে তিতির খরগোশ মারতে যেতাম।

সেই মোরব্বা ক্ষেতের মধ্যেই, বলতে গেলে, রিফর্মেটরীর মোড়ে একটি নতুন বাড়ি তৈরী হল। বাড়ির মালিক কে ছিলেন তা মনে নেই আজ। সেই মূল মালিক এখন নেইও সে বাড়ির। শুনেছি, বিক্রী করে দিয়েছেন অন্যকে। তখন কণ্ঠেবাবু বলে এক ভদ্রলোক সেই বাড়িতে থাকতেন। বোধহয় বাড়ির কেয়ার-টেকার হিসেবে। মালিকের সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। তখন তাঁর বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আমাদের তখনকার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ।

আমরা গিয়ে পৌঁছতেই উনি এসে হাজির হতেন। কোনো নতুন জিনিস, সে সিগারেট লাইটারই হোক, পাইপই হোক, জামা, কাপড়, জুতো, বন্দুক যাইই হোক না কেন, কণ্ঠেবাবু জিনিসটি নিজের হাতে তুলে নিয়েই অথবা আঙুল দিয়ে দেখিয়েই বলতেন, "কিত্‌নামে লায়া?"

মানে, কত দিয়ে কিনেছি?

তাঁর ভাবগতিক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গোপাল একদিন বলেছিল, কণ্ঠেবাবুর জন্যে দেখছি আমাদের কারোই বিয়েও করা যাবে না কোনোদিন।

শুধিয়েছিলাম, কেন?

নতুন বৌ নিয়ে হাজারীবাগে এসে উঠলেই কণ্ঠেবাবু প্রথম প্রশ্ন করবেন, "কিত্‌নামে লায়া?"

গোপালদের বাড়ির আউট-হাউসে একজন রাজা-সাহেব ভাড়া থাকতেন। পালামৌর লাদিগড়ের কুমার সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের রিস্তেদারী ছিল। বড়হি রোডে হাজারীবাগ থেকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে কাঁচা রাস্তায় ঢুকে গেলে 'জলৌন্' বলে একটি গ্রাম আছে। সেখানেই ছিল তাঁদের জমিদারী। জলৌনের রাজাসাহেবের চেহারাখানা ছিল পেল্লায়। ওঁর একটি বদভ্যাস ছিল। চারজন অনুচরকে, তাঁর ঘুমোবার সময় দুখানি পা-কে লাগাতার "দেবে" দিতে হত। একজনের হাতও যদি থামত একমুহূর্তের জন্যে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে যেত রাজাসাহেবের। রূপোবাঁধানো ছড়ি পড়ত সেই বদ্‌তমিজ্ অনুচরের পিঠে। এসব শুনে ভাবতাম, একেই বোধহয় বলে "রহিসী"।

রাজাসাহেবের বাবা আর ঠাকুর্দা দুজনে মিলে দে-দনাদ্দন্ দে-দনাদ্দন্ করে রাইফেলের গুলি চালিয়ে একটি পাগলা হাতী কি করে মেরেছিলেন তারও গল্প শুনিয়েছিলেন আমাদের জলৌন্-এ বসে একদিন। এই সব অনেক মজার গল্পই আমার 'জঙ্গলমহল' বইতে আছে "একদফে বাপ মারিস্, একদফে বেটা মারিস্, বাপ মারিস্ বেটা মারিস্ বেটা মারিস্ বাপ মারিস্" এই করতে করতে হাতী ত গেল পড়ে। কিন্তু যখন পড়ল তখন দেখা

গেল বাপ বেটার গুলি শ-গিয়ে হাতীকে একেবারে মধ্যে দিয়ে চিরে দু-ফালা করে দিয়েছে। "হাত্থী যব-গিড়হিস্ তব্ এক হাতী ইধির্ ঔর দুস্‌রা হাত্থী উধির্।"

নাদিম সাহেব মহম্মদ নাজিম আসতেন বড়া মসজিদের কাছ থেকে সাইকেলে। কাঁকরের উপর কির-র-র শব্দ তুলে। পূর্বাচলের গেটের মধ্যে সাইকেলটা ঢুকিয়েই হাঁক দিতেন এ চম্‌না! চম্‌না হো।

এখনও কানে সেই সাইকেলের টায়ারের কির-র-র-র-র্ আওয়াজ আর তার গলার স্বর ভাসে।

দিশি বন্দুক আর জুতোর সামান্য দোকানী ছিলেন নাদিম সাহেব। কিন্তু অসামান্য ছিল তাঁর অন্তরের ঔদার্য। কত উমদা বিরিয়ানী আর কাবাব, কত বাখখরখোনি রোটি, কত ফির্‌নী যে খেয়েছি তাঁর, সে কথা বলার নয়। লক্ষ্ণৌ-এর আম, পাটনার রেউড়ি, গাজিপুরের আতর, আর তিতির-বটেরের মাংস, মাছের মত করে রান্না করা, সে সব কোনোদিনও ভোলার নয়। তাঁর কাছে আমাদের সকলেরই যে ঋণ জমা আছে, তা শোধ করতে অনেকবার আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে।

ইজাহারুল হক ছিল, হাজারীবাগ থেকে সীমারিয়া যাওয়ার পথের টুটিলাওয়া গ্রামের জমিদার। সেই সময়ে ঐ সমস্ত অঞ্চলেই ঘন জঙ্গল ছিল। টুটিলাওয়া থেকে বেরিয়ে গেছিল ওল্ড চাত্‌রা রোড। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

ইজাহারের মত শৌখিন মানুষ কমই দেখেছি। তার গাড়ি, তার বন্দুক-রাইফেল, তার জামা-কাপড় সব সময় থাকত ফিট-ফাট। ভাল শিকারিও ছিল সে। সীতাগড়ার মানুষখেকো বাঘটি হাজারীবাগের পুলিশ সাহেবের ছেলে যখন মারেন তখন অভিজ্ঞ ইজাহারই তাঁর সঙ্গে মাচায় বসেছিল।

সে সব অন্য গল্প।

টুটিলাওয়ার পথে, হাজারীবাগ থেকে কয়েক মাইল গেলেই ডাইনে কাছিম-পেঠা গোন্দা বাঁধের উঁচু পিঠটা মেঘের মত দেখা যেত। তার উপরে হুইসলিং টিলস্ উড়ত ঘুরে ঘুরে। বর্ষাকালে কুন্দফুলের মত বকের পাঁতি মালার মত দুলতে দুলতে ঢুকে যেত কালো মেঘের বহুতলা বাড়ির মধ্যে। সেই গোন্দা বাঁধেরই একটু আগে, বাঁদিকে একটি কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছিল কারো নদীর বুক কেটে। দুদিকে গা-ছমছম্ খোয়াই। কালি-তিতিরের বিধুর ডাকের মধ্যে লাল মাটির উঁচু-নিচু পথ কচি শালের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চলে গেছিল 'ক্বোসমা' গ্রামে।

রূপোবাঁধানো ছড়ি পড়ত সেই বদ্‌তমিজ্ অনুচরের পিঠে।

শ্রদ্ধেয় সুবোধ ঘোষ মশায়ের একটি গল্প আছে এই ক্বোস্‌মার পটভূমিতে।

এই ক্বোস্‌মা ছিল বলতে গেলে গোপালের খাস-জমিদারী। এখনও তা আছে। এখানে একসময় বড় বাঘ ছাড়া শিকার করিনি আমরা এমন জানোয়ার প্রায় ছিলোই না বলতে গেলে। একবা   স্টা পাগলা হাতীর উপদ্রবও হয়েছিল এখানে। নাদিম সাহেব আর কাড়ুয়ারা মিলে তাকে মারে। অনেকেই কষ্ট করে।

এই "কাড়ুয়াও" এক আশ্চর্য চরিত্র। আমার কোজাগর উপন্যাসের "কাড়ুয়া"-এরই আদলে গড়া। ইজাহারুল হকও অতি অল্প বয়সে মারা যান। নাজিম সাহেব ত নেইই। "ওয়ার্লড্‌কা সব্‌সে বীটিফুল জাগা" এই হাজারীবাগের সবচেয়ে বড় প্রবক্তাই আজ নেই। তবে কাড়ুয়া আছে। তার ভাই আসোয়াও আছে এবং আছে আরও অসংখ্য মানুষ-মানুষী ক্বোস্‌মা গ্রামের। যাদের কাছে গোপালবাবু 'ভগবানতুল্য' লোক। তার ছেলে-বেলার বন্ধু হিসেবে আমার সম্মানও তাদের কাছে আজও নেহাৎ কম নয়। এখনও গেলে, কত লোক যে ঘিরে ধরে। আমি তাদের চিনি না। গোপালের বন্ধু হিসেবে তারা আমায় চেনে।

কত কথাই যে মনে পড়ে হাজারীবাগের কথায়, পিছন ফিরে তাকালে!

মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যায়। আমাদের জীবনের একটা বিশেষ সময়, একটা অধ্যায়; মনে হয় শেষ হয়ে গেছে।

সেই সময়ের সব স্মৃতি ভীড় করে আসে মনে। মনে হয়, সদ্য-ঘটা সব ঘটনা বুঝি টাটকা, নতুন, চকচকে।

ভাগ্যিস কণ্ঠেবাবুও আজ নেই। থাকলে চোখ বড় বড় করে বলতেন, "কিত্‌নামে লায়া?"

ছবি: সরোজ সরকার

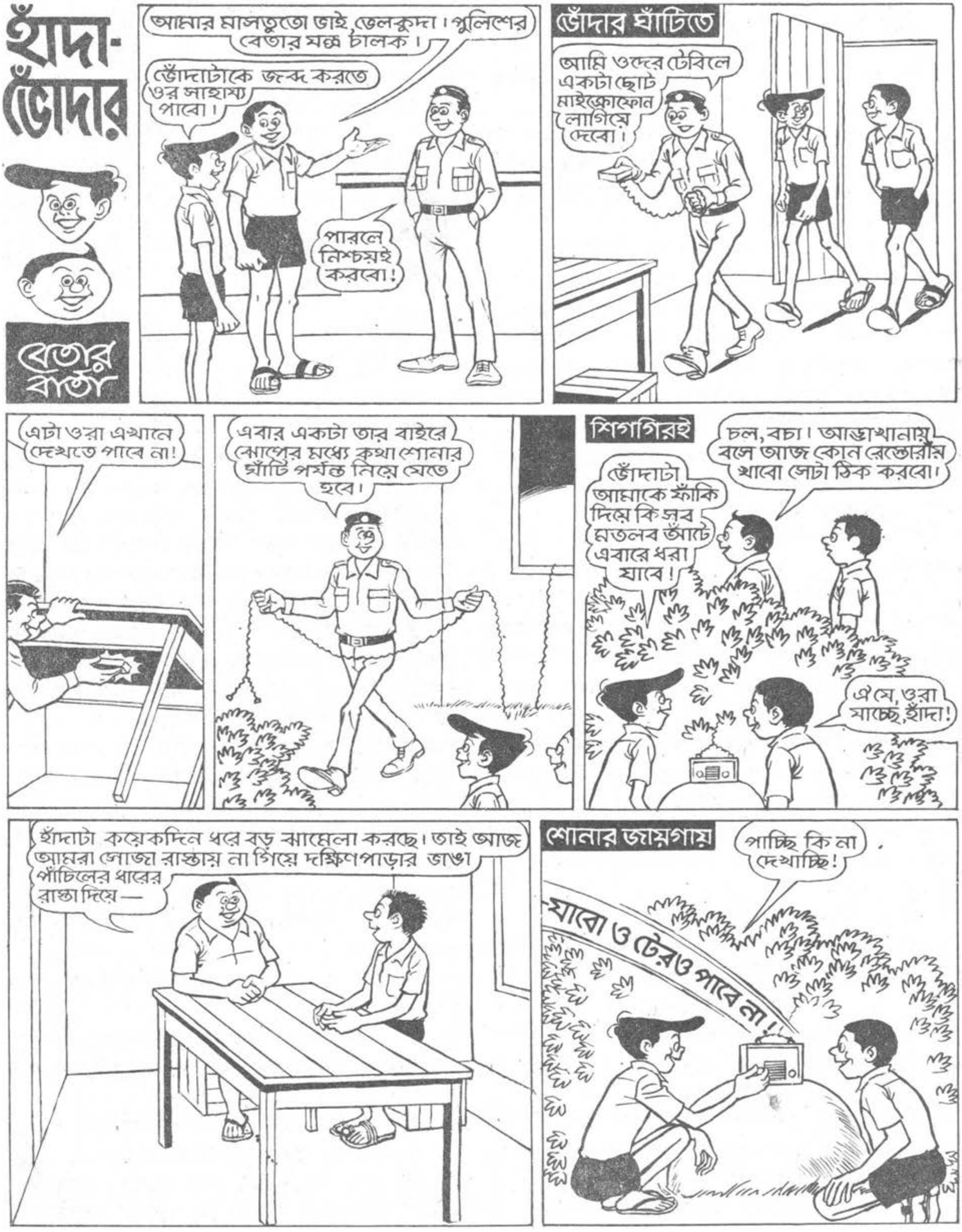
হাঁদা-ভোঁদার
বেতার বার্তা
আমার মাসতুতো ভাই ভেলকুন্দা। পুলিশের বেতার যন্ত্র চালক।
ভোঁদাটাকে জব্দ করতে ওর সাহায্য পাবো।
পারলে নিশ্চয়ই করবো!
ভোঁদার ঘাঁটিতে
আমি ওদের টেবিলে একটা ছোট মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেবো।
এটা ওরা এখানে দেখতে পাবে না!
এবার একটা তার বাইরে ঝোপের মধ্যে কথা শোনার ঘাঁটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।
শিগগিরই
চল, বচা। আড্ডাখানায় বসে আজ কোন রেস্তোরাঁয় খাবো সেটা ঠিক করবো।
ভোঁদাটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কি সব মতলব আঁটে এবারে ধরা যাবে!
ঐ যে, ওরা যাচ্ছে, হাঁদা!
হাঁদাটা কয়েকদিন ধরে বড় ঝামেলা করছে। তাই আজ আমরা সোজা রাস্তায় না গিয়ে দক্ষিণপাড়ার ভাঙা পাঁচিলের ধারের রাস্তা দিয়ে —
শোনার জায়গায়
পাচ্ছি কি না দেখাচ্ছি!
যাবো ও টেরও পাবে না!

বচা! আজ দিলপসন্দ রেস্তোরাঁতে খেয়ে সিনেমা দেখে তারপর ফিরবো!
সিনেমার খেল এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি—তৈরি হ', লটকা!
তোকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, ভোঁদা! তোর টাকা নিয়ে আমরাই ওটা তোর হয়ে করে দিচ্ছি, হোঃ হোঃ!
উফ!
ওফ!
আশ্চর্য! ওরা জানলো কি করে যে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি?
গেছি রে!
আবার ঘরে এসে
ঠিক আছে, এবার আমাদের এই ঘাঁটির কিছু দূরে যে ঝোপ ঝাড় রয়েছে—
—তার আড়াল দিয়ে চল যাবো! ওরা হদিশ করতে পারবে না!
বেরিয়ে আয়, বচা, ধারে কাছে কেউ নেই।
ভোঁদার আড্ডাঘর
আবার ওদের উত্তম মধ্যম লাগিয়ে মাল কড়ি হাতিয়ে নি!
মরেছে! ঠিক এখানেও হাঁদা ওর চামচা নিয়ে আমাদের থামাতে এসেছে।
এই রে! হামলার আগেই দেখে ফেলেছে!

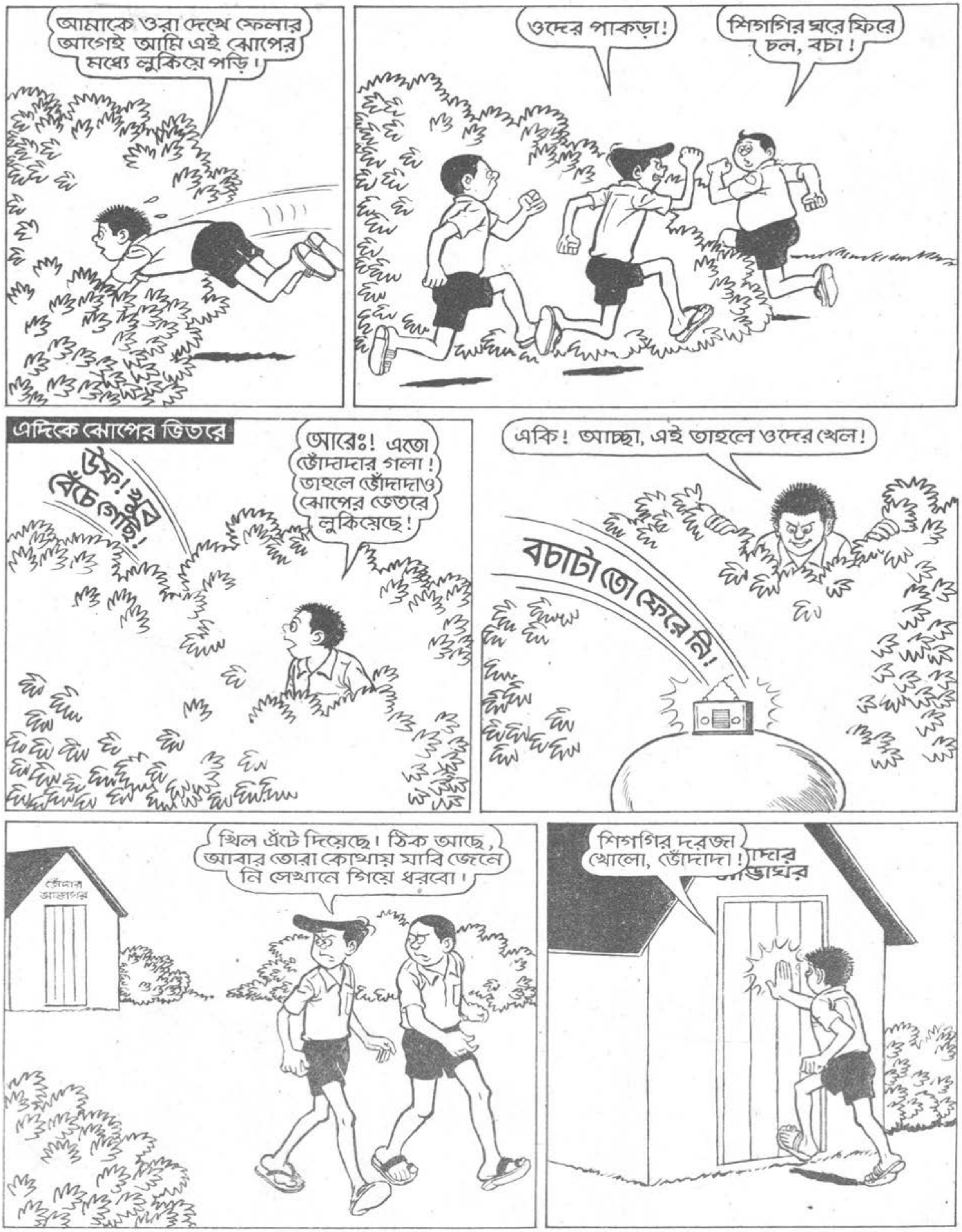
আমাকে ওরা দেখে ফেলার আগেই আমি এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি।
ওদের পাকড়া!
শিগগির ঘরে ফিরে চল, বচা!
এদ্দিকে ঝোপের ভিতরে
উফ্! খুব বেঁচে গেছি!
আরেঃ! এতো ভোঁদাদার গলা! তাহলে ভোঁদাদাও ঝোপের ভেতরে লুকিয়েছে!
একি! আচ্ছা, এই তাহলে ওদের খেল!
বচাটা তো ফেরে নি!
খিল এঁটে দিয়েছে। ঠিক আছে, আবার তোরা কোথায় যাবি জেনে নি সেখানে গিয়ে ধরবো।
শিগগির দরজা খোলো, ভোঁদাদা!

আমাদের সব কথা শোনার জন্য ওরা ঐ ঝোপের ভেতরে বেতার যন্ত্র বসিয়েছে।
বটে! এবার তবে ওদের কল দিয়েই ওদের চোখের জল ফেলার ব্যবস্থা করছি!
ওদের পাত্তা নেই। নির্ঘাত ওরা আবার ওদের বেতারের ঘাঁটিতে শুনতে গেছে।
চমৎকার!
এবং সেটা সঠিক
এবারে উত্তর পাড়ার শেষে নদীর ধারের জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে পিকনিক করবো!
এবার ওদের কাবু করে তাঁবু থেকে হঠিয়ে আমরা ওদের জিনিস দিয়ে পিকনিক করবো।
উত্তর পাড়ার নদীর ধারের জঙ্গলে
এটা নির্ঘাত ভোঁদাদের তাঁবু! ইঁট মেরে টিট করে ওদের এখান থেকে তাড়া
গেছি রে!
গরর! আমরা যে চোরাচালানীদের সন্ধানে এখানে ঘাঁটি করে বসে আছি, মনে হচ্ছে এরা সেই দলের। ঢিল মেরে আমাদের জখম করার ধান্দা।
ইরর! পু-পুলিশ!
যাবি কোথায়? পাল্টা ইঁট মেরে তোদের একেবারে টিট করে ছেড়ে দেবো!
উফ!
ইঁফ!
উত্তরপাড়ার নদীর ধারের জঙ্গলে পিকনিকে এতো খেয়েছিস হাঁদা যে, মাথা ফুঁড়ে ঠেলে বেরোতে চাইছে।
হেঃ হেঃ!
ব্লাহ্!

হাতের কাজ

প্রফুল্ল রায়

এখন যেটা বাংলাদেশ আটত্রিশ বছর আগে তাকে বলা হতো পূর্ব বাংলা। ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হবার পর পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান। তারপর এই সেদিন অনেক লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলো। এখন তার নাম বাংলাদেশ। এ সব ইতিহাস সকলেরই জানা।

আমি যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা এখনকার বাংলাদেশের নয়, আটত্রিশ বছর আগের পূর্ব বাংলার।

পূর্ব বাংলা জলের দেশ। চারদিকে বিরাট বিরাট সব নদী—পদ্মা, মেঘনা, কালাবদর, ধলেশ্বরী, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতী—এমনি কত যে, তার লেখাজোখা নেই। এ ছাড়া রয়েছে অগুনতি খাল বিল। নৌকো, স্টিমার বা মোটর

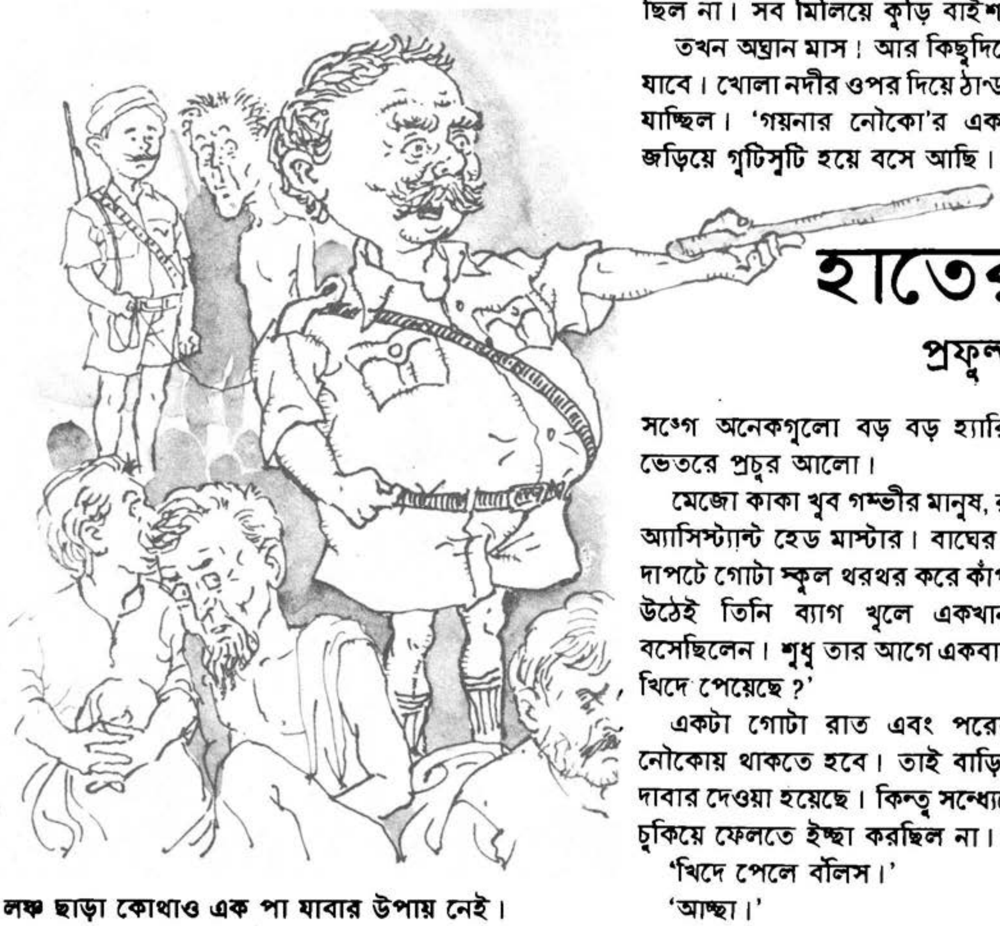

লঞ্চ ছাড়া কোথাও এক পা যাবার উপায় নেই।

সেবার আমাদের ছোট্ট শহর রাজদিয়া থেকে 'গয়নার নৌকো'য় উঠেছি। যাব তিনটে নদী পেরিয়ে অনেক দূরে নবাবগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। ওখানে আমার মামার বাড়ি।

আমার বয়স তখন দশ এগারো, ক্লাস ফাইভে পড়ি। 'গয়নার নৌকো' ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ট্রেন যেমন নানা স্টেশনে থেমে কিছু প্যাসেঞ্জার তুলে, কিছু প্যাসেঞ্জার নামিয়ে চলতে থাকে, 'গয়নার নৌকো'ও অবিকল তা-ই। নদীর পাড়ে এক একটা ঘাটে থামতে থামতে সেটা এগিয়ে যায়।

রাজদিয়া থেকে উঠেছিলাম সন্ধ্যেবেলায়। সংগে আমার মেজো কাকা। নবাবগঞ্জে পৌছতে পৌছতে পরের দিন দুপুর হয়ে যাবে। তার মানে সারাটা রাত আমাদের নৌকোতেই কাটাতে হবে।

আমরা যে 'গয়নার নৌকো'টায় উঠেছিলাম সেটা প্রকান্ড। মাঝি মাল্লা ছাড়া এক শ জন যাত্রীর তাতে জায়গা হয়ে যায়।

রাজদিয়ায় নৌকোটা ছাড়ার সময় খুব বেশি ভিড় টিড় ছিল না। সব মিলিয়ে কুড়ি বাইশ জন প্যাসেঞ্জার।

তখন অঘ্রান মাস। আর কিছুদিনের মধ্যেই শীত পড়ে যাবে। খোলা নদীর ওপর দিয়ে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। 'গয়নার নৌকো'র এক কোণে গায়ে চাদর জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। মাথার ওপর ছইয়ের সংগে অনেকগুলো বড় বড় হ্যারিকেন বাঁধা রয়েছে। ভেতরে প্রচুর আলো।

মেজো কাকা খুব গম্ভীর মানুষ, রাজদিয়া হাই-স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। বাঘের মতো মেজাজ। তাঁর দাপটে গোটা স্কুল থরথর করে কাঁপতে থাকে। নৌকোয় উঠেই তিনি ব্যাগ খুলে একখানা মোটা বই খুলে বসেছিলেন। শুধু তার আগে একবার বলেছিলেন, 'কিরে, খিদে পেয়েছে?'

একটা গোটা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত নৌকোয় থাকতে হবে। তাই বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-দাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল না। বললাম, 'না।'

'খিদে পেলে বলিস।'

'আচ্ছা।'

এক সময় 'গয়নার নৌকো' ছেড়ে দিল। মাঝিরা তার আগেই পাল খাটিয়ে দিয়েছে। নৌকো নদীর ওপর দিয়ে বিশাল একটা জলপোকার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে।

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। আকাশে রূপোর থালার

মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই অঘ্রান মাসে চারপাশে প্রচুর কুয়াশা, তাই জ্যোৎস্নাটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

ছইয়ের ভেতরে বসে থাকতে আমার একদম ভাল লাগছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল, বাইরে মাঝিদের কাছে গিয়ে চারপাশের দৃশ্য-টৃশ্য দেখব। ভয়ে ভয়ে সে কথা একবার মেজো কাকাকে বললামও কিন্তু বই থেকে মুখ তুলে চোখ কুঁচকে এমন ভাবে তাকালেন যে ভীষণ দমে গেলাম। মেজো কাকা কড়া গলায় বললেন, 'ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবার ইচ্ছে ?'

কাজেই ছইয়ের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে যেটুকু চোখে পড়ে, দেখে যাচ্ছিলাম। নদীটা খুব চওড়া। আমাদের নৌকো নদীর একটা পাড় ঘেঁষে যাচ্ছিল। এই পাড়ে মাঝে মাঝে ধানক্ষেত আর গাছগাছালির ফাঁকে আবছা আবছা দু-একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য পাড়টা এত দূরে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকটা একেবারে ধু ধু। তবে সারা গায়ে কুয়াশা আর চাঁদের আলো মেখে আমাদের নৌকোর ওপর দিয়ে অনেক রাতজাগা পাখি উড়ে যাচ্ছিল। নদীতে ভুস ভুস করে কত যে শুশুক ভেসে উঠেই তক্ষুণি আবার জলের তলায় অদৃশ্য-হচ্ছিল !

আকাশ, নদী, শুশুক, চাঁদের আলো, কুয়াশা—সব মিলিয়ে দারুণ একখানা ছবি। সে সব দেখতে দেখতে চলেছি।

এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টা পর পর আমাদের 'গয়নার নৌকো'টা এক একটা ঘাটে এসে থামছে। কিছু যাত্রী তুলে, কয়েক জনকে নামিয়ে আবার দৌড় লাগাচ্ছে।

দু-তিনটে ঘাট পেরিয়ে যাবার পর মেজো কাকা হাতের বইটা বন্ধ করে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার খেয়ে নেওয়া যাক—কি বলিস ?'

এতক্ষণে বেশ খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার দাবার সঙ্গে করে এনেছিলাম। লুচি, আলু-কপির তরকারি, বেগুনভাজা, ডিমের ডালনা আর চমচম।

আমরা একটা হোল্ড-অলে কম্বল বালিশ টালিশও নিয়ে এসেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে মেজো কাকা বিছানা পাতছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করছি—এই সময় 'গয়নার নৌকো'টা আরেকটা ঘাটে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে প্রচুর লোকজন উঠে পড়ল। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এরা ভীষণ গরীব। পরনে তালি-মারা ধুতি বা লুঙ্গি আর বহুকালের ধুধ্ধুরে পুরনো নোংরা জামা। তার ওপর জ্যালজেলে পাতলা চাদর জড়ানো। কারো পায়েই জুতো টুতো নেই। সবার গালেই খাপচা খাপচা দাড়ি, এলোমেলো চুল।

যে নৌকোয় এক শ জন ধরে সেখানে এখন প্রায় দেড় শ লোক। মাঝিরা এবং অন্য যাত্রীরা তাদের অনেক করে বোঝালো, 'তোমরা কয়েকজন নেমে যাও, নইলে নৌকো ডুবে যাবে।'

কে কার কথা শোনে ! খানিকক্ষণ হৈচৈ চেঁচামেচি চলল কিন্তু কাউকেই নামানো গেল না। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত মাঝিদের নৌকো ছেড়ে দিতে হল।

এদিকে আমরা যে তোফা একটা ঘুম লাগিয়ে নৌকোয় রাত কাটিয়ে দেব, তার আর উপায় রইল না। তাড়াতাড়ি বিছানা টিছানা গুটিয়ে আবার হোল্ড-অলে পুরে ফেলা হল।

ঘুমোতে তো পারবই না, একটু আরাম করে যে বসে যাব, তেমন জায়গাও নেই। গাদাগাদি ভিড়ে কোনরকমে হাত-পা বুকের ভেতর গুঁজে গুটিসুটি মেরে মেজো কাকা আর আমি বসে আছি। অন্য সবারও একই অবস্থা। কোথাও আধ ইঞ্চি ফাঁক নেই।

নতুন যে লোকগুলো উঠেছে, তারা নিজেদের মধ্যে কি সব পরামর্শ করছিল। কথা শুনে মনে হল, ওরা সব চাষী, নিজেদের জমি-টমি নেই, অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করে। এখন তারা ধান কাটতে যাচ্ছে নবাবগঞ্জে, অর্থাৎ কিনা আমার মামাবাড়ির দেশে।

কিছুক্ষণ পর আরেকটা ঘাট এসে গেল। নৌকোটা ভিড়তে না ভিড়তেই হুলুস্থূল কান্ড। বোঝা যাচ্ছে, আরো নতুন লোক উঠছে।

'গয়নার নৌকো'টা আগাপাশতলা বোঝাই হয়ে আছে। এর ওপর একটা মাছি উঠলেও সবসুদ্ধু জলের তলায় চলে যেতে হবে।

কিন্তু যারা উঠল তাদের ঠেকানো যায় না। তারা হল একজন ছোট দারোগা, চার জন কনস্টেবল এবং একটি চোর।

ছোট দারোগার বিরাট মুখ, বিশাল গোঁফ আর প্রকান্ড ভুঁড়ি। পরনে খাকির হাফ শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত খাকিরই হাফ প্যান্ট। তলার দিকে প্যান্টটার মস্ত ঘের, তার ফাঁক দিয়ে সরু সরু লিকলিকে দুটো পা নেমে এসেছে। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট আর পায়ে জবরদস্ত বুট।

ছোট দারোগাকে দেখে মনে মনে ফিক করে হেসে ফেললাম। ওই রকম রোগা রোগা পায়ের লোকটা তিন মণ

আপনার মাথার ভেতর বাঁই বাঁই করে দশখানা নাগরদোলা ঘুরতে থাকবে

ওজনের একটা শরীর বয়ে বেড়ায় কি করে?

ছোট দারোগার মতো অত বড় মাপের না হলেও চার কনস্টেবলেরও ভুঁড়ি এবং গোঁফের বাহার আছে। তাদের সবার কাঁধেই রাইফেল বাঁধা এবং গলায় টোটার মালা।

এদের মধ্যে সব চাইতে দর্শনীয় হল চোরটা। রোগা টিন্‌টিনে ফড়িঙের মতো চেহারা। মাথায় খাড়া খাড়া চুল, গোল চোখ, চোখা থুতনি। লোকটার চোখ সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরছে।

চোরটার দু হাতে লোহার হ্যান্ড কাফ, কোমরটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই দড়ির একটা মাথা একজন কনস্টেবলের হাতে।

দারোগা-পুলিশ দেখে সবাই তটস্থ; কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। নৌকো ডুবে তলিয়ে যাক, তবু তাদের নেমে যেতে বলার সাহস কারো নেই।

ছোট দারোগা এদিক সেদিক তাকিয়ে পছন্দমতো একটু জায়গা খুঁজছিল, হঠাৎ মেজো কাকাকে দেখতে পেল সে। বেশ খুশি হয়েই বলল, 'মাস্টারমশাই যে—'

মেজো কাকা বললেন, 'আরে সমাদ্দার সাহেব, আপনি এখানে!'

'এসে বলছি।' বলেই যে সব চাষী টাষী দম আটকে বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে বাজখাঁই গলায় হুংকার ছাড়ল ছোট দারোগা বা সমাদ্দার সাহেব, 'অ্যাই, তোরা সরে সরে বস্; যাবার জায়গা দে।'

চাষীরা নিজেদের শরীরগুলো কুঁকড়ে এই এ্যাত্তটুকু করে রাস্তা বানিয়ে দিল। ছোট দারোগা চোর এবং কনস্টেবলদের নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। তারপর সে নিজে বসল মেজো কাকার গা ঘেঁষে, চোর আর কনস্টেবলরা চাষীদের ভেতর জায়গা করে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসল। চোরের কোমরের দড়িটা সেই কনস্টেবলটার হাতেই থেকে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'আপনার সংগে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারি নি। আপনার মতো পণ্ডিত লোকের দেখা পেয়ে বড় ভাল লাগছে। দিন রাত চোর ছ্যাঁচড় ঘেঁটে ঘেঁটে মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। তা চললেন কোথায় মাস্টারমশাই?'

বুঝতে পারছিলাম ছোট দারোগার সংগে মেজো কাকার জানাশোনা আছে। আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে নিয়ে নবাবগঞ্জে ওর মামা বাড়ি যাচ্ছি।'

'ছেলেটি কে?'

'আমার ভাই-পো।'

মামা বাড়ি কেন যাচ্ছি, এ নিয়ে ছোট দারোগা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মেজো কাকা এবার হেসে হেসে বললেন, 'এত রাত্তিরে এই বাহিনী নিয়ে চললেন কোথায়?'

'হবিবপুরে। যা একখান চাকরি জুটেছে তাতে রাত বিরেত বলে কিছু নেই, চব্বিশ ঘন্টাই ডিউটি।' একটু থেমে ফের বলল, 'তিন বছর একটানা কাজ করছি। কাল ভেবেছিলাম মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও একটু বিশ্রাম করব, কিন্তু ওই ব্যাটার জন্যে সব প্ল্যানের বারোটা বেজে গেল।' বলে আঙুল বাড়িয়ে চোরটাকে দেখিয়ে দিল।

একটা চোর কীভাবে ছোট দারোগার ছুটি বানচাল করে দিল, বুঝতে না পেরে মেজো কাকা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মেজো কাকার মনের কথাটা যেন ধরতে পারল ছোট দারোগা। বলল, 'ওই ব্যাটা বিখ্যাত চোর। ওর নাম যুধিষ্ঠির।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই হ্যান্ডকাফ-পরা হাত দুটো জোড় করে বলল, 'চোর ছিলাম ছোট সাহেব। এখন তো একরকম সাধুই হয়ে গেছি।'

জবরজং মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে সস্নেহে চোরটাকে দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল ছোট দারোগা, 'তা বটে, তা বটে! ব্যাটা একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরই বনে গেছে। কিন্তু মাস্টারমশাই, ওর লাইফ হিস্ট্রি যদি শোনেন আপনার মাথার ভেতর বাঁই বাঁই করে দশখানা নাগরদোলা ঘুরতে থাকবে।'

মেজো কাকার মজাও লাগছিল, আবার কৌতূহলও হচ্ছিল ভীষণ। বললেন, 'কি রকম?'

ছোট দারোগা এর পর যা বলে গেল তা এই রকম। ভূভারতে যুধিষ্ঠিরের মতো চোর নাকি আর একটাও জন্মায় নি। পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীতে যত স্টিমার, মোটর লঞ্চ আর 'গয়নার নৌকো' যায় তার যাত্রীদের রক্ষে নেই। যুধিষ্ঠির তাদের সব লোপাট করে দেয়।

কান খাড়া করে শুনে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির। সে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে, কাঁচমাচু মুখ করে ছোট দারোগার একটা ভুল শুধরে দিল, 'ওসব তিন বছর আগের কথা ছোট সাহেব। এখন তো আমি সাধুই হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ'—ঘাড়টা সামনে পেছনে নাচাতে নাচাতে ছোট দারোগা বলল, 'তিন বছর আগের আগের কথাই এ সব। —তারপর শুনুন মাস্টারমশাই। যুধিষ্ঠির ব্যাটার হাতের কাজ ছিল দারুণ সূক্ষ্ম। আপনার সঙ্গে কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ একসময় দেখলেন ও সামনে নেই। সেই সঙ্গে আপনার বোতাম আর ঘড়ি লোপাট হয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে আমার চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল। মেজো কাকা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'বলেন কি সমাদ্দার সাহেব!'

'ঠিকই বলি মাস্টারমশাই। ব্যাটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিসিয়ান। ওর কান্ডকারখানা লিখলে বাইশখানা মহাভারত হয়ে যাবে।'

চোখেমুখে গর্ব গর্ব একটা ভাব ফুটিয়ে যুধিষ্ঠির তাকিয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'সেই বউটার কথা এঁদের বলুন ছোট সাহেব।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করে ছোট দারোগা বলতে লাগল, 'ব্যাটার হাতের কাজ যে কতটা ফাইন এই ব্যাপারটা থেকে বুঝতে পারবেন। সেবার মুন্সিগঞ্জের স্টিমারঘাটা থেকে গোয়ালন্দের স্টিমার ছাড়বে ছাড়বে করছে। প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই উঠে পড়েছে। শুধু একটি বউ বাকি। যে কাঠের পাটাতন দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা জেটি থেকে স্টিমারে ওঠে, বউটা ছুটতে ছুটতে তার ওপর দিয়ে আসছিল। দু পা গেলেই সে উঠতে পারবে কিন্তু তার আগেই স্টিমার ছেড়ে দেবার ঘন্টি বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জেটির খালাসিরা পাটাতন ধরে দিয়েছে টান। বউটি হুড়মুড় করে জলেই পড়ে যেত। স্টিমারের ভেতরে গেটের কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল যুধিষ্ঠির; হাত বাড়িয়ে বউটির একটা হাত ধরে এক টানে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বউটি কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে, ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে দেখল তার আঙুলের দুটো আংটি উধাও হয়ে গেছে। তক্ষুণি যুধিষ্ঠিরের খোঁজে দলে দলে প্যাসেঞ্জাররা রে রে করে বেরিয়ে পড়ল কিন্তু কোথাও তার পাত্তা মিলল না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।

খুশিতে এবং গর্বে যুধিষ্ঠিরের চোখ চক চক করছিল। সে বলল, 'একবার নরসিংপুরের জমিদারের টাকার ব্যাগ কেমন করে হাত সাফাই করেছিলাম, সেটা বলুন ছোট সাহেব।'

ছোট দারোগা দু হাত তুলে, শরীরটা বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আঙুল ফোটাতে ফোটাতে হেসে হেসে বলল, 'আর পারি না রে ব্যাটা। তোর কীর্ত্তিকলাপ বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।'

মেজো কাকা সেই কথাটা ভোলেন নি। বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের হাত-সাফাইয়ের অনেক গল্পই তো করলেন। কিন্তু ও কী ভাবে আপনাকে ছুটি নিতে দিল না সেটা কিন্তু বলেন নি।'

ছোট দারোগা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে তাই তো, দাঁড়ান দাঁড়ান, বলছি। জানেন মাস্টারমশাই,

যুধিষ্ঠির তো হাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার টিকি ছোঁবার যো নেই। বজ্জাতটা একেবারে ইন্দ্রজাল জানে মশাই। এই হয়ত তাকে দেখা গেল, এই নেই। এদিকে তার নামে থানায় রোজ গণ্ডা গণ্ডা ডাইরি হচ্ছে। এস.পি থেকে পুলিশের বড় বড় কর্তারা ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে ছাড়ছে। উল্লুকটার জন্যে মনে আর সুখ নেই।'

'তারপর ?'

'তারপর ব্যাটার কপাল! আগে একদিন ধরা পড়ে মাধবগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট জেলে চলে গেল। পাক্কা তিন বছরের জেল। এ অঞ্চলের লোকের হাড় জুড়লো মশাই।' ছোট দারোগা বলতে লাগল,' কাল যখন ছুটির দরখাস্ত দিতে যাব তখন ও. সি. বললেন যুধিষ্ঠিরের জেল খাটার মেয়াদ শেষ হয়েছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ও.সি.'র বাতের ব্যথাটা ভীষণ বেড়েছে। তাই আমাকে হাত ধরে বিশেষ করে রিকোয়েস্ট করলেন যাতে মাধবপুর থেকে যুধিষ্ঠিরকে হবিবপুরে নিয়ে যাই। ওখান থেকেই ওকে কিছু সই টই করিয়ে মুক্তি দেওয়া হবে। ওকে ও.সি.'র কাছে পৌঁছে দিলেই আমার কাজ শেষ। কাল থেকে আমি ছুটি পাব।'

এই সময় যুধিষ্ঠির বলে উঠল, 'তিন বছর আগের কথাই খালি বলে গেলেন ছোট সাহেব। মাঝখানের ব্যাপার স্যাপার তো মাস্টারমশাইকে কিছুই জানালেন না।'

ছোট দারোগা নড়ে চড়ে বসল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'আরে তাই তো; আসল কথাটাই বলা হয় নি। তিন বছর জেল খেটে ওই ঘাঘী জাঁহাবাজ যুধিষ্ঠির একেবারে বদলে গেছে। কি রে, বদলাস নি ?'

মাথাটা ডান দিকে দু ফুট হেলিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, 'তা আর বদলাই নি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে পাল্টে গেছি। আমার ভেতর একটা ভক্তি ভাব এসে গেছে, পাপ কাজে এখন বড্ড ঘেন্না লাগে।'

ছোট দারোগা বলল, 'মাধবপুর জেলের জেলারের কাছে শুনলাম, দিনরাত যুধিষ্ঠির নাকি আজকাল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বা 'মা কালী মা কালী' করছে। ব্যাটা সত্যিকারের ধম্মপুত্তুর বনে গেছে। আখের কলে যেমন রসটুকু বার করে ছিবড়েটা ফেলে দেয়, তেমনি তিন বছর ঘানি ঘুরিয়ে ওর বডি থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে।—না কি বলিস রে ব্যাটা ?' বলে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকালো।

যুধিষ্ঠির তক্ষুণি সায় দিল, 'ঠিক বলেছেন ছোট সাহেব। জেলে আমার সংগে আর যে সব চোর ডাকাত খুনী ছ্যাঁচোড়রা ছিল তারা তো আমাকে মহাপুরুষ বলতে শুরু করেছিল।' বলতে বলতে বিনয়ে মাথা নুইয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আমি অবিশ্যি অতটা এখনও হই নি। তবে আপনাদের আশীর্বাদ পেলে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আশীর্বাদ না হয় দেওয়া যাবে। এখন একটা কথা মন খুলে বল্। জেল থেকে তো বেরিয়ে এলি, আগের মতো হাতের কাজ আবার শুরু করবি না ?'

যুধিষ্ঠির শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে বলল, 'আপনিই বললেন আমি ধম্মপুত্তুর হয়ে গেছি, আবার এখন এ কী বলছেন! যে সাধুমহাত্মা হয়ে হিমালয়ে চলে যাবে তার এ সব শোনাও পাপ।' বলতে বলতে মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল যুধিষ্ঠিরের।

ছোট দারোগা হাত তুলে বলল, 'আহা, কাঁদিস না ব্যাটা, কাঁদিস না। ঠাট্টাও বুঝিস না ?'

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতেই যুধিষ্ঠির বলল, 'কবে ওসব করেছি, এখন কি আর তার কায়দা টায়দা মনে আছে ? অভ্যেস না থাকলে সূক্ষ্ম হাতের কাজ করা যায় ?'

অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করল ছোট দারোগা।

এদিকে রাত আরো বেড়েছে। সবার চোখ বুজে আসছে। কথা বলতে বলতে ছোট দারোগার গলা জড়িয়ে এল। এক সময় বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে, সংগে সংগে নাকের ডাক শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকোর একটা লোকও আর জেগে রইল না। চার কনস্টেবল, যুধিষ্ঠির এবং অন্য যাত্রীরা—সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এ ওর ঘাড়ে পড়ছে।

ট্রেনে, স্টিমারে বা নৌকোয় উঠলে সহজে আমার ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পর আমার চোখও জুড়ে আসতে লাগল। তার মধ্যে আবছা আবছা দেখতে পেলাম, নৌকোয় যত লোক আছে তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি ঢুলছে যুধিষ্ঠির। ঢুলতে ঢুলতে তার চারপাশে যত চাষী টাষী রয়েছে সবার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। তাদের সংগে ওর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে।

ভোর রাত্তিরে, তখনও বেশ অন্ধকার আছে, যুধিষ্ঠির এবং কনস্টেবলদের নিয়ে হবিবপুরে নেমে গেল ছোট দারোগা। 'গয়নার নৌকো'র যাত্রীদের কারো ঘুম ভাঙে নি

তখন পর্যন্ত। সবাই জড়াজড়ি করে ঢুলছে।

আরো দু ঘন্টা পর কুয়াশা আর অন্ধকার কেটে গেল। ঝলমলে সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যেতে লাগল। এই সময় 'গয়নার নৌকো'টা পেয়ারাতলির ঘাটে এসে ভিড়ল। এর পর চার পাঁচ ঘন্টা কোথাও আর না থেমে দুপুরবেলা নৌকো সোজা নবাবগঞ্জে গিয়ে ভিড়বে। তার মানে যাদের সংগে খাবার দাবার নেই, পেয়ারাতলি থেকে কিছু চিড়ে মুড়ি টুড়ি কিনে না নিলে দুপুর পর্যন্ত তাদের উপোস দিয়ে থাকতে হবে।

আমাদের সংগে লুচি মিষ্টি-টিষ্টি আছে। কিন্তু যে চাষীরা নবাবগঞ্জে ধান কাটতে যাচ্ছে তাদের কয়েকজন মুড়িটুড়ি কিনবার জন্য জামার পকেট বা লুংগির কষি থেকে পয়সা বার করতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপরই একসংগে তারস্বরে মড়াকান্না জুড়ে দিল।

হঠাৎ কী হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকগুলোকে থামানোও যাচ্ছে না। মেজো কাকা সমানে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের, কী হয়েছে?'

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর চাষীরা জানাল, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রাস্তায় খরচের জন্য পাঁচ সাতটা করে টাকা সংগে এনেছিল, কিন্তু সেই টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—সব চুরি হয়ে গেছে। এখন তারা কী কববে?

মেজো কাকা তাদের সবাইকে দুটো করে টাকা দিয়ে বললেন, 'যাও, কিছু কিনে টিনে আনো।'

এদিকে আমার মাথার ভেতর বন বন করে একটা চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। মনে পড়ছে, যাদের টাকা চুরি হয়েছে তাদের মধ্যেই কাল রাত্তিরে গাদাগাদি করে বসে ছিল যুধিষ্ঠির। ঘুমের ঘোরে আমার চোখে পড়ছিল, ঢুলতে ঢুলতে সে ওদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। তখন বুঝতে পারি নি, যুধিষ্ঠির কী করছে।

হাতে হ্যান্ডকাফ, কোমরে দড়ি, চারপাশে দারোগা-পুলিশের পাহারা—এর মধ্যেই যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে দিয়েছে সে কত বড় ম্যাজিসিয়ান। তিন বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে যখন তার ভেতর থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে, যখন সে সাধু মহারাজ হতে যাচ্ছে, সেই সময় যুধিষ্ঠির সূক্ষ্ম একটি হাতের কাজ দেখিয়ে আমার মুন্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে।

ছবি—দিলীপ দাস

আদ্যিকালের বুড়ী

মৌসুমী গুপ্তা

এক যে ছিল আদ্যিকালের বুড়ী
বয়সটা তার বোধহয় ছয় কুড়ি।

প্যারতোনা সে হাঁটতে মোটেই সোজা
মাথায় নিয়ে শুকনো কাঠের বোঝা
যাচ্ছিল সে চিতকৌড়ার হাটে
ঠা-ঠা রোদে মাথার চাঁদি ফাটে।

নামিয়ে বোঝা ঝাঁকড়া গাছের তলে
শ্রান্ত বুড়ী ক্লান্ত স্বরে বলে,
যম মহারাজ মুখটি তুলে চাও
কষ্ট থেকে এবার ছুটি দাও।

হঠাৎ আকাশ ঢাকলো কালো মেঘে,
অনন্ত নাগ উঠল বুঝি জেগে—
যমের গাড়ি স্পর্শ করে ভূমি,
যম শুধালো, ডাকলে কেন তুমি?

ভয়ে ভয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে
বললে বুড়ী হাত দুটি জোড় করে,
যম মহারাজ কাঠের বোঝাটারে
একটু তুলে দাও না মাথার প'রে।

[চণ্ডিগড় গার্লস কলেজের ছাত্রী ষোল বছরের মৌসুমী 'তোমাদের পাতার' জন্যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলো।]

ঘাটবাবু

বিমল মিত্র

যা কোনও দিন কল্পনা করতে পারিনি শেষকালে কিনা তাই-ই হলো। ছোটবেলায় স্কুলের মাস্টার-মশাই একদিন আমাদের পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমরা বড় হয়ে কে কী হতে চাও?

প্রশ্নটা শুনে আমরা ক্লাশের সব ছেলেরা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ভবিষ্যতে কে কী হতে চাই তা তো কখনও ভাবিনি। আমরা ভাবতুম সে-সব চিন্তা আমাদের নয়, সে-চিন্তা করবেন আমাদের বাবা মায়েরা। সেইটেই ছিল আমাদের সেই যুগের নিয়ম। আমরা স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া করবো, তারপর একদিন স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবো। আর তারপর কেউ করবো চাকরি আর কেউ বা করবো ব্যবসা বাণিজ্য। আর কেউ বা পৈতৃক সম্পত্তি বসে বসে ভোগ করবো!

আমাদের ক্লাশের সব চেয়ে নিরীহ ছেলে ছিল অনাদি। নিরীহ হলেও তারা ছিল বিরাট বড়লোক। তাদের বাড়িটার চেহারা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। কলকাতা শহরের মধ্যে অত বড় বাগানওয়ালা বাড়ি বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। বাড়িটা ছিল এক বিঘে জমির ওপর। বাড়িটা তেতলা। সব মিলিয়ে বাড়ির ভেতরে বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘর ছিল। আর মানুষ বলতে ছিল মাত্র তিনজন। অনাদি, তার বাবা আর তার মা। অনাদির বাবা কালীশ মুখার্জি মশাই ছিলেন সেকালের জমিদার বংশের একমাত্র সন্তান। পূর্ববঙ্গে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল তাদের। কিন্তু কালীশবাবু মাঝ বয়সেই চলে আসেন কলকাতায়। এবং তখন থেকেই কলকাতায় লোহার ব্যবসা শুরু করেন। আর সেই ব্যবসা থেকেই পরে তিনি আরো অনেক টাকা উপার্জন করেন। তাঁর যে ব্যাঙ্কে কত টাকা খাটতো তা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন না। যদি কেউ জানতো তো তাঁরা উকিল এ্যাটর্ণি আর ব্যারিস্টার। তাঁরা কালীশবাবুকে যেমন ভাবে টাকা খাটাতে বলতেন, যেমন ভাবে টাকা খরচ করতে বলতেন, কালীশবাবুও তেমনি করেই টাকা খাটাতেন আর খরচ করতেন।

কিন্তু অত টাকা থাকা সত্ত্বেও কালীশবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র অত্যন্ত শিক্ষিত আর অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। লোকের বিপদে-আপদে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে কেউই কখনও খালি হাতে ফিরে আসেনি। কালীশবাবুর বাড়িতে ছিল আমাদের ফুটবল খেলার মাঠ। মস্ত বড় মাঠ পড়েছিল বাড়ির পেছনে। আর ছিল সুইমিং-পুল্। বাইরে থেকে দেখে মনে হতো সেটা যেন একটা ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখা যেত অন্য রকম। ভেতরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখা যেত চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। মধ্যেখানে বাড়ি ভর্তি তর্ তর্ করছে জল। ইচ্ছে হলে সেই জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। তেল, সাবান, গামছা, তোয়ালে—সব কিছু সাজানো আছে। কালীশবাবু রোজ বুড়ো বয়েস পর্যন্ত সেখানে স্নান করতেন, সাঁতার কাটতেন। তাতে শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল।

আর ছিল তাঁর একটা বিরাট গাড়ি। সে-যুগের নিয়ম অনুযায়ী বিরাট আকারের একটা বিলিতি গাড়ি।

আমরা, যারা অনাদির সংগে একই ক্লাশে পড়তুম, তারা ওই সুইমিং-পুলএ গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করেছি, সাঁতার কেটেছি। আর শুধু তাই নয়, তাদের গাড়িতেও চড়েছি। সে-জন্য কালীশবাবু কখনও রাগ করেননি বা বকেননি আমাদের।

শুধু একটা কথাই বার বার আমাদের বলতেন—খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে বাবারা। লেখা-পড়া না করলে মানুষ হতে পারবে না তোমরা, বুঝলে?

আমরাও কালীশবাবুর কথা মন দিয়ে শুনতাম। অনাদিও বাবার কথা খুব মন দিয়ে শুনতো। অনাদির জন্যে কয়েকজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁরা এক-একজন এক-একটা বিষয় পড়াতেন। অনাদি যে লেখা-পড়ায় খুব ভালো ফল করতো তা নয়। মোটামুটি কোনও রকমে পাশ করতো প্রত্যেক বছর।

সেদিন মাস্টারমশাইএর প্রশ্নের জবাবে এক-একজন এক-একরকমের কথা বললে।

আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনীয়ার হবো স্যার—

মদন উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো স্যার—

কার্তিক বললে—আমি ব্যারিস্টার হবো স্যার—

সবাই কে কী হবে তা উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে বলে গেল।

শেষকালে আমার পালা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমি লেখক হবো স্যার—

শুনে সবাই একটু আশ্চর্য হলেও মুখে কেউ কিছু বললে না।

একেবারে সকলের শেষে অনাদির পালা এল। অন্য সকলের মত মাস্টারমশাই তাকেও জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বড় হয়ে কী হবে অনাদি?

অনাদি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমিও লেখক হবো স্যার—

আজ এতকাল পরে ভাবি—হায়রে মানুষের সাধ আর হায়রে মানুষের বিধাতাপুরুষের বিধান! সাধ আর সাধ্যের সংগে কি কখনও সামঞ্জস্য থাকে?

তাই তো গোড়াতেই বলেছি—যা কোনওদিন কল্পনা করতে পারিনি, শেষকালে কিনা তাই-ই হলো। কিন্তু তা বলে এ কী-রকমের পরিণতি!

অনাদিদের বাড়িতে তার বাবার অনেক বই ছিল। কালীশবাবুর বাতিক ছিল বই পড়ার। অনাদি তার স্কুলের বই যত না পড়তো তার চেয়ে বেশি পড়তো তার বাবার সেই বইগুলো। সেই বই পড়বার সংগে সংগে সে যেন সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করে বেড়াতো! কোথায় ফরাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস, কোথায় আমেরিকার একশো বছরের স্বাধীনতার যুদ্ধের কাহিনী, কোথায় নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রাশিয়া আক্রমণ, কোথায় এডওয়ার্ড গিবনের লেখা 'ডিক্লাইন এ্যান্ড ফল্ অব্ রোম্যান এম্পায়ার', আর কোথায় টমাস এ্যাডিশনের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের সব কাহিনী।

আমিও অনাদিদের বাড়িতে গিয়ে ওই সব পড়তাম।

অনাদি বলতো—জানিস, পৃথিবীর সব লেখকদের বই না পড়লে লেখক হওয়া যাবে না। ভালো লেখক হতে গেলে আগে ভালো পাঠক হতে হবে।

আমিও কথাটা বিশ্বাস করতাম। জিজ্ঞেস করতাম—এ-কথা তোকে কে বলেছে?

অনাদি বলতো—এ-কথা বই পড়েই আমি শিখেছি—

অনাদির কোনও দিনই কোনও অহংকার ছিল না। সে যে অত বড়লোকের ছেলে তা যেন তার জানা ছিল না। এইটুকু শুধু তার জানা ছিল যে তাদের কখনও টাকার অভাব হবে না। সুতরাং তাকে কখনও কোনও চাকরি করে টাকা উপায়ও করতে হবে না।

আর তার বাবার ব্যবসা?

কালীশবাবুর অবর্তমানে সেই ব্যবসা কে চালাবে?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—তুই যদি লেখক হোস তাহলে তোর বাবার লোহার ব্যবসা কে চালাবে? তোর তো আর ভাই-বোন কেউ নেই! একলা তোকেই তো সব দেখতে হবে!

অনাদি বলতো—তাহলে তুই কী করে লেখক হবি?

আমি বলতুম—আমি দিনের বেলা একটা চাকরি করবো আর বাকি সময়টায় লিখবো—

অনাদি বলতো—চাকরি করতে করতে লিখলে কি আর ভালো লেখা হবে? তাহলে যেমন অন্য সবাই চাকরি করতে করতে লেখে, সেই রকম লেখাই হবে। তাতে হয়ত দু'দিনের জন্যে একটু নাম-টাম হলো। তারপরে আবার একদিন সবাই তোর নাম ভুলে যাবে। এ-রকম তো আগেও হাজার হাজার লোক লিখেছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়?

কথাটা আমার শুনতে ভালো লাগেনি।

অনাদি বলতো—ও-রকম লেখার চাইতে না-লেখাই ভালো।

অনাদির কথাগুলো তেতো ওষুধের মতন গিলে ফেলতাম। কোনও মন্তব্য করতাম না।

অনাদি বলতো—লেখাটা তো ব্যবসা নয়, লেখার জন্যে নিজের সব কিছু দিতে হবে। পারলে নিজেকেও দিতে হবে। নিজেকেও উৎসর্গ করতে হবে মা-সরস্বতীর কাছে।

আমি বলতাম—সকলের বাবা তো তোর বাবার মত বড়লোক নয়। তোর পক্ষে যা সম্ভব আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়—আমরা গরীব লোক, লেখার জন্যে আমরা জীবন দিতেও পারবো না। লেখার জন্যে আমরা মা-সরস্বতীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতেও পারবো না—

অনাদি বলতো—তাহলে আর লেখক হয়ে লাভ কী? শুধু কাগজে নাম ছাপানো আর কয়েকটা বই ছাপালেই তো কেউ লেখক হয়ে যায় না। সে-রকম লিখে মানুষের কী করা যাবে?

চাকরি-সূত্রে আমি তখন সমস্ত ইন্ডিয়াটাই চষে বেড়াচ্ছি। কোথায় রাজস্থান, কোথায় মদ্রাজ, কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, কোথায় বিহার, সব দেশই আমার স্বদেশ হয়ে গেল, সব মানুষই আমার আপন-জন হয়ে গেল।

মাঝখানে তারই মধ্যে অনাদির সন্ধান নিতে গিয়ে শুনি সে ইন্ডিয়ায় নেই। সে নাকি ভারতবর্ষের বাইরে কোথায় ভ্রমণ করতে গেছে।

আর তাদের বাড়িটা?

তার বাবা-মা কেউই নেই। সেই তাদের বাড়িটা কোথাকার কোন্ এক অবাঙালী ব্যবসায়ী কিনে নিয়ে বড় বড় আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট-বাড়ি বানিয়ে দিয়ে অত বিঘে জমি অতখানি বাগান সব ইট্-পাথর-সিমেন্ট-কংক্রীটে ভরাট

তুই যদি লেখক হোস তাহলে তোর বাবার লোহার ব্যবসা কে চালাবে?

তা এই-ই ছিল আমাদের অনাদি। অনাদি মুখার্জি। আস্তে আস্তে আমরা সবাই স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকলুম। কলেজ পেরিয়ে একদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলুম। সেই ইউনির্ভাসিটিও একদিন ছাড়তে হলো আমাদের। আমাদের সহপাঠীরা কে কোথায় ছিট্‌কে গেল তার খবর রাখবার অবসর হলো না আমাদের। সেই আনন্দ শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনীয়ার হতে পারলো কি না, সেই মদন শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হতে পারলো কি না, সেই কার্তিক শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার হতে পারলো কি না, তার সন্ধান রাখবার প্রয়োজনই হলো না আমার। কারণ আমি নিজেই তখন ঝড়ের আগে শুক্‌নো পাতার মত কোথায় যে ছিটকে চলে গেলাম তার খেয়াল করবার মত সময়ও আমার রইল না।

হয়ত সকলের জীবনেই এই রকম হয়। হয়ত এই রকম হওয়াটাই নিয়ম।

করে ফেলেছে। আগেকার কালীশবাবুর বাড়িটা যে কোথায় ছিল তার চিহ্নটি পর্যন্ত আর নেই।

এর পর ভাবলাম যে আর যাযাবর-বৃত্তি নয়, এবার একটা জায়গায় স্থিত্ হয়ে বসবো। এবার আর বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী হবো। আর তাই করতে গিয়ে কোথা দিয়ে দিন-মাস-বছর কেটে গেল, রাত আর দিন একাকার হয়ে গেল, বয়েস গড়িয়ে গড়িয়ে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে দিলে, কিছুই খেয়াল ছিল না। কত হাজার পাতা লিখলুম, কত হাজার পাতা ছিঁড়লুম, কত বই ছাপা হলো, কত বই কত ভাষায় অনুবাদ হলো তার হিসেব রাখবার সময়ও পেলাম না। কোন্ প্রকাশক টাকা দিলে না, কোন্ প্রকাশক বেশি টাকা দিয়ে ফেললে, তার হিসেবই কি রাখতে পেরেছি? আর শুধু তাই-ই নয়, আমার নাম জাল করে কত নকল বই আমার নাম দিয়ে বেরোল, কত লোক আমাকে গালাগালি দিলে, কত লোক আমাকে প্রশংসা করলে, আশীর্বাদ

করলে, তার হিসেব রাখাও আমার পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

ঠিক এই সময়ে একটা কান্ড ঘটলো আমার জীবনে।

হঠাৎ এক সিনেমা-কোম্পানির খপ্পরে পড়ে গেলাম। বোম্বাইএর হিন্দী সিনেমা-কোম্পানি আমার গল্প নিয়ে তারা ছবি করবে, কিন্তু আমার সহযোগিতা চাই চিত্রনাট্যের ব্যাপারে।

শুধু চিত্রনাট্য রচনাই নয়। তাদের সংগে লোকেশানেও যেতে হলো মধ্যপ্রদেশের এক গ্রামে। সেখানে মকর-সংক্রান্তির দিন বিরাট এক মেলা হয় ছত্রিশগড়ীদের। বড় সৎ আর সরল মানুষ এই ছত্রিশগড়ের লোকরা।

কান্ডটা সেখানেই ঘটলো।

টিল্ডা স্টেশনে নেমে কদম্‌কুয়া গ্রামে যেতে হয়। সেখানেই এক নদী আছে। নদীর নাম আড়পা। প্রতিদিন কত অসংখ্য লোক যে সেই নদীর ওপর দিয়ে এপার-ওপার করে তার ঠিক নেই। আমাদেরও খেয়া নৌকোয় এপার থেকে ওপারে যেতে হলো। আমাদের দলে কম লোক ছিল না। নদীটা চওড়া, তাতে জলও খুব কম নয়। ওপারে গিয়ে সিনেমা কোম্পানির তাঁবু পড়লো। কিছু লোক তার ভেতরে রইলো। আর আমরা ক'জন শুধু রইলাম একটা স্কুল-বাড়িতে।

একেবারে খাঁটি গ্রাম্য স্কুল। সেখানকার গ্রাম-পঞ্চায়েতই এই স্কুলটা করে দিয়েছে। কদম্‌কুয়ার ছত্রিশগড়ী ছেলে-মেয়েরা এই স্কুলে পড়তে আসে। মকর-সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষ্যে স্কুলের তখন ছুটি চলছিল। তাই মাস্টার-মশাই-এর তখন কোনও কাজ নেই।

আমার নিজেরও তখন কোন কাজ নেই। তাই মাস্টারের সংগেই বসে বসে গল্প করি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম-সারা জীবন এই অজ্-পাঁড়াগায়ে থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?

রামাবতারজী বললেন, খারাপ লাগবে কেন? অন্ততঃ কিছু লোক তো আমার কাছে মানুষ হচ্ছে।

তা বটে! কোথায় সেই বোম্বাই আর কোথায় সেই কলকাতা! তার তুলনায় এই কদম্‌কুয়া! এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই, তাই রেডিও টেলিভিশন কিছুই নেই। আর খবরের কাগজের কথা তো না তোলাই ভালো। এই খোলার চালের ঘর, এই মাটির রাস্তা। কিছু দূরেই জংগল। জংগলের ভেতর বাঘ বা বুনো-শুওর না থাকাটাই আশ্চর্যের। এখানে লেখা-পড়া জানা এই রামাবতার শর্মা থাকে কী করে?

রামাবতার শর্মা বললেন—আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি খুব সুখে আছি। অন্তত কিছু লোককে তো আমি মানুষ করে তুলছি—এইটে ভেবেই আমার সুখ!

তারপর বললেন, একটা গল্প শুনবেন মিত্রজী?

বললাম, বলুন?

যে-গল্পটা শর্মাজী সেদিন বললেন তা বড় অদ্ভুত। সে-গল্পটা শুনে সেদিন আমি আমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।

গল্পটা রাশিয়ার লেখক টলস্টয়ের জীবনের।

রাশিয়ার লেখক কাউন্ট টলস্টয়ের লেখার সংগে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর কত বই যে বার-বার পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর নাম এই কদম্‌কুয়ার ইস্কুল মাস্টার রামাবতার শর্মার মুখে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত লেখকের নাম এই ছত্রিশগড়ের অখ্যাত এক গ্রামের মধ্যে বসে শুনতে পাবো, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি।

শর্মাজী বললেন—দেখুন মিত্রজী। আমিও ছোটবেলা থেকে আপনার মত একজন লেখক হতেই চেয়েছিলুম। কিন্তু টলস্টয়ের জীবনের একটা ঘটনার কথা শুনে সে আশা ত্যাগ করে আজ এই ছত্রিশগড়ের একটা গ্রামের ইস্কুল-মাস্টার হয়েছি—

জিজ্ঞেস করলাম—ঘটনাটা কী?

শর্মাজী গল্পটা বলতে লাগলেন। তিনি তখন নিজের ঘরের ভেতর বসে নিজের ভাত রান্না করছেন আর রান্না করতে করতেই গল্পটা বললেন।

সে বহুদিন আগের কথা। সালটা ১৯০৯। রাশিয়ার একটা ছেলে বাবা-মা'কে লুকিয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে একটা চিঠি লিখতে লাগলো। অনেকগুলো কাগজ নষ্ট করেও চিঠির লেখাটা তার ঠিক পছন্দ হলো না। এই রকম বার বার লেখার পর শেষকালে একটা চিঠি কোনও রকমে খাড়া করে ফেললে সে।

ছেলেটির বয়েস তখন মাত্র আট বছর।

আট বছর বয়েসের একটা ছেলে এমন করে কাউকে চিঠি লিখতে পারে এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বানান ভুলে ভর্তি, বাঁকাচোরা লাইন, চোতা কাগজ। চিঠিখানা সে একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

কিন্তু তারপর? তারপর সে-চিঠির উত্তর আর তার কাছে এল না। যে-চিঠিটা সে লিখেছিল তার কথাও সে ভুলে গিয়েছিল। কারণ চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা বরাবর মনে রাখতে হবে। এইটুকু শুধু মনে ছিল যে সে

তাতে লিখেছিল—"ডিয়ার কাউন্ট্ টলস্টয়, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে আপনাকেই আমি সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। আমি বড় হয়ে একদিন আপনার মত সাহিত্যিক হতে চাই। তাই আমি আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। ইতি—"

ছোট চিঠি। কিন্তু যিনি বহু লোকের শত শত চিঠি রোজ পান তিনি কেন সামান্য একটা আট বছর বয়েসের ছেলের বানান-ভুল চিঠির উত্তর দেবেন? তাঁর অত সময় কোথায়? তাঁকে তো আরো বড় বড় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

কিন্তু না, একদিন সত্যিই উত্তর এল টলস্টয়ের।

ছেলেটার বাবা মা দু'জনেই সেদিন তাদের বাইরের ঘরে বসে আছেন, এমন সময়ে একজন পোস্ট্‌ম্যান একটা চিঠি দিয়ে গেল তাঁদের হাতে। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন চিঠিটা বুঝি তাঁদেরই। কিন্তু তা নয়। চিঠির ওপরে তাঁদের আট বছর বয়েসের ছেলের নাম-ঠিকানা লেখা।

আশ্চর্য! আট বছর বয়েসের ছেলেকে কে চিঠি লিখলো?

তাড়াতাড়ি তাঁরা চিঠির মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেন। পত্রদাতার নাম পড়ে তাঁরা তো অবাক! চিঠি লিখেছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়।

টলস্টয় লিখেছেন:

"Seryojna Yermoluisky
Snegovaya st. no 7. Flat no. 1. Villinus.
Yasanaya Polyana

March 25. 1909.

Your wish to become a writer is a wicked wish, for it means that you want worldly fame for yourself. It is just wicked vanity. One should have only one desire to be kind, not to offend, not to censure and not to hate anyone, but to love everybody.

Lev Tolstoy."

এর ভাবার্থ হলো এই যে—"তোমার লেখক হওয়ার ইচ্ছেটা হচ্ছে বদ্ ইচ্ছে। এর মানে হচ্ছে তুমি নিজের জন্যে জাগতিক খ্যাতি চাও। এটা একটা বদ্ দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারোর প্রতি নিষ্ঠুর হবো না, কারোর প্রতি দোষারোপ করবো না, কাউকে আঘাত দেব না, সকলকে ভালোবাসবো—এইটেই মানুষের প্রথম আর প্রধান কামনা হওয়া উচিত। ইতি-লিও টলস্টয়।

রামাবতার শর্মাজী এবার থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

রামাবতার শর্মা বললেন—চিঠিটা পড়ে আট বছর বয়েসী ছেলেটি কিছুই বুঝতে পারলে না। চিঠিটাতে টলস্টয় যা লিখেছিলেন তার তাৎপর্য বোঝবার মত বয়েস তখন ছেলেটির হয়নি। ছেলেটির মনে শুধু সমস্যা জাগলো একটা। তবে কি লেখক হওয়া খারাপ?

কথাটা বড় জটিল। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে খারাপ নয়, ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার ইচ্ছেও খারাপ নয়, উকিল-ব্যারিস্টার-এ্যাকাউন্‌টেন্ট হওয়ার ইচ্ছেও খারাপ নয়। তবে কি শুধু লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছেটাই খারাপ? যশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছেটাও খারাপ?

অথচ সবাই-ই তো অর্থ-যশ-প্রতিষ্ঠা চায়।

কথাটা ভাবিয়ে তুললো সেই আট বছর বয়েসের ছেলেটিকে।

কিন্তু ছেলেটির বাপ-মায়ের মনে খুব আনন্দ। তাঁরা তখন কৃতার্থ হয়ে গেছেন। তাঁদের ছেলেকে টলস্টয় চিঠি লিখেছেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

রাতারাতি ছেলেটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে গ্রামের মধ্যে। সে রাস্তা দিয়ে গেলে অন্য লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখায়। বলে—ওই দ্যাখ্, ওই ছেলেটা।

বাড়িতেও ভিড় জমতে লাগলো শেষকালে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছেলেটা আর টলস্টয়ের চিঠিটা দেখতে আসতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীর লোক যে মহাপুরুষকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব সেই তিনিই চিঠি দিয়েছেন। তিনি চিঠি লিখেছেন নিজের হাতে। এ এক রকমের বিস্ময়কর ঘটনা।

তারপর আর এক মজার ঘটনা ঘটলো।

সেই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকেই একখানা করে চিঠি যেতে লাগলো টলস্টয়ের নামে। সবাই টলস্টয়ের হাতের লেখা চিঠি চায়। কেউ বা একখানা বই চায়। কেউ চিঠি লেখে উপদেশ চেয়ে, কেউ চিঠি লেখে আশীর্বাদ চেয়ে। কেউ দেখা করতে চায়। কেউ আবার চায় একটা ফোটোগ্রাফ—অটোগ্রাফ দেওয়া। সবারই ওই এক কথা। ভালো কাগজে শুদ্ধ বানানে লাইন সোজা করে সবাই-ই লিখলে—শ্রদ্ধেয় টলস্টয়, আমি বড় হয়ে একজন লেখক হতে চাই, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

কিন্তু তখন ১৯১০ সাল। সে-সব চিঠি টলস্টয়ের কাছে পৌঁছোল কিনা কে জানে! কারণ সেই বছরেই ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি মারা গেলেন। তাই সেই গ্রামের আর কোনও ছেলেই তাদের সে-সব চিঠির কোনও জবাব

পেলে না তাঁর কাছ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

রামাবতার শর্মা বলতে লাগলেন—তারপর আর কী! ছোটবেলা থেকে আমারও অন্য ছেলেদের মত লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টলস্টয়ের ওই চিঠির ঘটনা জানার পর থেকেই আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তখন মনে হলো যে আমার লেখক হওয়ার বাসনাটা আসলে আমার অহঙ্কারের বাসনা, আমার আত্মপ্রচারের বাসনা, আমার নীচতার বাসনা, মানুষের জীবনের আসল কামনা হওয়া উচিত পরকে আপন করার সাধনা, পরকে ভালোবাসার সাধনা, দূরকে কাছের করবার সাধনা, সেই উদ্দেশ্যেই আমি আর লেখক হওয়ার চেষ্টাই করিনি। লেখা বন্ধ করে দিয়ে এখন আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার সাধনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

তারপর শর্মাজী একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে সিনেমা-পার্টি বোম্বাই থেকে এখানে শূটিং করতে এসেছে—এর স্টোরি-রাইটার কি আপনি ?

বললাম—হ্যাঁ, স্টোরি ডায়ালগ, দুটোই আমি লিখেছি। কিন্তু ওই যে আপনি টলস্টয়ের চিঠিটার কথা বললেন ও ঘটনাটা কি কোনও বইতে পড়েছেন ? যদি পড়ে থাকেন তো সে বইটার নাম কী, আর কোথায়ই বা তা কিনতে পাওয়া যাবে ?

শর্মাজী বললেন—ওটা শুনেছি ঘাটবাবুর কাছে!

বললাম—ঘাটবাবু ? ঘাটবাবু কে ?

রামাবতার শর্মাজী বললেন—ওই যে যিনি আপনাদের নদী পারাপার করে দিয়েছেন। ওপারে তো আপনারা মকর-সংক্রান্তির মেলার শূটিং করতে গিয়েছিলেন। ওই মেলার জন্যে রোজ হাজার হাজার লোক এপার-ওপার করছে, ওই ঘাটবাবু নিজে নৌকা বেয়ে সকলকে খেয়া পারাপার করে দেয়। তার জন্যে কারো কাছে একটা পয়সাও নেয় না। আপনি তো দেখেছেন তাকে!

জিজ্ঞেস করলাম—সেই মাথায় পাগড়ি-পরা লোকটা ?

—হ্যাঁ, উনিই আমাদের ঘাটবাবু। এই স্কুলটা ওরই টাকায় তৈরি করে দেওয়া। এই স্কুলটাই শুধু নয়, এখানে আদিবাসী ছেলেদের জন্যে একটা লাইব্রেরীও করে দিয়েছে ওই ঘাটবাবু। আগে এখানে আদিবাসীদের জন্যে খৃষ্টান মিশনারিরা হাসপাতাল ডাক্তারখানাও করে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে আদিবাসীদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ নিতে হতো। হাসপাতালের দরোয়ান-চাপরাশিরা অনেক ঘুষ নিত, কিন্তু ঘাটবাবু যে হাসপাতাল করে দিয়েছে তাতে ও-সব তকলিফ নেই। ঘাটবাবু শুধু দাওয়াইএর ব্যবস্থাই করেনি, সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। বিনা পয়সায় তারা সাবু বার্লি পায়। এখানকার ইস্কুল থেকে পড়ে ছেলেরা নাগপুর থেকে ডাক্তারি পাশ করে এখন এখানে এসে এই হাসপাতালে ডাক্তার হয়েছে। এখন আর কোনও আদিবাসীকে খৃষ্টান মিশনারিদের হাসপাতালে ইলাইজের জন্যে যেতে হয় না। মিশনারি সাহেবরাও তাদের হাসপাতাল এখান থেকে পেন্‌ড্রা রোডে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

রামাবতার শর্মাজীর কাছে এখানকার ঘাটবাবুর

আমি লাফিয়ে উঠলাম, আরে অনাদি না ?

অনুবাদ সিরিজ

প্রত্যেক মাসে একটি করে নতুন বই বেরুচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় আমাদের নতুন সংযোজন।

১লা সেপ্টেম্বর বেরিয়েছে এইচ. জি. ওয়েলসের

দ্য স্লীপার এ্যাওয়েকস

১ আগস্ট বেরিয়েছে
স্যার ওয়ালটার স্কটের

দ্য ট্যালিসম্যান

১ জুলাই বেরিয়েছে
মার্ক টোয়েনের

এ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলেবেরি ফিন

১ জুন বেরিয়েছে লুইস ক্যারলের

এ্যালিস'স এ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড

১ মে বেরিয়েছে
জ্যাক লন্ডনের **হোয়াইট ফ্যাং**

প্রত্যেকটি বই ছবিতে ভরা। দাম মাত্র আট টাকা করে।

অনুবাদ সিরিজের আরও ক'য়েকটি বই

ফিফথ কলাম, টয়লার্স অব দি সি, গ্রেট এক্সপেক্টেশনস, দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন, দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লডস, রব রয়, দ্য পাথ ফাইণ্ডার, দ্য কনস্পিরেটর্স, সাইলাস মার্নার।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রা:) লি:
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৯

কাহিনী শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কদমকুয়া তখন নিথর নিস্পন্দ। আমাদের সিনেমা-পার্টির লোকরা তখন বোধহয় তাদের ট্রানজিসটার খুলে দিয়ে রেডিওর 'বিবিধ-ভারতী'র গান শুনছে। তার সুর মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে।

চারদিকের দেওয়ালের গায়ের আলমারিতে অনেক বই থরে থরে সাজানো রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম—অত বই কার? কে অত বই পড়ে?

শর্মাজী বললেন—ও বই সব ঘাটবাবুর—ওরও লেখক হওয়ার নেশা ছিল। কিন্তু টলস্টয়ের ওই চিঠিটা পড়বার পর থেকেই উনি লেখা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে এই ঘাটবাবু হয়েছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন—ওই যে ঘাটবাবু এসে গেছে—

আমি দেখলাম সেই ঘাটবাবু ঘরে ঢুকছে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া, খাটো ধুতি আর পায়ে দেহাতি জুতো। মনে পড়লো এই ঘাটবাবুই আমাদের সিনেমা-পার্টির লোকদের আড়পা নদীর ওপারে খেয়া বেয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলতেই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

আমি লাফিয়ে উঠলাম—আরে অনাদি না?

অনাদিও তখন আমার দিকে চেয়ে আমাকে চিনতে পেরে বললে—আরে, তুই?

আমি তখন অনাদিকে সামনে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছি। বললাম—তুই আমাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছিস ভাই—

বলে সংগে সংগে তার পায়ে হাত দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই সে আমাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলে। বললে—ছি ছি, তুই পায়ে হাত দিচ্ছিস কী বলে? আমরা তো সবাই সমান রে! কেউ বড়, কেউ ছোট নই, সবাই আমরা সমান.....তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি.....

তার কথা শুনতে শুনতে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না, আমার দু'চোখ বেয়ে তখন শ্রাবণের ধারা নামতে শুরু করেছে.....

আমি তখন ভাবছি কবে আড়াই হাজার বছর আগে কোন্ এক রাজার ছেলে পথে নেমে এসে বুদ্ধদেব হয়ে গিয়েছিল আর এ-যুগে তেমনি আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। এক কোটিপতির ছেলে অনাদি মুখার্জি কার লেখা একটা বই পড়ে কোন্ এক যাদু-মন্ত্রে হয়ে গেল ঘাটবাবু!

ছবি—দিলীপ দাস

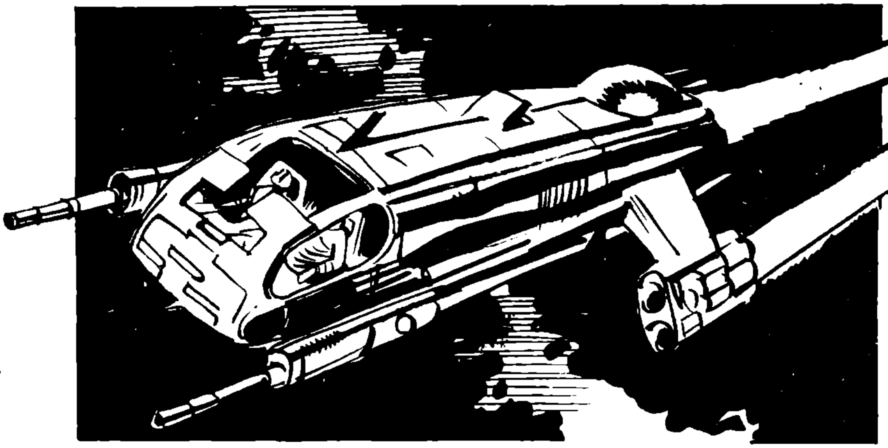

মহাশূন্যের বিভীষিকা

শচীন দাশ

ব্যাপারটা ভাবতেই এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর একটু, আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই যে আমাদের মহাকাশযান চৈতক একটা ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বিপদ কী যে সে বিপদ—ছুটন্ত ওই উল্কাপিণ্ডটার সংগে ধাক্কা লাগলে চৈতক তো ভেঙে টুকরো টুকরো হতই, সেই সংগে আমরাও যে কে কোথায় ছিটকে পড়তাম তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়তো আমাদের কাটাছেঁড়া অংগ-প্রত্যংগগুলো এতক্ষণে মাধ্যাকর্ষণের অভাবে পৃথিবীতে না পড়ে এই মহাশূন্যেই ভেসে বেড়াত। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে এ-যাত্রায় আমরা বেঁচে গেছি। আর যার জন্য এ ব্যাপারটা সম্ভব হল সে নিঃসন্দেহে সুগ্রীব।

সুগ্রীব আসলে একটি বাঁদরের নাম। আমার অ্যাসিসট্যান্ট। একবার বেনারস থেকে মাত্র মাসখানেকের বাচ্চাবস্থায় ওকে নিয়ে এসেছিলাম। তখনই লক্ষ্য করেছিলাম আর পাঁচটা বাঁদরের তুলনায় ও অনেক বেশি তৎপর ও বুদ্ধিমান। লেবোরেটরিতে বিশেষ শব্দ-তরংগের সাহায্যে ওর মস্তিষ্ক পরীক্ষার পর জেনেছিলাম ওর ব্রেন একদম মানুষের মতো; তফাৎ শুধু একচুলের। আর সেজন্যেই ওকে দিয়ে মানুষের মতো কথা বলানো না গেলেও বাকি সবই করানো যাবে। ব্যস, কথাটা জানার সংগে সংগেই শুরু হয়েছিল ওকে ট্রেনিং দেওয়া। আমি ওর পেছনে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। আর পাক্কা বছর পাঁচেক ট্রেনিং নেওয়ার পর ও এখন আমার একজন দক্ষ সহকারী।

ওই দেখুন। একটা উল্কা আসছে।

কথা বলতে পারে না তবে আকারে-ইঙ্গিতে সবই বোঝায়। তাছাড়া আমাদের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য আমি এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা তৈরি করেছিলাম। সে ভাষায় ডাকলে বা কিছু বললেই সুগ্রীব চট করে তা বুঝতে পারত। ফলে আমাদের মধ্যে কথার আদান-প্রদানে তখন আর কোনো অসুবিধে ছিল না। আর এভাবেই আস্তে আস্তে আমি ওকে এই মহাকাশযানের অনেক কিছুই চিনিয়েছিলাম। দেখিয়েছিলাম, কোনটা কন্ট্রোল রুম; কোন বোতামে চাপ দিলে চৈতকের ভেতরে একটা বিশেষ আলো জ্বলে ওঠে আর আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে চৈতকের স্বয়ংক্রিয় রাডার কিভাবে বাইরের কক্ষপথের ছবি পাঠাতে শুরু করবে। বুঝিয়েছিলাম, লাল-নীল-হলুদ-সবুজ ইত্যাদি নানারকম বোতামের কোনটা টিপলে কী হয়।

সুগ্রীব শুনত আর মন দিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করত। কিন্তু আমার সহযাত্রীদের চোখে বোধহয় এটা ভালো ঠেকল না। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই অভিযানে সুগ্রীবও যাচ্ছে শুনে ওরা আপত্তি জানাল। একজন তো থাকতে না পেরে বলেই বসল, কোনার—এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আপনি এত শেখাচ্ছেন শেষে প্রভুভক্ত সেই বাঁদরের গল্পের মতো না হয়ে যায়। তারচেয়ে ওকে না নেওয়াই ভালো।

আরে না না—পাল্টা বাধা দিয়ে আমিও জানিয়েছিলাম সুগ্রীবকে নিয়ে কোনো ভয় নেই। ওকে বিশেষভাবে দেখেছি আমি। এমনকি ওর ব্রেন টেস্টও করিয়েছি.......এই দেখুন না সেই রিপোর্ট—

বলে উঠে গিয়ে রিপোর্টটা দিতেই ওদের চোখ ছানাবড়া। নিজেরাই পরস্পর কী যেন আলোচনা করল। পরে কী বলবে কিছুই বুঝতে না পেরে অনেকক্ষণ ওরা সুগ্রীবের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি জানতাম, এরপর আর ওরা বাধা দেবে না। কোনোরকম আপত্তিও করবে না।

করলও না। অগত্যা নির্দিষ্ট দিনে আমাদের সঙ্গে সুগ্রীবও চৈতকে উঠল।

উঠল তো—কিন্তু চোখ ছিল আমার সব সময়ই ওর দিকে। আসলে মহাশূন্যে ভেসে পড়েছি আমরা বিশেষ একটি লক্ষ্য নিয়ে। শুক্র ও তার আশেপাশের কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এই ছিল আমাদের গবেষণার বিষয়। আর সে লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যই চারজনের একটা টিম নিয়ে আমরা পাড়ি দিয়েছি অজানার উদ্দেশে। অথচ এ গবেষণায় নামলেও পৃথিবীর একটি প্রাণ মহাশূন্যে উঠে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে কি করে মানিয়ে নিচ্ছে তাও ছিল দেখার বিষয়। সুগ্রীবের দিকে তাই বারবার তাকাচ্ছিলাম।

কিন্তু ও খুবই স্বাভাবিক। নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। লাল নীল বোতামগুলোর দিকে চোখ ফেরাচ্ছে, আবার সময়মতো কন্ট্রোল রুমের ভেতরের টেলিভিশনের পর্দায় রাডারের পাঠানো বাইরের কক্ষপথের ছবি দেখছে।

আমরাও দেখছিলাম। আর লক্ষ্য রাখছিলাম পর্দায় কখন শুক্র গ্রহের ছবি ফুটে ওঠে।

এমনিই চলছিল। হঠাৎ-ই একটা চিৎকার।

কোনার, কোনার ওই দেখুন। একটা উল্কা আসছে। কী প্রচন্ড গতি—

চিৎকারটা করেছিল নায়ার। সঙ্গে সঙ্গে আমি টি.ভির পর্দার দিকে মুখ ফেরালাম। সত্যিই একটা উল্কাপিন্ড—প্রকান্ড সাইজের। তীব্র গতিতে এদিকে ছুটে আসছে। কিন্তু এ কী—! আসছে তো আমাদের মুখোমুখি রাস্তায়। সর্বনাশ—! রাস্তা পাল্টাতে না পারলে তো এক্ষুণি ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যাবে চৈতক। আর আমরাও তাহলে—

নায়ারকে দেখি সে এপাশে ওপাশে কী দেখছে। তারপরেই ব্যাপারটা জানাবার জন্য আমাদের আরও দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। যদিও লাহিড়ি ও দুবে ততক্ষণে দেখে ফেলেছে, তবুও জিনিসটা দেখিয়ে খুব সংক্ষেপে নায়ার ওদের সঙ্গে একবার আলোচনাও করে নিল। ওরা কী বলল জানি না, তবে আমি খুব চিন্তায় পড়লাম। টি.ভি-র দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই বললাম,

ব্যাপার কী নায়ার! এখন কি করা যায় বল তো?

নায়ার প্রথমে কী ভাবল, তারপর যা বলল তার সংগে আমিও একমত। অর্থাৎ উল্কাপিন্ডটার গতিপথ তো আর সরানো যাবে না, সরাতে হলে আমাদের চৈতককেই তার রাস্তা পাল্টাতে হবে। আর তা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই। কেননা উল্কাটি কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর আমাদের সামনে আসতে লাগবে পাঁচ-ছ মিনিট। এদিকে এত কম সময়ের মধ্যে আমাদের মহাকাশযানের গতিপথ ঘোরাতে গেলেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না, হঠাৎ সেই সময়েই কন্ট্রোল রুমের সবুজ আলোটা জ্বলে উঠল। আর সংগে সংগেই বেশ জোরে একটা শব্দ। মুহূর্তেই টি.ভি-র পর্দাটা পুরো কালো হয়ে গেল। মনে হল, কিছু যেন একটা খুব জোরে বেরিয়ে গেল আমাদের যানের পাশ দিয়ে।

নায়ার চেঁচিয়ে উঠল, সাবাস—সাবাস সুগ্রীব—

তাকিয়ে দেখি আমার সামনেই সুগ্রীব। কন্ট্রোল রুমের সবুজ বোতামটা টিপে ধরে বসে আছে।

নায়ার বলল, নাহ্ বাঁদরটা আপনার সত্যিই জিনিয়াস কোনার। ও না থাকলে আমরা আর এতক্ষণে বেঁচে থাকতাম না। বিপদটা টের পেয়ে যেভাবে গিয়ে ও সবুজ বোতামটা টিপে ধরল তাতেই চৈতকের গতিপথ পাল্টে গেল।

আমি ততক্ষণে ব্যাপারটা আবার প্রথম থেকেই ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ভাবনা আর বেশিদূর এগোল না। ঠিক তখুনি কানের যন্ত্রে লাহিড়ির গলা ভেসে উঠল।

লাহিড়ি স্পিকিং.....লাহিড়ি স্পিকিং.....

হ্যালো.....হ্যাঁ.....কোনার বলছি—

স্যার একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন!

কী.....কী জিনিস বল তো?

আমরা একটা অজানা গ্রহের কাছাকাছি এসে পড়েছি—

সে কী! কই কোথায়?

লাহিড়ির কথায় চোখ ফেরাতেই দেখি টি.ভি-র গায়ে একটা গ্রহের ছবি ফুটে উঠেছে। এতক্ষণ টি.ভি-র পর্দায় শুধু উল্কাপিন্ডটাকেই দেখছিলাম। সেটা চলে যেতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি সংগে সংগে এই গ্রহটা এসেছে। কিন্তু এটা কোন গ্রহ? এ তো শুক্র নয়। আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, এখনো আমরা শুক্র গ্রহের সন্ধান পাইনি; পাবো আরো কয়েক ঘন্টা বাদে। কিন্তু তার আগে এই গ্রহটা কোত্থেকে এল! তবে কি একটু আগে সুগ্রীব আমাদের গতিপথ পাল্টে দিতেই হঠাৎ এই গ্রহটির দেখা পাওয়া গেল!

লাহিড়ি বলল, স্যার আমরা কি নামবো এখানে?

দাঁড়াও। অত তাড়াহুড়ো করলে চলে! এ গ্রহের পজিসন কি দেখ। আবহাওয়া কেমন, টেম্পারেচার কত?

মোটামুটি সব খবরই নিয়েছি স্যার। তাপমাত্রা ও আবহাওয়া আমাদের অনুকূলেই।

তবে তো এখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হ্যাঁ স্যার সেজন্যই বলছি।

তবে সবাইকে জানাও। আমি তোমার রিপোর্টটা আর একবার খুঁটিয়ে দেখি—

বলতে না বলতেই কন্ট্রোল রুমের লাল আলোটা জ্বলে উঠল। সংগে সংগে বিব্-বিব্ করে একটা আওয়াজ। অর্থাৎ চৈতক সিগন্যাল দিচ্ছে। আর একটু বাদেই সে দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ নামবে অজানা ওই গ্রহে—আমাদের নিয়ে। আর অন্য অংশ সামান্য দূরে ঘুরতে থাকবে। পরে কাজ হয়ে গেলে আমাদের নিয়ে সেই অংশ আবার মূল-অংশের সংগে গিয়ে মিশবে।

দেখতে দেখতে গ্রহটা আরও কাছে এসে গেল। আর সেই সময়েই আমাদের নিয়ে চৈতক মূল-অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে সে নামতে লাগল গ্রহের দিকে।

ততক্ষণে আমরা স্থির। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছি। এই সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক মতো নামতে না পারলে বিপদের সম্ভাবনা। আর বিপদ যে হয়নি আগে তা নয়। এর আগেরবার অন্য এক গ্রহে নামতে গিয়ে আমাদের যানটা গোলমাল করে ফেলেছিল। একটুর জন্য সেবারে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারের চৈতক ঠান্ডা মাথায়ই নামছে। ঠিক যেভাবে নামা উচিত সেভাবেই গতি কমাতে কমাতে এরপর একসময় খুব আস্তে গ্রহের বুকে সে নেমে দাঁড়াল। আর তারপরই তার স্বয়ংক্রিয় দরজাটা খুলে গেল।

কিন্তু দরজা খুলে নামতেই অবাক। চারদিকে শুধু খানাখন্দ আর বালি পাথর। কোনো গাছপালা নেই, নদী-নালা নেই। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু একই দৃশ্য। তাছাড়া যেমন গরম আর শুকনো আবহাওয়া তাতে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছিল; তবে তাহলেও তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না।

পা ফেলে ফেলে আমরা এগোচ্ছিলাম। মুখে অক্সিজেনের নল বাঁধা, পেছনে পিঠের ওপরে অক্সিজেন-সিলিন্ডার। এছাড়া লাহিড়ি ও নায়ারের

হাতে ছোট ছোট দুটো গ্লাস-ফাইবারের বাক্স ও চিমটে। চৈতক যান থেকে নামার সময় মনে করে এগুলো ওরা নিয়ে নেমেছে। আনার উদ্দেশ্য এই অজানা গ্রহের মাটি-পাথর বা অন্য যা কিছু চোখে পড়ার মতো পাওয়া যাবে, তাই এতে সংগ্রহ করা।

নায়ার বলল, কোনার এটা কি গ্রহ বলুন তো?

আমি জানালাম, ঠিক বুঝতে পারছি না; তবে পরিচিত কোনো গ্রহ তো নয়। মনে হয় শুক্রের কাছাকাছি কোনো গ্রহ।

এদিকে বোধহয় একদিন সমুদ্র ছিল। এসব বালি আর পাথরই তার প্রমাণ–

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো নায়ার। এখন সমুদ্র নেই তবে জায়গাটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

কথা বলতে বলতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি দুবে নেই। এই তো আমাদের সংগে সংগে আসছিল, এর মধ্যে কোথায় গেল। এদিকে ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, অনেকটা পেছনে দাঁড়িয়ে চুপ করে একমনে কী দেখছে সে।

কী হল! দুবে হঠাৎ ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছে! আমরা এগোতেই দুবে হাত তুলল। কাছে যেতেই বলল, স্যার দেখেছেন–

কী বল তো?

ওই দেখুন–

দুবে আঙুল তুলতেই নজরে পড়ল, সামনে একটা খাদ মতো জায়গা। বালি আর পাথর জমে সেখানে একটা ঢিবির মতো তৈরি হয়েছে। আর সেই ঢিবিরই এক জায়গায় একটা হাড় পড়ে।

এখানে হাড়! আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তার মানে তো দাঁড়াচ্ছে, এখানে প্রাণ আছে। কোনো প্রাণী মরে যাওয়ার পর তার দেহের কোনো একটা হাড় কি করে এখানে এসে পড়েছে।

দুবে জিজ্ঞেস করল, স্যার ওটা তুলে আনবো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আনতে তো হবেই। তবে আমার মনে হয় ওদিক দিয়ে না গিয়ে এদিক দিয়ে যাওয়াই ভালো।

দুবে নেমে হাড়টা আনতে গেল। আর ঠিক তখুনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব বিরক্ত হলাম। দুবের হাতের গ্লাভসের বোতামগুলো খোলা। সত্যি ওকে নিয়ে পারা যায় না! পই পই করে বলা সত্ত্বেও কখন যে গ্লাভসের বোতাম খুলে গেছে সে ব্যাপারে খেয়াল করেনি। এসব অভিযানে এত অমনোযোগী হলে চলে!

হাড়টা নিয়ে কাছে আসতেই ধমক দিলাম। কি হল দুবে! তোমার গ্লাভসের বোতাম খোলা কেন?

দুবে হাসল, খেয়াল নেই স্যার কখন খুলে গেছে। এই আটকে দিচ্ছি–

দুবে আমার হাতে হাড়টা তুলে দিয়েই গ্লাভসের বোতাম আটকে নিল। কিন্তু ততক্ষণে আমি অবাক। শুধু আমি কেন, নায়ার ও লাহিড়িও আমার দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, কী মনে হচ্ছে?

স্যার এটা তো মানুষের হাড়। লোয়ার পোরশানের কোনো বোন.বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু–

হ্যাঁ, সেটাই তো আমি ভাবছি–লাহিড়ির কথায় জানলাম, নিশ্চয়ই এই গ্রহে কোনো দেশ থেকে কেউ এসেছিল। দু'জন বা তিনজন। কিন্তু ফিরতে পারেনি–

কিন্তু কোনার–নায়ার চিন্তিত মুখে জানাল, তাহলে ওদের মহাকাশ যানের তো চিহ্ন পাওয়া যাবে।

বললাম, হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। তবে মানুষটির আরও হাড়গোড় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তার কারণ দলছুট হয়ে হয়ত হারিয়ে গিয়েছিল। যানে উঠতে আর পারেনি। এদিকে নির্দিষ্ট সময় হয়ে যাওয়ায় যানটি গিয়ে মূল-অংশের সংগে মিলেছে। ফলে দলছুট মানুষটি রয়েই গেছে এখানে। এর পরে তার পরিণতিটা ভেবে নাও–

পরিণতিটা ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ দুবের গলা শোনা গেল, স্যার আমার হাতটা অসম্ভব চুলকোচ্ছে। আপনাদেরও কি এমন হচ্ছে?

কই না তো। দেখি কোথায়?

গ্লাভসসহ হাতটা তুলে দেখাল দুবে, এর ভেতরে.....ভীষণ চুলকোচ্ছে–

তখনই বলেছিলাম এত আনমাইন্ডফুল হয়ো না। নিশ্চয়ই কোনো রকম ইনফেক্শান হয়েছে। একটু অপেক্ষা কর–

কিন্তু বলতে না বলতেই দুবে চেঁচিয়ে উঠল, উঃ–কী সাংঘাতিক। স্যার আমি পারছি না। হাতদুটো মনে হচ্ছে কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে–

কি বলছ দুবে–আমি ভয় পেলাম। আলতো করে ওর হাতদুটো ধরে নায়ারকে ডাকলাম, নায়ার আস্তে করে গ্লাভসের বোতামটা খোল দেখি–

নায়ার খুলতেই অবাক হলাম। দুটো হাতই কব্জি থেকে রক্তের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য! দুবে তো কুচকুচে কালো; হঠাৎ ওর হাতটা এমন লাল হল কি করে? একমাত্র শরীরে নায়েসিনামাইড ভিটামিনের অভাবে গায়ের চামড়া ও ঠোঁট এ রকম লাল হয়ে যায়।

ওকে তখন পোলেগ্রা বলে। কিন্তু দুবের তো এ ধরনের কোনো রোগ হয়নি। তাছাড়া এই অভিযানে আসার আগে আমাদের অন্তত বারো বার মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয়েছে। তাহলে?

দুবে আর্তনাদ করে উঠল, স্যার আমি আর পারছি না। গ্লাভস দুটো খুলে ফেলুন।

উপায় না দেখে টেনে খুলতেই দেখি দুটো হাতই দগদগে লাল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া হাত দুটো যেন ফুলেও উঠেছে। এখন কি করা যায়? কি ওষুধ দেব!

ভাবতে ভাবতে যখন নায়ারের দিকে তাকিয়েছি সেই সময়েই সুগ্রীব আচমকা সরে গেল জায়গাটা থেকে। ব্যাপারটা আমার নজর এড়াল না। সংগে সংগে আমি মুখ তুললাম। দেখি সুগ্রীব দৌড়োচ্ছে। দৌড়তে অবশ্য পারছে না গায়ে ও পায়ে পোশাক থাকায়। কিন্তু সে যে ছোটার চেষ্টা করছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতক্ষণ তো ভালোই ছিল, হঠাৎ কী দেখে এমন চঞ্চল হল।

আমি ডাকলাম, সুগ্রীব—এ্যাই সুগ্রীব—

সুগ্রীব দাঁড়াল না। নায়ার বলল, কিছু একটা দেখেছে ও। শত হলেও তো জন্তু। আমাদের আগেই নিশ্চয়ই কারও অস্তিত্ব টের পেয়েছে।

আমি আবারও চেঁচিয়ে ডাকলাম। তারপরেই ওর পিছু নিলাম। অজানা অচেনা পরিবেশে গিয়ে আবার দুবের মতো না কিছু বাধিয়ে বসে। তাই পিছন থেকে বাধা দিলাম।

কিন্তু সুগ্রীব আমার কথায় দাঁড়াল না। সে ততক্ষণে অনেকটা দূরে। ভয়ংকর চঞ্চল হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। একবার দাঁড়াল খাদের মতো একটা জায়গার নিচে তাকিয়ে কী দেখল; আর তারপরেই হঠাৎ পেছনে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিচ্‌কিচ্‌.....কিচিকিচি.....

বুঝলাম, সুগ্রীব কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি বলছে ও! ও কি কিছু দেখেছে?

জিজ্ঞেস করার আগেই দেখি হাত তুলেছে সুগ্রীব। ঠিক যেদিকে তাকিয়েছিল সেদিকে মুখ ফিরিয়েই আবার সাংকেতিক ভাষায় আমার সংগে কথা বলল। এবার পরিষ্কার হল, দূরের দিকে আমাদের কী দেখতে বলছে সুগ্রীব।

আমরা তাকালাম। তবে আমি কিছু দেখার আগেই লাহিড়ি চেঁচিয়ে উঠল, আরি বাপ্‌স—ওগুলো কি স্যার? দেখুন লালচে ধোঁয়ার মতো উড়ে আসছে।

আমরা একটা অজানা গ্রহের কাছাকাছি এসে পড়েছি

ততক্ষণে আমারও চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। খালি চোখে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, তবে গলা থেকে দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগাতেই ভেসে উঠল, ঠিক মাছের ডিমের মতো লাল রঙের অসংখ্য কী যেন ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় তারা কোটি কোটি। ওগুলো কি! ওরা কি কোনো প্রাণী?

হঠাৎ মাথার ভেতরে কী যেন লাফিয়ে উঠল। সংগে সংগে দূরবীন নামিয়ে দুবের হাতটা তুলে নিলাম। যা ভেবেছিলাম। পকেট থেকে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটা বের করে ওর হাতের ওপরে ফেলতেই চমকে উঠলাম। দুবের হাতেও লাল রঙের মাছের ডিমের মতো অসংখ্য কী যেন লেগে আছে। সমানে ওর হাতের কালো চামড়া খেয়ে যাচ্ছে। দু এক জায়গায় ইতিমধ্যে মাংসও বেরিয়ে এসেছে।

ঠিক সন্দেহই করেছিলাম। এগুলোই ঐ প্রাণী, যা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে। আর দুবে যখন হাড়টা কুড়িয়ে আনতে যাচ্ছিল তখন এগুলো বোধহয় আশেপাশে কোথাও ছিল; এত ছোট যে দুবের ঠিক চোখে পড়েনি। হাতের গ্লাভসটা একটু আলগা পেয়ে ওগুলো ওর হাতে আক্রমণ করেছে।

দুবেকে জিজ্ঞেস করলাম, দুবে, এখন আর কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না?

দুবে স্থির। আগের মতো আর অত ছটফট করছে না। বলল, না এখন আর কিছু বুঝতে পারছি না। হাতটা কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে—

সে কী—!

আমি কিছু বলার আগেই লাহিড়ি বলে উঠল, স্যার ওই দেখুন—ওরা এসে পড়েছে। শিগগির পালান.....এ

নিশ্চয়ই কোনো ভয়ংকর পোকা–

পোকা নয়, প্রাণী–দুবের হাতে যেগুলো লাল হয়ে আছে। আসছে আমাদের খবর পেয়েই। পেলে এবারে আমাদেরও টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তার চেয়ে লাহিড়ি যা বলেছে তাই ভালো। চল আমরা পালিয়ে যাই–

কিন্তু পালাবেন কি করে–নায়ার বলল, ওগুলো এসে গেছে.....

এদিকে চৈতকও অনেকটা দূরে; কাছাকাছি থাকলে দৌড়ে গিয়ে উঠে চালিয়ে দেওয়া যেত–

দিলে কি হবে.....

কেন সময় তো হয়ে গেছে কোনার–

বললাম, হ্যাঁ তা জানি। আর ওই প্রাণীগুলো না এলেও এবার আমাদের যেতেই হত। কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে অন্য জায়গায়।

কী সমস্যা স্যার.....তাড়াতাড়ি বলুন–

তোমরা কী ভেবে দেখেছ, দুবেকে নিয়ে এ অবস্থায় কী করে যানে উঠব। দুবের হাতটায় ইনফেকশান হয়ে গেছে।

শীঘ্র প্রভাবশালী সফল চিকিৎসার সন্ধান

শ্বেতীর চিকিৎসা

সাদা দাগের সহস্রাধিক রোগীকে ব্যাধিমুক্ত ক'রে আমরা প্রচুর প্রশংসাপত্র লাভ করেছি। বহু বছরের পরিশ্রমে সাদা দাগ হ'তে অব্যাহতি লাভের সাফল্য অর্জন করেছি। ঔষধ এতই শক্তিশালী

যে শুরু থেকেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ ক'রে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে। দাগ বিলুপ্তি হবে না ব'লে যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদেরও ব্যাধি নির্মূল করা হয়েছে, হাজার হাজার ব্যক্তি ফল লাভ করেছেন এবং নিত্য ফল লাভ করছেন। প্রচারার্থে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সব দিক নিরাশ হ'য়ে থাকলে অন্ততঃ একবার এটি পরীক্ষা করে দেখুন। কোথায় কোথায় দাগ আছে এবং কত দিনের, বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই লিখবেন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন।

ধবল বা শ্বেতী কেন হয় এবং কিভাবে এর নিরাময় হয় তাহা জানার জন্য **'শ্বেতী বা ধবলের চিকিৎসার অনুসন্ধান'** বইখানি **বিনামূল্যে** নিন।

NATH AYURVEDASHRAM (SK)
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

বিপদের মধ্যেও কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল লাহিড়ি। বোধহয় ওর মনেও এ প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছিল। আমার কথায় বলল, স্যার দুবেকে নিয়ে আমরা চৈতকেই তুলব।

তারপর–

তারপর আর কী.....আমরা তো 'অন্য গ্রহের প্রাণ' নিয়ে গবেষণায় বেরিয়েছি; তা দুবের হাত থেকে বিন্দু বিন্দু ওই প্রাণগুলোর কিছুকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেখে দেব, পৃথিবীতে গিয়ে গবেষণার জন্য–

আর দুবের দূষিত হাতটা–

কেন স্যার.....আমাদের কাছে তো সালফেনিলামাইড লিকুইড আছে। দুবের হাতে লাগালে আমার তো মনে হয় ওগুলো মরে যাবে। হাতটাও বাঁচবে–

রাইট। ঠিক–ঠিক বলেছো তুমি লাহিড়ি। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। তাহলে চল আমরা পালাই। যেভাবেই হোক ওদের আগে আমাদের পৌঁছতেই হবে। সুগ্রীব.....সুগ্রীব কোথায়–

বলতে না বলতেই আমরা ছুটতে শুরু করলাম। দুবের দুটো হাত দুদিকে–আমার আর নায়ারের কাঁধে। পা দুটো ধরেছে লাহিড়ি। এ ভাবেই আমরা ছুটছি। কিন্তু সুগ্রীবকে কোথাও দেখলাম না। কী জানি গেল কোথায়! তবে কি ও গিয়ে আগেভাগেই উঠে পড়ল।

হঠাৎ একটা শব্দ উঠল।

তাকাতেই দেখি আমাদের যান চৈতক গ্রহ ছেড়ে উঠছে। একটু উঠেই সে এবার আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আশ্চর্য তো! চৈতক কি করে উড়ল? তবে কী সুগ্রীব–

আর ভাবতে পারলাম না। আমাদের অবাক করে দিয়ে চৈতক ততক্ষণে আমাদেরই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর দুবেকে তুলে দিয়ে চটপট আমরা উঠতেই দেখি–কন্ট্রোল রুমে সুগ্রীব।

সুগ্রীব তুই এখানে!

কিন্তু সুগ্রীব কোনো উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা বোতাম টিপল।

মুহূর্তেই চৈতক উড়ল আকাশে। তাকিয়ে দেখি, নিচে ততক্ষণে সেই লাল প্রাণীদের ঝাঁকটা এগিয়ে এসেছে। আর একটুর জন্য আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি–ভাগ্যিস সুগ্রীব ছিল।

সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে কন্ট্রোল রুমে বসার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম। লাহিড়ি ও নায়ার দুবেকে নিয়ে বসেছে ততক্ষণে।

ছবি : সরোজ সরকার

অলৌকিক ক্যালেন্ডার

মানবেন্দ্র পাল

লোকটিকে প্রথম থেকেই আমার বেশ মজার লেগেছিল। কুচকুচে কালো রঙ। একমাথা রুক্ষ চুল। লম্বা নাক। চোখদুটো জ্বলজ্বলে। পাতলার ওপর গড়ন। দেখলে মনে হয় গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু আলাপ হয়ে গেলে বেশ সহজ মানুষ বলেই মনে হয়।

এই মানুষটির সঙ্গে কিন্তু যে অবস্থায় আলাপ হয়েছিল তা বেশ সুখকর ছিল না।

সেবার পুজোর ছুটিতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলাম। রামেশ্বরম, মহীশূর, কন্যাকুমারিকা দেখে শেষে তিরুপতি দর্শনে এসেছিলাম। বেশ উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই আঁকা-বাঁকা পথে বাসে করে পাহাড়ে উঠতে হয়। পাহাড়ের ওপর উঠেই অবাক! রীতিমতো শহর। যাই হোক এখান থেকে কিছুদূর হাঁটলে বা রিকশায় গেলে তিরুপতির মন্দির।

বেজায় ভিড়। দর্শনপ্রার্থীদের লম্বা লাইন। পুজো দিতে দিতে বিকেল হয়ে গেল। তার পর জায়গাটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। পশ্চিম বাংলা থেকে এত দূর আসা তো আর বার বার হয় না। হয়তো এই প্রথম—এই শেষ।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নামার জন্যে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। কিন্তু হায়! লাস্ট বাস পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছে। আজ আর নীচে নামার উপায় নেই।

মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কী করব এখন? এদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু ওদিকে—অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে জমাট অন্ধকার। ঐ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ নেমে গিয়েছে। দুপাশে পাহাড়ী জঙ্গল। দেখলেও ভয় করে।

তা হলে? বললাম বটে জায়গাটা শহরের মতো কিন্তু গেরস্তবাড়ি বিশেষ নেই। দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস এইসবই বেশি।

গেরস্ত লোক যদি-বা থাকে তাহলেও কি এই অজানা অচেনা একজন বাঙালিকে কেউ আশ্রয় দেবে?

কী করব ভাবছি। এই সময়ে ঐ মানুষটির আবির্ভাব। ও যেন দেখেই আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, বাস ফেল করেছেন?

এই রকম একটা জায়গায় ঐ রকম চেহারার মানুষের কাছে বাংলা কথা শুনব আশা করি নি। বিনীতভাবে বললাম, হ্যাঁ। লাস্টবাস কখন জানতাম না।

—তা হলে এখন কি করবেন ভাবছেন?

—কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।

লোকটি হাসল।—তবে চলে আসুন এই গরিবের কুটিরে।

তাই যেতে হল।

কুটিরই বটে! চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। তারই মধ্যে পাথর দিয়ে ঘেরা ঘরের মতো। মাথা গোঁজার আস্তানা। ভেতরে পিলসুজের ওপর মস্ত এক পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। তারই ঘোলাটে আলোয় গুহাটা দেখলাম। একপাশে একটা খাটিয়া। একটা কম্বল আর তেলচিটে বালিশ। একটা দড়ি টাঙানো। তাতে গোটা দুয়েক ময়লা প্যান্ট—একটা ছেঁড়া তোয়ালে।

গুহার ওদিকে একটা কালো পর্দা টাঙানো—যেন থিয়েটারের স্টেজের স্ক্রিন।

লোকটি বলল, তিরুপতি তো দর্শন করলেন। আমার ঠাকুর দেখবেন না?

বলে পর্দাটা সরিয়ে দিল। সংগে সংগে যা দেখলাম তাতে আমার গা শিউরে উঠল। ফুল পাতা ভরা একটা পুরনো কাঠের গামলার মধ্যে একটা মড়ার খুলি বসানো। খুলিটা সিঁদুরে সিঁদুরে লাল হয়ে গেছে।

এই রকম সিঁদুরমাখা খুলি আমি সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে অনেক দেখেছি। এর জন্যে গা শিউরে ওঠে নি। শিউরে উঠেছিল অত বড়ো খুলি কখনো দেখি নি বলে।

এ কি মানুষের খুলি?

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

—কি ভাবছেন?

—এত বড়ো খুলি কোথায় পেলেন? এ কি মানুষের?

লোকটি আবার হাসল। বলল, দানিকেন পড়েছেন তো? সেই অতিমানবের কথা?

আশ্চর্য হলাম। এ লোকটা দানিকেনও পড়েছে!

মুখে বললাম, হ্যাঁ, ওর সব কখানা বইই আমার পড়া।

লোকটি বলল, আমিও ওঁর মতে বিশ্বাসী। তা ছাড়া এই খুলিটাই তো একটা মস্ত প্রমাণ। নয় কি?

—এটা পেলেন কোথায়?

এবারও এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল, তবে দানিকেনের চেয়ে আমি আরো কিছু গভীর তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলে মৃদু হেসে অন্য প্রসংগে চলে গেল। আমিও আর কৌতূহল দেখালাম না।

সেদিন পাহাড়ের গুহায় কলা চিঁড়ে আর দুধ খেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে রাত্রিবাস হল। বেশ ভালো করেই আলাপ জমল। লোকটির নাম কেশব রাও। জন্ম অনন্তপুর জেলায় পেনুকোণ্ডা শহরের কাছে। দীর্ঘকাল দেশ ছাড়া। এখন বাস তিরুপতির এই পাহাড়ে। লোকটির বিষয়ে আমি প্রথমে বলেছিলাম বেশ মজার লোক কিন্তু পরে মনে হয়েছে লোকটা বোধহয় একটু বিশেষ ধরনের পাগল।

প্রায় সারা রাত ধরে সে এমন সব কথা শোনালো যা পাগলামো ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

সে বললে, দানিকেনের মতে বহু সহস্র বছর আগে ভিন্ গ্রহ থেকে যে অতিমানবেরা পৃথিবী প্রায় আবিষ্কার করেছিল এক সময়ে তারা আবার তাদের নিজেদের গ্রহেই ফিরে গিয়েছিল। এটা আমার মতে অ্যাবসার্ড—অসম্ভব।

কেশব রাও একটু হাসল। তারপর বলল, আমি মনে করি তারা কেউ ফিরে যায় নি। পৃথিবীতেই ছিল—পৃথিবীতেই আছে—যে কোনো আকার নিয়ে।

তারপর ও বলল, তার এখন অনেক কাজ। সারা পৃথিবী ঘুরতে হবে। এইরকম খুলি আর কোথায় পাওয়া যায় দেখতে হবে।

একটু থেমে বলল, শুধু খুলি বা কঙ্কাল নয়। আমি বিশ্বাস করি তাদের আত্মাও এখনো বিশেষ বিশেষ জায়গায় আছে।

আমি আবার শিউরে উঠলাম।

এরপর সে যেন নিজের মনেই বলল—সব চেয়ে আগে যাওয়া দরকার ইস্ট্ ইউরোপে। কার্পাথিয়ান রেঞ্জ—ট্রানসিলভেনিয়া—মোণ্ডাভিয়া—বুরোভিনা—বিসট্রিজ—

এ সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তবু কিছু বলা উচিত মনে করেই বললাম—জায়গাগুলোর নামও তো শুনি নি।

কেশব রাও সরু করে হেসে বলল, ড্রাকুলা পড়েন নি? ব্রাম স্ট্রোকারের ড্রাকুলা? সেই যে রক্তপায়ী পিশাচ—যারা কত কাল ধরে—অ-মৃত অবস্থায় কবরে থাকে। কিন্তু রাত হলেই মানুষ-শিকারে বেরোয়!

আমি বললাম, হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু সে তো গল্প।

—গল্প! কেশবের চোখ দুটো গোল গোল দেখালো।—আমি যদি তার প্রমাণ দেখাতে পারি?

সর্বনাশ! বললাম, না—না, প্রমাণে দরকার নেই।

—সেসব জায়গায় আমায় যেতে হবে। কিছু যে একটা আছে তা খুঁজে বের করতে হবে।

আমি নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

এইভাবে সেই পাথরের গুহায় রাত কাটল। আমি খাটিয়ায় আর কেশব মাটিতে একটা বহু পুরনো বাঘছাল পেতে শুয়ে রইল।

সত্যি কথা বলতে কি সারা রাত বেশ ভয়ে ভয়েই কেটেছে। ভয়টা কেশবকে না তবে ঐ অদ্ভুত ঠাকুরটিকে না অন্য কিছুতে বুঝতে পারি নি।

ভোর হলে প্রথম বাসটাই ধরার জন্যে যখন বিদায় নিচ্ছি তখন ভদ্রতার খাতিরে কেশবকে বললাম, যদি কখনো কলকাতায় আসেন তো দয়া করে আমার বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

কেশব তখনই বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় একবার আমায় যেতে হবে। বলে ঠিকানাটা দুর্বোধ্য ভাষায় লিখে নিল।

অনেক দিন কেটে গিয়েছে কেশবের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন আমাদের কসবার বাড়িতে কেশব এসে হাজির। ওকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারি নি। কি করে চিনব? কুচকুচে কালো রঙ, মুখে চাপ দাড়ি—যা আগে ছিল না—পরনে দিব্যি শার্ট ও ট্রাউজার—চোখে বিদ্‌ঘুটে কালো সানগ্লাস। বাঁ হাতে একটা বড়ো পুঁটলি আর ডান হাতে স্যুটকেস। কেশব রাও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে।

যখন ও পরিচয় দিল তখন আমি সত্যিই খুশী হলাম। আমার মনে পড়ল সেই রাত্রে আশ্রয় দেওয়ার কথা। আশ্রয় না পেলে কী হত বলতে পারি না। সেই আশ্রয়দাতা আজ এসেছে আমার অতিথি হয়ে। এ কী কম সৌভাগ্য!

তা ছাড়া তিরুপতি থেকে ফিরে এসে এই কেশবের কথা বাড়িতে সবার কাছে গল্প করেছিলাম। ভাইপো-ভাইঝিরা তো কেশবের কথা শুনে রোমাঞ্চিত। কবে কেশব আসবে তার জন্যে পথ চেয়ে থাকত। এত দিন পর শেষ পর্যন্ত সে সশরীরে হাজির।

ছেলেমেয়েরা বেশ আগ্রহ করেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু কী জানি কেন ওকে দেখে প্রথমেই ছেলেমেয়েরা কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে কি ওর কুচকুচে কালো রঙের জন্য না কি ওর ঐ বিদ্‌ঘুটে চশমাটার জন্যে?

যাই হোক্ দিন দুয়েকের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। ভাবটা ওদের সঙ্গে এমন জমল যে আমাকে যেন আর ওর দরকারই হয় না।

তবু দরকার হত।

একদিন বলল, কলকাতায় পার্কস্ট্রীট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে নাকি খুব পুরনো কালের কবর আছে?

সর্বনাশ! এখানে এসেও যে কবরখানার খোঁজ করে!

মুখে বললাম, হ্যাঁ, তা আছে। তবে খুব আর কি পুরনো? মাত্র শ' দু আড়াই বছর আগের।

—তাতেই হবে। আপনি একদিন নিয়ে চলুন।

অগত্যা কেশবকে নিয়ে একদিন—যা কখনো করি নি তাই করলাম। কবরখানায় ঢুকলাম। সার্কুলার রোড আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গাছপালায় ঢাকা সেই পুরনো কবরখানা। ঢুকতেই গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। কিন্তু কেশবের এসব কিছুই হল না। সে মহা আনন্দে বাঁধানো কবরগুলো দেখতে লাগল। তারপর একটা খুব পুরনো ভাঙাচোরা কবরের কাছে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর ও উবু হয়ে বসল। তারপর তার হাতের লাঠিটা চালিয়ে দিল কবরের মাটির নীচে। এক সময়ে লাঠিটা সরিয়ে নিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল।

আমি তো ভয়ে কাঁটা। সাপে কামড়াবে যে! পাগল আর কাকে বলে!

ওকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি।

কিছুক্ষণ কবরের মাটি হাতড়াবার পর ও উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে খুশ মেজাজে বলল, ঠিক হ্যায়।

কি 'ঠিক হ্যায়' তা আর জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হল না।

এরপর সে জানতে চাইল পুরনো কবরখানা আর কোথায় আছে। হুগলিতে ডাচেদের সময়ের অনেক কবর আছে শুনে সেখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এদিকে বাড়িতে যেন কেমন একটু গোলমাল শুরু হয়েছে। ছেলেমেয়েদের তো পড়াশোনা মাথায় উঠেছে। তারা কেশবকে আঙ্কেল বলে ডাকে। আর গল্প শোনে। সবই ভূতের গল্প। কেশব লোকটার এই একটা গুণ—নির্জন পাহাড়ে দেশের লোক হলেও সে বেশ মিশতে পারে। ছেলেদের সঙ্গে এই মেশবার ক্ষমতা কোথা থেকে পেল কে জানে! গুহায় বাস করে এমন শার্ট-প্যান্টই বা পায় কোথা থেকে কে বলবে!

যাই হোক রোজ সন্ধ্যের সময়ে ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরত।—গল্প বলো আঙ্কেল। ভূতের গল্প। তোমার নিজের চোখে দেখা ভূতের গল্প।

আঙ্কেল অমনি গল্প শুরু করে দিত। এক-একদিন শুনতাম দানিকেন-ড্রাকুলাও এসে পড়েছে। মনে মনে হাসতাম।

কিন্তু নিছক হাসির ব্যাপার যে ছিল না তা সপ্তাহ খানেক পর থেকেই টের পেতে লাগলাম।

আমার ঘুমটা বরাবরই খুব পাতলা। একটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়।

ক'দিন থেকেই রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। আর শুনতে পাচ্ছি নীচের যে ঘরে কেশব থাকে সেই ঘরে ঠুন্ ঠুন্ করে কিসের যেন শব্দ। ঠিক যেন কে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করছে।

একদিন দিদিমাও সেই শব্দ শুনলেন। পরের দিন সকালে বললেন, তোর ঐ কেশবের ঘরে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল কে?

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম।—ধ্যেৎ, অত রাতে খামকা ঘণ্টা বাজাতে যাবে কে?

উড়িয়ে দিলাম বটে কিন্তু মনে খটকা বিঁধে রইল। কেশবই কি গভীর রাতে পুজো করে? কার পুজো? তবে কি ও ওর ঠাকুর—সেই বিকট খুলিটা এখানে নিয়ে এসেছে!

ভাবতেও গা শিউরে উঠল। কিন্তু এসব কথা কেশবকে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। ও বলবে না। উল্টে চটে যাবে।

সেদিন আর-এক কান্ড! দুপুরবেলা বাড়িতে কেউ ছিল না। কেশবের ঘরে তালা বন্ধ। ওকে নিয়ে হুগলির একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। বলা হয়নি—ইদানিং ও ধরেছিল গ্রাম দেখবে। গ্রাম দেখবে না ছাই। খুঁজবে গ্রামের পুরনো কবরখানা।

যাই হোক, বাড়িতে কেউ নেই। ছেলেমেয়েরাও ইস্কুলে। মা নীচে নামছিলেন। দিদিমা তো ঘুমোচ্ছেন। কেশবের ঘরের কাছে আসতেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট শুনলেন সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে খট্ খট্ করে কী যেন চলে বেড়াচ্ছে।

মায়ের মুখে এ কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমার স্থির বিশ্বাস হল কেশব সেই খুলিটা এখানে নিয়ে এসেছে।

পরের দিনই—কেশব যখন স্নান করতে গিয়েছে তখন চুপি চুপি ওর ঘরে ঢুকলাম। আমার সন্দেহ ছিল ওর পুঁটলিটায় কিছু আছে। সেটা খুলে ফেললাম। দেখলাম ভেতরে কালো কাপড়ে জড়ানো কী রয়েছে! আমার হাত কেঁপে উঠল। কোনো রকমে পুঁটলিটা বেঁধে বেরিয়ে এলাম।

তারপর মনে মনে কেবলই চিন্তা করতে লাগলাম লোকটা কবে এখান থেকে যাবে।

আমি ওর চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলে কী হবে? ছেলেরা ওকে ছাড়তে চায় না। ওরা কেবল জেদ ধরে—আঙ্কেল, সত্যি, ভূত বলে কিছু আছে? সত্যি, তুমি ভূত দেখেছ? তা হলে আমাদের ভূত দেখাও।

এই ভূত দেখাবার কথা হলেই ওদের আঙ্কেল কিন্তু সত্যি সত্যি চটে যায়। ধমকে উঠে বলে, ছেলেমানুষি নাকি? ভূত দেখাব বললেই দেখানো যায়? নাকি দেখব বললেই দেখা যায়?

কথাটা একটু ধমকানির সুরেই বোধহয় বলেছিল যার জন্যে আমার যে ভাইঝিটি ওকে সবচেয়ে ভালোবাসত সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বলে গেল, আঙ্কেল, তোমার সঙ্গে আড়ি—জন্মের মতো আড়ি। আর কখনো তোমার কাছে গল্প শুনব না।

আচ্ছা জেদী মেয়ে এই রুণা। তারপর কতবার কেশব সাধ্য সাধনা করেছে ও আর আঙ্কেলের কাছে আসে নি। ভূত দেখতেও চায় নি।

এর ক'দিন পরেই কেশব হঠাৎ বলল, চললাম।

আঃ! এর চেয়ে সুখবর বুঝি আর কিছু হয় না।

মুখে বললাম, এরই মধ্যে যাবেন কেন?

কেশব বললে, অনেক দিন তো থাকলাম। আর নয়।

—কোথায় যাবেন? ইস্ট ইউরোপ?

—না, আগে নেপাল।

কেন হঠাৎ নেপাল যাবেন তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

যাবার দিন বিদায়ের পালা। ছেলেমেয়েদের চোখ ছলছল। রুণাও এসেছে। কেশব ওকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। তাই একটু আদর করল। ওর চোখেও জল। রুণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আঙ্কেল, তুমি আবার আসবে তো?

কেশব তার স্বভাব মতো হাসল—আমার ওপর রাগ পড়েছে তো দিদিমণি?

—বা, তুমি তো ভূত দেখালে না?

কেশবের মুখটা শুকিয়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ভূত কি কাউকে দেখানো যায়? এ কি সম্ভব?

আমি রুণাকে একটু বকলাম। রুণা মুখ ভার করে রইল।

—আবার আসবে তো? ছেলেরা জিজ্ঞেস করল।

কেশব কি ভেবে বলল, কথা দিচ্ছি না। তবে আসবার চেষ্টা করব যদি মরে না যাই।

আমার ভাগ্নেটি একটু ডেঁপো। বলে উঠল—তুমি মরে গেছ কিনা জানব কি করে? আমরা তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

কেশব কী ভাবল। তারপর হঠাৎ ঘরে গিয়ে পুঁটলি খুলে কি একটা রোল করা কাগজ এনে আমার হাতে দিল। সেটা খুলে দেখি—একটা ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের ছবিটা অদ্ভুত। ছাপা নয়। কেশবই বোধহয়—নিজে হাতে গোটা-কতক ছক্ক কেটে ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে এঁটে রেখেছে?

ক্যালেণ্ডারটা হাতে নিয়ে আমি বললাম, এটা নিয়ে কি করব?

ও বলল, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন। যেদিন দেখবেন ক্যালেণ্ডারটা উল্টে গেছে সেদিন বুঝবেন আমি আর নেই।

এ আবার কী কথা! অবাক হব, না হাসব, না ভয় পাব বুঝে উঠতে পারলাম না।

বছর দুই তিন কেটে গেছে। কেশবের কথা ভুলেই গেছি। ছেলেমেয়েরাও ইতিমধ্যে বেশ বড়ো হয়ে গেছে।

সেদিন বাইরের ঘরে ওরা পড়াশোনা করছে। আমি একটা ম্যাগাজিন পড়ছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন দরজার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে তাকিয়ে দেখি—কেশব রাও। দরজায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি। সেই কুচকুচে কালো রঙ আর নেই। কেমন যেন ফ্যাকাশে। মুখটা শুকনো। ঘন কালো দাড়ির বদলে পাতলা পাতলা বিবর্ণ দাড়ি ঝুলছে। চুল এলোমেলো। সবচেয়ে অবাক হলাম—ওর হাতে সুটকেসও নেই—সেই পুঁটলিটাও নেই।

—রাও সাহেব না?

কেশব রাও একটু হেসে আমায় নমস্কার করল।

—আসুন—আসুন। স্বাগতম।

ছেলেমেয়েরাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল—আঙ্কেল, গল্প—!

আমি ওদের ধমকে শান্ত করলাম।

ছেলেমেয়েরাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল আঙ্কেল, গল্প!

আপনি আরও, আরও চাইবেন—মনে হবে আরও খাই।

মর্টন-এর রকমারি সুইট পাবেন নানা স্বাদে,—
ক্রীমের সরেস স্বাদে, দুধের স্বাদে, যেমন—চকলেট কুকিজ্, কোকোনাট কুকিজ্, রোজ এক্লেয়ার্স, চকলেট আর সুপরিম টফি, ল্যাকটোবনবন ও ডিলাক্স টফি।

বাড়তি শক্তি যোগাতে এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর দুধ আর গ্লুকোজ। ছেলে-বুড়ো সবারই সমান প্রিয়।

MORTON
SWEETS

CC/M-2/85/BEN

মর্টন কনফেকশনারি অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি
পোঃ অঃ মারহাওড়া (জেলাঃ সরণ), বিহার।

—আজ উনি ক্লান্ত। দেখছ না ভালো করে দাঁড়াতেও পারছে না।

তারপর কেশবকে সেই ঘরে নিয়ে এলাম। বললাম, খাওয়া-দাওয়া করে আজ বিশ্রাম করুন। কাল সবাই মিলে গল্প শুনব।

কেশব কিন্তু কিছুই খেতে চাইল না। বলল, আমি একটু ঘুমোতে চাই। আমি ওখানেই ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক। কেশব নেই। ঘর খালি। কিরকম হল? এত সকালে গেল কোথায়?

বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—যেমন ফর্সা চাদর পেতে দিয়েছিলাম তেমনই আছে। কেউ যে শুয়েছিল তা মনে হয় না। গেলাসে জল দিয়েছিলাম। সেটাও ঠিক তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। অর্থাৎ ঘরে যে কেউ ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই।

মনে মনে যেমন অবাক হলাম তেমনি দুঃখও পেলাম—কেশবের এমনি ভাবে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

এমনি সময়ে কে যেন এসে আমায় দ্বিগুণ অবাক করে দিয়ে বলল, পালিয়ে যাবে কি বাইরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধই রয়েছে।

এইবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে আবার কী!

এ রহস্যের মীমাংসা আমরা কেউ করতে পারলাম না। তবে সেইদিনই খবরের কাগজের এক কোণে একটা ছোট্ট খবর ছিল। পার্ক স্ট্রীটের পুরনো কবরখানায় এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে ছিল একটা পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে পাওয়া গেছে একটা অস্বাভাবিক মড়ার মাথার খুলি! পুলিস তদন্ত করছে।

আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটি কেশব রাও ছাড়া আর কেউ নয়। তার বডি পাওয়া গেছে কাল সকালে। তাহলে কাল রাত্তিরে আমার বাড়ি কে এল?

কেনই বা শুধু এক রাত্তিরের জন্যে এল? আর—আর তার মৃত্যু হঠাৎ কবরখানাতেই বা হল কেন?

সবই রহস্যময়।

তখনই কী মনে হল ছুটলাম পাশের ঘরে। দেখি রুণু কখন এ ঘরে এসে ক্যালেন্ডারটার দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। ক্যালেন্ডারটা এত দিন পর কে যেন উল্টে দিয়েছে।

ছবি—সুশান্ত বিশ্বাস

গ্রামের নাম কলকাতা

অমিতাভ চৌধুরী

এক যে আছে গ্রাম
কলকাতা তার নাম।
বৃষ্টি পড়ে যদি
রাস্তারা হয় নদী।
চারদিকেতে ডোবা
আবর্জনার শোভা।
ধুলো গলে কাদা
গাদা গাদা গাদা।
বৃষ্টি যখন নেই
খরাতে জ্বলছেই।
জলের হাহাকার
রাত্রে অন্ধকার।
ডাক পাড়ে সব ঝিঁঝি
ভূতের হিজিবিজি।
ঠেলা গরুর গাড়ি
সবার তাড়াতাড়ি।

চায় যে যেতে আগে
মানা করলে রাগে।
আইন কানুন নাই
সকলে ঠাঁই ঠাঁই।
থাকার মধ্যে ভিড়
গা-গিজগিজ স্থির।
চোখজ্বলুনি ধোঁয়া
এবং ঢেঁকুর চোঁয়া।
বলতে হবে তবু
মন্দ সে নয় কভু।
সকল দেশের রাণী
কৃষ্টির রাজধানী।
নয়াদিল্লিই বাম
কলকাতা নয় গ্রাম।

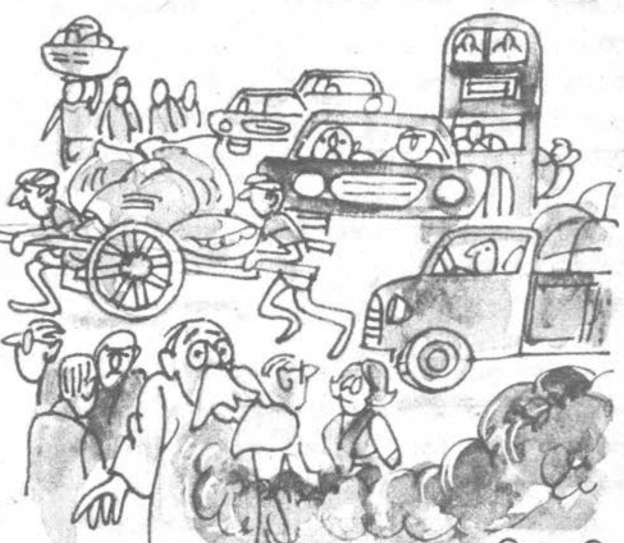

ছবি ঃ সুফি

দিশারী

শিশিরকুমার মজুমদার

লোকটার চালচলনে আমার গা জ্বলে গেল। পথের মাঝে থেমে ও বলল, ও সব পারব না বাপু। আমি কি কুলি যে মোট বইব? পথ চেন না, তাই দয়া করে চিনিয়ে দিতে চলেছি। তার জন্য যে তুমি বারবার কিছু ধরে দেবে বলেছ, তা নিয়ে আমি কি কোনও কথা বলেছি? কত দেবে, দশ বিশ? তবেই হয়েছে। জানি শেষ পর্যন্ত দেবে তো ক'গন্ডা পয়সা। ওতে আমার দরকার নেই। নাও এখন বাঁ পাশে ফের। ফিরে চল সোজা। আহা, বাঁপাশ বলেছি শুনতে পাচ্ছ না? সোজা যাচ্ছ যে বড়?

থমকে থেমে আমি বাঁ পাশের পথটা ধরে এগোলাম। লোকটা আসছে আমার পিছন পিছন। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল আমার।

বদরপুর স্টেশনে নেমে বিপদে পড়লাম। মাধব না পাঠিয়েছে গাড়ি, না পাঠিয়েছে লোক। খাঁ-খাঁ জন-শূন্য স্টেশনে আমি একা। প্লাটফর্ম জনশূন্য। স্টেশনের বাবুরাও কেউ ঘর থেকে বার হন নি।

ট্রেনটা চলে যেতেই আবছা অন্ধকারে ঢাকল চারদিক। কোন দিকে যে যাব, কোন দিকে যে হরিশপুর কে জানে। এখন এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মাঝে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকেও যে কোনো লাভ হবে না তা বুঝলাম। বিছানার বান্ডিলটা এক হাতে কাঁধে তুলে অন্য হাতে সুটকেসটা ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে। যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের একজন বেশ বিরক্তিতে বললেন, হরিশপুর যাবেন তো এ গাড়িতে এলেন কেন? ও তো অনেক দূরের পথ। তা এসেছেন যখন, চলে যান নাক বরাবর। পথে লোকচলাচল পাবেন না সন্ধ্যের পর। তবে ভয়ের তেমন কিছু নেই। যান,চলে যান।

অগত্যা কাঁধে বিছানা আর হাতে সুটকেসটা ঝুলিয়ে হাঁটা দিলাম। সুটকেস ভারি না হলেও দামী কিছু জিনিস আছে। মাধবকে তা-ই পৌঁছে দিতে চলেছি। কদিন পরে ওর মেয়ের বিয়ে। ও ছুটি নিয়ে বসে আছে। আর সে কারণেই এ কাজের ভার পড়েছে আমার উপরে।

কিছু দূর হেঁটে এসে মনে হলো বোঝা দুটোই বিশ টন ওজনের! কত পথ যে হাঁটতে হবে কে জানে, গোটা পথ ও দুটো যে কি করে বয়ে নিয়ে যাব!

সত্যিই পথে আর কারও দেখা পেলাম না। আশেপাশে ঝোপ জঙ্গল অনেক, কিন্তু কোথাও কোনো গাঁ নেই। বেশ ভয় ভয়ই করতে লাগল আমার। অন্ধকারও দেখতে দেখতে বেশ ঘনাল। গাঁয়ে যে রাতের

অন্ধকার এত মিশকালো হয় সে ধারণা আমার ছিল না, জানলে কখনও এমন ভাবে আসতাম না। এখন কতক্ষণে যে হরিশপুরে পৌঁছাব কে জানে।

আচ্ছা বোকা তো মাধব, আমাকে কাজের ভার দিয়েছে, অথচ ওর এখানে আসতে যে এত ঝামেলা তা জানায়নি। আর আমার চিঠি পেয়েও কোনো ব্যবস্থাই করেনি।

ঠিক তখনি ঘন ঝোপের ধারে কেমন যেন আওয়াজ উঠতে চমকে দেখলাম একজন লোক পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কালো অন্ধকারের থেকেও কালো বোধ হয় ওর গায়ের রং, নইলে রাতের অন্ধকারে আমি ওকে এক নজরেই দেখতে পেলাম কি করে? নির্বিকার চিত্তে ও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম, হরিশপুর আর কত দূরে বলতে পার?

ও বলল, কোন হরিশপুর? চাতরা হরিশপুর না এমনি হরিশপুর?

সর্বনাশ, কই মাধব তো এসব কথা বলে নি। এখানে যে দুটো হরিশপুর আছে তা আমি জানব কেমন করে?

ও বলল, কী? জান না মনে হচ্ছে! তা বাপু কার বাড়ি যাওয়া হবে শুনি? এ তল্লাটের দশখানা গাঁয়ের সবাই আমার চেনা।

সাহস পেয়ে আমি বললাম, ওই যে মাধবনারায়ণ রায়, এক কালে যাদের পূর্বপুরুষেরা এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন, তাঁদের বাড়িতে যেতে চাই। বিয়ে আছে তাঁদের বাড়িতে, সে কাজেই এসেছি।

ও বলল, অ, তাই বল। তা সে পথ কি তুমি এই আঁধারে চিনে যেতে পারবে? সঙ্গে আবার তো বোঝা রয়েছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কেন পথে কি কোনও গোলমাল আছে? ও গাঁ কত দূর এখান থেকে, যেতে কতক্ষণ লাগবে?

ও বলল, তা হবে কোশখানেক পথ। না, না, ভয় পেও না। ডাল ভাঙা কোশ নয়। পথে সরকারি নিশানা আছে। তবে বলছিলাম, পথ তো সিধা নয়, গোলমেলে.....। পারবে কি একা যেতে?

আমি অধীর হয়ে বললাম, তুমি আমাকে পৌঁছে দাও না একটু। এ তো তোমার চেনা জায়গা, খুব অসুবিধা হবে না।

আমার কত কাজ। তাচ্ছিল্যের মতো ও বলল, তবে হ্যাঁ, ও পথে তুমি একা যেতে পারবে না, সে কথাও নিশ্চিত।

এ কথা শুনে যেমন ভয় হলো আমার তেমনি রাগ হলো। লোকটা আমাকে ভয়ও দেখাচ্ছে, আবার হাতেও রাখছে। তার মানে কি দর বাড়াতে চাইছে! বাধ্য হয়েই বললাম, চল না ভাই, আমি না হয় তোমাকে কিছু...

ও ধমকে বলল, এখন তো কত কথাই বলবে। তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ভিন্ন মূর্তি। চেনা আছে সব।

লোকটা একটু ভিজেছে মনে হলো। তাই তাড়াতাড়ি ফের বললাম, না, না, কোনও গোলমাল হবে না। পাঁচ দশ যা চাও তুমি তাই দেব। একটু পৌঁছে দাও ভাই।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল। হঠাৎ বলল, যেতে তো আমাকে হবেই, আর যাব বলেই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তবে কি জান? তোমার ভাল করতে গিয়ে আবার খারাপ কিছু না করে বসি। তা বাপু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি কথা বলবে। হার্টের ব্যামো ট্যামো নেই তো? সত্যি বলবে বাপু।

এমন বিপদে পড়ে আত্মারাম তো প্রায় খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়। এখন আর হার্টের খবর নেয় কে? আর তাতে এই লোকটারই বা দরকার কি? বললাম, না, না, দূর পথ হাঁটা আমার অভ্যাস আছে। ওতে বুক ধড়ফড় করবে না। তুমি ভাই আমাকে নয় একটু পৌঁছেই দাও। বলেছি তো, খুশি...

ও বলল, এগোও এগোও, আমি পিছুতে আছি। ও বাড়ির পাকা সড়কের কাছে ছেড়ে দেব তোমাকে। আগে আর আমি যাব না। আসলে কি জান, আমরা হলাম গিয়ে মাধবদের জ্ঞাতি। ওরা বড়লোক ছিল একদিন, আমরা ছিলাম গরিব। তাই ওদের আমাদের মাঝে অনেক ফারাক! এখন মাধবের অবস্থাও তেমন নয়। তবে ফারাক আর মেটেনি। তা না মিটুক, আমি তো জানি, কি করে বেচারা মেয়ের বিয়ের যোগাড় করছে। তা যতদূর বুঝেছি, জামাইটি হবে ভালো। তা ভালো জামাই পেতে গেলে কিছু খরচপাতি তো করতেই হবে। আমাকে ও নেমন্তন্ন করবে না। বুঝলে, তাই ধুলো গায়েই বিদায় নেব।

লোকটার পরিচয় পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাক ঠিক জায়গায় তাহলে পৌঁছতে পারব। তবে মাধবের অবস্থার কথা আমিও জানি। একসঙ্গে কলকাতার এক মেসে থাকি আমরা দুজনে। একই অফিসে কেরানীর কাজও করি। ওর মেয়ের বিয়ের টাকা যে ও কি করে যোগাড় করছে তাও আমার জানা। সেই টাকার কিছু খরচ করে কলকাতার স্যাকরাকে দিয়ে গহনা গড়ান হয়েছে।

সেই গহনা সুটকেসে ভরে নিয়ে চলেছি আমি। তবে এতটা পথ দুটো বোঝা বয়ে এনে দম ছোটার যোগাড় আমার। লোকটাকে যখন কিছু দিতেই হবে, তখন ওকে বিছানার মোটটা বইতে বললে এমন কি দোষের হবে? বলতেই লোকটা যেন খেঁকিয়ে উঠল!

বাঁক ফিরে একটা পথে পড়লাম, মনে হলো সে পথে বহুদিন কোনও লোক চলে না। কিছুটা এগিয়েই ভীষণ ভয় হলো আমার। ও কি অত সব কথা বলে ভুলিয়ে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে? ও কি কোনো ভাবে বুঝতে পেরেছে, আমার সঙ্গে গহনা আছে। সেই গহনার লোভে এত সব করছে?

দুপাশের কাঁটা ঝোপ গায়ে লাগাতে আমি থমকে দাঁড়ালাম। লোকটা কি সত্যিই মাধবের জ্ঞাতি? না কি ওসব কথা বলে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়! পিছন থেকে ও বলল, কী হলো, থামলে কেন?

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, এ কোথায় নিয়ে চলেছ তুমি? এদিকে পথ কোথায়?

ক'পা এগিয়ে এসে ও বলল, জানি ভয় পাবে তুমি। তাইতো হার্টের কথা জিজ্ঞাসা করেছি। তা, মিথ্যা বলব না, বড় রাস্তা ধরে গেলে পুরো দু কোশ হাঁটতে হতো। আর এই জঙ্গল পথে গেলে এক কোশ। তাছাড়া এ পথে গেলে আমার কাজটা হয়ে যায়। তাই তো এ পথেই এলাম।

আমি বললাম, তুমি পিছন পিছন আসছ কেন? সামনে এস না। তোমার কাজ মানে? তোমার যে কোনও বদ মতলব নেই তা বুঝব কেমন করে?

এ কথা শুনে ও হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। সে হাসি শুনে আমার তো প্রাণ উড়ে গেল। কোনও সন্দেহ নেই, ওর ভীষণ বদ মতলব আছে। আমাকে বোকা বানিয়ে এখানে আনতে পেরেছে বলেই অমন করে হাসছে! আমি মরব। কিন্তু বেচারা মাধব তাহলে আর তার মেয়ের বিয়েই দিতে পারবে না। অত কষ্টে যোগাড় করা টাকা শেষে বদলোকের ভোগে যাবে!

মিছে ভয় পাচ্ছ কেন? ও হঠাৎ বলল, বললাম না, আমি মাধবের জ্ঞাতি। তবে হ্যাঁ, দেখাসাক্ষাৎ নেই বহুকাল। থাকবে কি করে বল? আমিও গরিব মাধবও গরিব, কোনও দেওয়া থোওয়া ছিল না আমাদের মধ্যে, তাহলে সম্বন্ধ থাকে কি করে? তবে হ্যাঁ, যে ইস্তক ওর মেয়ের বিয়ের কথা কানে গেছে, ভাবছি আমি। এমন দুর্দিনে ও কি করে অত খরচ চালাবে? করে তো সামান্য কেরানীর চাকরি। তার উপরে অতবড় সংসার চালিয়ে...ভাবছি, ভাবছি, এমন সময় দেখলাম তুমি আসছ। তখনি একটা মতলব মাথায় এল। তাই তো অত ধানাই পানাই করে শেষ পর্যন্ত আসছি তোমার সঙ্গে, যাতে তুমি না বুঝতে পার, আমারও একটা উদ্দেশ্য আছে। আর এদিকে তুমি কিনা আমার সম্বন্ধে যা তা ভাবছ!

আমি বেশ রাগ দেখিয়েই বললাম, অতসত বুঝি না, যে পথে লোক চলে না, সে পথে এলে কেন তুমি? কি করে তোমাকে আর বিশ্বাস করব?

ও বলল, হ্যাঁ, এ পথে লোক আজকাল আর চলে না বটে। তবে একদিন চলত। ওই দেখ না ওই ঝোপের আড়ালে ওই তো রায় পরিবারের পূর্বপুরুষদের বাস বাড়ি। রাজবাড়িও বলতে পার। এখন ভূতের আড্ডা। ওই বাড়িতেই যাবার পথ ছিল এটা। দুপাশে তখন বাহারী গাছের সারি ছিল। শুনেছি, সময়ে দেউড়িতে নহবৎ বাজত প্রহরে প্রহরে।

ও দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম। ঝোপের আড়ালে অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে আকাশে মাথা তুলে

দাঁড়িয়ে আছে সত্যিই এক বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপ। জমাট অন্ধকারের মতো চেহারা নিয়ে। কোনও সন্দেহ নেই, ও বাড়িতে এখন আর কেউ বাস করে না। আবারও ভীষণ ভয় আমাকে পেয়ে বসল। লোকটা কি আমাকে ওই বাড়িতেই নিয়ে যেতে চায় নাকি! ওই অন্ধকারেই বোধহয় ওর দলের লোকরা লুকিয়ে আছে। ওখানেই আমাকে গুম করে সব কিছু ওরা কেড়ে নেবে!

আজেবাজে চিন্তা কর না তো—লোকটা ধমকে উঠল, ওই বাড়িতেই আগে যাব আমরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছি না আমার একটা কাজ আছে, করতে হবে তোমাকে। তবেই না আমি এসেছি। সে কাজ ওই বাড়িতে। কাজ শেষ না হলে বাপু তোমাকে আর ছাড়ছি না।

আমি শিউরে উঠে বললাম, ও বাড়িতে তো মানুষ থাকে না, ও বাড়িতে তবে কিসের কাজ?

লোকটা একথা শুনে দাঁড়াল একটু। একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, তাহলে তোমাকে আসল কথাটাই বলে ফেলি। ও বাড়ির এক জায়গায় আমাদের পূর্ব-পুরুষের গুপ্তধন লুকান আছে। তুমি জান না, মাধব তার মেয়ের বিয়ের সব টাকা যোগাড় করতে পারেনি। পাত্র ভাল জানি, এদিকে বিয়ে ভাঙো ভাঙো অবস্থা, কগাছা গয়না নিয়ে গিয়ে আর ওর কি উপকার হবে বল? যদি গুপ্তধনের কলসিটা নিয়ে যাও তো ও বেচারার মান বাঁচে।

আমি বললাম, কি আবোল-তাবোল বলছ? গুপ্তধন কোথায় আছে জান তুমি অথচ তা তুলে নাও নি! রেখে দিয়েছ আমার জন্য, আমি তুলে তা দেব মাধবকে?

লোকটা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, সারা জীবন আমি তো ওরই জন্য মাথা খুঁড়ে মরেছি। তখন খুঁজে পাইনি, এখন ওর খবর আমার নখদর্পণে। কিন্তু কি আর হবে ও দিয়ে আমার? ও কথা থাক, এখন যদি ওটা তুমি তুলতে পার তো মাধবটা বাঁচে। মেয়েটার সৎপাত্রে বিয়ে হয়। এত সব ভেবেই না তোমাকে এ পথে এনেছি।

বেশ গল্প ফাঁদতে পারে লোকটা। আমাকে যে করে হোক ভুলিয়ে ওই বাড়ির মধ্যে ও ঢোকাবেই। তা না হলে ওর সুবিধা হচ্ছে না।

ও বলল, আর দেরি কর না। সামনে ক'পা আগেই একটা ভাঙা লোহার রড পড়ে আছে, ওটা তুলে নাও। ওটাই হবে তোমার অস্ত্র।

সুটকেস বিছানা নামিয়ে সত্যিই লোহার রডটা তুলে

ডিস্ট্রিবিউটার ঃ চ্যাটার্জ্জী এন্টারপ্রাইজেস্ ২, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৪

নিলাম আমি। এদিকে বাগানের ঘেরা পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিলের উপরের চোখা লোহার শূলেরই একটা এটা। এটা হাতে থাকলে একাই আমি অনেকের সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ লড়তে পারব। মনে বেশ সাহস এল এতক্ষণে।

ও বলল, আর কি, হাতে তো অস্ত্র পেলে, নাও চল, এখন বাড়িতে ঢুকি। ইঁটের গাঁথুনি ভেঙে কলসটা বার করতে আর তাহলে কতক্ষণই বা লাগবে।

রডটা বাগিয়ে ধরে আমি বললাম, আর আমি কিছুতেই ও বাড়িতে ঢুকছি না। তাতে যা হয় হোক। আমি যে দিক থেকে এসেছি, সেদিকে ফিরে যাব। তুমি আর আমাকে আটকাতে পারবে না।

লোকটা থমকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, বাঃ, বেশ বুদ্ধি তো তোমার। দুহাতে লোহার রড ধরে গায়ে জোর বেড়েছে দেখছি। তা দুহাতেই তো ওটা ধরা, কোন হাতে বিছানার বান্ডিলটা নেবে, কোন হাতে গহনার সুটকেস? হয় লোহার রড নয় সুটকেস কোনটা নেবে? বিছানার কথা নয় ছেড়েই দিলাম।

কথাটা তো বেজায় সত্যি। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম আমি।

ও বলল, বিশ্বাস কর, কোনও বদ মতলব আমার নেই। যতই কেন অসম্ভব আমার কথা মনে হোক না, সবটুকু এর সত্যি। তুমি বিছানা সুটকেস দুটোই এখানে রেখে এস আমার সঙ্গে। তাতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে। না, না, কোনও গোলমালে পড়বে না তুমি।

কি যে করব আমি ভেবে পেলাম না। ভয়ে দুশ্চিন্তায় ভাবার ক্ষমতাও আমার চলে গেছে। কেমন যেন করছে মাথার ভিতর। সব দোষ মাধবের। ও পথের কথা কিছু জানায় নি। এখন তাই পরোপকার করতে গিয়ে আমার প্রাণ যায়।

ও তেমনি করে ঘুরে দাঁড়িয়েই ডাক দিল, এসো, এসো, এসো। আর দাঁড়িও না। আর দাঁড়ালে ফিরতে দেরি হবে। বেশি রাতে গৃহস্থ বাড়িতে গেলে তাদের অসুবিধা। এসো, এসো, এসো তুমি।

ও আর দাঁড়াল না। ঝোপ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

আমার যেন কেমন সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। ভীষণ ভয় আর চূড়ান্ত সন্দেহ নিয়েই কেমন যেন মোহগ্রস্তের মতো এগোলাম ওর পিছন পিছন। যে সুটকেসের চিন্তায় এতক্ষণে আমি প্রায় পাগল হতে বসেছিলাম, তা পড়ে রইলো জঙ্গলের মাঝেই। দুহাতে লোহার রডটা বাগিয়ে ধরে আমি ওর পিছন পিছন ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে গিয়ে দাঁড়ালাম রাজবাড়ির সামনে।

পাশের অনেকটা অংশ ধসে পড়ে গেছে। পড়ে গেছে অনেক দেওয়াল থাম। ইঁট কাঠ কড়ি বরগা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার মাঝ দিয়ে বড় বড় গাছও গজিয়ে গেছে।

ও নিশ্চিন্ত মনে একটা ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে সরু একটা বারান্দার মধ্যে ঢুকে গেল। সেখান থেকে ডাক দিল, এদিকে, এদিকে।

সাপের ভয় ভূতের ভয় সব আছে আমার। তবুও আমি এগিয়ে গিয়ে সে বারান্দা পার হলাম। ভিতরে একটা ঘেরা বাগান ছিল বোধহয়। এদিকে সেদিকে উঁচু বেদীতে কটা ভাঙা মূর্তি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। তারই একটা বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ও বলল, এইখানে, এই বেদীর মধ্যে গুপ্তধনের কলসিটা লুকান আছে। ফাঁপা বেদী, ঠুকে ভেঙে ফেল ওটা।

বেদীটার এক পাশের দেওয়াল ভাঙতেই একটা কুলুংগী বার হয়ে পড়ল। তার মাঝে ছোট্ট একটা পিতলের কলসি রাখা। টেনে নামাতে গিয়ে দেখি বেশ ভারি।

ও খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল, এই সেই গুপ্তধন। হুঁ হুঁ বাবা, আমাকে ধোঁকা দেবে! খুঁজে বার করে তবে ছাড়লাম তো। উঃ কত লোকের কত গঞ্জনা অপমানই না সইতে হয়েছিল। যাক, যাক, সে সব কথা। ভাগ্যিস তখন পাইনি। পেলে কি আর এত দিন এক আধলাও থাকত। এখন পাওয়াতে মাধবটার উপকার হবে।

আমি কলসিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ও বেশ চিন্তা নিয়েই বলল, কিন্তু মাধব এখন এসব কথা প্রমাণ করে কি করে? শেষে না ওকে আবার কেউ চোর চোট্টা ভাবে।

আমি বললাম, বকবক থামিয়ে ফিরবে কি এখন? ওদিকে সুটকেসটা না আবার গায়েব হয়। তাহলে যে আমার হাতে হাতকড়া পড়বে।

ও ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর দেরি করার কোনো মানেই হয় না। চল সুটকেসটা তুলে নেবে চল। ও তোমার ছেঁড়া কম্বল চাদর, ও আর কেউ নেবে না। ভোরে এসে তুলে নিয়ে যেও। এখন তোমাকে ও বাড়ির পথে ছেড়ে আসি চল।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে চলতে চলতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সব তো হলো। এখন তুমি বল তো তুমি কে? এই গুপ্তধনের অংশ তুমি নেবে না কেন? ইঁট মাটিতে ভরা নাকি কলসিটা? মাধবকে ঠকাচ্ছ? না কি ওর গরিব

একদা শ্রী যদুপতি সঙ্গে নিয়ে রাধাসতী যমুনাতে করিলে গমন
অকস্মাৎ শ্রীরাধার, ছিঁড়িল গলার হার, অর্দ্ধেক পাইল নারায়ণ।
তেঁহাই পড়িল জলে, পঞ্চভাগ রইল গলে, ষাসভাগ পেল শিশুগণ
অবশিষ্ট বিংশতি তাহা পেল রাধাসতী কত মুক্তা করহ গণন ॥

উত্তর ৩২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌজন্যে
এম·পি·জুয়েলার্স এণ্ড কোং
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন ও বৃহত্তম জ্যোতিষ সংস্থা
জোড়াসাঁকো-৩৩-১৭৭১/৩৩-৫৭৬৫• গড়িয়াহাট-৪৬-৮১৩৯/৪০

অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওকে নাচাবার তাল করছ? ব্যাপারটা কি ঠিক বল তো?

চলতে চলতেই লোকটা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, জান, বহুদিন আগে একটা অবুঝ ছোট্ট মেয়ে, কতই বা বয়স হবে তার, এই চার কি পাঁচ, তার ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে ছুটে আসত জেঠু জেঠু বলে। ও না বুঝত বড়দের মন, না বুঝত ঝগড়াঝাঁটি দলাদলি। কিন্তু তা বললে তো হবে না। সম্পত্তির ভাগাভাগি হলো। ওর জেঠুকে চলে যেতে হলো বহুদূরে। এসব হলো, কারণ জেঠুর টাকা ছিল না তাই। সেই টাকার নেশাই পেয়ে বসল ওর জেঠুকে। সে নেশা ওই গুপ্তধনের। সবাই ভাবল লোকটা টাকার নেশায় পাগল হয়েছে। কেউ কিন্তু বুঝল না, ওই টাকা দিয়ে ও সেই দুটো ছোট্ট হাতের পরশ আপন বুকের মাঝে ফিরে পেতে চাইছিল। আজ আর ওসব কথার কোনও মানেই হয় না। ওই যে ওই সুপারি গাছের সারি দেখছ, ওই হলো মাধবের বাড়ির পথ। সোজা চলে যাও। ওকে বল, পাত্রটি যখন ভালো, আর ওর যখন আর কোনো অভাবই থাকল না, দেরি হলেও ওখানেই যেন মেয়ের বিয়ে দেয়। আচ্ছা, তুমি এগোও। আমিও চলি।

আমি বললাম, মাধবকে তো তুমি খুব ভালোবাস। তাহলে কেন আর রাগ করে দূরে থাকছ। তুমিও এস না।

অন্ধকারে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, নাঃ, আর তা হবার নয় ভাই। সব কিছু যেন কেমন হয়ে গেছে। আমি চলি, আমি আর থাকতে পারব না। মাধব নিজেই এদিকে আসছে। ওই দেখ...

আমি সুপারি গাছের সারির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লণ্ঠন হাতে একজন গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে এল পথে। আবছা আলোয় সে বোধ হয় আমাকে দেখতে পেল। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, রাঘব ভায়া নাকি? কি যে চিন্তায় ফেলেছিলে আমাকে।

ও গলা মাধবের।

খুশিমনে আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি কোথাও সেই লোকটা নেই! পথ তো এখানে সোজা গেছে, লণ্ঠনের আলোতে তো অনেকদূর দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে ও গেল কোথায়! অবাক কান্ড!

কাছে এসে মাধব বলল, এ কি হাতে কলসি কেন? ওতে কী আছে? আমি বললাম, গুপ্তধন। তোমার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে তোমার এক জ্ঞাতি এটা খুঁজে দিয়েছেন। তিনিই তো আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফেল মাধব। উনি তোমার জন্য খুব ভাবেন।

মাধব কিছুক্ষণ থমকে থেকে বলল, এত রাতে তুমি রাজবাড়িতে গেছিলে?

হ্যাঁ, সেখানেই তো এই কলসিটা পেলাম।

ভূতের ভয়ের কথা থাক। তোমার সাপের ভয় করেনি? দিনেও ভুলে কেউ ওখানে যায় না সাপের ভয়ে।

সঙ্গে তো তোমার সেই জ্ঞাতি ছিলেন। কই সাপটাপ কিছু তো দেখিনি।

মাধব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চল ভিতরে চল। তোমার চিঠি অন্য গাঁয়ে চলে গেছিল। সে গাঁয়ের এক ভদ্রলোক এই তো কিছুক্ষণ আগে আমাকে তা দিয়ে গেলেন। আমি তো তাই ছুটছিলাম স্টেশনে।

কলসির মুখের মাটি সরিয়ে উপুড় করতেই বার হয়ে পড়ল সোনার গহনা, দামী পাথর আর বেশ কিছু আকবরী মোহর। সব রাতের মতো বিছানার তলায় রেখে দিল মাধব। খেতে বসে বলল, গয়ায় একটা পিন্ডি দিতে যেতে হবে আমাকে। বিয়ের হাঙ্গামা মিটুক তখন যাব। বুঝলে, ও হলো আমার গোপাল দাদা। আপন নয়, আবার খুব দূরসম্পর্কেরও নয়। ওর বাবা আমার খুড়ো। ভীষণ কূট প্যাঁচানো মানুষ ছিলেন তিনি। রোজ কিছু না কিছু নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটা হাঙ্গামা বাধাতেন। আমার মেয়ের তখন চার পাঁচ বছর বয়স। ও কি ওসব বুঝত। ওর যত ভাব ছিল গোপালদার সঙ্গে। আমার বাবা বেশি জমির লোভ দেখিয়ে গোপালদার বাবাকে বদরপুরে যেতে রাজি করালেন। গোপালদাও তাই চলে যেতে বাধ্য হলো। আমরা ওর কথা কদিনেই ভুলে গেলাম। কিন্তু আমার মেয়ে সুষমার ভুলতে অনেকদিন লেগেছিল। ওদিকে শুনেছিলাম, গোপালদা নাকি টাকা যোগাড় করতে লেগেছে। টাকা দিয়ে আমাদের বাড়ির কাছেই একটা জমি কিনে আবার একা ওখানে ফিরে আসবে। কিছু করত না গোপালদা, জমির আয় থেকেই চলত, তা কাঁচা টাকা পাবে কোথায়। শেষে ওই গুপ্তধন উদ্ধারে নেমে পড়ল। সবাই বলত, মাথার গোলমাল হয়েছে।

আমি বললাম, সে গুপ্তধন তো উনি পেয়েছেন। আর তার সবটাই তো তোমাকে দিয়েছেন। এখন তোমার উচিত তাঁকে...

মাথা নিচু করে ভাতের থালায় হাত নাড়তে নাড়তে মাধব বলল, বহুদিন আগে এক শীতের রাতে বাড়িতে আগুন লেগে গোপালদা পুড়ে মারা গেছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, তার মানে?

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

তিনটে ম্যাজিক

জাদুকর পি.সি.সরকার(জুনিয়র)

আমি প্রদীপদা লিখছি।

আমার এই লেখা যখন ছাপা হয়ে তোমাদের হাতে আসবে তখন আমি কিন্তু কলকাতায় থাকবো না। থাকবো রুমানিয়ায়। সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া থেকে বলশয় ব্যালে আমাদের দেশে এসেছিল। তার বিনিময়ে ভারত সরকার এই 'সরকার জুনিয়র'কে মেলে ধরেছিলো। সোভিয়েত গভর্নমেন্ট আমাকে সেই চুক্তি অনুযায়ী খুব খাতির করে নিমন্ত্রণ করেন। খবরটা আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্‌, সব্বাই রাশিয়ার পেছনে লাইন লাগিয়ে দিয়েছে। আপাততঃ যা বুঝছি, সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির দৌলতে আমাকে রাশিয়ার পর পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি অন্ততঃপক্ষে মোট আটটা দেশে যেতে হবে।

বিদেশে পাড়ি দেবার আগে আমার হাতে দিন কুড়ি ছুটি ছিল। ছুটি না বলে ছুটির ছুটি বলা ঠিক হবে। ভেবেছিলাম ধীরে সুস্থে তোমাদের জন্য লিখবো আর বেশ কয়েকটা মজার মজার ম্যাজিক শিখিয়ে দেব। কিন্তু খবরের কাগজে আমি 'পি. সি. সরকার কলোনী বা নগরী' পরিকল্পনাটা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিতেই হুড়মুড় করে এতো চিঠি, কাজ এবং চাপ আসতে শুরু হয় যে ছুটির চিন্তাটাকেও ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছি। বিজ্ঞাপনে লিখেছিলাম দয়া করে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে আসবেন না; কিন্তু এতো লোক আমার সংগে দেখা করবার চেষ্টা করছেন যে বাড়ির দরোয়ানও বলছে কমাসের জন্য ছুটি চাই। সব দিক রক্ষা করতে আমি দরজা জানলা বন্ধ করে বাইরে নোটিশ লিখে দিয়েছি– "দয়া করে বিরক্ত করবেন না। আমি বাড়িতে নেই।" লেখাটা পড়ে সবাই হাসছেন...তবে এতে কাজও হয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এখন চিঠির মাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন। আর সেই ফাঁকে আমি এই লেখাটা লিখছি। পুজোর পর যখন বিদেশ থেকে ফিরবো পি. সি. সরকার কলোনীতে কে কে জায়গা পাবেন তা স্থির করবো। এখন চিঠিগুলো আসতে থাকুক। তখনকার কাজ তখন হবে।

এবারে ঠিক করেছি, তোমাদের মোট তিনটে ম্যাজিক শেখাবো। প্রথমটা হচ্ছে একটা রুমালের ম্যাজিক, দ্বিতীয়টা হলো একটা পেন্সিলের আর তৃতীয়টা হলো একটা হিসেবের।

প্রথম ম্যাজিক :

জাদুকর দর্শকদের কাছ থেকে একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে বললেন–"আরে! এটা তো ম্যাজিকের রুমাল, আপনি পেলেন কোথা থেকে?" কথা শুনে ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিক ভাবেই বেশ ঘাবড়ে যাবেন,–ম্যাজিকের রুমাল! সে আবার কি কথা? জাদুকর তখন বললেন, "বিশ্বাস করছেন না?–এর ঠিক মাঝখানে একটা অদৃশ্য দরজা আছে, সেটা ম্যাজিক করে খোলাও যায়–বন্ধও করা যায়। আচ্ছা, প্রমাণ করে দেখাচ্ছি।"

জাদুকর তখন রুমালটাকে টেবিলের ওপর পেতে রেখে বললেন–"দেখুন তো এতে কোনও ফুটো বা দরজা টরজা আছে কি না?" বলাবাহুল্য কোনও ফুটোই তাতে নেই। এবারে জাদুকর একটা পেন বা পেন্সিল নিয়ে সেই রুমালের ঠিক মাঝখানে রেখে ভাঁজ করলেন। ছবি অনুযায়ী ভাবো রুমালটার চারটে কোণের নাম ABCD; জাদুকর পেন্সিলটাকে CD বরাবর রেখে রুমালটাকে ভাঁজ করে 'B' কোণাটাকে 'A' কোণার ওপর রাখলেন। তারপর পেন্সিলটা সমেত রুমালটাকে (3নং) ছবি অনুযায়ী আস্তে আস্তে গুটোতে শুরু করে রুমালটাকে একটা লাঠির মতো লম্বা (4নং ছবি) করে দর্শকের একজনকে B কোণাটাকে চেপে ধরে রাখতে বললেন। আর নিজে A কোণাটাকে ধরে টেনে রুমালটার প্যাঁচ আস্তে আস্তে খুলে মেলে ধরতে শুরু করলেন। রুমালটা

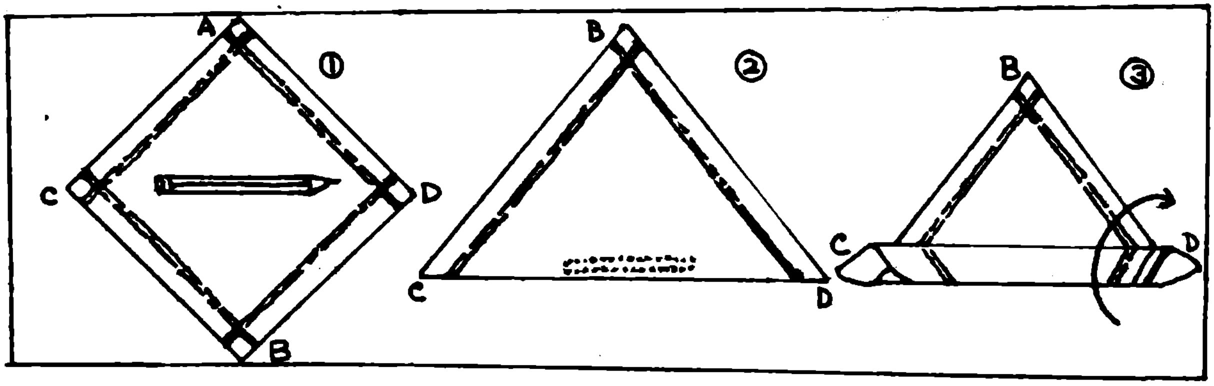

অর্ধেক খোলা হবার পর দর্শকের একজনকে রুমালের মাঝখানটা টিপে দেখতে বললেন–পেন্সিলটা তখনও আছে কী না। বলা বাহুল্য, পেন্সিলটা ভেতরে রয়েছে। জাদুকর এবার সেই দর্শককে বললেন–পেন্সিলটাকে আপনি হাত দিয়ে ঠুকতে থাকুন–আর আমি এই কোণাটা টেনে রুমালটা পুরো মেলে ধরছি। তার কথামতো দর্শক ঠুকতে লাগলেন, জাদুকরও কোণা টেনে রুমালটা মেলে ধরলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! পেন্সিলটা আর রুমালের ওপরে নেই। জাদুকরের কথা মতো এক অদৃশ্য ফুটো বা দরজা দিয়ে রুমালের তলায় ওপিঠে চলে গেছে। পেন্সিলটা তো ওপরে ছিল কিন্তু তলায় গেল কি করে? সবাই তো অবাক!

এর কৌশলটটা এত সহজ যে তোমরা নিজেরাই তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। দ্বিতীয় ছবি অনুযায়ী রুমালটাকে যখন ভাঁজ করবে তখন B কোণাটাকে ঠিক A-এর ওপরে না রেখে একটু ওপরে রেখে রুমালটাকে পাক খাইয়ে যাও। এভাবে পাক খাওয়ালে দেখবে B কোণাটা দর্শকের দিকে আর A কোণাটা পাক খেয়ে খেয়ে তোমার দিকে এসে রয়েছে। এবার ওই A কোণা ধরে টেনে যাও–ব্যস পেন্সিলটা নিজে নিজেই রুমালের তলায় চলে যাবে। দর্শকরা নিজেরা যদি চেষ্টা করে দেখতে চান তখন A কোণার ওপর B কোণাটাকে চাপা দিও–এবং তারপর রুমাল পাক খাইয়ে খুলতে বলো। দেখবে তাহলে পেন্সিল আর রুমালের তলায় যাচ্ছে না।

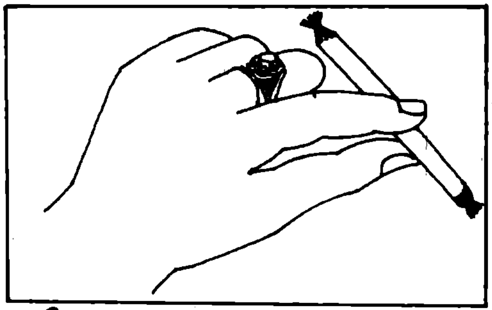

দ্বিতীয় ম্যাজিক:

জাদুকর দর্শকদের হাতে একটা পেন্সিল দিয়ে তার ওপর একটা কাগজ মুড়িয়ে তার দুদিকটাকে লজেন্সের কাগজের মতো করে পেঁচিয়ে দিতে বললেন। তবে হ্যাঁ, কাজটা জাদুকরের চোখের আড়ালে করতে হবে। তারপর বললেন–এর কোন দিকটায় শীস কাটা আর কোন দিকটায় রবার লাগানো তা বাইরে থেকে দেখে মোটেই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি না দেখে, শুধু মাঝখানটা ধরেই বলে দিতে পারবেন কোন দিকে শীস আর কোন দিকে রবার। বলা বাহুল্য, অন্য কারুর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। জাদুকর ওই কাগজে মোড়া পেন্সিলটার ঠিক মাঝবরাবর ধরে একটু উঁচু করে তুলে মনে মনে কি যেন একটা হিসেব করলেন। আর তারপর বলে দিলেন–কোন দিকে কি আছে। কাগজের মোড়ক খুলে দেখা

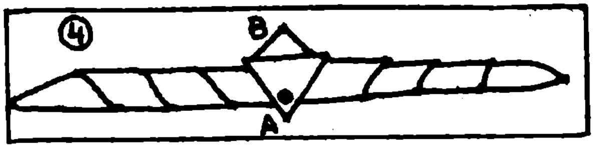

হলো। কি অবাক ব্যাপার, সত্যিই তাই! দর্শকদের অনুরোধে জাদুকর ম্যাজিকটাকে আবার দেখালেন। দর্শকেরা আরও গোপনীয়তা রক্ষা করে পেন্সিলটাকে মোড়ালেন। কিন্তু তবুও জাদুকর সঠিকভাবে বলে দিলেন কোন দিকে কি।

এর কৌশল আশা করি তোমরা একটু আন্দাজ করেছ। ম্যাজিক শিখতে শিখতে নতুন ম্যাজিকের কৌশল সম্পর্কে আইডিয়া এসে যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে–পেন্সিলের যে দিকটা কাটা, সে দিকের ওজন কম। আর যে দিকে রবারটা আছে সেদিকটা তুলনামূলক ভাবে ভারী। সুতরাং পেন্সিলটা আলতো করে মাঝ বরাবর তুলে ধরলে রবারের দিকটা ভারী বলে কাত হয়ে বেঁকে থাকতে চাইবে। বেশী ঝুঁকতে দিও না। বুঝে নিয়েই টাইট করে ধরে জাদু-মন্ত্র করবার অভিনয় চালিয়ে যাও; আর তারপর বলে দিও এদিকে রবার আর ওদিকটা কাটা।

তৃতীয় ম্যাজিক:

জাদুকরের হাতে দুটো মুদ্রা বা কয়েন রয়েছে। একটা পাঁচ পয়সা, আর একটা দশ পয়সা। একজনকে তার দু-হাতে পয়সা দুটোকে আলাদা আলাদা ভাবে ধরতে বললেন। কোন হাতে কি রইলো, তা যেন তিনি জাদুকরকে না বলেন। দর্শক তাঁর ইচ্ছেমতোভাবে কয়েন দুটো দুহাতে রাখবার পর জাদুকর তাঁকে বললেন–ডান হাতে যে পয়সাটা আছে তাকে দশ দিয়ে গুণ করতে। তারপর একইভাবে বাঁ হাতের পয়সাটাকেও মনে মনে দশ দিয়ে গুণ করতে। তবে হ্যাঁ গুণফল কত হলো তা যেন তিনি বলে না ফেলেন; শুধু 'হ্যাঁ করেছি' বললেই চলবে। একইভাবে জাদুকর বললেন–ডান হাতে যা আছে তাকে ঊনিশ দিয়ে গুণ করতে। দর্শক মনে মনে গুণ করে বললেন–'হ্যাঁ করেছি।' জাদুকর তখন বাঁ হাতের পয়সাটাকেও ঊনিশ দিয়ে গুণ করতে বললেন। দর্শক বললেন–'হ্যাঁ করেছি।' এবার জাদুকর নিজে চোখ বন্ধ করে কি যেন একটা হিসেব করলেন–আর তারপর সঠিকভাবে বলে দিলেন দর্শকের কোন হাতে কোন পয়সাটা রয়েছে।

দারুণ নয় কি ম্যাজিকটা? এর কৌশলটা আরও মজার। যে হাতে পাঁচ পয়সাটা আছে সে হাতে ঊনিশ দিয়ে গুণ করে 'হ্যাঁ করেছি' বলতে দর্শক তুলনামূলকভাবে বেশী সময় নেবেন। সেই সময়টাকেই শুধু খেয়াল রেখো। বেশী সময় নেওয়া মানেই হিসেব করতে সময় লাগছে। কিন্তু দশ দিয়ে ঊনিশকে গুণ করতে বেশী সময় লাগবে না। আশা করি ব্যাপারটা বুঝেছ। একটু অভ্যাস করে বন্ধুদের দেখিও, দেখবে ওরা খু-ব ঘাবড়ে গেছে।

ছবির মজা   মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনাশক্তি বাড়াও

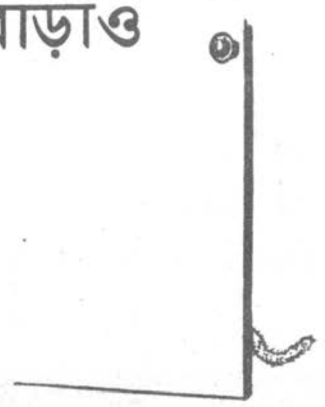

অসম্পূর্ণ অথচ ইংগিত যুক্ত এই ছবিটি কি বলছে? ৩ মিনিট সময়

(উত্তর ৩২০ পৃষ্ঠায়)

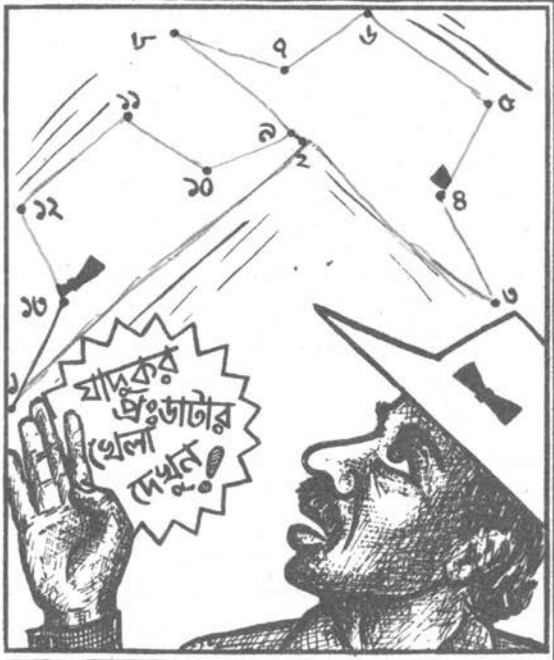

ক

ক/ প্রশান্ত মহাসাগরের সিন্ধুঘোটকদের দাঁত ৭০ সে·মি· পর্যন্ত লম্বা হয়। এই দাঁত দিয়ে তারা পাথরের খাঁজ থেকে "সেল-ফিস" বের করে খায়। আবার প্রয়োজনে ডাঙায় এলে দাঁতের সাহায্যেই হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলে। খ/ জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যের ৯টি গ্রহকে সহজ ভাবে বোঝার জন্য আলাদা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই প্রতীকটি পৃথিবীর

খ

দুনিয়ার সব থেকে লম্বা গোঁফের দাবীদার, ইংল্যান্ডের নর্থ ওয়ালেস অঞ্চলের ফল-বিক্রেতা মিঃ জন এডওয়ার্ডস

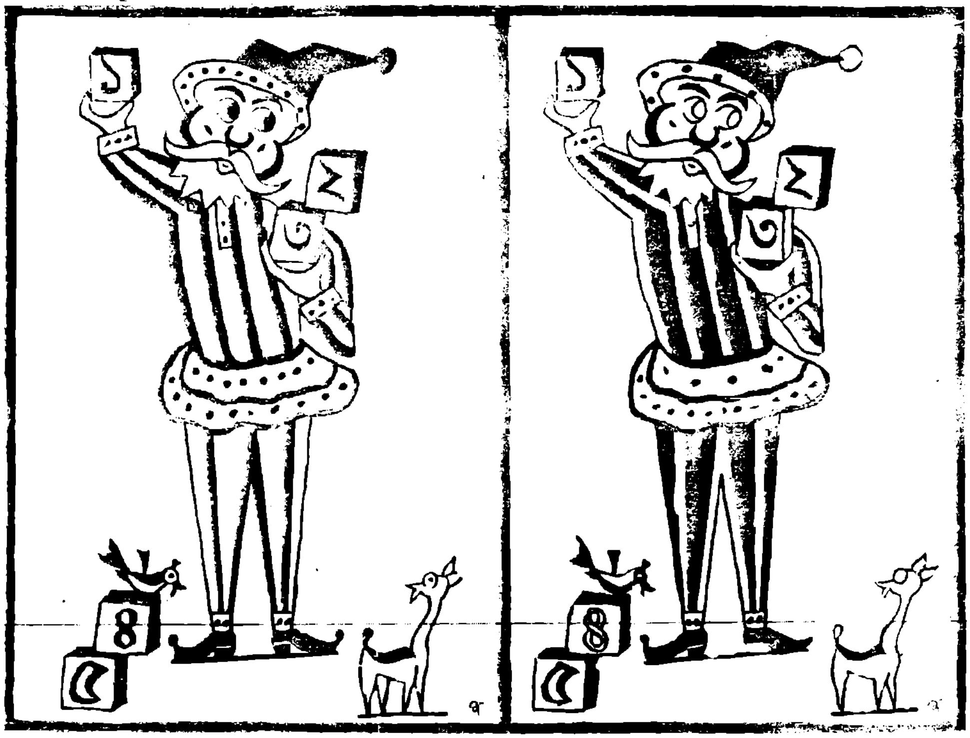

তৈরি করেছেন জয়ন্ত বসু, বাসস্ট্যান্ড রোড, সম্বলপুর।

বাবলু আর তপাই সেদিন গিয়েছিল সার্কাস দেখতে। কত মজার খেলা। বাবলুদের কিন্তু সব থেকে মজা লাগছিল দুই জোকারের খেলা। একজনের নাম রামা, আর একজনের নাম গামা। চেহারা আর পোশাক দুজনেরই এক রকম। বাবলুর কেবল গুলিয়ে যাচ্ছে কোনটা রামা আর কোনটা গামা। তপাই বলল, কেন, আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

এরই মধ্যে রামা-গামা এসে দাঁড়াল পাশাপাশি। বাবলু একবার চোখ রগড়াচ্ছে আর একবার গোনবার চেষ্টা করছে ওদের মধ্যে কী কী তফাৎ আছে। এক, দুই, তিন–ঐ যাঃ, আবার গুলিয়ে গেল।

তোমরা একটু গুনে বলে দেবে নাকি বাবলুকে মোট কতগুলো বিষয়ে তফাৎ আছে। এক মিনিটের মধ্যে গুনে ফেলতে হবে কিন্তু, না পারলে—নিচে উত্তরটা দেখে নাও।

ধাঁধার উত্তর	৩১৯ পাতার ছবির মজার উত্তর
(১) থর	দরজার ফাঁক দিয়ে একটা বেড়াল ঢুকছে
(২) পাবক	উত্তর: মোট ১৭টি বিষয়ে তফাৎ আছে।

ধাঁধা

[১]

উল্টোরথ
যেও নাকো তুমি
উল্টোরথের পথ
গেছে মরুভূমি।

তুহিন মিত্র

[২]

বক্ষ ভেঙে রান্না করি
মাথা কেটে পক্ষী ধরি
পক্ষীর মাথায় চরণ তুলে
আগুনের দেখা মেলে।

সুশান্তকুমার ঘোষ

এম. পি. জুয়েলার্সের ধাঁধার উত্তর

অর্দ্ধেক + তেঁহাই + পঞ্চভাগ + মাসভাগ + বিংশতি =ক মুক্তা

$$ক\left(\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{১৫}+\frac{১}{৩০}\right)+২০=ক$$

$$\frac{২৮\ ক}{৩০}+২০=ক$$

$$ক-\frac{২৮\ ক}{৩০}=২০$$

$$৩০\ ক-২৮\ ক=৬০০$$

ক = ৩০০ মুক্তা

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

চকলেট কেক আর জ্যাম রোল কেক—
টুটী ফ্রুটী কেক আরও অনেক অনেক।
রকমারি স্বাদে কেক, জিভে জল আনে—
ফেরিনীর তৈরী—সেরা গুণমানে॥

Registration No. W.B./E.C.—60 September '85 "Suktara